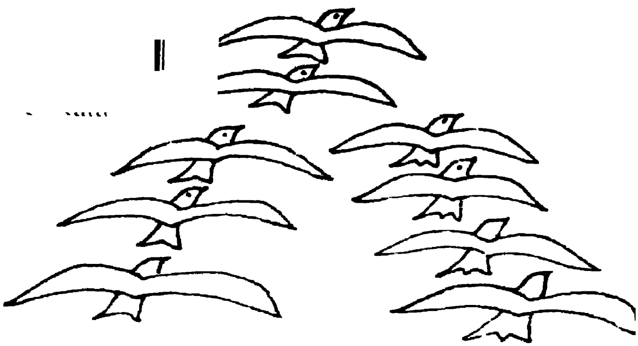
সোনা রূপা নয়

জ্যোতির্ময়ী দেবী



আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা ৯

প্রথম সংস্করণ অক্টোবর ১৯৬৯

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ফণিভূষণ দেব কর্তৃক
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলিকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে প্রকাশিত এবং
আনন্দ প্রেস এ্যান্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে
দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক পি ২৪৮ সি. আই. টি. স্কীম.
নং ৬ এম কলিকাতা ৭০০ ০৫৪ থেকে মুদ্রিত।

আজিকার এই ১৯৬৯ সালে, বহু সাহিত্য-সেবক সেবিত, বহু বিচিত্র শিল্পচিন্তা ও শিল্পরীতিতে সমৃদ্ধ বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে শ্রীযুক্তা জ্যোতির্ময়ী দেবী একটি উজ্জ্বল ও সম্মানিত নাম। তাঁর নামের উজ্জ্বলতায় দীপ্তি আছে কিন্তু উত্তাপ নাই, দাহ নাই; নামেব উচ্চাবণে যে সম্মান ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে তার মধ্যে আন্তরিক সম্ভ্রমের পরিপূর্ণ প্রকাশ থাকে।

শ্রীযুক্তা জ্যোতির্ময়ী দেবী দীর্ঘকাল ধরে বাংলা সাহিত্যের সেবা কবে আসছেন। সাহিত্য-সেবা তাঁব কাছে তাঁব পরিণত অস্তিত্বের শ্রেষ্ঠতম ও শ্লাঘ্যতম অংশ দিয়ে সাহিত্য-সবস্বতীর সেবা করা। তাব চেয়ে কিছু কম নয়, কিছু বেশী নয়। সেই কারণেই সাহিত্য-কর্ম তাঁর কাছে পেশা হয়ে উঠতে পারে নি। বলা বাহুল্য, আমি সাহিত্য-কর্মকে পেশা হিসাবে গ্রহণ কবা কিছু অসংগত কর্ম মনে কবি না। এক্ষেত্রে আমাব বক্তব্য এই যে শ্রীযুক্তা জ্যোতির্ময়ী দেবী সাহিত্য-কর্মকে পেশা হিসাবে গ্রহণ কবেন নি। সেই কারণেই তাঁর রচনার পরিমাণ সুপ্রচুব নয়। দীর্ঘকাল, প্রায় আটচল্লিশ বৎসব, সাহিত্য-কর্মে নিজেকে নিয়োজিত রেখেও তাঁর বচনার পরিমাণ সুপ্রচুর নয়। তাই তাঁব বিচার পরিমাণগত রচনাব বিপুলতার দ্বারা নয়; তাব গুণের ও স্বাদের দ্বাবা তাঁব সাহিত্য-কর্মের বিচাব।

পবিমাণগতভাবে তাঁব বচনা বিপুল নয বলেই বচনার বিশিষ্টতা, বৈচিত্র্য ও উৎকর্ষ সত্ত্বেও সাধারণ পাঠকের শুধু কেন, সাহিত্য রসিকদেব দৃষ্টিতেও তাঁর রচনা পড়তে বিলম্ব হয়েছে। কিন্তু সুখের কথা এই যে বিলম্বে হলেও নজবে পড়েছে। আমি ব্যক্তিগতভাবে বলতে পারি আজ থেকে অন্তত পাঁচ বৎসর পূর্বে শ্রীযুক্তা জ্যোতির্ময়ী দেবীব বচনার প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয। এই কালের পূর্বে যদিও তাঁব একাধিক গ্রন্থ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল তা আমাব চোখে পড়ে নি। অথচ তা একাধিক রসিক ও পণ্ডিতেব দৃষ্টিতে পড়েছিল, এবং সসম্মান স্বীকৃতি অর্জন কবেছিল।

আজ স্মবণ করতে পারি শ্রীযুক্তা জ্যোতির্ময়ী দেবীব প্রথম যে গ্রন্থখানি আমাব হাতে এসেছিল সেখানি তাঁর একটি গল্প-সংকলন, নাম 'আবাবল্লীর কাহিনী'। গ্রন্থের নাম সঙ্গে সঙ্গে কৌতূহল আকর্ষণ করেছিল। কারণ এই নাম সঙ্গে সঙ্গে আর এক মহৎ গ্রন্থেব কথা মনে পড়িয়ে দিয়েছিল; সে নাম বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহ'। যে ভূমিতে বাংলা সাহিত্যের আদি পুরুষ পদপাত কবে গিয়েছেন, সেই বিচিত্র ভূমিতে, সেই অজ্ঞাত, অপরিচিত, রহস্যময়, রোমাঞ্চকর মৃত্তিকায় আর একজন পদক্ষেপ করে কোন্ সাহসে? কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে বইখানি নাড়াচাড়া করতে গিয়েই বইখানির পিছনের মলাটে দৃষ্টি আটকে গেল। শ্রদ্ধেয় পরশুরামের একখানি পত্র ব্লক করে পিছন দিকে ছাপা হয়েছে। গভীরতর কৌতূহল নিয়ে, আগ্রহেব সঙ্গে পত্রখানি পড়লাম।

শ্রদ্ধেয় রাজশেখর লেখিকাব অন্যতর গ্রন্থ 'আবাবল্লীর আড়ালে' সম্পর্কে সংক্ষেপে নিজের মতামত ব্যক্ত করেছেন। তিনি লিখেছেন—"ক্ষীণ দৃষ্টির জন্য আপনার উপহৃত বইগুলি এতদিন পড়তে পারিনি। এখন 'আবাবল্লীব আড়ালে' পড়েছি। কয়েক বৎসর আগে কোনও মাসিক পত্রিকায় আপনার ওমদা বাঈ-এর কথা পড়ে মনে হয়েছিল, বাঙলা সাহিত্যে একজন অসাধারণ শক্তিমতী লেখিকার আবির্ভাব হয়েছে। 'আরাবল্লীব আড়ালে' বই-এ আপনার পূর্ণ শক্তির পরিচয় পাওয়া গেল। টমাস হার্ডির স্নিগ্ধ পল্লীচিত্র, আরব্য উপন্যাসের রহস্য, আব ক্ষুধিত পাষাণের বেদনা আপনি একত্র

সমাবেশিত করেছেন। পাত্রপাত্রীরা কাল্পনিক হতে পারে, কিন্তু পরিবেশ আর ঘটনাবলী নিশ্চয় সত্যমূলক, সেজন্য বইটি এত হৃদয়গ্রাহী হয়েছে। আশা করি রাজস্থানের প্রাকৃতিক আর সামাজিক চিত্র আপনার হাত থেকে আরও বেরুবে।"

'আরাবল্লীর কাহিনী' গ্রন্থের অন্তর্গত গল্পগুলি পড়বার পূর্বেই শ্রদ্ধেয় পরশুরামের অসঙ্কোচ ও দ্বিধাহীন প্রশংসার কথা পড়ে লেখিকার শক্তি সম্পর্কে নিঃসংশয় হলাম; কিন্তু তাঁর শক্তির উৎস সম্পর্কে কৌতূহল রয়েই গেল। সঙ্গে সঙ্গে 'আরাবল্লীর কাহিনী'র সমস্ত গল্পগুলি পড়া শেষ করলাম। লেখিকার শক্তি সম্পর্কে আমার ধারণাও শ্রদ্ধেয় পরশুরামের মত দৃঢ় হল। সেই সঙ্গে উপলব্ধি করলাম—লেখিকা রাজস্থানকে, রাজস্থানের প্রাসাদ ও তার অন্তঃপুর, সেই সঙ্গে রাজস্থানের সাধারণ মানুষ, গাছপালা, জলবাতাস—এক কথায় রাজস্থানের রাজা ও সাধারণ মানুষ, সেই সঙ্গে প্রকৃতিকে সম্পূর্ণভাবে চেনেন। কিন্তু কৌতূহল রয়েই গেল এ সম্ভব হল কেমন করে!

আমার কৌতূহল কিন্তু নিবৃত্ত হতে মুহূর্তের বেশী সময় লাগেনি। তাঁর পরিচয় জানার সঙ্গে সঙ্গেই সমস্তটুকু আমার কাছে আকস্মিকভাবে চাবি-পাওয়া এক অপরিচিত লিপির পাঠোদ্ধারের মতই সহজ হয়েছিল। শ্রীযুক্তা জ্যোতির্ময়ী দেবী, যিনি এই কাহিনীগুলি রচনা করেছেন, তিনি রাজস্থানের জয়পুর স্টেটের সুপরিচিত ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী 'সংসারচন্দ্র সেনের পৌত্র, জয়পুর স্টেটের ভূতপূর্ব অন্যতম মন্ত্রী 'অবিনাশচন্দ্র সেনের কন্যা এবং তাঁর জন্মস্থান রাজস্থানের জয়পুরে। যে ভূমি তাঁর জন্মভূমি, যেখানকার খাদ্য ও পানীয়ে তিনি জীবনের প্রথম স্বাদলাভ করেছেন, যে ভূমিতে তিনি চোখ মেলেছেন ও বাল্যকাল অতিবাহন করেছেন সে ভূমির কথা একান্ত সহজ ও সুন্দর করে তিনি লিখবেন, এ তো অতি সহজ সত্য কথা। মহৎ ও উজ্জ্বল কুলে জন্মলাভ করে রাজস্থানের মর্মর প্রাসাদগুলির অন্তঃপুর তাঁর কাছে দুরধিগম্য ছিল না। যেমন তিনি সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা দেখেছেন তেমনি দেখেছেন রাজ্যের অতি-অভিজাতদের অনুদ্ঘাটিত জীবনলীলা। অথচ সাধারণভাবে কারও পক্ষে এ দুইকে এক সঙ্গে দেখার সৌভাগ্য হবার কথা নয়। তাঁর পিতা-পিতামহের প্রসাদে তাঁর পক্ষে তা সম্ভব হয়েছে।

তিনি রাজস্থান নিয়ে অজস্র কাহিনী রচনা করেছেন। সে কাহিনীতে রাজা, রাজমাতা, লালজী সাহেব থেকে পাত্রী, পাশোযান, পর্দায়েৎ, বড়ারন, বাঁদী, সর্দার, ঠাকুর সাহেব, শেঠ, শেঠানী, সিপাহী—বহুস্তরে বিন্যস্ত রাজপুত অভিজাত সমাজ, সেই সঙ্গে অজস্র দুঃখী দরিদ্র সাধারণ মানুষ সমান শক্তিতে ও প্রত্যয়ে, সমান মহিমা ও ঔজ্জ্বল্যে আপন আপন লীলা করে গিয়েছে। সমস্ত ক্ষেত্রেই তা গভীর মমতা ও সহানুভূতিতে অভিষিক্ত। সকলের জন্যই লেখিকার অকপট শ্রদ্ধা ও প্রেম সুপরিস্ফুট। তাঁর দৃষ্টি গভীর ও প্রাত্যাহিক পরিচয়ের মধ্য দিয়ে রাজস্থানের সমগ্র জীবনকে যেমন আত্মস্থ করেছে, তেমনি গভীর মমতার ও প্রীতির রসে সেই দৃষ্টি সব সময়ই সরস ও স্নিগ্ধ হয়ে আছে। যা দেখেছেন, যা প্রকাশ করেছেন তার মধ্যে যেন জননীর স্নেহসিক্ত হাস্য ও অশ্রুজল মেশামেশি হয়ে আছে।

তারই সঙ্গে আছে ভূয়োদর্শন ও একটি সামগ্রিক জীবনবোধ। এই সামগ্রিক জীবনবোধ, আমার মনে হয়েছে, জন্মলাভ করেছে জীবন সম্পর্কে শ্রদ্ধা থেকে। আর সেই শ্রদ্ধার সঙ্গে সর্বক্ষেত্রেই একটি উজ্জ্বল ও গভীর বিচক্ষণতা সর্বত্র যুক্ত আছে। তাঁর ক্ষেত্রে এ তিনি কেমনভাবে অর্জন করেছেন তা স্থানান্তরে বলার প্রয়োজন আছে।

এখন পূর্ব প্রসঙ্গে ফিরে আসি। তাঁর রাজস্থানের কাহিনীগুলি যে শুধু শিল্প-মূল্যেই মূল্যবান এ-ই শুধু নয়, তিনি এই কাহিনীগুলি বাঙলা সাহিত্যের ভাণ্ডারে যুক্ত করে বাঙলা সাহিত্যের ভৌগোলিক সীমাকে রাজস্থান-মথুরা-বৃন্দাবন পর্যন্ত

প্রসারিত করেছেন। তাঁর এই সাহিত্য-কর্মকে সেই কারণে অনন্য সাহিত্যকীর্তি বলে অভিহিত করতে পারি। তিনি বাঙলা সাহিত্যের অঙ্গনে বাঙালীর পাশে রাজস্থানী মানুষদের এনে একাসনে বসিয়ে দিয়ে তাদের বাঙালীর আত্মীয়তুল্য করে তুলেছেন। বাঙলার সরস মৃত্তিকা, শ্যামল প্রকৃতির সঙ্গে রাজস্থানের রুক্ষ, কঠিন, বালুকাময় মৃত্তিকার গ্রন্থি বন্ধন করেছেন। আমি মনে করি, কেউ যদি প্রথমে তাঁর এই রচনাগুলি পাঠ করে পরে রাজস্থান ঘুরে আসেন, তিনি রাজস্থানকে অপরিচিত দেশ বলে মনে করবেন না; মনে হবে কোন চেনা জায়গাতেই যেন বিচরণ করছি।

কিন্তু শ্রীযুক্তা জ্যোতির্ময়ী দেবীর সাহিত্যকর্ম এখানেই সীমাবদ্ধ নয়। এইখানেই তাঁর ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে কিছু কথা খুব অপ্রাসঙ্গিক হবে না। একদিক দিয়ে তাঁর জীবনে এক বিচিত্র আশ্চর্যের সাক্ষাৎ মেলে। একদিকে তিনি যেমন সৌভাগ্যবতী, অন্যদিকে অশেষ সৌভাগ্য সত্ত্বেও ভাগ্যের আঘাত তাঁকে প্রচণ্ডভাবে আহত করেছে। কীর্তিমান পিতৃ-পিতামহের কোলে তিনি সমাদরে আদৃত হয়েছেন একদিকে, অন্যদিকে জীবনের প্রারম্ভেই, মাত্র পঁচিশ বৎসর বয়সে তাঁর স্বামীবিয়োগ হয়। তাঁর সৌভাগ্য ও তাঁর বেদনা—উভয়কেই তিনি ধীরে ধীরে শিক্ষা, দীক্ষা, সাহিত্যসেবা ও কর্মের মাধ্যমে পরিপাক করেছেন এবং করতে পেরেছেন। করতে পেরেছেন বলেই তিনি, যে ভূয়োদর্শন, জীবনবোধ ও বিচক্ষণতার কথা পূর্বে উল্লেখ করেছি, তা অর্জন করতে পেরেছেন। তাঁর এই সামগ্রিক জীবনবোধ সেই কারণেই তাঁর সমস্ত রচনায় সর্বত্র একটি বিষণ্ণ মধুর ছায়া বিস্তার করে রেখেছে রৌদ্রতপ্ত মধ্যাহ্নে বর্ষার আকস্মিক এক খণ্ড মেঘের ছায়ার মত।

শুধু রাজস্থানের কাহিনীগুলিই নয়, তাঁর রচিত বিভিন্ন গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ ও স্মৃতিকথা পড়ে এবং তাঁর জীবনের কথা যতটুকু জেনেছি, দুইকে মিলিয়ে বারবার মনে হয়েছে সৌভাগ্যকে নিরহংকৃতভাবে ও সহজে গ্রহণ করে, এবং দুর্ভাগ্যের আঘাতকে নম্রচিত্তে, ক্ষোভহীনভাবে পরিপাক করতে পারলে, এবং সেই চিত্তকে শিক্ষা, দীক্ষা ও সাধনার দ্বারা পরিপুষ্ট করলে নিয়ত কর্ষণে চিত্তের যে পরিশীলন হয় সেই পরিশীলিত চিত্ত তিনি বিধাতার পরম আশীর্বাদের মত লাভ করেছেন। তারই কল্যাণে তিনি যেটুকু রচনা করেছেন সর্বত্রই তার নির্মল, উজ্জ্বল ও দাহহীন চিহ্ন বর্তমান রয়েছে।

দীর্ঘকাল বাঙলা সাহিত্যের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন যোগ রেখে যদিও তিনি সাহিত্যচর্চা করেছেন তবুও তাঁর রচনার পরিমাণ সুবিপুল নয়—এ কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। তবুও এই দীর্ঘকালের মধ্যে তিনি যা রচনা করেছেন তার সমস্তটুকুই গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি। তিনি রাজস্থানের জীবনের কথা যেমন লিখেছেন, তেমনি গল্পে, উপন্যাসে বাঙালী জীবনের কথাও লিখেছেন। সেখানেও ওই একই চিত্তের নির্মল-সুন্দর ও বুদ্ধি-উজ্জ্বল স্বাক্ষর রয়েছে। যে সমস্ত প্রবন্ধ ও স্মৃতিকথা লিখেছেন তাতে যে যে পথে মানস-যাত্রা করে জীবনের স্থিরভূমিতে পৌঁছেছেন তার দিক্‌চিহ্ন রয়েছে।

সব মিলে এ পর্যন্ত তাঁর নয়খানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তার মধ্যে চারখানি উপন্যাস—ছায়াপথ, বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ, এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা এবং মনের অগোচরে। বাকী পাঁচখানির চারখানি গল্প সংকলন এবং অন্যখানি তীর্থ পরিক্রমার কাহিনী। গল্প সংকলনগুলি হল—রাজযোটক, আরাবল্লীর আড়ালে, আরাবল্লীর কাহিনী এবং ব্যাণ্ড মাস্টারের মা। তীর্থ পরিক্রমাখানির নাম হল—সময় ও সুকৃতি। এ ছাড়াও আরও রচনা রয়েছে—যা সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে কিন্তু এখনও গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় নি।

গ্রন্থাকারে প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত তাঁর সমগ্র রচনাবলীর মধ্য থেকে নির্বাচন করে তাঁর একটি গ্রন্থাবলী প্রকাশের আয়োজন হয়েছে। সেই প্রযোজনেই এই ভূমিকা। এই

ভূমিকা লিখে মনে হচ্ছে আমি একটি পুণ্য কর্তব্য সম্পাদন করলাম।

শ্রীযুক্তা জ্যোতির্ময়ী দেবীর রচনা এমনি ধরনের গ্রন্থাবলী আকারে প্রকাশের যেন বিশেষ প্রয়োজন ছিল। যেকালে সমস্ত তপস্যা ও সাধনা এক কুঞ্চিত-ভ্রূ জিজ্ঞাসা চিহ্নে লাঞ্ছিত, সমস্ত মূল্যবোধ বিপর্যস্ত, সে সময় এই পরিপক্ক হৃদয়ের দীর্ঘ-সাধনার ধনগুলি যদি একালের পাঠক মাঝে মধ্যে ফিরে পাঠ কবেন তবে আপনার হৃদয়ের হারানো অনেক প্রিয় ও শ্রেয় বস্তুকে খুঁজে পাবেন।

৩০শে সেপ্টেম্বব, ১৯৬৯ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

সোনা নয় রূপা নয়—ঐশ্বর্য সম্পদ—
ধনজন-গৃহ যশ-খ্যাতি মানপদ—
কিছু নয়, কিছু নাই। ছোট বড় কুচি
কাগজ এ শুধু। শুধু লিখি ছিঁড়ি মুছি
সাগর বুদ্বুদ সম ঢেউ ভেঙে উঠি
হৃদয় বেলায় তারা করে লুটোপুটি।
তার মাঝে ফিরে মন কি কথার খোঁজে
লিখিয়া লইতে চায় কালিতে কাগজে।

কোথা সে কাগজ হায় কোথা বা সে কালি
সে কালির রঙ যেন সোনালি রূপালি
ক্ষুদ্র খণ্ড কাগজের মহাকাশে মোর
ফুটাবে তপন চাঁদ তারার অক্ষর।
যদি লেখে দু'-একটি সোনার লিপিকা
জীবনের সত্য মিথ্যা মায়া মরীচিকা।

হায় এ যে ইন্দ্রধনু চাঁদ তারা নয়
নিমেষে মিলায় রঙ লীলা পরিচয়
সেই রঙে ডুবালাম আমার রঞ্জিকা
শূন্যে শূন্যে আঁকা মোর এরা নিমেষিকা।

* * *

অশোকা, অনুভা, অঞ্জলি, সুহাসিনী, অনিমা
ও
অনিমা রায়কে
দিলাম

সূচীপত্র

সেই ছেলেটা	১
আমি এম্ পি	১৫
পঞ্চাশোর্ধ্বে . ..	২৫
এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা ..	৩৮
যাজ্ঞা .. .	৪৫
জবালা . ..	৫৩
মিছে কথা	৬৩
প্রতিলোম . ..	৭৪
মধুমালতী .. .	৮১
একটি সেকেলে লেখক	৮৮
তেপান্তরের মাঠ	৯৯
মণিকর্ণিকা .. .	১০৫
গঙ্গাফড়িং . .	১১১
রাজযোটক .	১২৩
তিনকন্যা	১৩৬
চিরকালিনী . .	১৪৩
দর ও দস্তুর	১৫১
স্ত্রীধন	১৫৯
জননী .	১৭২
কর্ণকুন্তী কথা	১৭৮
পুত্রেষ্টি ...	১৮৭
আগাছা . .	১৯৫
সন্ন্যাসী .. .	২০৮
সি ব্লকের তেরো নম্বর ফ্ল্যাট	২১৪
সুমের রায় . ..	২২৩
শেঠানীজী . .	২৩৪
সেপাই পিসিমা ..	২৪৩
আরাবল্লীর আড়ালে	২৫৩
বেটীকা বাপ	২৬৩
সেই মেয়েটি	২৭২
মালতী পাটপুর	২৮২
ধান	২৮৬
ভাত	২৯৪
নীল চোখে	৩০০
টিনের মাংস	৩০৪
রক্তের ফোঁটা	৩০৭

লেখিকার অন্যান্য বই

ছায়াপথ [উপন্যাস]
(নিঃশেষিত) মাঘ ১৩৪১

রাজযোটক [ছোটগল্প]
(নিঃশেষিত) বৈশাখ ১৩৪৮

বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ [উপন্যাস]
(নিঃশেষিত) আষাঢ় ১৩৫৫

মনের অগোচরে [উপন্যাস]
বৈশাখ ১৩৫৯

আরাবল্লীর আড়ালে [ছোটগল্প]
আষাঢ় ১৩৬২

ব্যাণ্ড মাস্টারের মা [ছোটগল্প]
বৈশাখ ১৩৬৮

সময় ও সংস্কৃতি [তীর্থ পরিক্রমা]
(নিঃশেষিত) শ্রাবণ ১৩৬৮

পঞ্চনদীর তীরে [বয়স্কশিক্ষা]

আরাবল্লীর কাহিনী [ছোটগল্প]
বৈশাখ ১৩৭২

এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা [উপন্যাস]
ফাল্গুন ১৩৭৪

সোনা রূপা নয়

দিল্লীর বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র। কুইন্‌স্ পার্কের মাঝে জায়গাটা।

চারদিকে লোক যাওয়া-আসা করছে, বসেও আছে। তিনটি মেয়ে শিক্ষাকেন্দ্রের বাড়ীটার কাছে দাঁড়িয়ে কথা কইছিল। শীতের সকাল, রোদ্দুরটা ভালই লাগছিল।

তাদের আলোচ্য বিষয়টি হল দু'একটি চাকুরি খালি হয়েছে, বয়স্কা মেয়েদের শিক্ষা বিভাগে। মেয়ে চাই। মাহিনা এখন ৫০৲ টাকা ক'রে। পরে পাকা চাকরি হলে ৮০৲ টাকা হবে। কোয়ার্টার পাবে। উন্নতির আশাও থাকবে। গুণপনা বা বিদ্যাবুদ্ধি ম্যাট্রিক হলেই চলবে আপাততঃ। স্কুল বা পাঠশালা বসে দুপুরে তিন ঘণ্টা করে— সেলিমগড়ে, বিল্লিমারনে, খাড়িবাউড়ীতে, কারোলবাগে, বাল্মীকি মন্দিরের হরিজন কলোনীতে বা অন্যত্র যেখানে হোক পড়াতে হবে। ছাত্রীদের ১৪ বছরের ওপর থেকে ৬০।৭০।৮০ বছর বয়স অবধি চলতে পারে। ১৪ বছরের নিচে বয়স চলবে না।

দাঁড়িয়ে ছিল বরুণা গুপ্ত, সুজাতা মিত্র আর রাজকুমারী (ক্ষেত্রী) মেহেরা— তিনজনেই ম্যাট্রিক পাস করে কলেজের ফার্স্ট ইযারের, সেকেণ্ড ইয়ারের ছাত্রী।

চাকরিটার ভারী সুবিধা। সকালে কলেজ ক'রে দুপুরে একটার পর বয়স্কদের স্কুলে— 'পহেলী কিতাব' আর 'দুসরী কিতাব' আব পহাড়া পড়ানো— (প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ আর নামতা)। ফার্স্ট ইয়াবের ছাত্রীর কাছে ত এ পড়ানো 'ডাল-ভাতের' চেয়েও সোজা। এতেই মাস গেলে পঞ্চাশটি টাকা। এরা তিনজনেই দরখাস্ত দিয়েছে। আরও কতজন দিয়েছে তা ওরা জানে না। তবে মনে হয় ওরাই ক'জন দিয়েছে। সকলে ত খবরও জানে না আর সকলের ত সময়-সুযোগও হয় না।

এরা তিনজনেই ইন্দ্রপ্রস্থ বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী। চেনাশোনা আছে।

বরুণা জিজ্ঞেস করলে রাজকে আর সুজাতাকে— 'তোরাও কি এখানে দরখাস্ত দিয়েছিস?'

সুজাতা বললে, 'হ্যাঁ, গুপ্তর অপিসে।'

রাজকুমারীরই বয়স সব চেয়ে কম। সে বললে, 'আমিও ত এখানেই দিলাম'। সেদিন আমার কাকা দিয়ে গেছেন। কিন্তু গুপ্তজী কি বাঙালী? তোমাদের কেউ আপনার লোক হন কি? বরুণা বিবিজীও ত গুপ্ত? তা হলে তোমাদের চাকরি হবে। তাতে এবারে সেকেণ্ড ইয়ারে উঠেছ তোমরা।'

সুজাতা হাসলে, বললে, 'না, গুপ্তজী বাঙালী নন। ইউ. পি'র লোক বোধ হয়। লোকটিকে কেমন যেন লাগল। টেবিলের ওপর পা তুলে বসে দাঁত খুঁটছিলেন। আমরা ক'জন মেয়ে ঘরে ঢুকলাম নানা কাজে। আমার হাতে দরখাস্ত ছিল, দিলাম। তা যেমন বসে ছিলেন, তেমনই বসে রইলেন। দরখাস্ত দেখে বললেন, আপ বাঙালী? কোন্ দেশে থাকেন? বললাম, হ্যাঁ আমি বাঙালী। বহুদিন দিল্লীতে আছি। পড়াশুনা দিল্লীতেই করেছি। হিন্দীও জানি। ভদ্রলোক বললেন, 'আপকি হিন্দী জোবান অচ্ছি নেহি।' (আপনার হিন্দী উচ্চারণ ভাল নয়) সবিনয়ে বললাম—'হাঁ, আমি ত বাঙালী কাজেই তা হ'তে পারে। কিন্তু হিন্দী পড়াতে পারব। হিন্দীতেই পাস করেছি, এখানেই ইন্দ্রপ্রস্থ স্কুল থেকে।'

সুজাতা হাসতে লাগল। বললে, 'আমাদের কাজ পাবার ভরসা নেই। রাজ পাঞ্জাবী, তাতে উদ্বাস্তু। তুমি পেলেও পেতে পার।'

রাজ অন্যমনে ফুলের কেয়ারীর দিকে চেয়ে ছিল। চোখে যেন জল। একটু ম্লান ভাবে বন্ধুদের দিকে চেয়ে বললে, 'এই চাকরিটা পেলে আমার কলেজে পড়া হবে, নইলে কাকা আর পড়াতে পারবেন না। কোনও রকমে ভর্তি হয়েছি বটে—কিন্তু বই কলেজের মাহিনা, নানা খরচের জন্য বাড়ীর কারুর মত নেই পড়ার। আমাদের ত সব ফেলে পালিয়ে আসতে হয়েছে। এখন খুবই অসুবিধা।'

বরুণা বললে, 'তোমার মা কি বলেন? ঐ অসুবিধার জন্যেই ত আরও দরকার।'

রাজ আরও ম্লান হয়ে গেল। বললে 'মা নেই—মা থাকলে···।'

বন্ধুরা বললে, 'আহা। তা হলে বাড়ীতে কে আছে?'

'অনেক লোক। বাবা, ঠাকুমা, কাকারা, কাকীরা, তাদের ছেলেমেয়ে, আমার ভাই-বোনেরা, সবাই আছে।'

ওরা কেন্দ্রের অপিসে ঢুকল। সেখানকার প্রধানার কাছে শুনল, দু'তিন দিনের মধ্যে খবর পাবে। দরখাস্তের জবাব। দুটো কাজ খালি আছে। এবং জানুয়ারীর গোড়াতেই রাজকুমারী আর অন্য একটি মেয়ে কাজ পেয়ে গেল।

সুজাতা ও বরুণা রাজের হাসিমুখ দেখে খুব খুশী হ'ল। রাজ পেল বিল্লিমারন গলিতে একটি ছোট্ট কেন্দ্রে কাজ। সকলেই নানা জায়গার অধিবাসিনী হলেও কুইন্স্ পার্কে কর্ম্মসূত্রে আসা-যাওয়া করে।

কাজের শেষে পার্কের ওদিকের গেটে বাস্ স্ট্যাণ্ডে যায়। একসঙ্গে বাড়ীর দিকের বাসে ওঠে। বাগানে বেড়ায়। চিনেবাদাম কিনে খায়। চাঁদনী চকের ঘণ্টাওয়ালার দোকানের প্রসিদ্ধ 'ডালমোট্ও' খায়। দইবড়া খায়। ভালমন্দ যা খুশি খায়।

বাস্ স্ট্যাণ্ডের আশেপাশে বাগানের ঝোপঝাড়ের পাশে অসংখ্য ভিখিরী থাকে নানা রকম ধরনের।

সেদিন ওরা বাগানে রোদ্দুরে ব'সে বাদাম খেয়ে বাসের দিকের গেটে এল।

সহসা একটা ভিখিরী মেয়ে একটি ছেলের হাত ধ'রে এসে এদের সামনে দাঁড়াল, 'বিবি, কুছ দে।' ছেলেটা হাত পাতল না, মার ওড়না ধরে দাঁড়িয়ে রইল।

মা হাভ পাতল।

বরুণা বললে সুজাতাকে, 'তোর কাছে খুচরো আছে? তা হ'লে দুটো পয়সা দিয়ে দে। আমার খুচরো নেই।'

রাজ বাদাম ছাড়াতে ছাড়াতে আসছিল একটু পিছনে।

সুজাতা থলে থেকে ব্যাগ বের করল।

বরুণার হাতে পয়সা দিল, নিজেও দুটো দিল।

ভিখিরী মেয়েটি পয়সা নিল। এবারে রাজ এসে পৌছেছে। তাকে দেখে বললে, 'বিবি তু ভি দে কুছ।' (তুইও কিছু দে) 'শালওয়ার কামিজ' দেখে স্বদেশিনী বলে একটু হেসে বললে, 'কুছ ওড়নে-কা দে বিবি (গায়ের কাপড়)।'

রাজও পয়সা বের করছিল, 'ওড়নেকা কুছ' শুনে একটু হাসল। 'শোন কথা! তোর জন্য যেন ওড়না নিয়ে আমরা এখানে এসেছি।'

তারপর ছেলেটিকে দেখে বললে, 'মুঙ্ ফলি (চিনেবাদাম) খাবি? এই নে।' নিজের ওডনার আঁচল থেকে ছেলেটির হাতে দিতে গেল।

সুজাতা হাসল, 'ও চাইছে 'চুননী' (ওডনা) আর রাজ দিচ্ছে মুঙ্ ফলি (বাদাম)।'

ভিখারিণী চিনোবাদাম নিতে এগিয়ে এল। তারপর হঠাৎ বললে, 'বিবি, তোর ঘর কোথা?'

রাজ আবার হাসল—'আমাব ঘর দিল্লীর সেলিমগড়, তুই যাবি সেখানে? ওড়না নিতে?' ঠাট্টার সুরে বলল।

ভিখারিণী বললে, 'না তোর পিণ্ড্ (দেশ) কোথায় জিজ্ঞেস করছি।'

রাজ বললে, 'আমার দেশ লাহোর। তোরও কি লাহোরে দেশ?'

বরুণা আর সুজাতা এবারে একসঙ্গে হেসে বলে উঠল, 'ওরে রাজ, তুই ওর দেশের লোক কিনা জানতে চায়, কি মুশকিল। আমবা বাঙালী তাই পয়সা দিয়েই খালাস পেয়েছি।'

ভিখারিণী একটু থমকে গিয়ে যেন নিজের মনেই বললে, 'আ রাজ? তোর নাম রাজ? লাহোর তোর দেশ?'

রাজকুমারী হেসে উঠল, 'হ্যাঁ, রাজকুমারী। লাহোর আনারকলি বাগের কাছে,

তা তোর কি হ'ল ? নে পয়সা, আয়—'

ভিখারিণী ওড়না পেতে চিনেবাদাম নিতে বা পয়সা নিতে আর এগিয়ে এল না। আস্তে আস্তে পিছিয়ে গেল ছেলের হাত ধ'রে। একবার যেন বললে, 'আ মেরি রাজ।'

ওদিকে বাস্ এসে দাঁড়িয়েছে, গন্তব্য পথের নম্বর মাথায়। রাজ বললে, 'কি হ'ল ? নে পয়সা ?'

সুজাতা বরুণা ডাকলে, বললে, 'রাজ আয় আমাদের বাস্ এল।'

কিন্তু ভিখারিণী কোথায় ? সহসা কোন্ ঝোপের আড়ালে চ'লে গেছে। আর দেখা গেল না। পয়সা নিতে এল না আর। রাজ আবার ডাকল, 'কই রে পয়সা নে।' কোথাও নেই। ওরা অবাক হয়ে গেল তিনজনেই।

বরুণা বলল, 'ও তোকে চেনে না কি ? রাজ বললে কেন ?'

সুজাতা বললে, 'হ্যাঁ শুনলাম 'রাজ' 'রাজ' বললে যেন।'

পয়সা হাতে একটু চুপ করে থেকে রাজ স্তম্ভিতভাবে বললে, 'কি জানি তোরা নাম ধরে ডাকলি, তাই হয়ত শুনে ও রাজ বললে।'

আর দাঁড়াবার সময় নেই। সকলে বাসে উঠে পড়ল।

২

রাজের বাড়ী কারোলবাগে উদ্বাস্তু কলোনীতে। সেলিমগড়ে নয়।

বাড়ী ফিরে অনেক কাজ তার। আটা মাখতে হবে। তন্দুরে রুটি হবে। উঠানের কোণে মুখভাঙা জালার মত প্রকাণ্ড তন্দুরে ঘুঁটের আগুন জ্বেলে দিয়ে সে ওড়না কামিজ বদলে রান্নাঘরে আটা মাখতে এল। সন্ধ্যেবেলাতেই সব খাওয়া হয়ে যায়, ওদের পাঞ্জাবীদের। এক্ষুনি ভাইরা, বোনেরা, ঠাকুমা খাবে। তারপর বাবা কাকারাও খেতে আসবে। দেখলে, মেজ খুড়ীমা 'মাহ্ কী দাল' (মাষ কলাই) রান্না করে রেখেছিল, আটাও মেখেছে।

ওকে দেখে সে নিজের অন্য কাজে গেল ছেলেমেয়ে দেখতে।

রাজ আটার থালা নিয়ে উঠানে তন্দুরের পাশে দাঁড়াল। তারপর এক-একটা মোটা মোটা রুটির তাল হাতে করে তন্দুরের গায়ে চেপটে লাগিয়ে দিতে লাগল। সেগুলি উনানের গরম গায়ে সেঁকা হয়ে আগুনে পড়ে যায়। আর সে চিমটেতে নয়ত হাতে নেকড়া জড়িয়ে তুলে নেয়।

আড়াই সের আটার রুটি সেঁকা হল। থালার মধ্যে নেকড়া জড়িয়ে সেগুলি গরম রাখল, পরে ঘি মাখাবে। পাঞ্জাবে ঘিয়ে বা মাখনে ডুবিয়ে তুলত। এখানে আর সেদিন নেই।

ভাই-বোনেরা খেতে এল। রুটি ডাল আচার আর দুধ দিয়ে খাওয়া হ'ল। দাদী বাবা কাকারা খেয়ে নিল।

দেখতে দেখতে শীতের রাত ঘনিয়ে অন্ধকার হয়ে গেছে। পাঞ্জাবী পাড়াব লোকেদের খাওয়া সেরে বেড়ানোর বা জিরোনোব সময় তখন।

সবারই খাওয়া শেষ হয়েছে। রাজ আর কাকীরা দু'জনে খেতে বসল। মেজ কাকী বললে, 'তোর মুখটা আজ ভারী শুকনো লাগছে। আর রুটিও ত কম নিয়েছিস দেখছি। কেন অসুখ করেছে কী?'

রাজ একখানা রুটিই নিয়ে বসেছিল। ছিঁড়তে ছিঁড়তে বললে, 'না, অসুখ করে নি। তবে ভাল লাগছে না যেন।'

ছোট খুড়ী বললে, 'আজ তা হলে শুয়ে পড়গে শীগ্‌গীর করে। আমি বাসনগুলো মেজে রাখব।'

পালা ক'রে ভাগে ভাগে কাজ করে সবাই। তবে ওরই ভাই-বোন নিয়ে কাজ বেশী পড়ে।

শীতের রাত। সকলেরই ছোট ছোট খাটিয়াতে বিছানা। দিল্লীর শীত। লেপ কম্বল নিয়ে সব ভাই বোন ঠাকুমা বাবা এক ঘরেই শুয়েছে।

'শালওযার' কামিজ-ওড়না ছেড়ে রেখে ছোট জামা আর 'কাছেড়া' বা পাজামা পরে রাজও নিজেব খাটিয়াতে শুয়ে পড়ল।

নিবালোক নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকার ঘর, কোনদিকের একটা জানলার ফাঁক দিয়ে রাস্তাব একটু আলোয় চিল্‌তে এসে পড়েছে।

রাজ সেদিকে চেয়ে রইল।

এতক্ষণে ওর হাতের কর্মচক্র থেমেছে। মন যেন স্থির হয়ে দাঁড়াতে পেরেছে এক জায়াগায। সেটা কোন্ জায়গা? মন জানে সেটা কোথায়। রাজও জানে কোথায়। কিন্তু রাজের গলা থেকে ঠোঁট দু'খানা অবধি যেন শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল হঠাৎ। ভাবতে ইচ্ছে করছে না সেই জায়গাটির কথা।

তা হলে কি উঠে জল খাবে? যদি ভাবনাটা নড়ে যায়? উঠল, জল খেল। ঘুমের মাঝে ঠাকুমা বললে, 'কে, রাজ?'

এবারে শুয়ে পড়ল আবার। আজ আর শীত করছে না। ঘরটা যেন সব গরম হয়ে গেছে।

গরম হোক, শীত হোক, তেষ্টা পাক, গলা শুকোক, কিন্তু সেই জায়গাটা আর রাজের মনের চোখের সামনে থেকে মিলিয়ে যায় না।

রাজ বালিশে শুকনো মুখ গুঁজে যেন কাঁদতে চাইলে। কিন্তু কান্না এল না।

অশ্রুহীন মুদিত চোখের সামনে ভেসে এল কুইন্স্ পার্কের সেই জায়গা ও সেই ভিখারিণী…। ছেঁড়া বিবর্ণ ওড়না, ময়লা জামা শালওয়ার পরা বিহ্বল দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে 'আ রাজ? মেরি রাজ' বলে পিছন দিকে সরে যাওয়া সেই ভিখারিণী।

হ্যাঁ, রাজ চিনেছে তাকে। তার নাম বলতেই যেন মনে হয় চিনতে পেরেছিল সে কে। প্রথমটা বুঝতে পারে নি।

এবারে চোখে জল এল। রাজ নিঃশব্দে নিঃশ্বাসের মত শব্দহীন গলায় বলল, "মা"। হ্যাঁ, মা-ই তো যেন।

এবারে ঝর্‌ঝর্ ক'রে চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল।

৩

আর চোখের জলের সাগরে প্রতিবিম্বের মত ফুটে উঠতে লাগল সেই '৪৬ সালের লাহোরের দুর্যোগের দুর্দিনের ছবি।

অনেক রাত্রি তখন। কত রাত্রি কে জানে? সব ঘুমিয়েছে ঘরে ঘরে কাকারা ঠাকুমা। মা-র ঘরে মা বাবা ভাই বোন ওরা সব।

সহসা এক কাকা ডাকলেন ত্রস্ত শঙ্কিত স্বরে—ঘরে ধাক্কা দিয়ে, 'ওঠ ওঠ সব, শীগ্‌গীর ওঠ। মুসলমানরা এদিকে আসছে।'

বাবা-মা উঠলেন। ঠাকুমা কাকীরা বাড়ীসুদ্ধ সব যে যেখানে ছিল, মস্ত বাড়ী বাগান কত দাসদাসী লোকজন সব একে একে জেগে উঠে নিঃশব্দে সভয়ে বাইরের প্রাঙ্গণে দাঁড়াল একত্র হয়ে।

খবর দিতে পুলিশের লোক এসেছে। তিন-চারখানা ট্রাকও এসেছে। এই রাত্রেই লাহোরের সীমানা ছাড়িয়ে যেতে পারলে বাঁচতে পারে। না হ'লে তাদের কোনও দায়-দায়িত্ব নেই। 'যার যা দরকারী জিনিস, টাকা-কড়ি-গহনা নিতে পার নিয়ে যাও।' আরও বললে, 'বেশীক্ষণ সময় নেই। বাইরে আলো জ্বেলো না, কথা বলো না, দেরি করো না। জানানাদের ইজ্জৎ, প্রাণ বাঁচাতে তারা পারবে তাড়াতাড়ি করলে। নইলে খোদা জানেন কি হবে।'

আতঙ্কে অভিভূত ঠাকুমা থর্‌থর্ করে কাঁপতে লাগল। তাকে বাবা আর কাকারা ধ'রে ধ'রে নিয়ে এসে খোলা ট্রাকের উপর বসিয়ে দিলেন। সেখানেও রাস্তার অসংখ্য লোক জমেছে, সকলেই গাড়ীতে উঠবার জন্যে ব্যাকুল। ঠাণ্ডা কন্‌কনে শীতের রাত্রি। পৌষের না মাঘের রাত্রি। পথের সবাই ভূতের ছায়ার মত নিঃশব্দে মিনতি-ভরা মুখে চেয়ে আছে পুলিশদের দিকে। যদি তাদেরও নেয়।

পুলিশরা বললে, 'আমরা সারারাত ধরে সকলকে যত পারব অমৃতসরের সীমান্তে

পৌঁছে দিয়ে আসব। কিন্তু আগে কিছু বুড়ো মানুষ আর বাচ্চাদের, মেয়েদের দলদের দিয়ে আসি। পরে অন্য সবাইকে নেব। তাই হুকুম আছে।'

'ওঠ ওঠ' করতে করতে কাকারা কে ওকে গাড়ীতে তুলে দিলেন। কাকীরাও উঠে বসেছে। ছোট ছোট ভাই-বোনেরা ভয়ে শীতে কাঁদতেও যেন ভুলে গেছে। ফ্যাল্‌ফ্যাল্ চোখে চেয়ে ব'সে আছে।

বাবা কাকারা সব উঠলেন।

পুলিশ বললে, 'গাড়ি ছাড়ছি।'

সহসা বুড়ী ঠাকুমা বললে, 'সবাই এসেছে? বিবি? বড়ি বিবি কোথায়?' (অর্থাৎ বড়বৌ।)

বাবা বললেন, 'উঠেছে সব। ওঠে নি? ভিড় আর অন্ধকারে দেখা যায় না মানুষ।'

সহসা এক কাকা বললেন, 'না, আসেন নি বিবিজী। দেখছি না ত।'

অন্ধকারে এক খুড়ীও বলল, 'হ্যাঁ তিনি ওপরের ঘরে কি আনতে গিয়েছিলেন।' অন্য এক কাকা ডাকলেন, বিবিজী? সাড়া নেই।

বাবা পুলিশকে বললেন, 'দাঁড়াও একটুখানি, তাকে ডেকে আনি।'

সহসা দূরের মোড়ের কাছে মশালের জোর আলো দেখা গেল। আর "আল্লা হো আকবর" শোনা গেল।

পুলিশ বাবার হাত ধ'রে নিলে। বললে, 'আর নামা হবে না। তিনি পরের গাড়ীতে আসবেন। হয়ত বা অন্য গাড়ীতে উঠেছেন। শীঘ্র গাড়ী ছাড়। ওরা এক্ষুণি এসে পড়লে আমি কারুকে বাঁচাতে পারব না। তুমিও মরে যাবে নামলেই।'

বাবা অস্থিরভাবে হাত ছাড়িযে নিয়ে লাফিয়ে পড়তে গেলেন।

কিন্তু পুলিশরা তাকে জোর করে ধরে রেখে ড্রাইভারকে জোরে গাড়ী চালিয়ে দিতে বললে। বললে, 'আপনার জন্য এত লোক বিপদে পড়বে! বর্ডারে গিয়ে খুঁজে নেবেন।'

যে সব রাস্তার আলো সব জায়গায় নেই, গলি-ঘুঁজি দিয়ে অন্ধকার সেই সব রাস্তায় আতঙ্কে প্রাণভয়ে ভীত নিঃশব্দ মানুষদের নিয়ে তিন-চারখানা ট্রাক অন্ধকার নরকের পথের ভূতুড়ে গাড়ীর মত চলতে লাগল। সারি সারি পায়ে চলা অসংখ্য নিঃশব্দ মানুষও চলেছে সেই সব পথে। কারুর মুখে কথা নেই, কেউ কারুকে দেখতে পাচ্ছে না। কারুর মনে আর কোন ভাবনা চিন্তাই নেই, কোনক্রমে অমৃতসরের সীমানায় খাসা গ্রামে পৌঁছান ছাড়া; অনন্তকালের পিতৃলোকের বাস করা দেশ, কত নিদ্রিত সুপ্ত স্বজন বন্ধু, যারা এখনও পথে বেরিয়ে আসে নি, ঠিক জানে না ব্যাপারটা; তারা ছাড়া ধন-ধান্য ঘরবাড়ী ঐশ্বর্য সম্পদ চিরকালের বাস-নিবাস স্বদেশ ছেড়ে সকলেই পথে

বেরিয়ে পড়েছে—দীন দরিদ্র ভিখারী থেকে ধনী শেঠ প্রবল প্রতাপান্বিত জমিদার অবধি। এত কথা তখন রাজ ভাবতে জানত না। পরে ভেবেছে, পরে দেখেছে তাদের। পরে জেনেছে। নরক কেমন কেউ জানে না, রাজও জানে না। কিন্তু যমযন্ত্রণার ভয়ই যদি নরকের ভয় হয়, সেই আতঙ্কময় অন্ধকারময় নরকের পথের সহসা শেষ হ'ল। দম বন্ধ ক'রে ছোট ট্রাকগুলি একেবারে সীমান্তে এসে থামা গ্রামে দম ফেলল যেন।

কে কি ভাবছিল কেউই জানে না। রাজের কোলের উপর ছোট দুটি ভাইবোন নেতিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল। মা-র কথা কেউ জিজ্ঞাসা করে নি। কাঁদে নি। তাকে ডাকে নি। তারাও কি ভয় পেয়েছিল? কিসের ভয়? রাজও কিছুই ভাবে নি। অস্পষ্ট ভাবনা—আজকে স্পষ্ট হয়েছে। সেদিন বুঝবার মত বয়স ছিল না। দশ-এগার মাত্র বয়স তখন।

শুধু দাদী কাঁদছিল ফোঁসফোঁস ক'রে। কাকীদের সঙ্গে দু-একটা কথাও বলছিল। শুনতে পেয়েছিল রাজ—'কি আনতে' বৌ ওপরে গিয়েছিল? 'জেওর জেওরাত' (গহনাপত্র) 'সোনা মতি'?…হায় হায়!…কি হবে সে সব—যদি "জান" আর "ইজ্জৎ" চলে যায়? এমন বেহিসাব আক্কেল কেমন করে হ'ল!'

কাকা ধমক দিলেন, 'চুপ কর। পরের গাড়ীতে হয়ত আসছেন।'

বাবা পাগলের মত বসেছিলেন। পুলিশটা বাবার কাছ ছাড়ে নি।

দু'ঘণ্টার জায়গায় এক ঘণ্টায় গাড়ী এসে পৌঁছেছিল। একে একে সব গাড়ী থামল। প্রাইভেট গাড়ীও ছিল সামনে পিছনে ক'খানা। লোকেরা ক্লান্ত অবসন্ন দেহে নামল—ঘুমন্ত শিশু বালক-বালিকাদের হাত ধ'রে—কোলে নিয়ে। জিনিসপত্র প্রায় কিছুই নেই। একবস্ত্রে অর্থাৎ যা পরেছিল তাই জড়িয়েই সব চ'লে এসেছে।

বাবা নামলেন সকলের আগে। ওদের কারুর দিকে তাকালেন না। কিছু বললেন না। শুধু অন্য গাড়িগুলোর কাছে গিয়ে দেখতে লাগলেন। তারপর ডাকতে লাগলেন, "বিবি, বিবি, বিবি তুমি কি এসেছ এখানে?"

কেউ সাড়া দিল না। কাকারা নেমেছেন, কাকীদেরও নামিয়েছেন। ট্রাকগুলো এখনই ফিরে যাবে আরও বিপন্ন পলাতক যাত্রী আনতে। তখনও তারাভরা আকাশ। রাত্রি শেষ হয় নি। গাড়ীগুলো যাত্রী নামিয়ে পথে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

বাবা কাকারা যাত্রীদের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। ডাকতে লাগলেন "বিবিজী" "বিবিজী" বলে। ঘোমটা দেওয়া, মাথায় ওড়না দেওয়া, শাল জড়ানো চেহারা মেয়েদের যাকেই দেখেন বাবা তারই সামনে গিয়ে দেখেন। যেন মনে করেন সেই বুঝি বিবিজী, ওদের মা। তারা অচেনা মুখে পিছন ফিরে তাঁর দিকে চায়।

তিনি অপ্রস্তুত হয়ে মাপ চেয়ে আবার অন্য মেয়েদের দিকে যান। ঠাকুমাও ভাঙা গলায় "বৌটি" (বউ) বলে ডাকেন। কাকীরা 'জিঠানীজী' (জ্যেষ্ঠানী) 'হো জিঠানীজী' বলে ডাকেন। কেউ 'আ হো' (হ্যাঁ) 'এই যে' এখানে বলে সাড়া দেয় না।

যাত্রীরা একে একে সবাই যে যেখানে পারল গ্রামের মাঝে শহরের পথে চ'লে গেল। ভোর হয়ে এল। ওরা ছোটরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শীতে কাঁপতে লাগল। কাকারা জোর জোরে 'বিবিজী' 'বিবিজী' বলে ডাকতে ডাকতে গ্রামের বাইরে জঙ্গল ক্ষেত সব দিকে ঘুরতে লাগলেন। ভাবেন যদি অন্ধকারে এসে থাকেন—পথ আর মানুষ চিনতে না পেরে গ্রামে কি অন্যদিকে চ'লে গিয়ে থাকেন।

যদিও মনে জানছিলেন সবাই যে, তিনি আসেন নি। আসতে পারেন নি। মা-র গাড়ীতে ওঠা হয় নি। এখানে পথ ভোলেন নি। চিরকালের মত লাহোরেই রয়ে গেছেন। হারিয়ে গেছেন। সেই বাড়ী থেকে বেরুতে পারেন নি আর। বিপদে পড়েছেন।

কিন্তু মনকে মিথ্যা আশাময় সান্ত্বনা দেয়। আছে, সে আছে। আসবে। হয়ত আসবে সে পরের গাড়ীতে।

পরের গাড়ী এল। আরও কত গাড়ী, হাঁটা পথে লোক এল। সারা সকাল সারাদিন ধ'রে কত লোক এল, চেনা-অচেনা। বাবা উদ্‌ভ্রান্ত মুখে ঘুরে ঘুরে দেখলেন। তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, পথে মা-ব মত দেখতে সুন্দর চেহারা দামী জামা-কাপড় পরা কারুকে দেখেছ কিনা? কেউ কি হেঁটে আসছে সেরকম?

কাকারাও সারাদিন খুঁজে খুঁজে বেড়ালেন··· ক্রমে আর যাত্রী আসা কমে এল। লোকমুখে শোনা গেল সেখানে মহল্লায় মহল্লায়, পাড়ায় পাড়ায় আগুন লাগানো, লুটপাট শুরু হয়ে গেছে। মেয়েরা অপমানের ভয়ে কেউ কেউ কুয়োয় ঝাঁপ দিয়েছে। নদীতে ঝাঁপ দিয়েছে। বিষ খেয়েছে। অন্য রকমে মরেছে। আর যারা তা পারে নি, তাদের 'লুঠেরা'রা ধরে নিয়ে গিয়েছে···।

রাজের চোখ এখন শুকনো। আর জল নেই। চুপি চুপি যেন নিজের মনকেও না জানিয়ে ভাবে, তা হ'লে কি মা-ও পালাতে পারে নি, মরতে পারে নি? বেঁচে রয়েছে?

আবার চকিতভাবে ভাবে, না তার হয়ত ভুল হযেছে। ও মা নয়, অন্য কেউ। এমন ত একরকম দেখতে হয়। আর এত রোগা, মা-র মত ফরসাও নয়, মোটাসোটা সুন্দর দেখতেও নয়। আর ঐ ছেলেটি?···মা-র সঙ্গে ছেলেটি কেন? কার ছেলে? নাঃ, নিশ্চয়ই ও মা নয় তা হ'লে।

মনটা যেন একটু ভাল লাগল, 'তাকে' মা নয় ভাবতে। কি ক'রে মা হতে পারে

যখন ঐ ছেলেটা রয়েছে। এবারে রাজ ঘুমিয়ে পড়ল।

সহসা যেন দেখলে, লাহোরের সেই বাড়ী, সব ভাইবোন সকালে খেতে বসেছে। ইস্কুলের তাড়া সকলেরই। মা রুটি পরোটা আচার দুধ নিয়ে সকলকে ভাগ করে দিচ্ছেন। আর হাসছেন, গল্প করছেন। সাদা শালওয়ার, রঙীন রেশমের জামা, হালকা ফিকে নীল রঙের 'চুন্নী' (ওড়না) পরা।

ওরা সকলেই খাচ্ছে। কিন্তু···কিন্তু মা-র কাছে মা-র হাঁটু জড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে কে একটা ছেলে। সে ত ওর ছোট ভাই নয়? কে ওটা? সেই ছেলে কি? সেইটেই তো যেন!

কি রকম গলা শুকিয়ে ঘুমটা ভেঙে গেল। দেখল অনেক বেলা হয়েছে, কেউ ঘরে নেই।

কাকী ডাকছে, 'রাজ, ওঠ, বেলা হযেছে।'

৪

কারোলবাগের বাস্ এসে থামল চাঁদনীচকেব দিকে। রাজ 'বিল্লিমারন'-এর স্কুলের দিকে তখনই গেল না। এখনও বাকী ছাত্রী সবাই আসে নি জানে। সংসাবের কাজ সেরে তারা আসে।

সে কুইন্স্ পার্কের ভিতরে ঢুকল। শীতের রৌদ্রে অনেক লোক বেঞ্চিতে ব'সে, ঘাসে ব'সে রোদ পোয়াচ্ছে। ঝোপ-ঝাড়ের দিকে ভিখারী-ভিখারিণীরা ও ছেলেমেয়েরা ছেঁড়া নেকড়া জড়িয়ে নোংরা থালা ঘটি বাটিতে ভিক্ষালব্ধ রুটি মুড়ি অন্য খাবার নিয়ে—কেউ বা গেলাসে চা নিয়ে খাচ্ছে। কারুর খাওয়া হয়ে গেছে, ছেলেমেয়ের মাথা নিয়ে বসেছে উকুন বাছতে। কেউ কেউ ঘুমিয়ে পড়েছে।

পরিপূর্ণ স্তব্ধ দুপুর।

রাজ চেয়ে চেয়ে দেখে তা'দের। স্বপ্নটাও মনে আছে। ভিখারিণীকে সে আজ খুঁজে বার করবে। কাল বন্ধুরাও ছিল, আর ঠিক বুঝতেও প্রথমটা পারে নি বটে। তা আজও মনে সন্দেহ আছে, মা না হ'তেও ত পারে? আর হয় যদি? নাঃ, সে কথা ভাবতে মন চায় না। তবু ভাল ক'রে আজ দেখে বাড়ী ফিরবে, স্কুলে যাবে।

না! সেই ভিখারিণী আজ কোথাও নেই। আর সেই ছেলেটাও ত নেই! তা হ'লে আর কোথাও ভিক্ষা করতে গেছে। বোধ হয় আসবে সন্ধ্যার দিকে। যেমন সেদিন দেখেছিল। ফেরার সময়ে দেখতে পাবে নিশ্চয়।

তবে আজ আর অন্য সঙ্গিনীদের সঙ্গে সে আসবে না। তা হ'লে কথা কইতে পারবে তার সঙ্গে।

সকাল সকাল স্কুলের পড়ানো সেরে সে আবার ফিরল। তখনও বরুণা সুজাতাদের দলের কেউ বাগানের দিকে এসে পৌঁছয় নি। বো:ধ হয় কেন্দ্রের ক্লাস হয় নি। কলেজ সেরে তারা বয়স্ক কেন্দ্রে আসে সেলাইয়ের, বোনার কাজে।

বিকাল শেষ হয়ে এল। ভিখারীর দলও ভিক্ষা চেয়ে বেড়াল। ঠাণ্ডা পড়বার আগেই অনেকে ফিরে গেল প্রতিদিনের মত।

কিন্তু সেই ভিখারিণী মেয়েটি নেই, আসে নি। তা হ'লে কোন দূর জায়গায় ভিক্ষা করতে গেছে।

সহসা পিছন থেকে বন্ধুরা এসে ডাকল, 'এই রাজ, কি করছিস ওই নোংরা ঝোপের কাছে? আয় একটু "জলজিরা" ফুচ্‌কা খাই।'

রাজ চমকে পিছন ফিরে তাকাল হঠাৎ তাদের ডাকে।

তারা হেসেই আকুল, 'কি রে, ভয় পেয়েছিস? ভূত দেখলি?'

সেও হাসল। অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে "জলজিরা" কচুরি (ফুচ্‌কা) খেল। গল্প করল শুক্‌নো শুক্‌নো মুখে, অন্যমনস্ক ভাবে।

তারপর বাসে উঠল। সেদিন গেল, তার পরদিনও গেল। তাব পরের দিনও গেল। তার পরের দিনও ওই ভাবেই সে খুঁজল। কিন্তু সেই ভিখারিণী আর তার সেই ছেলেটাকে কোথাও দেখা গেল না।

তা হ'লে কি দরিয়াগঞ্জের মন্দির গুলোর কাছে ভিক্ষা করতে গেছে? অথবা কেল্লার কাছে প্যারেড ময়দানের সামনে 'দাউজী' 'গোপালজী'র মন্দিরের কাছে গেছে ভিক্ষা করতে? সেখানে সন্ধ্যেবেলা কথকতা হয়, অনেক মেয়ে আসে। মিষ্টির দোকানীরাও বেশ ভিক্ষা দেয়, রুটি, পয়সা ইত্যাদি।

ঘুরে ঘুরে রাজের মুখ শুকিয়ে সরু লম্বা হয়ে যায়। ক্ষেত্রী মেয়ের অত উজ্জ্বল রঙ, সে রঙ রোদ-পোড়া রাঙা হয়ে উঠেছে।

কাকীরা ভাবে, চাকরি আর পড়া দু'য়ের খাটুনি। আর বাড়ীর কাজও তো কম নয়। যেদিন রুটি না করে, সাবান কাচে, ইস্ত্রি করে, চরকায় সুতোও কাটতে হয় ঝ মাঝে। পুরনো তুলা জমেছে অনেক, সেগুলোর সুতো থেকে "খেস" বা সুজনী হবে। রাজের কাজের শেষ নাই।

কিন্তু রাত্রেও ঐ ভাবনা যেন ঘুমের আড়ালেও মনে জেগে থাকে। তবে এখন যেন ।ব মনে আর একটা সন্দেহ উঁকি মারে। তা হলে নিশ্চয় সে মা। তাই আর ওপথে ।সে না, আর সেজন্যেই সেদিনে ভিক্ষে না নিয়েই চলে গিয়েছিল।

এখন রাজের নিজেকে যেন অপরাধিনী মনে হয় ভিখারিণীটার পরিচয় না নেওয়ার ন্য। কেন সেদিন তার 'রাজ' বলা শুনেও ও এগিয়ে যায় নি? সঙ্গিনীদের জেনে

ফেলার ভয়ে অথবা কিসের সঙ্কোচে? ওই ছেলেটার জন্যে? না মা মরে গেছে বলেছিল বন্ধুদের সেই জন্যে? অন্য কিছু সম্পর্কও তো বলতে পারত?

রাজ বিনিদ্র চোখে শুয়ে শুয়ে ছেঁড়া ময়লা জামাকাপড় পরা ভিখারিণীর মুখটা স্পষ্ট করে মনে করবার চেষ্টা করে। চোখে জল আসে। আবার কখন ঘুমিয়ে প'ড়ে সহসা আচম্‌কা জেগে ওঠে। মনে হয়, কি অন্যায় ক'রে ফেলেছে যেন। কখনও আর সে ভুল শুধরানো যাবে না। কিন্তু···।

৫

সেদিন একটা শনিবারেব বিকাল। রাজ তেমনি আগে এসেছে, এদিক-ওদিক ঘুরছে।

সহসা পিছন থেকে তার কাঁধে হাত রাখল কে। ফিরে চেয়ে দেখল বরুণা।

বরুণা বললে, 'তোর কি হয়েছে রাজ,—কেবলই ঘুরে ঘুরে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াস্ আজকাল। বাড়িতে কিছু হয়েছে? না কোন দরকার পড়েছে! চল, একটু ওই ঘাসে বসি।'

রাজ শুকনো মুখে ঘাসে বসে। বরুণা বলে, 'খাবি কিছু?'

সে বললে, 'না এবাবে বাড়ি যাই।'

বরুণা বললে, 'একটু পবে যাব। সুজাতা আসুক। তার আগে তুই বল্ তো, কেন একলা ভিখারী পাডায ঘুরে বেডাচ্ছিস। সেদিন দরিযাগঞ্জে দেখলাম মন্দিরেব সামনে। তার আগে কেল্লার মযদানেব সামনেও দেখেছি। কি হযেছে বল্ তুই। কারুকে খুঁজছিস কি?'

এবারে রাজের চোখে জল এসে পড়ল। আত্মীয় নয়, আপনজন কেউ নয় বটে, কিন্তু ওরা ওকে ভালবাসে, ইস্কুল থেকে চেনা-জানা। এক ক্লাসে পড়া বন্ধু। হযত ওকে একথা বলা যায়। ওরা তো আপনার লোক নয় তাই বলা যায়। কিন্তু কিছুই বলতে পারল না। শুধু দু'ফোঁটা জল এসে পড়ল চোখে।

বরুণা তার পিঠের ওপর হাত রেখে বললে, 'কি হয়েছে বল্ তুই। আমি কারুকে বলব না। বাড়িতে গোলমাল হযেছে?'

রাজ চোখ মুছে বললে, 'না আজ নয় পরে বলব।'

বরুণা বললে, 'কারুকে খুঁজছিস্?'

রাজ ঘাড় নাড়লে।

'কাল থেকে আমিও তোর সঙ্গে যাব, একলা একলা ভিখিরী পাড়ায় ঘুবে বেড়াস নি।'

এবারও রাজ শুধু ঘাড় নাড়লে।

সুজাতা এসে পড়ল, দু'জনেই চুপ করল।

পরদিন আবার বরুণা এসে রাজকে ধরল।

বললে, 'আজ কোথায় যাবি?'

রাজ একটু ভেবে বললে, 'চল, বিড়লা মন্দিরের দিকে যাই। তারপর তোদের কালীবাড়ির কাছে যাব।'

তার পরদিন যমুনার তীর, তার পরদিন হনুমানজীর মন্দির, যেখানে মনে হয় সেখানেই যায়, ছোট ছেলে সঙ্গে ভিখিরী মেয়ে দেখলে চকিত হয়ে এগিয়ে যায়, তারপর বিমনা ভাবে ফিরে আসে।

দিল্লীর মন্দির-পাড়া, ভিখারি-পল্লী যেন আর বাকী রইল না।

সন্ধ্যাবেলা দু'জন ফিরে এসে কোনদিন কুইন্‌স্ পার্কের কোনখানে, কোনদিন আজমল খাঁ বাজারের দিকের প্রকাণ্ড পার্কে বসে পড়ে ক্লান্তভাবে।

ক'দিন গেল। এবারে সহসা বরুণা জিজ্ঞাসা করলে একদিন, 'রাজ, তুই কি সেই ভিখিরী মেয়েটাকে খুঁজছিস? যে তোকে 'রাজ' বলে ডাকল—আর ভিক্ষে নিল না?'

রাজ হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে নিল। কিছু বলতে পারল না।

বরুণা তার একটা হাত নিজের হাতে জড়িয়ে নিয়ে বললে, 'সেই মেয়েটাই ত? সে কি কেউ হয় তোর রাজ? এক মাস হয়ে গেল, তাকেই খুঁজছিস ত? তাই না?'

রাজ মুখ গুঁজেই ঘাড় নাড়ল।

বরুণা বললে, 'কে সে? আমাকে বল, আমি কারুকে বলব না।'

রাজ তেমনি ভাবেই মুখ না তুলে খুব আস্তে মৃদুস্বরে অনেকক্ষণ পরে বললে, 'মা।'

যে কথা কোন আপনার জনকে আজ অবধি বলে নি। বাপকেও নয়। কাকাদের ভাইবোনদেরও নয়—আজ বিদেশিনী বান্ধবীকে না ব'লে আর পারল না।

বরুণা স্তম্ভিত হয়ে গেল। 'মা?' একটু চুপ ক'রে থেকে বললে, 'মা ত তোর নেই বলেছিলি?'

সে তেমনি ভাবেই মুখ নীচু ক'রে বললে, 'ঠিক কথা বলি নি। ও আমার মা। সেদিন প্রথম ও দূরে ছিল আর আমিও তোদের অনেক পিছনে আসছিলাম, চিনতে পারি নি। পরে যখন ভিক্ষা নিতে এগিয়ে এসে বাড়ি কোথায় জিজ্ঞাসা করলে, তখনও অত বুঝতে পারি নি। খুব রোগা আর কালো হয়ে গেছে। খুব ভাল দেখতে ছিল আগে। তারপর যখন তোরা রাজ ব'লে ডাকলি, আর ও অবাক হয়ে যেন খুব আস্তে বললে, "আ মেরি রাজ। মেরি বিটি" বলতে বলতে পিছিয়ে গেল, আর ভিক্ষে নিল না, তখন একটু সন্দেহ হ'ল যেন। তখন আমাদের বাস্ এসে গেছে। আর আমরা দাঁড়ালাম না, সেও ত এগিয়ে এল না। রাত্রে বাড়িতে গিয়ে যেন স্পষ্ট মনে পড়ল।'

বরুণা বললে, 'কিন্তু মা কি লাহোর থেকে তখন তোদের সঙ্গে আসে নি?'

রাজ মুখ তুলল। বললে, 'মা কি গহনাপত্র আনতে বাড়ির ভিতর গিয়েছিলেন, আর আসতে পারেন নি। লোকেরা ভয়ে গাড়ি ছেড়ে দিয়েছিল, তারপর আমরা ধরে নিয়েছিলাম, মা মারাই গেছেন দাঙ্গার সময়ে।'

'তা সেদিন কেন তখুনি বললিনে? তা'হলে ত বাড়ি নিয়ে যেতে পারতিস?'

রাজ চুপ করে রইল।

সহসা বরুণা যেন সন্দিগ্ধভাবে কি ভাবে। বললে, 'আর ঐ ছেলেটা? ওটা কে তোর? তোর ভাই?'

রাজ মাথা নাড়ল। শুধু বললে, 'আমার ভাই নয়।'

এবারে যেন কি একটা কথা স্পষ্ট হয়ে উঠল বরুণার কাছে। বরুণা অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বললে, 'তুই বোধ হয় ঠিক চিনতে পারিস নি রাজ। তোর মা ও নয়।'

রাজ সে কথার জবাব দিল না। আর মনে মনে বরুণাও যেন জানে তার কথা ঠিক নয়।...

কিন্তু বরুণা আবার বলল, 'তুই তখন কত ছোট ছিলি—তোর কি আর মনে আছে মাকে? তোর নিশ্চয় ভুল হয়েছে। আর মা হ'লে ত চিনতে পেরে এগিয়ে আসত...।'

এবারে রাজ বললে, 'চিনতে পেরেছিল ব'লেই বোধ হয় আর এগিয়ে এল না।'

দু'জনেই যেন মনে মনে বুঝতে পারল কেন এগিয়ে এল না।

শীতের সন্ধ্যা। বাগান খালি হয়ে এসেছে। অন্ধকারও ঘনিয়ে এসেছে। গেটের ওপারে বাস্ এসে দাঁড়িয়েছে কয়েকটা। ওরাও বাগান থেকে বেরুল, নিজেদের বাস্ দেখে উঠে পড়ল।

নামবার সময় বরুণা বললে, 'আচ্ছা কাল আবার খুঁজব।' তারপর সান্ত্বনার ভাবে বললে, 'কিন্তু ও তোর মা নিশ্চয়ই নয়।'

রাজ শীর্ণমুখে হাসল একটু। তার মন জানে, সে তার মা। আর জানে, তার খোঁজ আর কোনদিনই পাওয়া যাবে না...। কেন যে পাওয়া যাবে না তাও যেন মন জানে।

রাজ বাড়ী ফিরল। কাজকর্ম সেরে শুতে কত রাত্রি হ'ল। তারপর নিঃশব্দে নিজের খাটিয়াতে শুয়ে পড়ল। নিশুতি ঘর। পাড়া শহরও ঘুমিয়ে পড়েছে যেন।

তার ঘুম আসে না। চোখের সামনে ভেসে আসে জীর্ণ মলিন শালওয়ার কামিজ পরা ছেঁড়া চুন্নী (ওড়না) মাথায়, দীন মিনতিভরা মুখ, ভিখারীর মতই শীর্ণ একটি ছোট ছেলের হাত ধরা সেই ভিখারিণী। কতদিন ভিক্ষা করছে সে? কতদিন ভিক্ষা ক'রে তার মুখের হাসি-কথা এমন ভিখারীর মত হয়েছে?

কেনই বা ভিক্ষা করতে আরম্ভ করল? তার বাপের বাড়ী, রাজের মামার বাড়ীর সবাই ত কত বড় লোক! এখনও মা-র বাবা মা আছে। ভাইবোনও আছে কতজন। শ্বশুরবাড়ীর এদিকেও ত ওরা ছিল! কেন খোঁজ করে আসে নি? নিজের বাপের বাড়ীর ঠিকানা ত জানে সে। লুধিয়ানায় তাদের বাড়ী—খুব বড় বংশ।

'কেন'র কথা—আব সে ভাবতে পারে না। সমস্ত ভাবনা যেন জটিল হয়ে ওঠে তার তরুণ মনের পক্ষে। মনে হয় বাবাকে বা কাকাদের কারুকে বলে এই কথা। কিন্তু তারা যদি জিজ্ঞাসা করেন কেন আগে বল নি?

কি বলবে সে? চিনতে পারে নি ঠিক! না···কি?

মনে পড়ে যায় সেই ছেলেটাকে। কি বলত ছেলেটার কথা? ছেলেটা কার? মা-র কি? মা কি আসতে পারত? তা হলে লুকিয়ে পড়ল কেন?

তা হ'লে ও কি মা নয়?···তাই হবে বোধ হয়। রাজ বেশ আশ্বস্ত হয় যেন মনে মনে।

কিন্তু তাব মনের কোন্ অতলে শীর্ণ মলিন মুখ, জীর্ণ বিবর্ণ বেশবাস, দীন করুণ নেত্র একটি ভিখারিণী নারী একটি ছোট ছেলের হাত ধ'রে স্থির হয়ে তার দিকে চেয়ে থাকে কুইন্স্ পার্কের ঝোপের সামনে—

যে তার মা। আর সে ছেলেটা তার ভাই নয়।

প্রবাসী, ভাদ্র ১৩৬৮

আমি এম. পি.

পার্লামেণ্ট থেকে সবে ফিরেছি। দারোয়ান কুশল সিং একটা 'তার' নিয়ে এসে দাঁড়াল।

ছোট্ট খবর 'মার অসুখ বাড়াবাড়ি।' ছোট ভাই তার করেছে কলকাতা থেকে। যাওয়া দরকার কি এস কিছুই বলে নি। ভাবতে বসি যাওয়া উচিত কিনা? যেতে হবে কিনা? মা'র আমি একমাত্র ছেলেও নই, আমার আরও চার ভাই আছে—আর আমি ছোটবেলা থেকেই মার কাছছাড়া বা বাড়িছাড়া। মাসীমার কাছে মানুষ হয়েছি। মেসোমশাই দিল্লীতে খুব বড় কাজ করতেন। বেশ বড় লোকই বলা যায়। আর আমার বাবা সামান্য কি কাজ করতেন কলকাতায় কোন্ আপিসে। আর বেশ বড় গেরস্ত। আমরা পাঁচ ভাই, তিন বোন। ঠাকুমা পিসিমাও ছিলেন বাড়িতে। বেজায় সেকেলে ধরনের বিব্রত পরিবার। দু-তিনখানা ঘরে কোন রকমে বস্তির মত

একগাদা লোক নিয়ে থাকা। তারি মাঝে বোন-ভগ্নিপতিদের আসা যাওয়া। যেমন নোংরা ভাবে থাকা তেমনি অভাবের সংসার ছিল।

সেই কবে? আমার দশ বছর বয়সে মাসীমা একবার কলকাতায় যান, আর আমাকে নিয়ে আসেন সেই সময়ে। তাঁর দুটি ছেলেমেয়ে ছিল। তবু মার ঝামেলার সংসার, আর আমাকে একটু ভালও বাসতেন। দেখতেও ভাল ছিলাম। লোকে বুদ্ধিমানও বলত। মাসীমা বলতেন, ছেলেটাকে আমায় দে, ভাল জায়গায় গেলে পড়াশোনা স্বাস্থ্য সব ভাল হবে। তোর তো আর পাঁচটি আছে…।

আজকের এই 'মানুষ' হওয়া, 'এম্-পি' হওয়া সবই ওই মাসীমা মেসোমশাইয়ের দৌলতে। নইলে…।

সেই ছেলে বয়স থেকে হিন্দী পড়েছিলাম, শিখেছিলাম বলেই তো আজ এত সুযোগ-সুবিধা পেয়েছি বড় কাজ পাবার।

দিল্লীওয়ালাদের মত শেরওয়ানী চুড়ীদার (পাজামা) পরি। গান্ধী-টুপী পরি কপাল অবধি নামিয়ে। আর চোস্ত হিন্দী-উর্দু বলি। বাঙালী বলে এখন লোকে বুঝতে পারে না। অবশ্য হয়ত ওসব ভেক। তা ভেক না হ'লে তো ভিখও মেলে না। তাছাড়া 'ভেকই' বা কেন বলি! সত্যি বলতে কি ঐ নোংরা হুজুগে কলকাতা শহরটায়, বাংলা দেশটায় সর্বক্ষণই হৈ-হুল্লোড়, সভা-সমিতি লেগেই আছে। মনে করতেও ভাল লাগে না।

মনে হল ভাগ্যিস্ মা মায়া করে আটকে রাখেন নি। আর বাবাও অমত করেন নি। করবেনই বা কি করে? আর কবে হ'তই বা কি? অখাদ্য কুখাদ্য কুমড়োর ঘ্যাট, ঝিঙে কাঁচকলা কুচোচিংড়ীর 'উরসুন্নী' ঝোল দিয়ে ভাত খাইয়ে একটা ক্ষীণজীবী ভেতো বাঙালী করে মানুষ করে একটা চাকরিতে ঢুকিয়ে দিতেন। আর আজ এক বোনের আঁতুড়ের, কাল ও বোনের অসুখের নয়ত ভাইদের পড়ার দায়দায়িত্ব ঘাড়ে নিতে হত। জানি তো বাংলাদেশের সেকেলে বাবা-মাদের।

মা-বাবা অবিশ্যি মনে মনে যেন একটু আশা করেছিলেন, মানুষ হয়ে একটু দেখা-শোনা করব। তাঁরা আমার কাছে আসা-যাওয়া করবেন এক-আধবার। তা করি নি কি কিছু? বাবাকে মাসে ৩০।৪০ করে টাকা পাঠিয়েছি, যতদিন ছিলেন। মাকেও মাঝে মাঝে কখনও দিই। তা মার আর খরচটা কি? ওরাও তো চারজনে রোজগার করে। আমার মত এত বেশী না হলেও। তা আমার স্ট্যাণ্ডার্ড অব লিভিং-এর জন্যে খরচের দায় অনেক…

তবে এই, আমাদের মধ্যে ওদের আনতে আর কখনও পারি নি। রেণু আমার স্ত্রী—আমার মত ঝামেলা, গেঁয়ো সেকেলে ধরনের ঝঞ্ঝাট সইতে পারেন না। বড়-

লোকের মেয়ে। ওরকম কলকাতাই লৌকিকতা কখনও দেখেন নি।

আবার 'তার'টার দিকে চোখ পড়ল। মার কথাতে মনে পড়ে গেল, চল্লিশ বছর আগে সেই আসবার দিন কুচোচিংড়ীর ঝোল দিয়ে মার কাছে গরম ভাত খেয়ে চলে এসেছিলাম। মার মুখে হাসি আর চোখটা যেন জলে ভেজা। হয়তো মন কেমন করছিল।

মনে পড়ল,—হ্যাঁ, ওইরকম চিংড়ী কাঁচকলার ঝোল আর কিন্তু কোথাও খাই নি। মার মতন রান্না···।

কিন্তু আমার মন কেমন করে নি। নতুন জায়গায় আসব। রেল-গাড়িতে কতদূর যাব। মাসীমার আদর যত্ন ··।

এসে মেসোমশাইয়ের ঐশ্বর্য দেখে অবাক হয়ে গেলাম। জীবনে ওসব দেখি নি। প্রকাণ্ড বাগানবাড়ি, মোটর, দারোয়ান, মালী, চাকর, ঝি, ফ্রিজিডেয়ার, রেডিও, পাখা ঘরে ঘরে, ড্রয়িংরুম। লোকজন আসাযাওয়া।···

রেণু এসে দাঁড়ালেন, 'চা দিক! 'তার' কার?'

বললাম, 'মার অসুখ, নরু তার করেছে।'

'তা অসুখ বেশী?' রেণু বললেন।

বললাম, 'তার যখন করেছে অসুখ বেশীই।'

রেণু: 'তা কি করবে তাহলে?' বললাম, 'সেই তো ভাবছি কোথাও ট্রাঙ্ক কল করি, না কি করি!' 'দেখ না আর কারুর কাছে যদি খবর পাওয়া যায়। অসুখ বললেই ঠিক খবর কি হয়েছে না দিলে যাবেইবা কি করে?'

চিন্তিত ও বেজারভাবে বললাম, 'হ্যাঁ দেখি নরেনের কি দাদার অফিসে 'তার'ই করি—কিংবা 'ট্রাঙ্ক কল'ই করে খবর নিই। দিনের বেলা ট্রাঙ্ক কল করাও মুস্কিলের ব্যাপার।'

২

জানি ওরা—ভাইরা আছে সবাই। ছিলও সবাই। তবু মনটাই কেমন হল, না লজ্জাই হল, কি কর্তব্যই মনে হল—কে জানে।

গিয়ে পড়লাম ঐ নোংরা হুজুগে শহরটায়। কলকাতা! লোকে যে কেন 'বাংলা দেশ' কলকাতা বলে মরে!

ট্রেনে নয়—প্লেনেই গেলাম। আমার সময়ের একটা দাম আছে তো। খরচ একটু হয় বেশী। তা ফার্স্ট ক্লাসেও তো কম যায় না।

এখন মুস্কিল। কোথায় উঠব। বাড়ীতে যাব, না হোটেলে উঠব। হোটেলে

—সেটা কি ভাল দেখাবে? কিন্তু বাড়ীতে ঐ রোগের ঝামেলা আর ভিড়ের মাঝে। ছোট বাড়ী। নাওয়ার জায়গা নেই। হড়হড়ে পেছল শেওলাধরা উঠানে কলতলা। মনে পড়লে গা শিরশির করে।

যাক। ভেবেচিন্তে চৌরঙ্গীর এক হোটেলে জিনিসপত্র রেখে ট্যাক্সি করে বাড়ী গেলাম।

বাড়ীতে একবাড়ী লোক। ছোট ছোট কালো কালো রোগা রোগা ময়লা জামা-কাপড়-পরা ছেলেমেয়েরা যেন চারদিকে কিলবিল করছে। কার যে এত ছেলেমেয়ে জানিও না। বোনেদের হবে। ভাইদেরও আছে বোধ হয়।

সবাই আমাকে দেখে চকিত হয়ে উঠল। খুশীও হল। বোধ হয় ভাবে নি আমি আসব।

সেই বাবার কাজের সময় এসেছিলাম দু'দিনের জন্য।

মা'র ঘরে ঢুকলাম। মা বাবার চৌকিটার ওপর শুয়ে আছেন। যতটা সম্ভব ঘরটা পরিষ্কার করে রেখেছে। তাকের ওপর অনেক ওষুধের শিশি। চৌকির তলায় একটা সেকেলে পিতলের পিকদানী 'কলঙ্কধরা' ময়লা। ছোট ভাই একটা আধ-ময়লা গেরুয়া লুঙ্গি পরে মার টেম্পারেচার নিচ্ছিল। বড়দা দাঁড়িয়েছিলেন মার বিছানার পাশে। একটু নিচু হলাম নমস্কারের ভাবে।

বড়দা বললেন, 'আসতে পেরেছিস তাহলে। ছুটি পেলি? বোস্।'

চুপ করে রইলাম। হাজার হোক (কেন হাজার হোক ভাবলাম জানি নে) আমারও মা তো। আমার কি একটা কোন কর্তব্যবুদ্ধি নেই? ছোট ভাইকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'জ্বর কত? কেমন আছেন?'

সে মৃদুস্বরে বললে, 'জ্বর রয়েছে।'

মা চোখ খুললেন। খুব ছোট্ট রোগা হয়ে গেছেন। কোটরে ঢোকা দুটি নিষ্প্রভ চোখ, আমাকে দেখে চিনতে পারলেন না। দশ-বারো বছর দেখেন নি। ভাইদের দিকে চেয়ে বললেন, 'কে? ডাক্তার?' আমার চেহারা বদলেছে, মোটা ভারি ধরন হয়েছি বেশ।

সে বললে, 'না, মেজদা।'

মনে হল বিবর্ণ মুখ পাণ্ডাস শুকনো সাদা ঠোঁটে একটু হাসবার চেষ্টা করলেন। কণ্ঠার হাড় উঁচু হয়ে দেখা যাচ্ছে। চুলও সব পেকেছে।

একটা হাত একটু উঁচু করবার চেষ্টা করলেন। খুব আস্তে আস্তে বললেন, 'দীনু। আমার নাম দীনেন্দ্র।'

সেই বাবার দিনের ছোটবেলায় চল্লিশ বছর আগের কথা মনে পড়ে গেল। সেদিন

মা এত বুড়ো হন নি। কিন্তু সেদিনেও মার মুখে হাসি আর চোখে যেন জল ছিল।

মার হাতটা ধরে জিজ্ঞেস করলাম, 'কেমন আছ?'

মা হাতটা আমার মাথার কাছে আনবার চেষ্টা করলেন। পারলেন না। ভাই বুঝল, সে আমার মাথায় মার হাতটা ঠেকিয়ে দিল।

মার কত গর্বের কৃতী সন্তান আমি। কত সম্মানিত, বংশের মুখ উজ্জ্বল করা ছেলে—লোকে বলে। কত আনন্দ তাঁর—আমার সাফল্যে। মার নিষ্প্রভ চোখ দু'টি একটু উজ্জ্বল হয়ে উঠল যেন।

এদিকে ওরা সবাই ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল, কোথায় থাকব, খাওয়া-দাওয়া কিরকম হবে…।

মা-ও জিজ্ঞেস করলেন, 'খেয়েছিস?'

বললুম, 'হ্যাঁ, চা-টা খেয়েছি।' কোথায় খেয়েছি তা আর বললাম না। বাইরে এসে ভাইদের বললুম, 'এখানে তো জায়গা নেই। সবাই এসেছে জানি। আমি হোটেলে উঠেছি তাই।'

ওরা নিশ্চিন্ত হল। কিন্তু দুঃখিত হল কি? জানি নে। চুপ করে রইল সব।

৩

মাকে দেখতে যাই রোজ একবার করে। অফিসেরও কিছু কাজ করি। ক'দিন গেল। ভাবছি ফিরে যাই। বুড়ী মানুষের অসুখ, একভাবেই আছেন।

হঠাৎ সেইদিন রাত্রেই ফোন এল। মেজদা আসতে পারবে? মার অবস্থা হঠাৎ খারাপ হয়েছে।

গেলাম। মা মারা গেছেন আমি পৌঁছবার কয়েক মিনিট আগেই। চারদিকে একবার চেয়েছিলেন। জ্ঞান ছিল? ওরা বললে, ছিল মনে হয়। যা কিছু করবার দাদাই করলেন। করবেনও, তিনি বড় তো।

মেজদের নাকি কোনও নিয়ম নেই কাজকর্ম করার। বাড়ীতেই ওদের সঙ্গে হবিষ্যি করলাম।

দু'দিন গেল। বললাম, 'তাহলে আমি চলে যাই? ছুটিও তো সাত দিনের নিয়েছিলাম।'

ভাইরা চুপ করে রইলেন। ক্রিয়াকাজ কি ভাবে হবে, আমি নিয়ম করব কিনা কিছুই তারা জিজ্ঞাসা করল না।

শুধু বড়দা বললেন, 'শ্রাদ্ধের সময় আসতে পারবি?'

আমি বললাম, 'ক'দিনে করবে? এক মাস না দশ দিনে?'

দাদা বললেন, 'একমাসেই হোক ? বাবারও তাই করেছিলাম।' দশ দিনে তো সবাই করেন না। খরচপত্র কিরকম করবেন ওরাও বললেন না, আমিও জিজ্ঞাসা করলাম না।

কেন জিজ্ঞাসা করলাম না ? পাছে খরচের দায় ঘাড়ে নিতে হয়। বোন ভগ্নিপতিরা চলে গেছে। তারা কুটুম।

একবার মনে হল, আমিও চলে যাচ্ছি। আমি তো কুটুম নই ? মনকে বোঝালাম। তা কেন ? আমার চাকরি কাজ, পার্লামেন্ট আছে। সে দায়িত্বও তো আমার আছে একটা···।

দিল্লী এলাম। বাড়ীতে খবর দিয়েছিলাম।

রেণু জিজ্ঞাসা করলেন, 'এক মাস ধরে নিয়ম পালন করতে হবে নাকি ? তুমি সেখানে কি করলে ?'

'সেখানে দু'দিন হবিষ্যি করেছিলাম ওদের সঙ্গে।'

সভ্য বন্ধু-বান্ধবরা এসেছিলেন দু-একজন।

বললেন, এখনকার দিনে অত কড়া করে নিয়ম আর কেউ মানে না। তুমি নিরামিষ খাও। হবিষ্যি-টবিষ্যি এসব সেকেলে লোকেরা করে। আর যস্মিন দেশে যদাচার। এদেশে ক্ষেত্রী বৈশ্যদের ঘরে আপনার লোকেরা সব রেঁধে খাবারদাবার পাঠায়। তাই সব খায়, এই নিয়ম। রেঁধেও দিয়ে যায় বাড়ী এসে, বলত, আমরা না হয় পাঠাই দু-চার দিন। আর দশ দিনেই অশৌচ পালন করার কথা বললে না কেন ? এখন তো প্রায় সকলেই দশ দিন করে নিয়েছে। তোমাদের বাড়ীর বড্ড গোঁড়ামী দেখছি। যা হোক, অত কঠোর নিয়ম করতে পারবে না এখানে। হবিষ্যি ও কম্বলে শোয়া···।

রেণু খুশী হলেন। আমিও খুশী হলাম বোধ হয়। রেণু মাকে বিয়ের সময় দেখেছিলেন মাত্র। আর সকলকেও তাই। কিন্তু আমি কেন খুশী হলাম ?

কিন্তু ঝঞ্ঝাট তো আরও আছে। কামানো হবে না। দাড়ি গোঁফ চুলসুদ্ধ একটা বনমানুষের চেহারা হবে এক মাসে। জুতা না হয় রবারের কি কাপড়ের পরব। কাছা গলায় দেওয়া আছে।

রেণু বললেন, আমি খালি গায়ে শাড়ী পরতে পারব না। মিসেস বোস বলছিলেন তিনি জামা সেমিজ পরতেন। আর সব নিয়ম তিন দিনই করেছিলেন ওঁর শ্বশুর মারা গেলে।

ভাবলাম বিদেশ তো। যা হোক, নিজেদের মত একটা ব্যবস্থা নেওয়াই সুবিধে।

কিন্তু মনে হল, এরা এদেশীরা কি করে নিজেদের দেশের মত নিয়ম মেনে চলে ? ···না, মানে না ?···

৪

শ্রাদ্ধের দিন এসে পড়ল।

ঠিক করেছিলাম যাব না, গেলে তো খরচ আছে। তার চেয়ে টাকা পাঠিয়ে দেব। যেতে যে খরচ হবে সেই টাকাটা শ'তিনেক দিলেই বেশ দেওয়া হবে। ওদের সাহায্যও হবে! ওদের ?···

কিন্তু মনটায় কুরকুর করে—কোথায় যেন কুরুণী দিয়ে কোরানোর মত। আমারও তো মা!

তা টাকা পাঠাচ্ছি তো। গেলে তো টাকাও দিতে হবে। ভাড়াও লাগবে।

কিন্তু পারলাম না থাকতে, মনটা যেন কেমন হল। মার সঙ্গে সম্পর্কটা এইবার একেবারে শেষ হয়ে যাচ্ছে, তাই ? না লোকে কি বলবে ? অথবা কর্তব্য ?

শ্রাদ্ধের দিন সকালেই পৌছলাম। ওরা জানত না আসব। অবাক হয়ে গেল। টাকাও আগে পাঠাই নি। ওরাও তো চায় নি। আশাও করে নি টাকা পাবার, কি আমার যাওয়ার। ওদের মনে অভিমান হয়ে ছিল ? মারও কি মনে কোনও দুঃখ ছিল ? আমাকে নিয়ে ওদের গর্বের অহঙ্কারের সীমা নেই···। কিন্তু মনে হয় ওরা আমাকে আপনার ভাবলো না, না আমিই ওদের আপনার করলাম না ? কি জন্যে ? বড়লোক নয় বলে কি ?···

কাছা গলায় দিয়ে গিয়েছিলাম হোটেল থেকে। পায়ে রবারের জুতো ছিল।

গিয়ে দেখলাম ওরা তিলকাঞ্চন করছে। বৃষোৎসর্গ কি করে আর করবে! খরচ বেশী হবে তো। বাবারও তো হয় নি। কিন্তু আমি তো তখন এত বড় কাজ করতাম না।

ভাইরা সব খালি গায়ে খালি পায়ে ঘুরছে। কম দামের শয্যা দিয়েছে। খাট-পালঙ্ক দিতে পারে নি। ষোড়শ করছে একটাই। কমদামী বাসনের। তবে ব্রাহ্মণভোজন আত্মীয়-বন্ধুদের খাওয়াবার একটু ব্যবস্থা করেছে—মন্দ নয়। আমার দেওয়া তিন-শো'তে হয়তো আর একটু ভাল করে করতে পারতো ; আগে দিলে, কিন্তু ওরা তো ভাবে নি সে কথা। তা ওদের আটকায় নি দেখছি।

দাদার কাজ হলে—হঠাৎ দাদা ডাকলেন, 'দীনু মাকে অন্নজলবস্ত্র দিবি আয়। বোস, উৎসর্গ কর।'

মাকে অন্নজলবস্ত্র ? মা—মাকে আমি তো কিছুই বিশেষ করে কখনও দিই নি। আজ দেব ? কি দেব ? শ্রাদ্ধের আসরে কুশাসনে বসলাম। কুশের আংটি পরলাম। মন্ত্র বলতে লাগলাম। বারবার বললেন পুরুতমশাই, এই অন্ন দিলাম, বস্ত্র দিলাম, জল দিলাম, শয্যা দিলাম—সব দিলাম। কত কি দিলাম।

মার কোটরে ঢোকা ঝাপসা চোখ, পাণ্ডাস মুখটা চোখের সামনে ভেসে এল যেন··· । আমার চোখটা হঠাৎ ঝাপসা হয়ে গেল।

চোখটা মুছে ফেললাম। আবারও "যে জীবা অনলদগ্ধা" শুনতে শুনতে চোখ ঝাপসা হয়ে গেল। এবারে দু'ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল। হাত জোড়া থাকায় মুছতে পারলাম না।

আমার রোগা রোগা শ্যামবর্ণ ভায়েরা এদিকে ওদিকে ঘুরছিল—দাঁড়িয়ে ছিল। হয়ত তারা দেখতে পেল অন্য লোকেও দেখতে পেল হয়ত।

আমার পরে তারাও একে একে অন্নজল দিলে মাকে। কিন্তু তাদের চোখ দিয়ে তো জল পড়ল না!

৫

দিল্লী ফিরলাম। আর দেশে যাওয়া হয় নি।

আরও কয়েক বছর কাটল। আমার খুব পদোন্নতি হয়েছে।

ঐশ্বর্যের—সুখের সীমা নেই। লোকজনের ভিড়ে এক মুহূর্ত অবকাশ নেই রেণুর আর আমার। লবীতে গুজব, এবারে নাকি আমার একটা উপমন্ত্রিত্ব পাবার সম্ভাবনা রয়েছে। বড় মেয়ে বড় ছেলের বিয়ে দিয়েছিলাম মা বেঁচে থাকতেই। ছোট ছেলেকে বিলেত পাঠালাম এবারে। মেয়ে ছেলে দুটিরই খুব ভাল বিয়ে দিয়েছি। কুটুম্ব সবাই এদিকের, জামাই বৌ সব।

নাঃ, মা কি ভাইদের তখন আনতে পারি নি। খরচও বটে আর ঐ সেকেলে ধরনের বাংলাদেশের মানুষ নিয়ে রেণুর বড্ড ঝঞ্চাট বাড়ত। আমার এদিকের বন্ধু ও ছেলেমেয়ে, রেণুদের বন্ধুও তো ছিল অনেক। তাই রেণুর বাবা মা (তাঁরা দিল্লীরই লোক, মেসোমশাইয়েরই ভাইঝি রেণু) বলেছিলেন, 'তাঁদের 'নমস্কারী' পাঠিও। মাকে না হয় গরদ দিও একটা।'

আমার জামাই মেয়ে ছেলের বৌকে মা আর ওরা কেউই দেখেন নি।

ক'দিন ধরে শরীরটা খারাপ যাচ্ছে। কেউ বলছে প্রেসার। কেউ বলছে বেশী খাটুনি, ও কিছু নয়। বিশ্রাম নাও, ছুটি নাও বলছে সবাই।

বড় মেয়ে এসেছে দেখতে। জামাই দিল্লীতেই বড় কাজ করে। মেয়ের একটি মাত্র ছেলে। ছুটে এল, বলল, 'দাদাজী নমস্তে। আব্ তবিয়ৎ কৈসী হ্যায়?'

হিন্দী শুনে হেসে তার হাত ধরে বললাম, 'ভালো। ঠিক হ্যায়। কিন্তু হিন্দীতে কেন বলছ?'

মেয়ে বললে, 'আমি আর ওকে বাংলা শেখাই নি। শিখে তো কোনও লাভ

হবে না। ইংরেজী আর হিন্দীই শেখাচ্ছি ভাল করে। যাতে পরে কাজকর্মের চাকরি-বাকরির সুবিধা হয়। একেবারেই বাংলা জানে না। বাড়ীতেও হিন্দী কথাই কয়।'

রেণু ছিলেন। বললেন, 'শুধু বাংলা শিখে আর কি হবে? দরকারে তো লাগবে না। আর এইদিকেই থাকা হবে। ওদেশে আর যাচ্ছে কে?'

মেয়ে বললে, 'হ্যাঁ যা তোমাদের বাংলা দেশ আর বাঙালী!'

ডাক্তারের মতে এখনও বেশ কিছু দিন বিশ্রাম নিতে হবে। পারলে একটু বাইরে কোথাও যাওয়া ভালো। আগামী নির্বাচনের আগে চাঙ্গা হয়ে নিতে হবে। কোথায় যাব ভাবতে বসে সবাই। কেউ বলে বম্বে। কেউ বলে জব্বলপুর বা নাগপুর। কেউ বলে পাহাড়ে। আমি চুপ করে থাকি।

হঠাৎ মনে হল, দেশে যাই না? কত দিন যাই নি।

ছোট বেলার কথা, ভাই-বোন মা বাবার কথা মনে পড়তে লাগল। নানারকম কথা, বন্ধুদের কথা, সেকালের গান মনে পড়তে লাগল। তখন স্বদেশীর যুগ। আমি তখন মোটেই বড় হই নি। কিন্তু সব যেন কেমন করে ছবির মত চোখের সামনে ভেসে এল। সুরের গুঞ্জন কানের মাঝে ভেসে আসতে লাগল। "সুজলাং সুফলাং …ধরণীং ভরণীং মাতরম্।" আমার 'সোনার বাংলা' 'এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাক তুমি' …। আমরা শুনেছি। বেসুরো বেতাল গলায় গেয়েছি। দিল্লীতেই কতকাল পরে শুনেছি, 'আ মরি বাংলা ভাষা।' তখন 'আ মরি' মনে হয় নি মোটেই বাংলা ভাষাকে। হঠাৎ মনে হল মেয়ের কথা—ওরা ছেলেমেয়েদের আর বাংলা শেখাবে না।

তা আমি? নিজের কথা কেন যেন ভাবতে ইচ্ছে হল না।

রেণু আর ছেলেমেয়েরা সব সন্ধ্যেবেলা এসে বসলেন।

বললাম, 'ভাবছি কতদিন তো দেশের দিকে যাই নি, সেই মার অসুখে গিয়েছিলাম। দেশে গেলে কেমন হয়। জায়গাও বদল হয়, দেশে যাওয়াও হয়। ভাইদের সঙ্গেও দেখা হয়।'

দেশ? বাংলা দেশ! রেণু অবাক হয়ে গেলেন। ছেলেও আশ্চর্য হয়ে গেল। একটু চুপ করে থেকে ছেলে বললে, 'ঐ পচা নোংরা বাংলা দেশে কোনখানে যাবেন? কলকাতা? ঐ ভিড় হৈ-হৈ হুজুগ! আর কোনখানে বা যাবার মত সেখানে জায়গা আছে? যেখানে আপনার শরীর সারবে—বিশ্রাম হবে?'

রেণু অবাক হয়ে খানিকক্ষণ আর কথা বলতে পারেন নি। এবারে বললেন, 'দেশে —তা ইচ্ছে হয় তো তুমি যাবে বৈকি! ওখানে হ'লে আমি কিন্তু যাব না। কার

কাছে উঠবে? হোটেলেই উঠবে তো? আর সেখানকার খাওয়া-দাওয়ার যেমন ছিরি, তেমনি জলবাতাসও!'

'তোমার এত নিয়মের এত দিনের পশ্চিমে থাকা শরীর···সইবে কি?'

বললাম, 'আমার ছোটবেলার দেশ তো—সইবে না কেন? রিটায়ার করে তো দেশেই ছোট বাড়ী ঘর একটু করব ভাবছিলাম।'

এবারে দু'জনেই হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন। তারপর রেণু বললেন, 'আর এখানকার এত বড় বাড়ী ঘর?'

'ছেলেরা থাকবে। ইচ্ছে হয় তুমিও থাকতে পারবে।'

রেণু। 'ওঃ! সব ঠিক করে রেখেছ। তা যা খুশী কর।' রেণু উঠে গেলেন। বুঝলাম বিরক্ত আর আশ্চর্য হয়েছেন। হবারই কথা। কোনও দিন তো দেশের কথা বলতে শোনে নি।

৬

চুপ করে শুয়ে ভাবি। উপমন্ত্রিত্ব পাবার খুব গুজব। ছেলেমেয়েরা, রেণু খুব খুশী ও ব্যস্ত।

আর দেশের কথা যাবার কথা তুলি নি। যখন রেণু যাবেন না।

একদিন বিকেলে এসে ছেলে বললে, 'বোম্বেতে যাওয়া ঠিক করেছি আমরা।'

মারও তাই ইচ্ছে। মার কে বন্ধুও আছেন মিসেস রায়। আর পার্শী গুজরাটী মারাঠী বন্ধুও তো আমাদের অনেক আছেন। তা ছাড়া ডাক্তারও চেনাজানা আছেন।

'দেশে যাওয়াতে মারও ইচ্ছে নেই, আমাদেরও মনে হয় ঠিক সুবিধা হবে না।' সহাস্য প্রসন্নভাবে রেণু বললেন, 'আর যেখানে এতকাল আছি সেই তো দেশ। দেশের কি আবার হাত পা মুখ আছে নাকি আলাদা করে!'

হাসিমুখে মেয়েও বললে, 'সব ভারতবর্ষটাই তো আমাদের দেশ এখন বাবা। সবাই বলেন।' ওরা বসে বসে অনেকক্ষণ ধরে নানা জল্পনা-কল্পনা করতে লাগল। রেণু প্রথমে যাবেন। আমি ভাল থাকলে রেণু ফিরে এসে বৌমাকে আর মেয়েদের পাঠাবেন। বৌমা বোম্বাই দেখেন নি। কত জায়গা আছে দেখবার বেড়াবার —'ইণ্ডিয়া গেট' সমুদ্রতীরে 'জুহু', 'তাজমহল হোটেল···'। ছেলে মাঝে মাঝে যাবে। নোংরা বাঙালী পাড়া, 'দাদারা' তাও যাবে। তাহলে ওরাও মাঝে মাঝে বাঙালীকে মনে করে। আমার নিজেরই কথা মনে পড়ে গেল।

আমি সেরে-টেরে ফিরে এলে নির্বাচনের তোড়জোড়-এ নামব। কিন্তু আমি

তো নির্বাচিত নই। আমি তো 'মনোনীত' পদে আছি, তা তারও তো তদ্বির আছে। কথা সেরে ওরা চলে গেল খুশী মনে নিশ্চিন্ত হয়ে।

মেয়ের কথা মনে পড়ল। কথাটা মন্দ নয়। পণ্ডিতজীরই উক্তি বোধ হয়। হ্যাঁ, আসমুদ্র হিমাচল, (অখণ্ড নয়) খণ্ডিত ভারতবর্ষ সবটাই আমার দেশ! সবটাই! এবং আমি ভারতবাসী!

এবং সেই দেশেরই আমি 'এম. পি.'।

তা অত বড় দেশে তো বাস করা যায় না। তাই ছোট দিল্লী শহরটিই এখন আমার স্বদেশ। সকলেরই 'কেন্দ্রীভূত দেশ'।

যেন ব্রহ্মক্ষেত্র। যে ব্রহ্মবিন্দু থেকেই সব উৎপত্তি ধারণ ও লয় হচ্ছে। কিন্তু আমিও সেই বিন্দুতে অধিষ্ঠিত।

হয়ত সেখানে মন্ত্রী হব। লাভ? লাভ রেণু মন্ত্রীর স্ত্রী হবেন। অনেক মালা অনেক সম্মান পাবেন। হয়ত ছোটখাটো দ্বারোদ্ঘাটন, ভিত্তিস্থাপনে আমার পাশে দাঁড়াবেন। ছেলেমেয়েরা মন্ত্রীর পুত্রকন্যা হ'বে। অনেক প্রতিষ্ঠা ক্ষমতা পাব। বর্তমান ভবিষ্যৎও আছে তো।

তারপর? তার পরে কি জানিনে। মনে পড়ে গেল হিন্দীতে তিনটি পরীক্ষা আছে—রতনভূষণ, আরও একটা কি। তা পাস করেছিলাম।

হয়ত সেইরকম মত একটা ভূষণ বা বিভূষণে ভূষিত হব। এমন অবস্থায় নিজের দেশকে দেশ ভাবা তো প্রাদেশিকতাই হয়ে দাঁড়াচ্ছে। কিন্তু ওরা? অন্য প্রদেশীয়রা বিহার, উত্তরপ্রদেশ, মাদ্রাজ, আসাম, উড়িষ্যা, বম্বে ওঁরা কি ভাবেন?

নাঃ, সে কথায় আমার দরকার নেই। তবু···। এখনও বাংলা ভুলি নি তাই শুধু কথামালার একটা গল্প মনে হয়ে গেল। শেরওয়ানী আচকান (চুড়িদার) টুপিটা কি গায়ে ঠিক মানিয়েছে? ক'পুরুষ মানাবে কে জানে?

যুগান্তর, ২রা বৈশাখ, ১৩৬৯

পঞ্চাশোর্ধ্বে

শাস্ত্রকাররা জানতেন, মানুষের কোন্ সময় কি লাগে, কি করা উচিত, কি উচিত নয়, তাই একটি শ্লোকের মাঝে সমস্ত মানুষের জীবনের কর্মপদ্ধতি ছকে দিয়েছিলেন। কিন্তু মানুষের নিজের বুদ্ধিকেই বড় আর বেশী মনে করার অভ্যাসও তো কম নয়, কাজেই সে বুদ্ধির খাল কেটে সে নিজের ঘরে কুমীর ডেকেই আনে। এও দেখা যায়।

তাই দেখা গেল চাটুয্যেদের বাড়ির গিন্নি 'পঞ্চাশোর্ধ্বে' বনে মানে তীর্থে তীর্থে কিম্বা গ্রামের বাড়িতে যাবার নামটি করলেন না! অথবা হরিনামের মালা নিয়ে আরেকটু আগের কালের মতও ঘরের কোণে বসে রইলেন না! বরং যেমন সধবা অবস্থায় কর্তার রোজগারে কর্তৃত্বের আসনে (টাকার সুদ এখনও কর্তারই) প্রতাপাম্বিতার ভূমিকায় সংসার পরিদর্শন করতেন, তাই করতে লাগলেন।

কেন না করবেন? লোকে বলে আহা, সতুর মা—রত্নগর্ভা! তিনটি ছেলে যেমন, মেয়েরা তেমনি জামাইরাও তেমনি! বড় ছেলে কোন ব্যাঙ্কের বড় কর্তা, মেজ ডাক্তার, সেজ সরকারী বড় কাজ করে। জামাইরাও বড় বড় কাজ নিয়ে আছেন ডাক্তার, উকিল, জমিদার একজন।

কিন্তু রত্নগর্ভা হলেন না হয়, সবাই না হয় ভালোও, উত্তরকাল বলে একটা কথা আছে তো। উত্তর পুরুষ না হয় মাকে সহ্য করল, 'উত্তর নাতী'রা বড়ই বিপদে পড়ল— গিন্নীকে বা বুড়িকে নিয়ে! শ্বশুর থাকতে তাঁর টাকা, তাঁর কর্তৃত্ব সহ্য করতে হয়েছে না হয়, কিন্তু এখনও শাকের ঘণ্ট, মোচার ঘণ্ট, কপি বেগুন পটলে খামকা কর্তৃত্ব সহ্য করা ভাল লাগে না। এখন সকলের সব রান্নাঘর আলাদা হয়েছে।

সকাল বেলাই বড় বৌমার তরকারীর ঝুড়ি নিয়ে বসে খ্যাচ খ্যাচ করে সতু কবে কি ভালবাসত তাই কুটতে বসবেন। কুটি কুটি করে যা ইচ্ছে কুটে কেটে সব প্রায় জঞ্জাল বানিয়ে দেবেন। যদি তাও সহ্য হয় বৌমার মাছ নিয়ে যা-তা রাঁধতে বলে দেওয়া নিজের মতে, এ যেন আর পারা যায় না। কবে ওঁর সতু কি ভালবাসত তা কি আজও বাসে? না, রোজই তাই খাবে? বড় বৌমা তিক্ত-মুখে বিরস হাসি নিযে ঘুরে বেড়ান। কিছু বলাও তো যায় না।

মেজ বৌমার ঘরেও ঢোকেন। সে আবার ডাক্তারের বৌ, তার ঘরে কিছুতে হাত দিলেই বলে, সাবান দিয়ে গরম জল দিয়ে তরকারী ফলগুলো ধুয়ে নিতে হবে। তার পর কোটা হবে।

ধোয়া হলে মা বলেন, 'কি কুটবো আরও? এই বেগুনের পুরে ভাজা আর শুক্ত কুটলাম। সমর ভালবাসে। মাছে সর্ষে দিয়ে ঝাল করুক?'

মেজ বৌমা চায়ের টেবিল থেকে উঠে এলেন, 'কি কাণ্ড মা? আর অত শুক্ত কে খাবে? আলুগুলো সব ছাড়িয়ে ফেললেন? আমার যে সব 'জ্যাকেট' সুদ্ধ আলু সেদ্ধর দরকার ছিল বিকেলের চপের জন্য। কি মুস্কিল এখন! সর্ষে বাটা ওঁর সহ্য হয় না, কেন দিলেন করতে!'

'জ্যাকেট' সুদ্ধ? জ্যাকেট সুদ্ধ আলু কি বাছা?' মা চোখ বড় করে জিজ্ঞাসা করলেন। ওঁদের কালে 'জ্যাকেট' মানে জামা জানতেন!

ঐ খোসাসুদ্ধু আলুকে মেজবৌমা 'জ্যাকেট' সুদ্ধু আলু বলেন। স্বামীর ভাষার অনুকরণে। খোসাসুদ্ধু বলেন না। যাকগে, আবার চাকরকে বাজারে পাঠালেন আলুর জন্য।

'আর সর্ষে বাটা দেওয়া ইলিস মাছ সমর এত ভালবাসত। এই তো সেদিনও খেয়েছে। কবে থেকে আবার সহ্য হচ্ছে না?' মা চোখ কপালে তুলেই জিজ্ঞাসা করলেন।

ডাক্তার-গৃহিণী বৌমা বললেন, 'ঐ সব খাইয়েই তো হজমটা গেছে। আপনারা তো ওসব বোঝেন না। ছেলেদেব শরীর!' মা অবাক, মা ছেলেদের শরীর বোঝেন নি? উনি মা তো বটে!

ছোট বা সেজবৌমার ঘরে তরকারী কাটা হয়ে গেছে। রান্নাও চড়ে গেছে। সে আবার খুব চতুর, দিদিদের বা জায়েদের ঘরে নিত্য ও নৈমিত্তিক গোলমাল দেখে রাত্রেই তরকারী কুটে সব ব্যবস্থা করে রাখে। শাশুড়ীকে মিষ্টি হেসে বলে, 'এই হয়ে গেছে মা সব। আপিসের তাড়া কিনা।' মা বিরক্ত মুখে রান্নাঘরের মাঝে ঘুরে আসেন। মাছ দেখেন। 'এত মাছ আনিয়েছ তা সবই একরকম কেন করাচ্ছ? রোজই ঝোল কেন দাও? অন্য কিছুও তো করতে পার বাছা। কোন ছিরি-ছাঁদ নেই কাজের তোমাদের।'

ছেলে এসে পড়লেন খেতে, 'দাও দাও, খাবার দিতে বল।'

অবগুণ্ঠন আর আজকাল নেই, বৌও এসে দাঁড়ালেন খাবার জায়গায়। ইচ্ছা, বলেন বৌদের ব্যবস্থায় কত ত্রুটি, খরচ হয়, ব্যবস্থা হয় না ইত্যাদি ·· !

বললেন, 'অমন মাছ, রোজই একঘেয়ে রাঁধছে! আর তরকারীটা কি রাঁধাই রেঁধেছে! একটু দেখিয়ে দিতে পারে নি বৌমা? কাঁচকলার ঝোল কড়ায় বেঁধেছে, কালির মত কালো রং! এ খেতে পারে ওরা? না কখনও এমন খেয়েছে!'

ছেলে খুব ব্যস্ত। বললেন, 'বেশ হয়েছে মা। এত রকমের দরকার কি? ভালই তো ব্যবস্থা করছে। আমার এই রকমই ভালো লাগে। ঝোল তো ভালই হযেছে।'

মা থ' হয়ে গেলেন। কোনদিন ছোট বেলায় বা বড় বেলাতেও নরেন রোজ এক রকমের মাছ আর কালো ঝুল ঝোল দিয়ে ভাত খেত না। রাঁধুনির সঙ্গে নিত্য গোলমাল লেগেই থাকত। আর আজ বললে, 'আমার এই রকমই ভালো লাগে!'

তিনঘরেই সমান। মা আর 'হালে পানি' পান না। যেন সব গৃহিণীপনা কাজকর্ম আরেক ধরণের হয়ে গেছে। এই এক বছর মাত্র কর্তা মারা গেছেন তারি মাঝে।

যখন উনি শোকার্ত ছিলেন ভাবতেন ওদের কত অসুবিধা হচ্ছে—বৌমারা কি তেমন জানেন ওদের রুচিমত রান্না খাওয়া!

কিন্তু চূড়ান্ত আক্কেল হল যেদিন এক বৌমা বললেন, 'ওঁর জন্য কি রাঁধতে দিয়েছেন মা?'

মা একটু অবাক ও বিরক্ত হয়ে বললেন, 'যা ভালবাসে তাই তো কুটে দিয়েছি বাছা!'

বধূমাতা বললেন, 'বলছিলেন বড় একঘেয়ে রান্নার ব্যবস্থা হচ্ছে আজকাল…। তুমি একটু দেখেশুনে বলে দাও না কেন?'

যতই সন্তানের উপর জোর থাক্, তাকে জানা থাক্, সেই যখন এই কথা বলে, মা হতবুদ্ধি হয়ে যেতে বাধ্য। কিন্তু লজ্জিত হতেও বাধ্য।

এখন মা সকালে তরকারীর ঝুড়ি নিয়ে বসেন, কোটেন না। জিজ্ঞাসা করে কোটেন। যদিও জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হয় না। যেন মনে হয় 'অনুমতি' নিয়ে কুটনো কুটতে হবে! দেখ একবার! আমি জানিনে আমার ছেলেরা কি খায়, কি ভালবাসে। কখনও মনে দুঃখ হয়, কখনও রেগে যান, তবু কাজ করতে যাওয়া, আদেশ উপদেশ দেওয়ার পুরানো অভ্যাস যায় না।

২

কাছাকাছি বাগবাজারে এক ননদ থাকেন। তিনিও বিধবা। মাঝে-মাঝে আসেন, সুখ-দুঃখের নানা কথা হয়। তাঁর সংসারও পুত্র-পৌত্রাদি বেষ্টিত। বৌমারা এই ধরণেরই আধুনিক; তবে তিনি বহু দিন পূর্বে নাবালক সন্তান নিয়ে বিধবা হয়েছিলেন। এই প্রতাপান্বিতা ভ্রাতৃজায়ার কাছে (মায়ের আমলে) কিছুদিন ছিলেনও। সংসার-যাত্রার রকম বেরকম তাঁর কিছু বেশী দেখা আছে এবং যাকে বলে 'মনরাখা' মন যুগিয়ে চলা তাও তাঁর কিছুটা অভ্যাস ছিল। সুতরাং বধূমাতাদের পরোক্ষভাবে কর্তৃত্ব তাঁর খুব অসহ্য হ'ত না।

ঠাকুরঝি এলেন একদিন দুপুর বেলা।

গল্প গুজব নানা কথায় সময় কাটে। ননদের চোখে পড়ে ভাজের বিমনা ধরণের ভাব, যেন সেই চারি-চৌপাটে স্বয়ংসিদ্ধা ভাবটি আর নেই।

বধূমাতারা ঘরে ঘরে ফ্যানের তলায় বিশ্রামরতা। নাতি-নাতনীরা স্কুল কলেজে, পুত্রগণ কর্মক্ষেত্রে, ডাক্তারজন বাদে।

মা নিজের ঘরে মাদুরে শুয়ে একখানি বই খুলে বসেছেন। খুব সেকেলে মত ন'ন, ঠিক ভাগবত রামায়ণ মহাভারতের মত ধর্মগ্রন্থ নয়।

কিন্তু বইটিতে মন নেই। চোখটা দুপুরের আকাশের চিলের দিকে চেয়ে আছে। বইখানা আঙুল দিয়ে চিহ্ন করা রয়েছে শুধু। অনেকগুলো চিল একসঙ্গে সাদা মেঘের পাশেই যেন উড়ে বেড়াচ্ছে। ননদ এসে বসলেন। ভাজ উঠে বসলেন, বললেন, 'এস এস।—মাদুরে উঠে বোস, অনেক দিন আস নি এবারে। ভাল তো সব?'

ভাজের চোখের কোলে শুয়ে থেকে দু'ফোঁটা জল এসেছিল কি? তিনি চোখটা মুছে মাদুরে জায়গা করে দিলেন এবং এই কথাগুলি বললেন।

ঠাকুরঝির সুচতুর দৃষ্টি ভাজের বই নিয়ে শুয়ে আকাশের চিল-দর্শন এড়ায় নি। মুখের ভাবটা যেন বেশ বিমনা। বললেন, 'হ্যাঁ ভাই, সব ভালো তোমাদের কল্যাণে। তোমার মুখটা যেন দেখছি বড় শুকনো শুকনো। শরীর ভাল নেই?'

মন ভাল নেই চট্ করে জিজ্ঞাসা করা যায় না। কি জানি কি ভাববেন বৌদি। যদিও বেশ বোঝা যাচ্ছে বিমনা ভাবটা শরীরের নয়, মনেরই ব্যাপার।

ভাজও সুচতুরা। বললেন, 'শরীর ভালই ভাই। তবে আমাদের জীবনে ভালমন্দ নতুন আর কি বল। এই আছি মাত্র। বুড়ো বয়সে তোমার ভাই একেবারে সব শূন্য করে দিয়ে গেছেন।'

ননদ বললেন, 'সত্যিই তো। তা বেঁচে থাক ছেলেপিলে, ওরা তো 'মা' বলতে প্রাণ বের করে দিত। তোমার আবার ভাবনা কি? বৌমারা হাতে হাতে মুখে মুখে কাজ করতে এগিয়ে আসতেন। নাতি-নাতনীতে জাজ্বল্যমান তোমার সংসার। আর একদিন তো একজন যাবেই, ভাই আমার কথা ভেবে দেখ না সেই কবে বিধবা হয়েছি আজও মরণ নেই যেন চিরকালই বিধবা হয়েই কাটল।'

ননদ চোখ মুছলেন।

ভাজেরও চোখ সজল হয়ে এল। ননদের যে দুঃখের কথা আগে কখনও অনুভব করেন নি, সহসা তার সর্বশূন্যতার একটা রিক্ত রূপ আজ যেন দেখতে পেলেন। তারও সন্তানাদি আছে মানুষও হয়েছে, সাংসারিক কোনও দুঃখই আর নেই। তবে? এ কি দুঃখ? কেন এই রিক্ততা? শুধু কি স্বামীর অভাবে, না কি জন্য?

অবচেতন মনের ভিতরের কোন কারণেই হোক বা অকারণেই হোক দুজনেই খানিকটা চোখের জল ফেললেন। দু'চারটি কথা বললেন স্বর্গীয়দের সম্বন্ধে। ভগবানের কঠিন হৃদয়তা সম্বন্ধে। মোট কথা তাঁদের বক্তব্য একটিই ছিল যে নিজেরা আগে না মরে, কেন কর্তাদের এইভাবে মৃত্যু হয়? মেয়েরা কেন এতদিন বাঁচে! (মেয়েরা যে তাদের কর্তাদের চেয়ে স্বভাবতঃই বয়সে ছোট এবং ক্ষয়হীন নিরুদ্বেগ জীবন যাপন করে তা জানা সত্ত্বেও এই দুঃখ আর তাঁদের যায় না।)

বিকাল হয়ে গেল। ছেলেরা কর্মক্ষেত্র থেকে ফিরলেন, পৌত্র-পৌত্রীরা স্কুল কলেজ থেকে।

ভাজ একটু নড়েচড়ে বসলেন। যেন উঠি উঠি ভাব।

ননদ বললেন, 'উঠবে নাকি? ওদের খাবার দেবে তুমি? চল যাই দেখিগে, খাবার করা আছে তো?'

ভাজ বললেন, 'হ্যাঁ খাবার সব করাই থাকে। এখন তো বৌমারা নিজেদের ঘরে ঘরে খাবার করেন কিনা। আমি আর খাবার-দাবার দিই না।'

ননদ মুখব্যাদান করে বল্লেন, 'ওঃ, ওরা ভেন্ন হয়েছে! অনেক দিন আসি নি কিনা। তা এখন আর ঠাকুর নেই? তা তোমার রান্না কে করে? তুমিই কর?'

'ঠাকুর আছে বড় বৌমার। মেজোর ঘরে চাকর রান্না করে। সেজ আপনি করে নেয়। আর আমার কে আর করবে, নিজেই ওই ভাঁড়ারের এক কোণে দুটো সেদ্ধ করে নিই।'

'ওমা! তা ওরা তিনজনের একজনও পারে না? তা বড় বৌমার তো ঠাকুর রয়েছে, তবু পারে না?'

বড় বৌমা এসে দাঁড়ালেন। কথাটা কানে প্রবেশ করেছিল। মা অপ্রতিভ। ননদও চুপ করলেন।

বড় বৌমা ভক্তিভরে পিস-শাশুড়ীর পায়ের ধুলো নিলেন, বললেন, 'কখন এসেছেন? ঘুমিয়ে পড়েছিলাম টের পাই নি।' তারপর পিসিমার কথার খেই ধরে বললেন, 'মার রান্নার কথা বলছেন বুঝি? ক'মাস তো করে দিলাম বাবা যাওয়ার পর, তারপর এমন মাথার অসুখ হল! সে তো মা জানেন। আর আগুন-তাত সইতে পারলাম না। তা মেজবৌ-সেজবৌও তো করতে পারে! ওদের আর কি কাজ! আমার তো শরীরে সহ্য হয় না তাই। নইলে…।'

মেজবৌমা, সেজবৌমাও রঙ্গমঞ্চে এসে পড়েছিলেন। বড়বৌমার মন্তব্য তাঁদের কানে প্রবেশ করেছিল।

সেজ বৌমা বললেন, 'আমরাও তো ক'মাস রেঁধে দিয়েছিলাম। তারপর আমি ভাইয়ের বিয়েতে বাপের বাড়ি গেলাম, এসে দেখি মা-ই রান্না করছেন। দিদি রান্না-ঘরে উকিও মারেন না। সেজবৌ'র না হয় কচি ছেলে।' মেজবৌ বড়জা'র দিকে অগ্নিবর্ষী দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। দু'কথা শুনে থাকার পাত্রী তিনি ন'ন।

পরিস্থিতিটা এখন ঘোরালো হয়ে উঠল। জননী বল্লেন, 'ছেলেদের খাবার দিচ্ছি? কোথায় সব?'

পিসিমা বললেন, 'হ্যাঁ অনেক দিন ওদের দেখি নি—চল না যাই খাবার ঘরে।' উঠে দাঁড়ালেন।

'এখন তো ঘরে ঘরে নিজেদের টেবিলে খায়। আগের খাবারঘরে কেউ খায় না।'

বৌমারা গম্ভীর মুখে প্রস্থান করলেন।

কথার হেরফেরে পড়ে গিয়ে ননদ ভাজ খানিকটা হতবুদ্ধি হয়ে রইলেন।

দুজনেই বুঝতে পারলেন কথাটার জের অনেক দূর গড়াবে।

৩

পরদিন সকালে তিন বৌ স্নান করে শাশুড়ীর রান্নাঘরে এলেন। মেজবৌমা শিলনোড়া পেতে বসলেন। বড়বৌ ডাল চড়ালেন। সেজবৌ তরকারীর ঝুড়ি নিয়ে বসলেন।

শাশুড়ী তেতলার পূজার ঘর থেকে আহ্নিক সেরে এসে দেখে অবাক ও অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন।

অপরাধিনীর মত বললেন, 'তোমরা সকলে মিলে এখানে কেন? আমি তো অত তরকারী ডাল রাঁধি না। বাটনাও লাগে না আমার বেশী। কেন এসব করছ, ছেলেদের আপিস ইস্কুলের সময়, একি উল্টো কাজ করতে এলে।'

বড় বৌমা তিক্তমুখে ফোঁস করে উঠলেন, 'ওঁদের তো আসবার দরকার ছিল না, ওঁরা এলেন কেন। কথা তো আমাকেই শুনতে হয়, আমিই কাজ করব। কাল পিসিমার কাছে সাত কথা শুনেছি—আবার কোন্‌দিন মাসীমা, জ্যেঠিমারা এসে দশকথা বলে যাবেন! কি জানি বাপু, আমরা ভাবি একটা মানুষের এই এক মুঠো হবিষ্যি তার জন্য এত কথাবার্তা কিসের! আমাদের বাড়িতেও তো ঠাকুমারা নিজেরাই করতেন দেখেছি।'

ছেলেরা খাবার ঘরে এসে টেবিলে বৌয়েদের না দেখে জননীর ঘরে এলেন।

বড় ছেলে বললেন, 'কি হচ্ছে তোমাদের এখানে? আমার যে আপিসের কাপড় বের করে দিতে হবে, এখনও ভাত দেয় নি ঠাকুর! সন্তুর কলেজের সময় হয়ে গেছে।'

মেজ ছেলে একটু উঁকি মেরে দেখে গেলেন, বললেন, 'আজ মার কপাল ফিরেছে, বড় বৌ রান্না করছেন!'

বড় বৌমা দুম করে হাঁড়ি কড়া নামিয়ে দিয়ে বললেন, 'সব সময় ইয়ারকি ভাল লাগে না মেজ-ঠাকুরপো, আমরা কি কাজ করি না?'

তারপর রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। আর ফিরে আসবেন কিনা কারুর জিজ্ঞাসা করায় ভরসা হল না।

অপরাধিনী জননী তিন তাল হলুদ-লঙ্কা-ধনে বাটা এবং অর্ধসিদ্ধ ডাল, আধোয়া চাল, কাঁচা তরকারীর স্তূপের মাঝে নীরবে বসে রইলেন কিছুক্ষণ।

তারপর অন্য বধূদের বললেন, 'তোমরা নিজের কাজ কর গে, আমি করে নিচ্ছি আমার রান্না।'

বিকেলবেলা ননদ এলেন। ভাজ আজ চিল দেখছিলেন না, চুপ করে বসেছিলেন।

ননদ বললেন, 'বৌ কথা শুনতে যাবে?'

ভাজ বললেন, 'কোথায়—'

'এই অন্নপূর্ণার মন্দিরে। আমার বাড়ির কাছে। বড় বৌমার কি হয়েছে? মাথায় পটি বেঁধে শুয়ে আছে, খায় নি, বললে সেজ বৌমা। বললে, মাথা ধরেছে জ্বর হয়েছে একটু!'

'খায় নি? তা তো জানি না, আজ তো আর এদিকে আসে নি। আমার রান্নাঘরে একবার এসেছিল। চল দেখে আসি।'

অপ্রতিভ জননী ও পিসিমা বড় বৌমার ঘরে গেলেন। মেয়ে স্কুল থেকে এসে মাথায় জলপটি দিচ্ছে। দুই জা' কাছে বসে আছে। মৃদুস্বরে কথা কইছে।

পিতামহী কন্যাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি হয়েছে মিতু?'

সুমিতা বললে, 'মার তো আগুন-তাত সহ্য হয় না। আজকে রান্না করতে মাথায় আঁচ লেগে খুব মাথা ধরে উঠেছে। কিছুই খেতে পারেন নি। হাতে-ভাতে করেছিলেন মাত্র। আজ ভাল মাছ আনিয়েছিলেন তাও খাওয়া হয় নি। তা ঠাকুর গুছিয়ে রেখে দিয়েছে। বললে, মা বিকেলবেলা উঠবেন তখন তাড়াতাড়ি রেঁধে খাইয়ে দেবে।'

ঘর নিঃশব্দ। নিরপরাধ অপরাধিনী মা ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেও পারছেন না, বসে থাকাও শক্ত। খামকা রান্নার কথায় একি বিপরীত কাণ্ড!

বড় ছেলে আপিস থেকে এলেন।

স্ত্রী শয্যায় চোখ বুজে পড়ে। জননী পিতৃস্বসা দাঁড়িয়ে। কন্যা অডিকলোনের শিশি আর জলনেকড়া ভিজিয়ে মাথার কাছে বসে।

চক্ষের পলকে ব্যাপারটা বোধগম্য হল। নীরবে কাপড় বদলে চায়ের খাবারের ঘরে ঢুকলেন। কারুর সঙ্গে কথা না বলেই।

শুধু কন্যাকে বললেন, 'বাহাদুরি করে আগুনের তাতে যায় কেন? রাঁধতে তো অন্য সকলেও পারে!'

মা ও পিসিমার কানে কথাটা গেল পরোক্ষ হলেও।

কথা শুনতে যাবার অনুমতি বা গাড়ি চাইবার ভরসা আর হল না। ননদ এই দু'দিনেই বাড়ির আবহাওয়া বুঝে নিয়েছিলেন, সরে পড়লেন।

বললেন, 'আজ যাই ভাই। আর একদিন নিয়ে যাব।'

৪

কিন্তু দিন দিন ভয় বাড়ে বই কমে না। প্রতাপান্বিতা গৃহিণী এখন আশ্রিতা—জননীও যেন অবাঞ্ছিত আত্মীয়ার পর্যায়ে পড়েছেন।

অস্তিত্বটাই যেন অপরাধবিশেষ। অকারণ সমীহ সম্ভ্রম করার লোক বাড়িতে থাকা যেন সকলের যন্ত্রণাবিশেষ। উভয়তঃই।

জননী কোথায় লুকবেন ভেবে পান না।

সেকাল নয় যে, একটা মৌখিক শিষ্টাচার পরিজনরা রাখবে। নাতি নাতনীরা গল্প শুনবে, ছেলেরা কথা কইবে, বৌমারা একটু কাছে বসবেন। একেবারে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যময় ধন-গর্বিত মানুষের অভদ্র একাল। যেখানে ধন সেখানেই মানসম্ভ্রম, নইলে কিছুই নেই।

অত যে বোঝেন জননী তা নয়, তবে এটা বোঝেন যে, যেন একটা অনাবশ্যক অতিরিক্ত বাড়তি মানুষ।

আবার একদিন সহসা ননদের আবির্ভাব হল। তীর্থে যাবেন।

এবার একেবারে সরাসরি প্রস্তাব ছেলেদের কাছে।

'আমাদের পাড়া থেকে কুণ্ডু কোম্পানীর রেলে সব তীর্থ করতে যাচ্ছে, আমি যাবার ঠিক করেছি—বৌকে নিয়ে যাই—কি বলিস তোরা?'

সকলের ঘর আলাদা—চা ও খাবার জায়গা পৃথক।

সকলকেই পৃথকভাবেই আবেদন করতে হল।

জ্যেষ্ঠ বললেন, 'তা যান। কত টাকা লাগবে, আমার হাতে এখন বেশী কিছু নেই।'

মধ্যম বললেন, 'কতদিন হবে তোমাদের? আর মাসে মাসে টাকা দিতে পারব—থোকে একেবারে দিতে পারব না।'

কনিষ্ঠ বা তৃতীয় বললেন, 'তা ঘুরে আসুন কিছুদিন। এখানে যা খরচ হয় তার ওপর রেল ভাড়াটা—সে ব্যবস্থা হয়ে যাবে এখন।'

কেউ বললে না, 'মার কষ্ট হবে কিম্বা তাদের কোন অসুবিধা হবে অথবা খোঁজখবর দিও।'

অবশ্য মা সেকথা ভাবেনও নি। তবুও পিসিমার মনে হল।

বহুসংখ্যক বুড়ো-বুড়ি—কিছুটা প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া, ধনী দরিদ্র-মধ্যবিত্ত নানা শ্রেণীর

তীর্থাভিযানের মাঝে এই ননদ-ভাজ ও তাঁদের বন্ধু-বান্ধবী সমভিব্যাহারে যোগ দিলেন। হিন্দুস্থানী, মাড়োয়ারী, বণিক শেঠও প্রথম শ্রেণীর যাত্রী জুটল।

কাশী, গয়া, অযোধ্যা, প্রয়াগ—মথুরা, বৃন্দাবন, জয়পুর—আগ্রা, দিল্লী, হরিদ্বার সেরে দ্বারকা শেষ করে ফেরা।

মাড়োয়ারী মেয়েরা—আকণ্ঠ অবগুণ্ঠনের মাঝে গান ধরে—যেখানে যেমন। গাড়িতে উঠে গায়,

শুনো রেলকা বয়ান।
শুনো রেলকা বয়ান
কলকাতামে আয়ো গাড়ি ঝন নন নন্।
গাড়ি কলকতামে আয়ি
দেখ নীচে গঙ্গা মাই॥

রেলের প্রথম স্তুতি-সঙ্গীত। প্রপিতামহীর আমলের।

তারপর সকল তীর্থের জয়ধ্বনি করতে করতে বলে, কাশী জী কী জয়, গয়াজী কা জয়, প্রয়াগ মহারাজের ভজনও গায়, সীতারামের ভজনই বেশী। অযোধ্যায় গাইল রাম নাম। কাশীতে গাইল, 'মহাদেব সতত ভজত দিব্য রাম নাম কাশী মরত, মুক্ত করত, শুনায়ে রাম নাম।'

বৃন্দাবনে মথুরায় আবক্ষ ঘোমটা টেনে হাততালি দিয়ে তারস্বরে গায় মন্দির দুয়ারে দাঁড়িয়ে,—'উঠ্ নন্দরাণী খোল কেওয়াড়িয়া! লাল আয়োগায় চরায় কে!' (ওঠো নন্দ-রাণী দুয়ার খোল তোমার দুলাল গরু চরিয়ে এল)

কথনও গায়, 'হরিসে লাগি রহোরে ভাই,
তেরা বনত্ বনত্ বনি যাই।
অক্কা তারে, বক্কা তারে,
তারে সুজন কসাই।
শুগা পড়ায়কে গণিকা তারে
তারে মীরা বাই।'

আবার গাড়িতে উঠে গায়,—'উঠে চল মুসাফির ভোর ভয়ো
অব রইন কাঁহা যো সোওত হ্যায়।'

পথে নেমে তৃতীয়, দ্বিতীয়, মধ্যম শ্রেণী সকলেই এক গান গায়, একভাবে পথ চলে।

সময়ের মা পিসিমারাও তাদের দলে একপাশে বসে থাকেন। স্টেশনে স্টেশনে নামেন, রান্নাবাড়া করেন, দর্শন করে ফেরেন, পথে চলেন।

শুধু তাদের মত ঐ আনন্দময় তীর্থ-সঙ্গীত বা ভজনের গান এঁদের দলের কেউ

গায়ও না জানেও না।

কদাচ কখনও যদিবা কোন বৈরাগী গায়, তাহলে গায়—

'আমার আশার আসা ভবে আসা
আশা মাত্র সার হল।
চিত্রিত পদ্মেতে যেন ভ্রমর ভুলে র'ল।
চিনি বলে নিম খাওয়ালি মা ক'রে কত ছল,
আমার মিঠার লোভে সারাটি দিন (মাগো)
তেতো মুখে গেল।'

আর বাঙালী যাত্রিণী-যাত্রীদের চোখ জলে ভেসে যায়।

কোথায় কবে কে যেন চিনি বলে নিম খেয়েছে! চিত্রিত পদ্মকে সত্যি মনে করেছে। সে কে? কারা? সকলেই? কিন্তু ওরা তো ওই অন্য প্রদেশীয়ারা তো নয়। পিসিমা ও সমরের জননী ভাবেন যেন কত গান, আধুনিক, রবীন্দ্রসঙ্গীত কত শুনেছেন তবু আজকের মত এমন করে গান কি মনে দাগ কেটেছিল?

গান শেষ হয়—

'প্রসাদ বলে, ভবের খেলায় মাগো, যা হবার তা হলো
এবার সন্ধ্যে হলো কোলের ছেলে ঘরে নিয়ে তোলো।'

কোথায় সে ঘর? সহসা সকলের মনে হয়ে যায় যেন আরেক জনমের কথা।···

যাই হোক কুণ্ডু মশাইয়ের তীর্থযাত্রার তো শেষ আছে, মাস তিনেকের মধ্যেই সেযাত্রা শেষ হল।

তারপর? এবার আর তো তীর্থপথ নেই।

ননদ-ভাজ দু'জনেই চুপ করে বসে ভাবেন। এবার কোথায় যাবেন? বাড়ি? বাড়ির কথায় আনন্দ হয়, কিন্তু মমত্ব বোধের সুখ হয় না। যেন ভয়ে সঙ্কোচে ভরা কি ভাবনা জাগে।

যেদিন স্বামীর মৃত্যুর পর আবার সংসারের দিকে ফিরে তাকিয়েছিলেন, সেদিন যেমন সব কিছু ঠিক থাকা সত্বেও একটা আমূল পরিবর্তন কোনখানে হয়েছে, বুঝতে না পারলেও অনুভব করেছিলেন, বাড়ি ফিরে এসে আজ তাঁর মনে হল, সহসা তিনি যেন আর কাদের বাড়ি এসেছেন। যারা তাঁর আত্মীয় নন, কুটুম্ব—যাদের তিনি স্বজন নন, অতিথি।

৫

রান্না করা এবং খাওয়ার শেষ আছে। আহ্নিক পূজা জপেরও শেষ আছে।

কথা কার সঙ্গে কইবেন? ছেলেরা কাজে ব্যস্ত—বৌমারা বিলাস-ব্যসনে ব্যস্ত, নাতি-নাতনীরাও পড়াশুনায় ব্যস্ত।

শীত শেষ হয়ে গেল।

ননদ মাঝে মাঝে আসেন, একদিন বললেন, 'চল ভাই, দোলগোবিন্দ দেখে আসি পুরীতে। আর জন্মে আর বিধবা হতে হবে না।'

ভাজ হাসলেন, 'আবার জন্ম? আবার বিধবা? তাও এদেশে! কে জানে হয়ত অন্য দেশে জন্মাব।'

ননদও হাসেন, 'কি বলা যায়? যাবে তো ঠিক করি। গিয়ে কিছু দিন থাকা যাবে। ছেলেরা যাচ্ছে, তারা মাসখানেক থেকে ফিরবে। আমরা ছোটখাটো বাড়ি দেখে নিয়ে রথ অবধি থেকে আসব।'

প্রস্তাবটি লোভনীয় মার কাছেও। পুত্র ও বধূদের কাছেও অপছন্দ নয়…।

সঙ্গে পৌত্র পৌত্রী বধূরা দু'একজন জুটে গেলেন। যাঁরা বাকি রইলেন, পরে যাবেন। পুত্ররাও যাবেন।

অকস্মাৎ দুই জননী আবার পুরাতন কর্ত্রীত্বের ও সংসারের মোহের খেই খুঁজে পেলেন এই তীর্থযাত্রায়।

যেন মথুরাধামের দ্বারকাধীশের দর্শনের লীলায় একবার দেবতা-দর্শন একবার পর্দা ফেলার মত, আবার তাঁরা সবসুদ্ধ পুরীতে এক অস্থায়ী সংসার পেতে বসলেন।

ভারি আনন্দে কাজ করেন, দর্শন করেন, সমুদ্রস্নান করেন, মন্দিরে মন্দিরে কথা শোনেন। লক্ষ্মীমন্দিরের, ষড়ভুজের মন্দিরে—মন্দিরের প্রাঙ্গণে এদিকে ওদিকে কথকতা যেন লেগেই আছে। উড়িয়া ভাষায় মিষ্ট সুরে গান গেয়ে যায় অন্ধ যুবক—'জগড়নাথ তুম্‌হে বড় দারুণ (নিদারুণ অতি)।'

কি তাঁর নিদারুণতা তা আর সে খুলে বলে না, শুধু গায় অতি অকরুণ তিনি।

দিন কেটে যায়। নাতিরা বৌমারা ফিরে যায়, আবার আসেন। ননদ ভাজ থাকেন। মন্দিরের ফুলের মালা গেঁথে দেন। কেয়াপাতার মালা রচনা করতে শেখেন। রচনা করে দেন দেবতাকে। কথা-পাঠ, কীর্তন শোনেন, আর রাত্রে শুয়ে ভাবেন সংসারের কথা। কোন্ ছেলে কে কোন্ কথা কবে বলেছে, কে কি খেতে ভালবাসে…।

বছর কাটে।

বধূরা পুত্রেরা বেড়িয়ে যায়। ছেলেরা কেউ হেসে হেসে বলে, 'মা আর যাবে না, দেখছি জগন্নাথেই আটকে গেলে?'

বলে না, 'মা চল। আমাদের ভাল লাগছে না।' জননী যে কথাটি শুনতে উৎকর্ণ হয়ে থাকেন।

বধূরা বলেন, 'মা বেশ মায়া কাটালেন। আর কি কলকাতা ভাল লাগবে?' তারাও বলে না, 'মা চলুন'। যদি মা সত্যই তাদের সঙ্গে যান!

ফিরে গিয়ে চিঠি একজন লেখে, 'মা কি রকম নিশ্চিন্ত হয়ে আছেন, কতদিন হল বাড়ি ছেড়ে আছেন।'

অন্যজন লেখে খুব মুন্সীয়ানা করে, 'বড় চমৎকার জায়গা, গেলে আর আমাদেরই আসতে ইচ্ছা করে না। তা আপনারা আর কি করে আসবেন ইত্যাদি।'

তৃতীয়া লেখে, 'এবার গিয়ে আপনাকে আমরা নিয়ে আসব আপনার নাতিরা বলেছে...

ননদের তারই মাঝে ডাক পড়ে, ছোট ছেলের বৌর আঁতুড় তুলতে। মেয়ের ছেলে হবে আসা দরকার—তাদের গৃহস্থঘর, লোকের দরকার।

ভাজের ছেলেদের টাকা আছে, লোকজন আছে—তাদের ঘরে আত্মীয় মানুষের প্রয়োজন নেই। থাকলে অসুবিধা, সঙ্কোচ।

জননী সকলের চিঠি পড়েন, মনে হয় ওরা সত্যই যেতে লিখেছে। একবার বলেন, 'যাব।' কি কি নেবেন মনে মনে ভাবেন।

হ্যাঁ, পুরীর জিনিসপত্র সরু চিঁড়ে, বড় মানকচু, সরভাজা, খেলনা পুতুল সব নিতে হবে। শাড়ি বৌমাদের নাতনীদের জন্য, কন্যাদের জন্য।

অনেকগুলি টাকাও সেজন্য দরকার...। বাড়িখানা রেখে যাবেন, না ছেড়ে যাবেন তাও ভাবেন। ভাবেন ননদ ফিরে এলে পরামর্শ করে যাবেন। বধূমাতাদের চিঠি লেখেন, 'এবার যাব, অনেক দিন রয়েছি...।'

শ্রীমন্দিরে কথা শুনতে যান, মহাভারতের স্ত্রীপর্ব শেষ হল। ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী তখনও যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে বাস করছেন...! তারপর ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী বিদুর সবাই বনে চলে গেলেন। কুন্তীও তাদের সঙ্গে গেলেন...। পুত্রদের রাজ্যপাটে রাজভোগে থাকতে চাইলেন না।

কয়েকদিন বাদে বধূমাতাদের কাছ থেকে চিঠির জবাব এল।—'মা আপনি আসবেন শুনে বড়ই আনন্দ হয়েছিল, কিন্তু আমরা সকলে কয়েকদিনের মধ্যেই একটু দেশ বেড়াতে যাচ্ছি—আগ্রা দিল্লী হরিদ্বার আর বম্বে মাদ্রাজ সব ঘোরা হবে। ফিরতে দেরি হবে। আপনি একলা এসে কষ্ট পাবেন—তাই আপনার ছেলেরা বললেন, মা যেন পুরীর বাড়ি ছেড়ে না দেন হঠাৎ।'

ছেলেরা বধূদের ওকালতনামা দিয়েছে সব বিষয়ের। তারা নিজেরা আর চিঠি দেয়

না। সন্ধ্যাবেলা মহাভারত খুলে বসলেন। অনুশাসনপর্ব চলছিল, সহসা চোখে পড়ল, 'অপত্যে হইলে প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা আর সংসারে বাস করিবেন না… ।'

কল্পনা, ১৩৬৩

এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা

অন্ধকার রাত্রি। জঙ্গলের হাঁটা পথ ও বিপথ। ভাল পথের দিক তারা জানে, কিন্তু তার দরকার নেই। সে পথে আতঙ্কের ভয় বেশী।

তারা চলেছে। ছোটদল, বড়দল, ভাঙ্গাদল হয়েও একমুখেই একই সঙ্গেই চলেছে।

না, তীর্থযাত্রী নয়। সাগর মেলা বা কেদার বদরিকাশ্রম যাত্রী নয়। মেলা বা অন্য কোনও দুর্গম পথের যাত্রীও নয়।

যদিও গন্তব্য তাদের দুর্গম। কোনরকমে যদি একবার গন্তব্যস্থলে পৌছয়! তাহলে? তাহলে মেয়েদের মান পুরুষের প্রাণ আর চিরকালের ধর্ম বাঁচবে। ধনরত্ন নয়। সে তাদের নেই। ধন ধান্য ছিল বটে।

পুরুষদের হাতে লাঠি টাঙ্গি। পিঠে কাপড়চোপড় বা চালচিঁড়ের পুঁটুলি। খালি গা, পরিধানে আঁটসাঁট ধুতি মালকোঁচা দিয়ে পরা। নানারকমের পুরুষ বৃদ্ধ যুবক প্রৌঢ়।

আর মেয়েদের কোলে শিশু। হাতেও শিশুর হাত ধরা। কারুর হাতে তার সঙ্গে চাল মুড়ি চিঁড়ে গুড়ের পোঁটলা। মাথায় ঘোমটা।

নানারকমের নারী, কমবয়সীরা একেবারে ভিড়ের মাঝখানে। গুরুজনের বন্ধুজনের বেষ্টনীতে।

নীরব যাত্রা। যাত্রীও আতঙ্কাভিভূত।

সহসা কোন্ বনজঙ্গলের একদিকে রেলের তীক্ষ্ণ বাঁশীর 'কু' শব্দ শোনা গেল। তারপর আকাশে কালো ধোঁয়া। গাড়ীচলার সুদূরবর্তী শব্দ।

আনন্দে মেয়েরা উলুধ্বনি দিল। আর পুরুষ কয়েকজন হরিবোল দিল।

আঃ কি হুজ্জুত লাগাইছস্ চুপ কর! ওরা শুনবার পাব বুঝছস্ না? একজন প্রৌঢ় পুরুষ ধমক দিলেন।

যাত্রীরা নীরব হয়ে গেল। কিন্তু মনে আনন্দের সীমা নেই। ক'রাত্রি হেঁটে চলে জঙ্গল ভেঙে নদী পার হয়ে আজ বুঝি কূল পাওয়া গেল। একবার টিকিট কিনে

গাড়ীতে বসলেই হয়। জানে দেশ গেছে। স্বজন নেই। মাটি নেই। ধন নেই। অর্থ নেই। নিঃসম্বল নিঃস্ব। তবু এক ধর্মের এক জাতের মানুষ তো আছে। শেয়াল কুকুরের মত তাড়িয়ে দেবে না। প্রাণ মান নিয়ে টানাটানি করবে না।

পঞ্চাশ-ষাট জনের জনতা এসে পৌছল। সীমান্তের স্টেশনের ধারে। পিছনে আরও আসছে।

এপার থেকে লোকেরা ঘিরে দাঁড়াল, 'কোত্থেকে আসছিস? পাসপোর্ট কই?'

বোকা নির্বোধ লোকগুলো পাসপোর্টের নাম জানে। শিখেছে। কিন্তু মাঝে মাঝে এমনি এসে পড়তে পেরেছে তো অনেক জন। গতবছরের দুর্যোগের দিনে।

তারা বললে, 'পাসপোর্ট করতে পারি নি, মিঞা সাহেব চলে যেতে দিন। আর তো আসুম না।'

মিঞা সাহেবরা চুপ করে থাকেন। বলেন 'ওদের ওপারে ভিগাও।' এরা ওদিকে যায়।

তারা বললেন, 'না, হুকুম নেই ফিরে যাও দেশে।'

'সে কি?' হতবুদ্ধি লোকগুলো হাতেপায়ে ধরে দুদিকের লোকদের।

নাঃ, হাতপায়ে ধরার চেয়ে ক্রন্দনের চেয়ে আরও স্পষ্ট স্থূল কিছু চাই।

হ্যাঁ। দু'দিকেই চাই; বড়-বড়রা পিছন ফিরে আছেন। ছোটখাটোরা ইঙ্গিত ইশারায় বক্তব্য বুঝিয়ে দেয়। দু'পক্ষেরই দ্বিমত হয় না।

যারা পারল গেল, বাকিরা স্টেশনের প্রান্তে একপাশে বসে থাকে।

সহসা একজন এসে তাকে জিজ্ঞাসা করলে, 'তোর নাম কি?'

জিজ্ঞাসিতেরা নীরবে বসে ছিল একধারে। তাদের 'সেলামী' 'নজর' দেবার মত কিছুই নেই। ফিরে যাবার উপায়ও নেই। কিন্তু এগিয়ে যাবার মত উপায় নেই। হেঁটে হেঁটে সে যেতে পারত যদি যেতে দিত। তারা দু'জন স্বামী-স্ত্রী।

সে আশান্বিত হয়ে বললে, 'বাবু আমার নাম সুদাম ঋষি।'

'ও কে তোর সঙ্গে?'

'আমার পরিবার। আর কেউ নাই আমরা দু'জনই আছি। যেতে দেবেন বাবু?'

বেশ সুশ্রী বিশ-বাইশ বছরের মেয়ে। সেও নতমুখে মাথায় ঘোমটা দিয়ে বসেছিল।

সকলের চোখ পড়ছে। কোথায় কোন্ ভাল মেয়ে আছে। কোথায় কার ট্যাঁকে টাকাপয়সা আছে। দু'পারের মানুষই এক নিমেষে বুঝতে পারে অভ্যস্ত চোখে কারা কেমন, কার কাছে কি পাওয়া যেতে পারে।

প্রশ্নকর্তা জিজ্ঞাসা করলে, 'কত দিতে পারবি দু'জনার জন্যে ?'

সুদাম ব্যাকুল ভাবে বললে, 'বাবু গো পাঁচটি টাকা আছে আর কিছু নাই।'

তারা হাসিতে ভেঙে পড়ল একসঙ্গে। 'যা বেটা ফিরেই যা দেশে।'

তারা সুদামের স্ত্রীর দিকে চাইল।—'ওর নাম কি ?'

'উয়ার নাম দুর্গা।'

'দুর্গা'ই বটে! তারা ভাবে। 'তোদের দুজনের জন্যে পঁচিশ টাকা লাগবে। তাহলে হাঁটাপথে যেতে দেব।'

'কোথায় পাব বাবু অত টাকা ?'

সহসা দুর্গা ঘোমটা সরিয়ে স্বামীকে কি বললে। কি সুন্দর মুখখানি। বাঃ রঙও তো বেশ। কে বলবে মুচির মেয়ে।

সুদাম বললে, 'কলকাতায় ওর ভাই আছে সেখানে গেলে টাকা আনতে পারি। কিন্তু ওকে পাঠিয়ে দিই একলা কার সাথে ?'

যারা দুর্গাকে দেখছিল তাদের চোখ ফেরে না।

তারা বললে, 'তুই যা না। টাকা নিয়ে আয়। ও এখানে মাস্টারবাবুর বাড়িতে থাক্।' (স্টেশন মাস্টার)।

ওরা দুজনে কাঁটা হয়ে গেল। যেন এখনি কে ছাড়াছাড়ি করিয়ে দিচ্ছে।

সুদাম বললে, 'না থাক্ বাবু। ফিরেই যাব।'

দিন শেষ হয়ে যায়। রাত্রি আসে। মুড়িসুড়ি দিয়ে দুর্গা স্বামীর কাপড়ের সঙ্গে নিজের আঁচল বেঁধে শুয়ে থাকে। একটু ঘুম আসে। আবার ভয়ে ভাবনায় আতঙ্কে ভেঙে যায়।

দেখতে দেখতে এ দলের সব লোকেই যে ভাবেই হোক এদিকে ওদিকে চলে গেল। যারা রইলেন তারা অচেনা ভিন্ গাঁয়ের লোক। তবু হিন্দুই।

আবার দিন গিয়ে রাত আসে। সেই দালালরাও আসে। বলে, 'তুমি চলে যাও সুদাম। টাকা নিয়ে এস, আমরা তোমার বৌকে দেখব।'

দুর্গা ভয়ে কাঠ হয়ে থাকে। ওরা দেখবে ? ওরা কারা ?

আবার দিনরাত যায়। অবশেষে দুর্গাই বলে, 'তা তুমি আমাকে মাস্টার সাহেবের বাড়ি নিয়ে রেখে এস। যদি তিনি রাখেন তো থাকব। তাঁর তো বিবি আছে!'

স্টেশন মাস্টারের কোয়ার্টার কাছেই। তাঁর বিবি আছেন। দু'তিনটি ছেলেমেয়ে আছে।

দুর্গা একগলা ঘোমটা দিয়ে ভেতরে ঢুকল। আর সুদাম বাড়িতে মাস্টার সাহেবের পায়ের কাছে বসে চোখের জল ফেলতে ফেলতে বললে, 'আপনি আমার বাপের মতন। আপনি ওরে রাখুন। আমি ওর ভাইয়ের কাছ থেকে টাকা এনে আপনাকে দেব।'

মানুষ পাথরও হয়, আবার মানুষও হয়।

লোকের দুঃখ-দুর্দশা দেখে স্টেশন মাস্টারেরও সবই যেন অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল।

তবু সহসা সুদাম আর দুর্গার অসহায়তা দেখে কেমন দয়া হল।—'আচ্ছা তুই রেখে যা আমার বিবির কাছে। কিন্তু ক'দিন হবে? এখানে তো নানারকম গুণ্ডা আছে, আমি একা সামলাতে পারব কি? আর খাবে কি? তোরা তো আমাদের কাছে খাবি না—হিঁদু তো।'

সুদাম খুশী হয়ে উঠে বসল।

'আমি যাব আর আসব। ওকে আপনার পোলাপান মনে করবেন। ও যা হয় কবে একটু ফুটিয়ে নেবে ওর 'মায়ের' কাছে—আপনার বিবিসাহেবের কাছে। চিঁড়েমুড়ি খাবে। সঙ্গে আছে। দু'তিন দিন বই তো নয়। মা-জানের কাছে থাকবে।'

তন্বী সুন্দরী তরুণী দুর্গা দিন গোনে। হ্যাঁ, আজ তিনদিন। আজ এসে পড়বেই সুদাম। দাদারা কলকাতায় আছে। ওর মাসী আছে। সুদামেরও পিসি আছে। সকলে মিলে কি আর পঁচিশটা টাকা দেবে না?

নাঃ পাঁচ দিন গেল। দেখতে দেখতে দশ দিনও কেটে গেল। সে ভয়ে ভাবনায় একবারে অভিভূত হয়ে যায়। কি হল সুদামের? কি হল? আর আসবে না? বিপদ হল কিছু? সেখানকার লোকেরা ছেড়ে দেয় নি? মিঞা বাড়ির কাছাকাছি স্টেশনের ফাজিল ছোঁড়াগুলো বিবিসাহেবের কাছে এসে দাঁড়ায়। নানা গল্পের মাঝে বলে, 'বিবিসাহেব ওকে কেন ঘরে পুষে ধরে রেখেছ! বিদেয় করে দাও। যেখানে ইচ্ছে যাক চলে।' স্টেশনের কুলীগুলো হি হি করে হেসে বলে, 'সে আবার আসবে টাকা নিয়ে! ঘাড় থেকে নামিয়ে বেঁচেছে বলে। এবার ছুঁড়ীই কত টাকা রোজগার করবে, আমরাই খদ্দের দেখে দেব!' দুর্গা ছোট্ট ভাঁড়ারঘরের এক কোণ থেকে সব শুনতে পায়। বুক ঢিপঢিপ করে। চোখ জলে ভরে যায়। ঠোঁট শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায়।

তারা চলে গেলে সে বিবিসাহেবের পা জড়িয়ে ধরে কাঁদে। বলে, 'তুমি আমার মা। মা-জান বলেছি তোমায়, তুমি আমায় ওদের কাছে দিও না।'

বিবি বলেন, 'নারে না, ভাবিস্ নি। থাক্ না তুই।'

কিন্তু রাত্রে অবসর হলে স্বামীকে বলেন, 'সে লোকটা আইল না ক্যান্? ফেইল্যা পালাইল নাকি?'

মিঞা বলেন, 'খোদায় মালুম সেকথা। তবে আসবে। জোয়ান পরিবার অত রূপ! যাবার সময় আমার পায়ে ধরে কাঁদল। তবে কলকাতা শহর। কি হয়ত বিপদ হল। নয়ত টাকা পায় নি। মোয়া ছেড়ে দিতে পারতাম। তা 'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা'! দুদিকেই তো টাকা দিতে লাগব। সবাই তো সমান সাধু! জানই তো।'

বিবি বললেন, 'আহা জোয়ান মেয়েটা। কি হবে কে জানে। সে যদি না আসে। কতদিন তুমি রাখতে পারবা এই হাঙ্গামা-হুজ্জুতের দিনে।'

পাশের ঘরে বিনিদ্র দুর্গা সব শুনতে পায়। তা হলে?

তাহলে কি করবে সে? ওই রাক্ষস দলের হাতেই এরা ছেড়ে দেবে ওকে? আর আর? যেমন গাঁয়ে দেখেশুনে এল। পথেও যেমন ক'বার হল! মেয়েরা কাঁদল। পুরুষরা মরল। পালাল। তাহলে? দুর্গা কাঠ। দুর্গা পাথর।

ভাবে, পালিয়ে যাবে? কোথায় পালাবে! বাইরেও তো ওরাই আছে। গলায় দড়ি দেবে? ডুবে মরবে? নদী আছে কোথায়? পুকুর আছে কি? আছে যেন। আবার ভাবে, আসবে। সুদাম আসবে নিশ্চয়ই।

কিন্তু আরও কদিন গেল।

স্টেশন মাস্টার সাহেব আর বিবি সবাই সন্দিগ্ধ হয়ে উঠছেন ক্রমশ। সুদাম পালিয়েছে। দুর্গা আর রাঁধে না। খায় না। শুকনো দুটি চিঁড়ে মুড়ি জলে ভিজিয়ে চিবিয়ে নেয়। বিবি বেশী বেশী বললে।

একুশ দিনের দিন সুদাম এল। চোখ মুখ বসে গেছে ভাবনায়—কিন্তু এল।

অতি কষ্টে নানা রকমের লোকের হাত থেকে টাকা ক'টি বাঁচিয়ে আনতে পেরেছে কেঁদে-ককিয়ে লুকিয়ে-চুরিয়ে।

এসে আভূমি নত সেলাম করে স্টেশন মাস্টারের সামনে দাঁড়াল। ডাকল, 'সাহেব!'

সাহেব যেন চমকে ভূত দেখলেন। 'এত দেরি করলি? তিনদিন বলে! কি হয়েছিল?'

'টাকার যোগাড় করতে দেরি হল সাহেব। তা আজকেই তো ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারুম? ভালো আছে তো সে?'

হাতের নোটগুলো সাহেবের সামনে ধরে দেয়।

তিনি নিলেন না। শুধু শুষ্ক মুখে বললেন, 'তুই কিছু খেয়ে নে। তার পর কথা বলব।'

সুদাম ভয় পেয়ে গেল। ভাবলে, বুঝি আরও টাকা চাইবেন। কোথায় পাবে? কোথায় পাবে টাকা?

সে সাহেবের সঙ্গে তাঁর কোয়ার্টারে গেল।

বিবি সাহেবকেও পেন্নাম করল। তিনিও শুকনো মুখে বললেন, 'ভাল আছ তো? তা এত দেরি কেন করলে?'

'সে কোথায় মাজান?' সুদাম উৎসুক হয়ে এদিক ওদিক চায়।

বিবি বললেন, 'কিছু খাওয়াদাওয়া কর। তারপর বলছি।'

'সেকি রাঁধে নাই? ওই তু'গা 'খাব'খন। দিতে বলুন।'

এবারে বিবির চোখে জল এল।

শুকনো কাঠ মুখে সুদাম বললে, 'সে কি নেই? ধরে নিয়ে গেছে তাকে?'

মিঞা পিছনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। বললেন, 'না ধরে নেয় নি। সে বেঁচে নেই। জলে ডুবে গেছে।' সুদাম স্তম্ভিতের মত উঠোনে বসে পড়ল।

অনেকক্ষণ—তারপর উঠে বাইরে গেল।

অকস্মাৎ তার মনে হল সবাই ওরা মিথ্যে বলছে। ওরা আরও টাকা চায়, তাহলেই ছেড়ে দেবে। সে বেঁচে আছে। সে আছে এইখানে কারুর কাছে।

সে স্টেশনে এল। একটু কাজের নিরিবিলি হলে সে মিঞা সাহেবের পা জড়িয়ে ধরে মাথা কুটতে লাগল মাটিতে জুতার ওপরে। কপাল মাথা ফুলে ঢিবি হয়ে ওঠে।

লোক জমে গেল এদিকে ওদিকে।

সে কাঁদে আর বলে, 'সাহেব গো ওরে দিয়া দেন। আমার আর কেউ নাই গো।'

গোলমালে ওপারের অফিসার এপারের কর্মচারী ভাগ্যনিয়ন্তারা সকলে এসে দাঁড়ালেন।

সকলেই বলে, 'সে একটা পচা পুকুরে গলায় ইট বেঁধে ডুবে মরেছে। সবাই জানে। বেঁচে নেই রে। তোর দেরি দেখে এই করেছে।'

সুদাম ফ্যালফ্যাল করে তাকায়। কিছু বলে না। তার বিশ্বাস হয় না।

হিন্দু অফিসার বলেন, 'তুই আমার সঙ্গে ওপারে চল্। এখানে থেকে কি করবি? পাঠিয়ে দেব।'

মুসলমান অফিসার বলেন, 'সত্যি বেঁচে নেই রে সে। আমরা দেখেছি, পুলিস জানে।' সে জন্তুর মত বসে থাকে। কারুর কাছে যায় না। কোনও কথাও কানে যায় না তার।

এক একবার বনের দিকে, যাওয়া আসার পথে লোকের বিরাম নেই। সেইদিকে তাকিয়ে থেকে থেকে দুর্গাকে খোঁজে। ওই মেয়েটি? ওই যে ফরসা মত রং, লালপাড় শাড়িপড়া, পায়ে আলতা? ঠিক যেন দুর্গা। কিন্তু নাঃ, সহসা কি মনে হয়। ফিরে আসে স্টেশন মাস্টারের বাড়ি।

সাহেব খানা খেয়ে বসে ছিলেন।

'সাহেব গো, আপনি জানেন সে কোথায় আছে মোরে বলেন। আমি তারে কলকাতায় নিয়ে গঙ্গাচান করিয়ে পঞ্চগব্যি খাইয়ে শুদ্ধ করে নিমু। তারে জাতে তুলে নিমু। বড় কেঁদেছিল সে। যাবার দিনে।'

দুঃখিতভাবে বিবি বললেন, 'ওরে সে নেইরে, নেই।'

তার পরদিন আবার আসে। এবারে বলে, 'মা-জান, আমি মোছলমান হব। তাহলেই তো ওরা আমাকে তারে ফিরে দিবে। তুমি তাদের তাই বল গো। মোছলমানরা তো মোছলমানের বৌরে ঘরে রাখবে না। ফিরিয়ে দেবে। মা-জান, তুমি আমার মা, সাহেবেরে বুঝায়ে বল। সে মরে নি। সে আমারে শীগগীর আসবার জন্যি বলেছিল।'

বিবি সাহেব হতবুদ্ধি। কি বলবেন ভেবে পেলেন না।

শুধু বললেন, 'তুই পাগল! সে যে বেঁচে নেই রে।'

সুদাম ফিরে গেল। পথে-বিপথে বনে-বাদাড়ে ঘোরে। রাত নেই দিন নেই, ঘোরার শেষ নেই। যেদিক থেকে এসেছে সেদিকেই হয়ত দুর্গা গেছে। লোকেরা নিয়ে গেছে। সেদিকে যায়। প্রতিদিনই লোক আসছে। জমছে। ভিড় করছে।

কত রকমের মেয়ে। পাতলা চেহারা তন্বী জোয়ান মেয়ে। ফর্সা রং। পায়ে আলতা, মাথায় সিঁদুর, মুখে পান। দূর থেকে দেখে মনে হয় ওই তো দুর্গা! চেঁচিয়ে ডাকে, 'দুর্গা রে দুগ্‌গা!'

এগিয়ে যায়। না। দুর্গা নয় তারা কেউ।

অনেক রাত্রে ক্লান্ত হয়ে স্টেশনে পড়ে ঘুমোয়। আবার সকাল হবার আগেই চম্‌কে ঘুম ভাঙে।

নিশুতি অন্ধকারেই উঠে পড়ে। আজ হয়ত পাওয়া যাবে দুর্গাকে।

আমাদের গ্রাম,
বৈশাখ—১৩৭২

প্রেম জিনিসটা এমনই বটে! রেবার মনে মনে হাসি এল। দাদা যতদিন চুপচাপ ছিল ততদিন কেউ জানত না যে ওর মনে এত উচ্ছ্বাস আছে।

তা যাক্, ভালই তো। কিন্তু তার যে ভারি বিপদ হল! নীরা আর তার দাদার এই উচ্ছ্বাসে মিলনে তার শুধু যোগাড় দিলেই হবে না, সাংসারিক ও সামাজিক উদ্যোগ করলেই হবে না, যোগ দিতে হবে! অর্থাৎ যোগ শুধু উলু দেওয়া বা শাঁখ বাজানো নয়, আর একখানি আলপনা দেওয়া পিঁড়িতে 'কনে' সেজে বসতে হবে তাকেও।

কবে একখানি সেকেলে বইয়ে পড়েছিল রেবা, যাতে শেষ অবধি পিসিমার জয়, মঙ্গলবার ব্রতের কাহিনীর মত জলেডোবা, সাপে কাটা, নিরুদ্দেশ হওয়া সবাই ফিরে এল, ঘড়া ঘড়া মোহর পেল নায়ক মাটি খুঁড়ে এবং পরম সুখে দেশের ঘরের যাবতীয় নটেগাছগুলি মুড়িয়ে (ভক্ষণ করে? কি দুর্লভ ও উপাদেয় বস্তু! সেকালকার পিতামহীরা কি সরলই ছিলেন!) দিনাতিপাত করতে লাগলেন।

অনেকে হাসে। অর্থাৎ কু-সমালোচকে হাসে। রেবা ভাবে হাসবে কেন? ওঁদের ওই সব সেকালের লেখকদের হৃদয় এত বড় যে ওরা কাউকে শেষ অবধি অসুখী রাখতে পারেন না। বিধাতার চেয়ে দাতা ওঁরা, বিধাতার দেওয়া সুখের শান্তির ফুলে দুঃখের কীট থাকে, মিষ্টিতে বালি থাকে। এঁরা সৃষ্টি করতে বসে নিজের সৃষ্ট প্রাণীর সে কষ্ট সইতে পারেন না। উদার মনে যা দরকার দিয়ে দেন।

রেবার দাদার মতলবটা এই জাতের। দাদাও চায় তাদের এই সুখের মাঝে তারও একটু সুখ হোক। উদ্দেশ্য ভালো, কিন্তু সুখের যে প্রকারভেদ আছে, তা ওরা ভুলে গেছে। ওদের সুখকে তর্জমা করে রেবার মনে বসিয়ে দিলেই যে সেটা রেবার হয়ে যাবে, রেবার তা মনে হয় না।

ওদের কিন্তু ধারণা তাই হবে। ওদের এখন ধারণা বিয়ে আর প্রেম না হলে কি সুখ আছে আর?

নীরা অনেক ভেবে বলে, (সে ভাবী ভাজও বটে) 'আচ্ছা ভাই শঙ্করবাবুকে যদি বিয়ে না করিস তো আর কারুকে পছন্দ কর্ না?'

আর দাদা বলে, 'হ্যাঁ একি! তুই থাকবি সন্ন্যাসীনীর মত বসে ··? আমার ছোট বোন তো বটে!'

রেবা হাসে, বলে, 'মানে? আমি খাচ্ছিদাচ্ছি, সাজসজ্জা যথোচিত করছি, হাসি গল্প গানেও আছি, এতে সন্ন্যাসটা কোনখানে? যে সহজ সুখের বন্ধনের লোভে লোকে

বিয়ে করে, সেই সহজ মুক্তির লোভেই আমি বিয়ে করছি নে। তোমার বিয়ে করে সুখ, আমার সেটা না করে সুখ। সুখের প্রকারভেদ মাত্র। এইমাত্র তফাত। আর ছোট বোন বিয়ে না করাটায় দোষই বা কি!'

নীরা মেয়ে কিনা—বুদ্ধিটি কিছু অদূরদর্শী অর্থাৎ সন্নিকটদর্শী। (বিলাতী পণ্ডিতদের মত এটা, আমার নয়) সে বললে, 'আচ্ছা, সীতেশবাবুকে তোর কেমন লাগে?' (ওদের কলেজের একজন প্রফেসার ওর হাতের কাছের যোগ্য পাত্র!)

রেবা হাসবে না কাঁদবে, ভেবে পেলে না। অবশ্য হাসলই খুব। বললে, 'অর্থাৎ ছেলেরা যেমন মেয়ে দেখে বলে আর একটু ফরসা, আর একটু রোগা বা মোটা কি লম্বা হলে বিয়ে করা যায়! আমি কি এইজন্যে বিয়ে করছি নে? তাই তুই রাম না হলে শ্যাম, না হলে যদু মতি চুনীবাবু ইত্যাদিদের নাম করতে থাকবি, আর আমি সেকালের স্বয়ম্বর সভার রাজকন্যের মত তোর (সখির) মুখে সকলের পরিচয় শুনে বরমাল্য হাতে এগিয়ে যেতে থাকব? না ভাই, তোরা তো বিয়ে কর্। আমার যেদিন মনে হবে সেদিন এসে বলব। তোরা যথারীতি ঘটা করে বিয়ে দিয়ে দিস্।'

দাদা অট্টহাস্য করলেন। নীরাও অপ্রস্তুতভাবে হাসতে লাগল। আসলে একমাত্র বোন রেবাকে ফেলে ওদের বিয়ে করতে লজ্জা করছিল।

দাদা শুধু বললেন, 'শঙ্কর কিন্তু বড়ই দুঃখিত হবে।' শঙ্করবাবু বাড়ীর পুরাতন বন্ধু। পাত্রও ভালো।

রেবা ভাবে, শোন একবার! মনে মনে বলে, বিধাতা যদি ঐ আগে বলা লেখকদের মত আমার হাতে তাঁর কলমটি দিতেন, তাহলে না হয় শঙ্করবাবুর ললাট-লিখনটি কেটে দিয়ে আবার নতুন করে লিখে দিতাম তিনি যাতে সুখী হন এমন কিছু। আর ভাবে, আমি তো দধীচি মুনি নই যে, পরোপকারের জন্যে শরীর দান করব! তাও আমার মৃতদেহ নয়, জ্যান্ত!

২

তারপর থেকে দাদা তর্ক না করে হতাশভাবে নীরার সঙ্গ খুঁজতে থাকে। আর নীরা রেবাকে নিঃসঙ্গতা থেকে রক্ষে করতে এ বাড়িতে আরও যাওয়া আসা করে। ফলে যা হয়, রেবা আর্ট স্কুলেই বেশীক্ষণ থাকে বাড়ি ছেড়ে, নয়ত নিজের ঘরে নিজের কাজ নিয়ে থাকে। ওরা পরম দুঃখে রেবার কথা আলোচনা করতে বসে ভুলে গিয়ে নিজেদের কথাই কয়।

এমন অবস্থায় আর পিসিমাকে না আনলে চলে না। সামনে বৈশাখেই যাতে শুভকাজ করা যায়। বিয়ের যে একটা বাইরের অনুষ্ঠান আছে সেটা তো সোশ্যিয়েট

রাশিয়ার মত সংক্ষিপ্ততম নয়, সুতরাং ছিরি, বরণডালা, পিঁড়ি, আলপনা, শাঁখ, কলাতলা, আইবুড়ো-ভাত, গায়ে-হলুদ, অধিবাস, নান্দীমুখ কে করে?

অবশ্য পিসিমা কাশী থেকে আসার আগেই রেবা পাঁজিতে শুভদিনের নির্ঘণ্ট দেখে বিয়ের দিন ঠিক করে নিয়েছিল। শাঁখ কুলাগাছ পদ্মলতার বেড় দিয়ে লাল চিঠিও ছাপিয়েছিল সেই "যথাবিহিত সম্মানপুরঃসর নিবেদন" করে।

নতুন কিছু করতে বসেও মানুষ পুরনোর মোহ ছাড়ে না। পিসিমা এসে সব ঠিক দেখে খুশী হলেন, কিন্তু রেবার শঙ্করের সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে না দেখে খুব রাগও করলেন। শঙ্করের সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাবটি বহু দিনের। উহ্যভাবে ছিল যদিও।

তারপর? তারপর পিসিমা পুরুতমশাই আর পুরবাসিনী এয়োদের দিয়ে ওদের বিয়ে হয়ে গেল। কেউ বর তুলে নিলে না, কেউ 'কনে' খারাপ বললে না, বরের বাড়ি থেকে তত্ত্বও কেউ ফেরত দিলে না। এবং খবরের কাগজে বেরুল, "স্বর্গীয় অমুকের পুত্রের সঙ্গে শ্রীযুক্ত অমুকের কন্যা কল্যাণীয়া অমুকের শুভ বিবাহ হয়েছে। বহু সম্পন্ন ব্যক্তি নিমন্ত্রিত ছিলেন ও বরপক্ষ যৌতুক গ্রহণ করেন নি!"

এবং শঙ্করবাবুও প্রথমে করুণ মুখে রইলেন। তারপর একসময় সহসা হাসিমুখে নানারকম কাজ করতে লাগলেন। ফুলের মালা ও দই পরিবেশনের ভার নিলেন। গল্পের নায়কদের মত কিছুই করলেন না। শেষ অবধি প্রচুর খেলেনও।

অর্থাৎ বিয়ের ব্যাপারটা ফুলের মালা ও দইয়ের হাঁড়ির মত যেমন সুন্দর রঙিন তেমনি স্থূল ও বাস্তব।

রেবার নিজেরও ভারি মজা লাগছিল। কত লোক তাকে ভর্ৎসনা করে গেল, বিয়ে করলে না। করুণা করে গেল বিয়ে হল না বলে। জনান্তিকে কেউ কেউ দাদাকে নিন্দা করে গেল, মা বাপ নেই তাই বোনকে ফেলে নিজে বিয়ে করে নিলে বলে।

যাই হোক্ ওদের বিয়ের অষ্টমঙ্গলার পর রেবা পিসিমাকে নিয়ে তাঁর সঙ্গে কাশীতে তার নতুন চাকরিতে চলে গেল।

৩

রেবা ভাবে এবার মুক্ত। মুক্তি এবং মুক্তির নামে আর এক কর্মের বন্ধন।

বিয়ে আর প্রেমের একঘেয়ে ন্যাকামি শুনতে শুনতে তার যেন মনে হত মানুষের এদেশে বুঝি আর কোনও কাজ নেই, শুধু আছে বিয়ে হওয়া আর বিয়ে করা!

পিসিমার যতই দুঃখ হোক রেবার কাজ যেন তাকে একটা আশ্রয় দিয়েছে। কিছুদিন অন্ততঃ সত্যমিথ্যাময় প্রেমের ছলনা আর বিয়ের কথা থেকে অব্যাহতি পেয়েছে।

তাই মনে হয় যা সহজ আর স্বাভাবিক তাকে শুভ নিগড়ে বেঁধে গণ্ডিতে ঘিরে

গোলকধাঁধায় ফেলেছে এরা ! মনে মনে ভাবে প্রেম কোথায় আছে ? মরে গেছে না পচে গেছে ?

যা প্রত্যেক মানুষের কাছে চিরনতুন অথচ সৃষ্টির পুরাতনতম আদিমতম বিষয়, তাকে কে জেনেছে শেষ পর্যন্ত বলতে পেরেছে তার মর্মের চরম কথাটি ? নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা দিয়ে ?

অন্ততঃ রেবার মনে হয় কেউ পারে না এবং জানেও না। তার মনে হয়, এদের এই প্রেমের অভিজ্ঞতাকে বলা যায় এটা অনেকটা জামাজুতোর মত। সকলেই জামা-জুতো পরে, তাতে এ বোঝায় না একজনের জিনিস অন্যের পরা চলবে, গায়ে হবে। তোমার পরা জামা আমার গায়ে হবে না, এ তুমি জান, কিন্তু তোমার প্রেমের ভালবাসার নজির আমার বেলায় খাটবে না, এ বুঝতে পার না ?

সে ভাবে, তার চেয়ে ওরা একটা প্রেম প্রকরণ ('ফরমূলা') তৈরী করুক না ?

অনুরাগ, পূর্বরাগ, সেবা-যত্ন, নেশা-মোহ, সহিষ্ণুতা ধৈর্য সব মিশিয়ে যেখানে যেমন, যে দেশে যেমন দেশাচার, ধর্ম, বিজ্ঞান, সাহিত্য, তথ্য অনুসারে।

আধুনিকতম সোভিয়েট রাশিয়ার প্রেম, বারট্রাণ্ড রাসেলের 'ম্যারেজ এণ্ড মরালস'-এর মতের প্রেম, নানা দেশের আদিম ও নব্যতম প্রেমের নানা সিদ্ধান্ত নিয়ে, সংক্ষিপ্ত এবং দীর্ঘসূচী প্রেম, জৈব ও আধ্যাত্মিক প্রেম সব নিয়ে, তার পাচক ও জারক ক্ষমতা বিশ্লেষণ করে ! (যার শেষ কথা মেয়েদের কতটা জরিয়ে জীর্ণ করতে পারা যায়। ব্যক্তি বা ব্যক্তিত্বটি সম্পূর্ণরূপে হজম করা আর কি !)

৪

নীরার চিঠি আসে প্রায়ই নিজেদের সুখের কথা নিয়ে, আর রেবার বিয়ে না হওয়ার দুঃখের বিলাপের কথা লিখে।

রেবা ভাবে, ভালো বিপদ এদের নিয়ে তো !

উপরে লেখা 'প্রেম প্রকরণে'র কথা সংক্ষেপে লিখে সে চিঠির জবাব দেয়।

ভাই নীরা, তোর চিঠিটার আর সব কথার জবাব তো দিলাম। এখন আমার নতুন চাকরি ও তার কর্তৃপক্ষের কথা বলি শোন্। এটির এরা 'আদর্শ হিন্দু আশ্রম' নাম দিয়েছে। সতীশবাবু সুকুমারমতি বালক-বালিকাদের নিয়ে একটি স্কুল তৈরী করেছেন।

আমি তাদের একটু পড়াই, আঁকতে শেখাই, মাটির পুতুল গড়তে শেখাই। পড়ার আগে প্রথমে নানাবিধ জন্তু তারা আঁকতে শেখে, গড়তে শেখে। বেশ মজার ব্যাপার তাদের আঁকাটা ! কারুর হাতিটা হয় ইঁদুরের মত, কারুর বা ইঁদুরটা হয় হাতীর মত। সাপটা ওরা সহজে আঁকতে পারে, পাখীটাও আঁকে, কিন্তু ব্যাঙ মোটেও আঁকতে পারে

না। ওদের চিত্র-বিদ্যা ও ভাস্কর্য শেখাতে গিয়ে মনে হয়, নিজে না চিত্র-বিদ্যাটি ভুলে যাই।

কর্তৃপক্ষটি হচ্ছেন সেই ধরনের লোক, যারা পৃথিবীকে একটা ইউটোপিয়া (রাম-রাজ্য) বানিয়ে দিতে চান। ইঁনি পৃথিবীকে নাগালে না পেয়ে কাশীটাকে ধরেছিলেন। এখন তাও সম্পূর্ণ অধিগত হল না, সুতরাং এই স্কুলটি আর তার পঁচিশটি ছাত্রছাত্রী নিয়ে তাঁর এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট বা গবেষণা চলছে। উদ্দেশ্য মহৎ, ওরা নৈতিক ও নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী থাকবে পঁচিশ বছর অবধি তারপর খাঁটি বর্ণাশ্রম মতে সংসারী হবে।

শারদা বিলের জন্য গৌরী বা কন্যা মেয়ে দশ বছরের পাবে না, তাই বড় মেয়ে চলবে।

তা তারা যা ইচ্ছে করুক। আমার মতে এখন তারা যদি ছবি আঁকা শেখবার জন্য একটু ভাল করে ড্রয়িং শেখে তো কাজ হয়।

আমি সমস্ত দিন স্কুলে থাকি, সন্ধ্যায় বাড়ী আসি। তাদের কাপড়-চোপড় পরিষ্কার রাখা; দাঁত মাজা, স্নান করানোর তদ্বির করি।

চুপি চুপি বলি ভাই, আমার ইউটোপিযার আদর্শ কিন্তু কিছুটা অন্য, পরিচ্ছন্ন শরীর ও নির্মল মন, বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব যদি পাওয়া যায় সকলে পাক।

সে যাক। যদি তোমরা একবার আস তো দেখে অবাক হয়ে যাবে আমার কী অসীম সহিষ্ণুতা। একেবারে বালখিল্য ব্রহ্মচারী দল পরিবেষ্টিত বিশ্বমাতা রূপ! (মানে স্কুল-মাতা।)

এখন অবধি বেশ শান্তিতেই তো ছিলাম।

কিন্তু হেনকালে হঠাৎ গঙ্গার ঘাটে পিসিমার সঙ্গে শঙ্করবাবুর মা'র দেখা।

তিনি কিঞ্চিৎ দুঃখ ও ক্রোধ প্রকাশ করেছেন আমার উপর। তাঁর ছেলের জন্য মেয়ের আবার ভাবনা কি? তবে কিনা ওঁরা একবার কথা পেড়েছিলেন, তাই সে এখন ওই মেয়ের পানেই চেয়ে আছে··· এবং 'যাচা কনে'! ইত্যাদি— আর দাদার বিয়ে হয়ে গেল, বোনের বিয়ে হল না। আশ্চর্য ও লজ্জার কথা নয় কি?

আর পিসিমাকে কে পায়! তাই তো, সত্যিই তো, রজনীরই বা কি আক্কেল! নিজে বিয়ে করল আর বোন করছে চাকরি। গঙ্গার ঘাটে আমার মুখ দেখান ভার! তোদের জন্যে!

আমি পিসিমাকে বললাম বুঝিয়ে, দাদাও চাকরি করছে। এবং আমারও বিয়ে হতে পারবে ইচ্ছে করলেই। সেটা আমিই ইচ্ছে করি নি।

তারপর বললাম, 'তুমি এক কাজ কর, তুমি ওঁর নাইতে যাবার সময়টা কাটিয়ে দিয়ে গঙ্গায় যেও। তা'হলে আর কথাও বাড়বে না, মুখ দেখানর অসুবিধেও হবে না!'

পিসিমার ঐ এক যুক্তি ও বিলাপ ঐ প্রবচনটি, ‘যাচা কনে’, ‘বাছা বর’। এবং এরপর আমার আর বিয়ে হবে না কোনকালে!

বললুম, ‘নাই হল।’

পিসিমা রাগে গরগর করতে করতে পূজোর ঘরে ঢুকলেন।

আমি ভাবতে লাগলাম, ‘যাচা কনে’ অর্থাৎ আমাকে যাচ্ঞা করেছে তারা। কৃতার্থ হয়ে গেলাম! কেউ যাচ্ঞা করেছে বলেই আমি তাকে যাচ্ঞা করব!

মানুষের দেখি মজার স্বভাব, আমরা ছেড়ে দিলেই তারা আঁকড়ে ধরে। সত্যই তো এই কন্যাদায়ের দেশে কি আর মেয়ে নেই?

পিসিমার বিলাপ আর শঙ্করবাবুর মা’র বিরাগ-সংবাদ শেষ করি এইখানেই।

হায়রে আমার শান্তি!··· ইতি রেবা।

জলের মত দিন, মাস, বছর যে কত এল গেল রেবাকে, রেবার দাদাকে বৌদিকে পরিক্রমা করে সে আর কারও মনে নেই।

তার মাঝে আর দু’চারবার রেবাকে যাচ্ঞা করেছে দু’চারজন। রেবা ফিরেও চায় নি। পিসিমা বিরক্ত হয়েছেন। দাদা ও নীরা বলে বলে হাল ছেড়ে দিয়েছে। শেষ অবধি পিসিমারও কাশীপ্রাপ্তি হল। বৌদিও সংসারযাত্রায় ভীষণভাবে জড়িয়ে পড়ল ছেলেমেয়ে আত্মীয়কুটুম্ব নিয়ে, লোক-লৌকিকতা নিয়ে।

বছরের হিসাব কে রাখে? আর রেবার বয়সের হিসাবই বা কে রেখেছে পিসিমার মৃত্যুর পর? কত বছর হল চাকরি? বয়সও কত হল? এক একবার ভাবে সে। বার বছর? চৌদ্দ বছর? সতীশবাবুর আদর্শ আশ্রম থেকে ছেলেমেয়েরা গেছে কয়েকটি।

তবে ভীষ্মদেব শুকদেবের মতও কেউ হয় নি। রাম লক্ষ্মণের মতও কেউ হয় নি। বর্ণাশ্রমের দ্বিতীয় আশ্রমটিতে ঢুকেছে, চাকরিবাকরি করছে। ম্লেচ্ছ স্কুলে পড়া লোকদের মতই যতটা পারে সুখস্বাচ্ছন্দ্যের লোভও করেছে। সন্নিকট আত্মীয়স্বজনকে বাদ দেবারও অভিসন্ধি রাখে আধুনিকতম ভাবেই।

রেবা মনে মনে হাসে। কিন্তু চাকরি ছাড়তে পারে নি। ছেড়ে করবেই বা কি? যেন অন্যমনেই জীবনটা তার কেটে যাচ্ছে।

গরমের ছুটি এল। বহুদিন পরে রেবা কলকাতায় এল।

নীরা বেশ গিন্নীবান্নি হয়েছে, দাদাও যেন খুব কর্তাব্যক্তি হয়েছে। নিজের বয়সের কথা রেবার মনে পড়ল না কিন্তু। আশ্চর্য!

এও তো সত্যি, বেশ ভারিসারি চেহারা ওর ছিলও না, হয়ও নি। পিসিমার মৃত্যুর পর সে অনেক কাল আসে নি, প্রায় পাঁচ বছর। রেবার মনে হল, ওরা আপনার লোক

বটে কিন্তু যেন কত তফাত হয়ে গেছে। যেন ভীষণ আত্মকেন্দ্রিক। কথাবার্তা কাজকর্ম সবই যেন শহুরে সমসাময়িক দ্রুত চিন্তায় আর আত্মকথায় ভরা। ওদের আশেপাশে যে অন্য কোন কাজ বা কথা অথবা মানুষ আছে তাদের কথা ওদের মোটেই ভাববার সময় নেই। রেবার অস্তিত্বও যেন আর ওদের মনে থাকতে চাইছে না।

কলেজের জীবনের কথা মনে পড়ল রেবার। মাঝে মাঝে পুরানো কথা তোলে সে, কিন্তু নীরা বা দাদার মোটেই আর সে প্রসঙ্গে আগ্রহ নেই।

৫

রেবার ফেরবার সময় হল কর্মক্ষেত্রে।

রাত্রে গাড়ি। মধ্যম শ্রেণীর একটি কামরায় উঠে সে বসল। ভিড় মন্দ নয়। কতজন এল, জায়গা করে নিল বসবার শোবার। দাদা তুলে দিয়ে চলে গেছে।

সহসা শেষ মুহূর্তে একজন পুরুষ একটি মেয়েকে তার দুটি সন্তান নিয়ে গাড়িতে তুলে দিতে এলেন।

বসবার জায়গা নেই তা নয়, কিন্তু রাত্রের যাত্রীরা বিছানা পেতেছে। বিছানা তুলে নিতে কেউ রাজী নয়। মেয়েটি দাঁড়িয়ে রইল ছেলেটিকে বাক্সের উপর বসিয়ে। বিছানাওয়ালাদের যুক্তি, আগে এসে জায়গা নিয়েছে তারা।

রেবারও বিছানা পাতা অর্ধেক বেঞ্চি। সে একটু ভেবে বললে, 'আমি ওপরে একটা বাঙ্কে উঠে যাচ্ছি, আপনি ওদের নিয়ে এখানে বসুন। বাচ্চাটিকে বিছানা পেতে শুইয়ে দিন।'

সে কৃতজ্ঞও হল। আবার 'না না, সে কি?' তাও বললে।

বেশ সুন্দর ছেলে দুটি। শ্যামবর্ণ দীপ্ত চোখ বুদ্ধিমান চেহারা বড়টির। রেবার মনে হতে লাগল, কার সঙ্গে সাদৃশ্য আছে যেন ছেলেটির। কে সে? মনে করতে পারলে না। ছোটটি যেমন হৃষ্টপুষ্ট তেমনি সুন্দর ফর্সা।

বাঙ্কের উপর থেকে সে ছেলে দু'টিকে দেখে, তাদের জননীকে দেখে। বিছানা পাতা হল, বেঞ্চির মাঝখানে বাক্স দিয়ে জননী সেখানে বসল। পাছে শিশুটি পড়ে যায়। বড়টির কোনোক্রমে একটু ঠেস দিয়ে শোবার জায়গা করে দিল।

গাড়ি ছেড়ে দিল। যাত্রিণীরা এতক্ষণে নিশ্চিন্ত হয়ে সকলে সকলের দিকে চাইল, নাম ও পরিচয় নিতে বসল। যাত্রাপথের ও গন্তব্যস্থানের কথা হ'তে লাগল।

আপনি কতদূর যাচ্ছেন? ও বাবা, দিল্লী? আপনি? কাশী? আপনি? পাটনা? কাশীতে কেন? ছেলেদের মা জিজ্ঞাসা করে। কে আছেন সেখানে?

আর একজন বলে।

রেবা হাসে, বলে, 'কেউ নেই, চাকরি করি।'

একজন বর্ষীয়সী বললেন, 'বিয়ে হয় নি বুঝি? মা বাপ নেই? দেখতে তো খাসা।'

রেবা হাসে, উত্তর দেয় না।

অন্য বাঙ্কের উপরের স্তূপাকার বাক্স, হোল্ড অল চোখে পড়ে। লেবেলগুলির নাম চোখে পড়ে। 'হাওড়া টু ডিল্হি—এন. কে. মিত্র'।

'হাওড়া টু পাটনা—এস. পি. দত্ত'! 'হাওড়া টু বেনারস'—আরেকজনকার নাম!

রেবা শুয়ে পড়ে, ঘুম পায়। যাত্রিণীরাও আপনাদের কথা আলাপ শেষ করে শুয়ে পড়ে।

ভোর হয়ে এল। বাংলাদেশের শ্যামল মাঠ ঘাট নদী বন আর নেই। গ্রামও আছে, শ্যামলতাও আছে। কিন্তু সেগুলি বাংলাদেশের "ছায়া সুশীতল নদী কালোজল, ছোট ছোট গ্রামগুলির" মত নয়। রেবার বাঙ্ক থেকে সে দৃশ্য দেখা যায় না, নামতে ইচ্ছা করে। কিন্তু জিনিসপত্র নারী ও শিশুদের নিদ্রিত পুরীতে নামা শক্ত। সে শুধু চেয়ে চেয়ে দেখে যায়।

পাটনা-যাত্রিণী উঠে পড়েছে। ছোট ছেলেটি ঘুমচ্ছে, মা'র মত মুখ। বড় ছেলেটিকে কিন্তু কেবলি চেনা-চেনা মনে হয় রেবার।

সহসা সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই পাটনা জংশন এসে পড়ল।

একটি পুরুষ এসে ডাকল, 'এস, এস, নেমে এস। মমতা, খোকাকে আমার কোলে দাও, ঘুমুচ্ছে। জিনিসপত্র ঠিক আছে তো? এই কুলি দো আদমী আও। রাত্রে ঘুমুতে পেরেছিলে?'

মেয়েটি বললে, 'হ্যাঁ, ভাগ্যিস ইনি ছিলেন, ওই যে বাঙ্কে রয়েছেন। উনি উঠলেন তাই তো জায়গা পেলাম, নইলে কি আর···। উনিই নিজের জায়গাটুকু দিলেন।'

'ওঃ' বলে পুরুষটি ওপরে চেয়ে দেখলেন, বললেন, 'অনেক ধন্যবাদ।'

রেবা তখন উঠে বসেছে। সহসা পুরুষটি বললেন, 'রেবা?'

অস্ফুট স্বরে রেবাও বললে আশ্চর্য হয়ে, 'শঙ্করবাবু!'

কুলিরা এসে পড়েছে, জিনিসপত্র নামান ও অন্য যাত্রী ওঠার ভিড়ের মাঝে মেয়েটি একবার একটু হেসে বললে, 'নামি ভাই। আপনাকে উনি চেনেন দেখছি।'

শঙ্কর নেমে গিয়ে জানলা দিয়ে বলল, 'আচ্ছা। খুব হঠাৎ দেখা হয়ে গেল। কতকাল পরে।'

রেবা বাঙ্ক থেকে নেমে পড়ল। তাদের তখন প্লাটফরমে জিনিসপত্র কুলির মাথায় তোলা হচ্ছে। ছেলে দুটি মা'র পাশে দাঁড়িয়ে আছে। জানলাপথে ওকে দেখতে

পেয়ে মেয়েটি আর একবার হাসল, বেশ দাঁতগুলি, চেহারাটিও মন্দ নয়। ছেলেমানুষ দেখতে। একখানি ধানী রংয়ের শাড়ি পরা সাদা ব্লাউজের সঙ্গে। চুলটি সাদাসিধে-ভাবে বাঁধা। হাতে ক'গাছা চুড়ি, গলায় হার, মাথায় সিঁদুর। বেশ দেখাচ্ছে উস্‌কো-খুস্‌কো চুলে। কত বয়স ?···

মাল ওঠান হল কুলির মাথায়। শঙ্করও একবার কামরার দিকে চাইল। তখন ভিড়ে ভরে গেছে গাড়ি নতুন যাত্রীণীদের। রেবাকে ভাল করে দেখা গেল না। রেবা অবশ্য দেখতে পেয়েছিল। তার মনে হল আর ভিতরে চাইবার কি দরকার ? ···কিন্তু···।

গাড়ি ছাড়ল। কি ভেবে সে মুখটি একটু ঝুঁকিয়ে বাইরের দিকে চাইল। তারা চলে যাচ্ছে, বেরিয়ে গেল প্লাটফরম থেকে, মেয়েটির ধানী রংয়ের শাড়ী, শার্ট ও হাফ-প্যান্টপরা ছেলেটি, বাপের কোলে ছোট ছেলে। মুখ হাত ধুয়ে সে ফিরে এসে একটা বেঞ্চির এক কোণে বসল। জানলা দিয়ে অন্যমনে বাইরে চেয়ে রইল।

এবার দানাপুর, তারপর ? মনে পড়ে না।

মনে পড়ল মেয়েটির কথা ক'টি, উনিই আমায় জায়গা ছেড়ে দিয়েছেন। সহসা মনে হল কত নিগূঢ় অর্থ যেন কথাটার ! 'জায়গা ছেড়ে দিয়েছেন।' কোন্ জায়গা, কতটা জায়গা ? তার ট্রেনের বসবার জায়গাটুকু শুধু ?···

এবার মনে পড়ল পিসিমার কথা 'যাচা কনে'। হ্যাঁ, পিসিমার আট বছর মৃত্যু হয়েছে, তারপর আর তার কথা কেউ ভাবে নি। সে নিজেও ভাবে নি।

কেউ তাকে আর 'যাচ্ঞা'ও করে নি। আর 'যাচ্ঞা' করবার লোকও কেউ আসবে না বোধ হয়।

এবারে সহসা মনে হয়, কোন কারও দুটি বলিষ্ঠ বাহুর মাঝে সেই জায়গাটি ছিল। আর তারই একখানি ঘরে আরও দু'একটি কচি হাতের বন্ধনে ঘেরা সে জায়গা। কে সে ? শঙ্কর ? আর কেউ ? কিন্তু সে সব জায়গাই ছেড়ে দিয়েছে অনেকদিন আগে। আর কোথাও জায়গা নেই !

উত্তরা, অগ্রাণ ১৩৬৪

জবালা

পথে অসম্ভব ভিড় জমেছে। বাড়ীর সামনে বসেছে একটি নহবতখানা—বসান হয়েছে গেটের একদিকে একটি মঞ্চ করে। নিচে দুটো বেঞ্চিতে সানাইওয়ালার দল বসে

সানাই বাজিয়ে চলেছে। একদল ব্যাণ্ডপার্টিও রাস্তার ধারে পাতা বেঞ্চিতে বসে আছে, উৎসব জমাট হলে হুকুম-মত বাজাবার অপেক্ষায়।

সারা পথ এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত আলোয় ঝলমল করছে। নানা রঙের বিদ্যুতের আলোর বাল্ব, নানা রঙের পতাকায়, ফানুসের আলোয় উৎসব-বাড়িখানি যেন আলতা-সিঁদুর-চন্দন-মালা-বেনারসী-জরী-জড়োয়ার নানা অলঙ্কার বসনভূষণ পরা নতুন কনেটির মত সেজে বসে আছে।

শহরে নতুন এসেছি। ভিড ঠেলে যেতে যেতে বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কাদের বাড়ি? বিয়েবাড়ি বোধ হচ্ছে। খুব বড়লোক বুঝি?'

বন্ধু বললেন, 'জান না বুঝি? শশী দত্তর ছেলেব বিয়ে। লোহার কারবারী শশী দত্ত। লাল হয়ে গেছেন। এই সেদিন গুলজারবাগে মস্ত বাড়ী করেছেন। ছেলের বিয়ে দিচ্ছেন নতুন বাড়ীতে এসে।'

'ওঃ। না, আমি তো সবে এসেছি বদলি হয়ে। ওঁর নাম শুনি নি।'

অভ্যাগত নিমন্ত্রিতদের নানাবিধ যানবাহন আর পথিক দর্শকদের এবং ভিখারী যাচকদের ভিড় ঠেলে নানারকম ভোজ্যবস্তুর ঘ্রাণে আমোদিত পথ ছাড়িয়ে পথের অন্য প্রান্তে এসে পৌছলাম।

বাঙালী ব্যবসা করে এত বডলোক হয়েছে—কৌতূহল হল। 'তা শশী দত্ত লোকটি কে? কোথাকার মেয়ে? কলকাতার?'

বন্ধু বললেন, নাঃ, কাশীর মেয়ে। ওঃ, তাই তো, তুমি তো কিছুই জান না শশী দত্তর ইতিহাস।'

আশ্চর্য হয়ে বললাম, 'এর আবার ইতিহাস কি?'

'বেশ একটু আছে। শুনবে?'

বললুম, 'বল।'

বন্ধু বললেন: আমার শোনা কথা। অনেকদিনের কথা হল। বহুদিন আগে একবার এক শীতের সন্ধ্যায় হঠাৎ বৃষ্টি নেমে এল। পথের লোক যে যেখানে পারে আশ্রয় নিল। কেউ-বা কোন দোকানঘরে, অনেকে কারুর বাড়ির রকে, কেউ-বা গাছতলায়। ভদ্রলোক, সাধারণ লোক সকলেই ঘেঁষাঘেঁষি করে একত্রে জড় হয়ে দাঁড়াল। বর্ষাকালের বৃষ্টি হলে তো বেশী ভাবনা ছিল না, শীতের সন্ধ্যায় বৃষ্টিতে ভিজলে পরদিনই শুয়ে পড়তে হবে। তারপর পরিণামে হয়ত চারজনের কাঁধে চড়ে নৌকা করে দ্বারভাঙ্গাঘাটে পৌছতে হবে। কিন্তু অত ভিড়ের মাঝে মেয়ে একটিই ছিল। কি করে সে বৃষ্টির সময় সঙ্গিনীদের দলছাড়া হয়ে গিয়েছিল, তারা যে কোন্ দিকে গেল তা বুঝতে পারল না। নিরুপায় হয়ে সে একটা বড় গাছের তলায় এসে

দাঁড়াল। বাড়ির রকে অনেক পুরুষ দাঁড়িয়ে ছিল। সে আর উপরে ওঠে নি।

কিন্তু খানিকক্ষণের মধ্যেই খুব জোরে বৃষ্টি নামল আর মেয়েটি তার কপালের 'টিকুলী', গায়ের 'চোলী', 'ইমামী' রঙের (মহরমের উৎসবের রং) ঘনসবুজ শাড়ী সবসুদ্ধ ভিজে সপসপে হয়ে গেল। কপালের টিকুলী ভেসে গেল— শাড়ী, জামা গায়ে লেপটে গেল।

রকের ওপরের দু'একজন লোক বললে, মাইয়া (মেয়ে) উঠে আয় না? কিন্তু সিক্তবসনা প্রায়-ষোড়শী মেয়েটির এ অবস্থা দেখে রকের ওপরেই দু'একটা ইতরশ্রেণীর লোক গুনগুন করে অশ্লীল গ্রাম্য গান গাইতে শুরু করে দিল ইঙ্গিতপূর্ণ চোখে বন্ধুদের দিকে চেয়ে।

মেয়েটি নাম রামপাতিয়া, গ্রামের মেয়ে। গ্রাম্য সঙ্গীত আর ঐ ধরনের ভাবভঙ্গী তার অজানা নয়। তার সঙ্গের লোকজনও হারিয়ে গেছে। তারা আপনজন না হলেও, এক জায়গার লোক তো বটে।

সে নিরুপায়, ভয়ে ভাবনায় চুপ করে দাঁড়িয়েই ভিজতে লাগল। যারা উপরে উঠে দাঁড়াতে বললে, তাদের কথা শুনতেও ভরসা পেল না ঐ গায়ক দলের ভয়ে। কে জানে ওরা সকলে কেমন। বৃষ্টিও জোরে নামল। রামপাতিয়ারও ভয়ে ভাবনায় ভীত চোখেও জলের ধারা নেমে এল। এদিকে গায়কদের গান আরও উত্তাল হয়ে উঠল।

এমন সময়ে একটা ঝড়ঝড়ে ঘোড়ার গাড়ী রকের সামনে এসে দাঁড়াল। আর একটি ভদ্রলোক গাড়ী থেকে বেরিয়ে এসে রকের ওপর উঠলেন। একটি ভৃত্য এসে বাড়ির দরজা খুলে দিলে। বোঝা গেল তিনি বাড়ীর লোক বা মালিক।

তিনি তীক্ষ্ণ চোখে রকের জনতাকে একবার চেয়ে দেখলেন, গাছের তলার মেয়েটির দিকেও চোখ পড়ল।

গানটা তখন সহসা থেমে গেছে। লোকটি বাড়ির মধ্যে ঢুকলেন। খানিক পরে যখন তিনি আবার একবার বাড়ির রকে এসে দাঁড়ালেন তখন রক একেবারে খালি— বৃষ্টি কমে এলেও পড়ছে। শুধু গাছতলার মেয়েটি রকের ওপর এসে দাঁড়িয়েছে— তার সর্বাঙ্গ দিয়ে জল ঝরে পড়ছে।

একটুখানি কী ভেবে তিনি মেয়েটিকে বললেন, 'তুমি ভিতরে এসে দাঁড়াবে? বৃষ্টি থামলে বাড়ি যেও।'

মেয়েটি ভিতরে এল। সদরের গলির মধ্যে একটা কেরোসিনের ডিবে জলছিল। ভদ্রলোক তার দিকে চেয়ে ছিলেন। তারপর ভৃত্যকে বললেন, 'যা, আমার একটা ধুতি এনে ওকে দে। ও কাপড়টা ছাড়ুক রান্নাঘরে গিয়ে। তারপর ওকে একবাটি চা বানিয়ে দে।'

মেয়েটিকে বললেন, 'কাপড় ছাড়, চা খাও, তারপর বাড়ি যেও।'

অত ভেজার ফলে মেয়েটি কাপড় ছেড়ে চা খেয়েও ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল। এবারে বসবার ঘরের আলোতে দেখা গেল বছর পনের-ষোল বয়স হবে মেয়েটির। শ্যামগৌর রং। অত্যন্ত ভীত ত্রস্ত মুখখানা।

ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার ঘর কোথায়?'

সে শহরের কাছাকাছি এক গ্রামের নাম করল।

'সেখান থেকে এতদূরে এসেছ কেন— কী কাজে?'

মেয়েটি বললে, 'আমার সঙ্গীরা সব মহরমের মেলা দেখতে এসেছিল এখানে, আমিও সেই সঙ্গে ছিলাম। তারপর এই বৃষ্টিতে তারা হারিয়ে কোন্ দিকে গেল আর দেখতে পাই নি। তাই এইখানেই দাঁড়িয়েছিলাম।'

এবারে সে বসে পড়ল গুটিয়ে-সুটিয়ে। বেশ বোঝা গেল সে কাঁপছে। একটা কম্বল এনে সদয়ভাবে ভদ্রলোক বললেন, 'তুমি কাঁপছ। এই কম্বলটা নাও। মুড়ি দিয়ে একটু শুয়ে থাক। শীত কমবে।'

শীত কমল কিনা, বৃষ্টি থামল কিনা, রাত্রি কত হল কিছুই আর রামপাতিয়ার জ্ঞানগম্য হল না।

কোনও সময়ে তার যখন চেতনা ফিরে এল, সে তখন হাসপাতালের একটা বিছানায় শুয়ে। যে-বাড়িতে সে ছিল, এটা সে বাড়ি নয়। সে আবার চোখ বুঁজে শুল।

বিকালবেলা সেই ভদ্রলোক তাকে দেখতে এলেন। তার জ্ঞান ফিরেছে দেখে বললেন, 'আজ তাহলে চোখ খুলেছে। ভাল আছে?' মেয়েটিকে বললেন, 'ভাল আছ? তোমার জ্বর হয়ে গেল। সেই যে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুলে আর ওঠ নি। তখন আমি তোমাকে হাসপাতালে পাঠালাম আজ তিন দিন হল। তুমি একেবারে অঘোরে ছিলে।'

রামপাতিয়া চুপ করে নির্বোধের মত চেয়ে রইল। গ্রাম থেকে মেলায় আসা, হাসপাতাল, গাছতলা, লোকটির বাড়িতে আশ্রয় সব তার কাছে স্বপ্নের মত মনে হচ্ছিল।

ভদ্রলোক বললেন, 'তাহলে ভাল হয়ে বাড়ী যাবে। তাদের নাম-ঠিকানা বল। তারা আসতে পারবে খবর দিলে?'

রামপাতিয়া ক্লান্তভাবে চোখ বুঁজলে।

লোকটি বললেন, 'আচ্ছা, আজ থাক।'

কয়েকদিন বাদে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবার সময় এল।

ভদ্রলোক এলেন। বললেন, 'আজ তোমায় ছাড়বে এরা। কোথায় যাবে?'

রামপাতিয়া চাদর গায়ে দিয়ে মহরম-রঙা নিজের কাপড়খানি পরে চুপ করে খাটের ওপর বসে ছিল।

ভদ্রলোকটির কথায় প্রথমে উত্তর দিলে না। তারপর চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। একটি নার্স এসে দাঁড়িয়ে ছিল; বললে, 'কাঁদছিস্ কেন? আজ তো বাড়ি যাবি।'

সে চোখ মুছলে, তার পর বললে, 'আমার তো বাড়ি নেই।'

'সেকি! তোর গ্রাম দেশ কোথায়?'

রামপাতিয়া গ্রামের নাম বললে, বাপেরও নাম বললে। কিন্তু বললে, 'আমার মা-বাপ তো নেই, সবাই পিলেগে মারা গেছে অনেকদিন। আমাকে আমার এক গ্রাম-সুবাদে নানীর বাড়িতে গ্রামের লোকেরা রেখে দিয়েছিল। আমি তাদের বাড়ির সব কাজ করতাম, গরু-ছাগলের কাজ করতাম, নানীর পা টিপতাম, তেল মাখাতাম— তারা খেতে পরতে দিত। এতদিন পরে গেলে তারা তাড়িয়ে দেবে, মারবে।'

নার্স অবাক হয়ে চুপ করে রইল। তারপর বললে, 'তবে ননীবাবু, কি করবেন? কোথায় যাবে ও? আজ তো ওকে যেতেই হবে। আপনিই নিয়ে যান।'

রামপাতিয়া এবারে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল। বললে, 'বাবুজী, আমাকে আপনার বাড়ীতে "দাই" ঝি করে রেখে দিন— আমি সব কাজ করতে পারি। গ্রামে গেলে এতদিন পরে তারা আমাকে আর রাখবে না। জাত নষ্ট হয়ে গেছে বলবে।'

পনের-ষোল বছরের কোমল মুখখানি ক'দিনের রোগে একটু পাণ্ডুর হয়েছে। কিন্তু বিশ্রামের জন্য রঙটা একটু উজ্জ্বল হয়েছে। মুখটির চেহারা এতদিন স্পষ্ট ননীবাবুর চোখে পড়ে নি, আজ মনে হল বড় ভীত শঙ্কিত অসহায় মেয়েটি।

কিন্তু নার্সকে বললেন, 'আমি কি করে নিয়ে যাব? আমার তো বাড়ীতে কেউ নেই। একটা চাকর মাত্র থাকে। আমি চাকরি করি, বাড়ীতে থাকি না সারাদিন।'

নার্সটি বললে, 'আপনি কোনখানে চাকরি করতে দিয়ে দেবেন ওকে। আপনি তো বাঙালী। কত জানাশোনা বাড়ী আছে, তারা ছেলেমেয়ের কাজে রেখে দেবে।'

রামপাতিয়া চোখ মুছে উঠে দাঁড়াল আশ্বস্তভাবে। আর ননী দত্ত বিব্রত ভাবে একটা ঘোড়ার গাড়ীতে তাকে নিয়ে উঠলেন।

নাঃ, রামপাতিয়ার চাকরি কোথাও হল না।

কেউ বললেন, 'ঐটুকু মেয়ে কী কাজ করবে?'

বুদ্ধিমান প্রাজ্ঞ কেউ-বা বললেন, 'নাঃ, ওরকম মেয়ে কে আগলে বসে থাকবে··· ।'

কোন রসিক বয়স্য বললেন, 'তুই-ই রাখ— তোর ঘরে কেউ তো মেয়েমানুষ দেখাশোনা করবার নেই··· ।'

রামপাতিয়া ঘর ঝাঁট দেয়। বাসন মাজে। কাপড় কাচে সাবান দিয়ে। আর ব্যাকুল উদাস মনে বসে থাকে আর মাঝে মাঝে কাঁদে। তাকে ননী দত্ত না পারেন তাড়াতে, আর সেও যেতে ভয় পায়, অথচ গ্রামের জন্যও মন কেমন করে। ননী দত্তর কোন কোন বন্ধুরা— আমার বাবাও একজন বন্ধু ছিলেন— বললেন, 'অনাথ আশ্রমে পাঠিয়ে দাও হে— বাঙালী নয়, জানা নয়, চেনা নয়— তোমার এত দায়দায়িত্ব কিসের?'

সেকালে অনাথ আশ্রম তেমন কিছু এখানে ছিল না। হিন্দু অনাথ আশ্রম তো নয়ই। দানাপুরে একটা অনাথ আশ্রম ছিল যেন, কিন্তু সেটি খ্রীষ্টানদের।

ননীবাবুর বন্ধুরা বললেন, 'হোক ক্রিশ্চান। তুমি দিয়ে দাও ওখানেই। আর ওর কি জাত-টাত বজায় থাকবে? পথে পথে চাকরিই করবে তো।'

খ্রীষ্টান অনাথ আশ্রমের লোকেরা তাকে নিয়ে যাবে শুনে, রামপাতিয়া আকুল অঝোরে কাঁদতে আরম্ভ করলে। আব আহার-নিদ্রা ছেড়ে দিয়ে কয়লার ঘরের কোণে আশ্রয় নিল।

অবশেষে নিরুপায় হয়ে ননী দত্ত ওকে সেখানে পাঠাবার চেষ্টা ছেড়ে দিলেন। আর কিছু করার আশা বা হালও ছেড়ে দিলেন। তবু মাঝে মাঝে বন্ধুদের বাড়ী 'দাই' বা ঝি করে রাখতে পারা যায় কিনা চেষ্টা করতেন। যদি ভদ্রভাবে দায়মুক্ত হতে পারেন।

এমন সময় মার্চের শেষে সেকালের মতই সমারোহ ক'রে বিহারের গ্রামে গ্রামে শহরে শহরে প্লেগের সমাগম হল। প্রথমে দূর গ্রাম, তার পর শহরের নানা বস্তি, তার পরে ঘরে ঘরে— এর বাড়ীর কোন সঙ্কীর্ণ কোণে জলের জালাব পাশে, আর বাড়ীর ভাঁড়ারের চালের টিনের পাশে, কারুর বাড়ীর বাক্সের পিছনে— গলাফুলো অর্ধমৃত ও মরা ইঁদুর দেখা দিতে লাগল। পোড়ো মাঠ বেয়ে, নর্দমার ধার বেয়ে সারি সারি নির্জীব ইঁদুরের পলায়ন অভিযানও দেখা যেতে লাগল।

মানুষও গলা ফুলে ওঠবার আগেই অর্ধমৃত হয়ে উঠল আতঙ্কে। দিনে রাত্রে যখন তখন বাড়ীর পাশের বসতি বা বস্তি থেকে, কাছাকাছি পাড়ার ঘর থেকে কখনও মৃদু কান্নার গুঞ্জন ওঠে। কখনও উত্তাল উদ্বেল কান্নায় আকাশ বাতাস ভেঙে পড়ে। আর তার পরে দেখা যায় ছোট-বড় বাক্স তোরঙ্গ পেঁটরা মাথায় অথবা

জীর্ণ মলিন বিছানা আর কাপড়ের পোঁটলা-পুঁটলি মাথায় হাতে নিয়ে সারি সারি আতঙ্ক-অভিভূত নরনারী—ছেলেমেয়ে শিশু কোলে নিয়ে, হাত ধরে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে চলেছে পথে—মৃত্যুর করাল প্রসারিত বাহুর সীমানা ছাড়িয়ে যাবার প্রয়াসে ও আশায়। কোথায় যাবে তা তারাও জানে না, আমরাও জানতুম না।

আর বস্তির সঙ্গে প্রাসাদ-অট্টালিকা থেকে নিয়ে সব রকম ঘর-বাড়ীর অধিবাসীরাও দেশ ছেড়ে পালাতে লাগলেন। শোন নদের উপরে জনবিরল গ্রামে, রাজগীরের কাছে বিহারের নানা স্থানে নানা পল্লীগ্রামে যেখানে প্লেগের বিস্তৃত আলিঙ্গন তখনও পৌছতে পারে নি সেই সব জায়গায় ছোট-বড় ঘর-বাড়ী নিয়ে লোকেরা আশ্রয় নিলেন।

আর প্রায়-জনশূন্য রাজপথেব দুধারে সরকারী 'ঝোপ্‌ড়ী' তৈরী করে প্লেগাক্রান্ত রোগীদের রাখা হতে লাগল। কুম্ভমেলায় সাগরমেলায় তীর্থ-ঝোপড়ীর মত।

ননী দত্ত আপিসের সামান্য কেরানী। বাড়ীতে আর কে-বা আছে যে পাঠাবেন তাদের? নিজেরও ছুটি নেই।

বাবা আমাদের পাঠিয়ে দিলেন শোনের ধারের গ্রামে কৈলওয়ারে। পুরুষরা—উকিল ডাক্তার দোকানদার— নানা কর্মচারী— সকলেই নিজের নিজের পরিজন স্ত্রী-পুত্রদের পাঠালেন বটে, নিজেরা কিন্তু যেতে পারলেন না রুজি-রোজগারের দায়ে। চাকরির দায়ে। তাঁরা আসা-যাওয়া করতেন। প্রাণ হাতে নিয়ে শহরেও বসে থাকতেন।

ননী দত্তও গেলেন না।

হঠাৎ একদিন তাঁর সর্বাঙ্গে ব্যথা হয়ে প্রবল জ্বর হল। চাকরটা বাবার কাছে খবর দিতে গেল মুখ শুকনো করে। বাবা ডাক্তার নিয়ে আসবার সঙ্গে সঙ্গেই, তার শরীর খারাপ লাগছে তাই বাড়ী যাচ্ছে ব'লে চাকরটা পালাল।

বাড়ীতে শুধু রামপাতিয়া আর রোগী। বাবাও সভয়ে ডাক্তারকে নিয়ে বাড়ীতে ঢুকলেন। সে প্লেগের যে কী ভীষণ আতঙ্ক তুমি বুঝতে পারবে না। দেখতে শুনতে সময় হত না। শরৎ চাটুয্যের 'শ্রীকান্ত'তে নিশ্চয় পড়েছ প্লেগের একটু-আধটু অথচ স্পষ্ট বর্ণনা।

যাই হোক, বাবাও শুকনো মুখে শঙ্কিতভাবে বন্ধুর ঘরে এসে দাঁড়ালেন ডাক্তার নিয়ে।

ডাক্তার নাড়ী টিপে, বগল আর সব গ্ল্যাণ্ডের জায়গা দেখে আশ্বস্ত ও নিশ্চিন্ত মুখে বাবাকে বললেন, 'না, প্লেগের আক্রমণ হয় নি। মনে হচ্ছে, বসন্ত হবে। গায়ের জ্বর-ব্যথা সেইজন্যেই।'

তার পর চারদিকের আবহাওয়ায়— প্লেগ, মাঝখানে একটি বসন্ত-রোগীকে নিয়ে রামপাতিয়া সাবিত্রীর মত বসে রইল ; এবং বাবা আর ডাক্তার নিয়মিত দেখাশুনা করতে লাগলেন।

তারপর ননী দত্তকে যমের মুখ থেকে একলাই ঐ মেয়েটাই টেনে নিয়ে এল যেন। বুঝতেই পারছ, এরপর সে তার ঐ 'সাবিত্রী'-ব্রতের পূর্ণফলই পেল। ননী দত্ত তাকে আর কোন জায়গায় পাঠাবার বিশেষ চেষ্টা-চরিত্রও করলেন না। সেও রয়েই গেল। এবং ক্রমে যেন সে তাঁর একজন আপনার লোকের মত বা ঘরের লোকের মত হয়ে উঠল।

ধর্মরাজ যম তাকে কিছু 'বর' দিয়ে গিয়েছিলেন কিনা জানি না। কিন্তু একসময়ে তারপরে সে শতপুত্র না হোক, ননী দত্তর এক পুত্রের জননী হয়ে বসল।

এই শশী দত্তই সেই ছেলে।

বিয়ে হল কিনা— হতে পারত কিনা এখনকার মত মান-সম্ভ্রম বজায় রেখে রেজিস্ট্রি করে— ননী দত্তর মনে সে সব দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কিছু হয়েছিল কিনা, ঠিকঠাক কিছুই আমরা শুনি নি। আর তখনকার এদেশের বাঙালী-সমাজে কতখানি তিনি পাঙ্‌ক্তেয় ছিলেন বা না-ছিলেন তাও জানি না। তবে দু'একজন তাঁর বন্ধু, যেমন আমার বাবা আর কেউ কেউ তাঁকে অপাঙ্‌ক্তেয় করেন নি। এ ছাড়া তখন সেকালে এখানে সম্পন্ন লালা কায়েত (কায়স্থ), 'বাভন' (যাদের বলে জরাসন্ধের ব্রাহ্মণ) ঘরে নৈতিক চরিত্র-নিষ্ঠাতে একটু এদিক-ওদিক হলে কিছু এসে যেত না। নিন্দেও হত না। অনেকেরই প্রকাশ্য-ভাবেই 'অবিদ্যা' থাকত। অবিদ্যাদের সন্তানাদিও থাকত। কমবয়সী রূপবতী দাসীদেরও পরিবারে একটা স্থান থাকত। আমাদের সেকালের বাংলাদেশের জমিদার ও ধনী মহিলাদের মত এখানকার গৃহিণীরাও এ-সব গলাধঃকরণ করে নিতেন, সন্দেশের মত না হোক কুইনাইনের মত করেই।

সুতরাং 'ননী দত্ত ও রামপাতিয়া' সংবাদটাতেও মনে হয় সেকালে বাঙালী-সমাজ তেমন মাথা ঘামায় নি। বিদেশ-বিভূঁইতে একলা মানুষ অমন হয়েই থাকে এই ভেবে।

যাই হোক, ননী দত্ত যে কী ভেবেছিলেন সেটা বাবাও ঠিক জানতেন না। তবে তিনি যেমন অসহায় অনাথ মেয়েটিকে তাড়িয়ে বা সরিয়ে দিতে পারেন নি, সে-ও তাঁর জীবন-সংশয়ের দিনে তাঁকে ফেলে যেতে পারে নি। যেন উভয়তঃ মনে একটা দাগ কেটেছিল ঘটনা দুটি।

কিন্তু তারপরে যখন ঘরণীর মত হয়ে বসল, আর তার সন্তান হল—সে যেন বড়ই সঙ্কুচিত হয়ে গিয়েছিল। বাড়ীতে সে ঝিয়ের (দাইয়ের) মতই থাকত। হয়ত তার মনে হত সে ঐ বাঙালী ভদ্রলোকটিকে তায় সমাজ থেকে নামিয়ে এনেছে। কোথায়

যেন তার একটি ভদ্র মন ছিল, পরে সেটা আরও বোঝা গেল।

ননীবাবু ছেলেটিকে কিন্তু ভালো স্কুলে, পিতৃনাম পরিচয় দিয়ে পড়াতে লাগলেন। দাসীপুত্র বা অবিদ্যাপুত্রের মত রাখলেন না।

ছেলে লেখাপড়া ভালোই শিখল। বি. এ. পাসও করল। তারপর কেমন ক'রে চোদ্দসালের যুদ্ধের সময়ে পিতাপুত্রে ব্যবসা করে একেবারে ফেঁপে উঠল। বি. এ. পাস, টাকাকড়িও হয়েছে, এবং ছেলেরও বিয়ের বয়স হল। পিতা পুত্রকে নিয়ে কলকাতায় গেলেন।

মা রামপাতিয়া এখানেই রয়ে গেল। কী ভেবে ননী দত্ত নিয়ে যান নি কে জানে। আমার বাবা গিয়েছিলেন বরযাত্রী হিসেবে।

এই বিয়ের পরই ব্যাপারটা ঘোরালো হয়ে উঠল। প্রায় অর্ধেক রাজত্ব ও রাজকন্যার মত মেয়ে এল কলকাতার বেশ সম্পন্ন এক স্বজাতীয় ঘর থেকে। রূপ নিয়ে, অর্ধেক রাজত্ব না হোক, বেশ-কিছু যৌতুক-গহনা-আসাবাব নিয়ে।

স্ত্রী-আচার-মতে বরণ-আচার-অনুষ্ঠান আদির আয়োজন ননী দত্ত বাড়ীতে কিছু রাখেন নি। রামপাতিযাও কিচ্ছু করে নি। কিন্তু সে গ্রাম্য সরল আনন্দে বিহারের মেয়েদের মতই কপাল অবধি সিঁদুর প'রে, টিকুলী প'রে, হলদে রঙের একখানি ভাল শাড়ী প'রে দুটি ভবা ঘট দুয়ারের দু'পাশে রেখে নিজেব মনের মত মাঙ্গলিকের কিছু আয়োজন করে রেখেছিল। ঝি বা দাই শ্রেণীর কয়েকটি মেয়েও জড় হয়েছিল মঙ্গলগান গাইবার জন্য।

তারপর কয়েকখানা ঘোড়ার গাডী বোঝাই করে যখন ছেলে-বউ নিয়ে ননী দত্ত বাড়িতে উঠলেন—বাবা দাঁড়িয়ে দত্তর পাশে। গ্রামকন্যা রামপাতিয়া হাসিমুখে সামনে এসে রূপে-সাজে ঝলমল-করা বাঙালী কনে-বৌ দেখে এত অবাক হয়ে গেল যে এগিয়ে আর এল না। আস্তে আস্তে পিছিয়ে রান্নাঘরের দরজার আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল।

শশী বৌ-সুদ্ধু এগিয়ে গেল মা'র কাছে। মাকে প্রণাম করবে বলে বোধহয়। করলও হয়ত। কিন্তু বৌ একেবারে হতবুদ্ধির মত চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তার সঙ্গের ঝি (সেকালে ঝি আসত বিয়ের কনের সঙ্গে) গালে হাত দিয়ে বললে, 'ও কে, জামাইবাবু? পেন্নাম করছ যে?'

অস্পষ্ট স্বরে, মাথা না নুইয়েই কনে-বৌও বলল, 'ও কে?'

বাড়ীতে আশেপাশের সমবেত সামান্য লোক-কটির সঙ্গে শশীর বাবা, আমার বাবাও যেন হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন। যেন শশীর বাবা, শশী—তারাও বুঝতে পারেন নি বা ভাবেন নি এরকমটা হতে পারে রামপাতিয়াকে নিয়ে—তার বেশভূষা নিয়ে।

ইতিমধ্যে রামপাতিয়া কিন্তু চট করে কী ভেবে নিয়ে যেন সব দিক সামলে ভাঙা বাংলায় বললে, 'আমি শশীর দাই, ওকে মানুষ করেছি।'

বাবা আর ননী দত্ত বাইরে বেরিয়ে এলেন। বাবা বললেন, ননী দত্তর মুখটা যেন লজ্জায় কিরকম হয়ে গিয়েছিল। আর শশী? তার বৌ, তার ঝি, তারা কি ভাবল কি করল পরে সে আর আমরা জানি না। বাবাও বাড়ী ফিরে এলেন।

তারপর আরও কিছুদিন গেল। শশী আর মাকে 'মা' বলত কিনা বা রামপাতিয়া কিভাবে থাকত কেউ জানি না। শশীদের কারবারের তখন পুরো মরশুম। অবস্থা বেশ সচ্ছল।

নতুন বউ মনে মনে কী ভেবেছিল তাও কেউ জানে না। কিন্তু তার অবজ্ঞাময় উদ্ধত উগ্র কর্ত্রীত্ব ও আচরণ রামপাতিয়া থেকে ননী দত্ত, শশী—সবাইকেই যেন নিজেদের বাড়ীতেই তটস্থ কোণঠাসা করে দিয়েছিল।

শুনেছি রামপাতিয়া নিচে রান্নাঘর, কয়লার ঘর ছেড়ে আর ওপরে উঠতই না সহজে। ননী দত্ত নিচের বৈঠকখানাতেই আশ্রয় নিয়েছিলেন। কদাচ ওপরে উঠতেন।

ভীরু ভালোমানুষ রামপাতিয়া বেশীদিন আর বাঁচে নি। সামান্য কী অসুখে—বোধহয় ইনফ্লুয়েঞ্জায় মারা যায়।

অসুখ হ'লে শশীর বাবা একটু দেখাশোনা করতেন। বধূ নেপথ্যে শুনিয়ে শুনিয়ে বলেছিল, 'বুড়োমানুষের আবার ঝিয়ের জন্য অত দেখাশোনা কেন? আমরা কি দেখছিনে?'— আরও অনেক কথা। কথাগুলো খুব ইঙ্গিতময় ও নোংরা।

কিন্তু ননী দত্ত তাতে আর ভয় পান নি।

আর রামপাতিয়াও মারা গেল।

তারপর এল শেষকৃত্য, শ্রাদ্ধশান্তির সমস্যা।

ননী দত্ত বিহ্বলভাবে বসে রইলেন। বাবা গেলেন তাঁর বাড়ী। তখন ওঁদের অবস্থা খুব ভাল। সেইটেই হল মুশকিল। ধনী হয়েছেন—প্রতিষ্ঠা বেড়েছে। শশীই কি শেষ কাজ করবে? বৌমা তো চারজন ব্রাহ্মণ দিয়ে ঘাটেই ব্যবস্থা করতে চাইল।

লোকেরা যেন চারদিক থেকে চেয়ে দেখছে ওঁদের বাড়ীকে। এতদিন পরে যেন ভাবছে, কে ঐ রামপাতিয়া—শশীর দাই, না মা?— না, বাড়ীর ঝি?

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'তা শশী কি জানত না রামপাতিয়া ওর মা?'

'কি জানি, ছোটবেলা থেকে তো মা বলেই জানত। হঠাৎ বিয়ের পর দাই শুনে আর সে মা ও বলে নি, চমকে গিয়েছিল যেন। কিছু জিজ্ঞাসাও করে নি বাপকে। আসলে ওর বিয়ের পর বাড়ীতে সহজভাবে আর কেউ ছিল না। বড়লোকের মেয়ে

এনে কেমন একটু সঙ্কোচ হয়েছিল। তা ছাড়া মেয়ের তো জাত কুল উঁচু ছিল। আসলে স্পষ্ট কথা শশীও জিজ্ঞাসা করে নি, ননী দত্তও বলেন নি তখনও।'

তার পর— বাবা তো সব জানতেন। ননীবাবুকে বললেন, 'শশী যাক শ্মশানে, যা কর্তব্য মনে হয় করবে। তুমি আর কিছু বল না।' "গোলে হরি বোল" দেওয়ার মত শেষ কাজ হল। শ্রাদ্ধও হল। ব্রাহ্মণ-ভোজনও হল। ওরা তখন বড়লোক। লোকে ধন্য-ধন্যও করল দাইয়ের শ্রাদ্ধে সমারোহের জন্য।

তারপর বেশি কিছু আর নেই। ননীবাবু বুড়ো তো হয়েছিলেনই, আরও শীগ্‌গির বুড়ো হতে লাগলেন। কয়েক বছর বাদে মারা গেলেন। সেই সময়ে একসময় শশীকে ডেকে বাবার সামনে বলে গেলেন শশীর মা'র জীবনের সব কাহিনীটা। নিজের দুর্বিপাকে পড়া, দয়া করা—তার পর রামপাতিয়ার তাঁর দুর্যোগের দিনে, জীবন-সংশয়ের দিনে সেবা ও বাঁচিয়ে তোলা—।

আমি বললাম, 'শশী কী বললে ?'

'শশী কী বললে আমি কিছু শুনি নি। তবে তার উদ্ধত স্ত্রীকে সে প্রথম থেকেই ভর করত। আর তার ছেলেমেয়েও তো হয়েছিল। শশী দত্ত বাপের কাছ থেকে সব স্পষ্টভাবে জেনে মার জন্য দুঃখ পেয়েছিল হয়ত। কেননা বাপের মরার পর সে স্ত্রীকে বড় কেয়ার বা সঙ্কোচ আর করত না। বোধহয় বলেছিল সব কথা। এখন লোকে কানাঘুষো করে— তাই নিজেই ছেলেমেয়েদের বিয়েতে সে আর কলকাতায় গিয়ে ভালো কুল ঘর দেখে পাত্র-পাত্রী খোঁজ করে নি। স্বামী-স্ত্রী কাশীতে গিয়ে কিছুদিন থেকে নিজেদের মত খুঁতওয়ালা ঘর বংশ দেখে ছেলে আর মেয়ের বিয়ের পাত্র-পাত্রী ঠিক করেছে।'

'তাহলে সে এখন জাতে উঠেছে—না অপাঙ্‌ক্তের ?'

'ঠিক এখনকার সমাজের জাতে ওঠে নি হয়ত। কিন্তু অগাধ টাকা, ছেলেমেয়েরা সব শিক্ষিত বিদ্বান—বেশিদিন কুলদোষ থাকবে না।'

আমি বললাম, 'কিন্তু মেয়েটা অত ভদ্রমেয়ের মত বুদ্ধি কেমন করে পেল ভাবছি।'

বসুধারা—কার্তিক, ১৩৬৬

মিছে কথা

পাশাপাশি বাড়ী। তেতলা বাড়ী যাঁদের—তাঁরা বেশ সমৃদ্ধ-ধনী বলা চলে। একটি মেয়ে, দুটি ছেলে, কর্তা-গৃহিণী, কিন্তু আর বড় কেউ নেই—কিন্তু ঝি-চাকর, গাড়ী-মোটর

ইত্যাদিতে সমস্তক্ষণ বাড়ী মুখরিত। একতলা বাড়ীতে যাঁরা থাকেন, তাঁরা নিতান্ত গৃহস্থ। কোনক্রমে পৈতৃক জীর্ণ ভদ্রাসনটুকুতে মাথা গোঁজা চলে, তাও বাইরের দিকের দু'খানি ঘর ভাড়া দেওয়া আছে। এ বাড়ীর কর্তা কোন আপিসে কাজ করেন, ষাটটি টাকা বেতন, স্ত্রী, পাঁচটি মেয়ে, দু'টি তার অবিবাহিতা, একটি ছেলে, একটি বৃদ্ধা বিধবা বোন কর্তার জ্যেষ্ঠা। একটি ঠিকে ঝি প্রচুর উপদেশ বর্ষণ করে, সশব্দে না ভেঙ্গেই বাসনগুলো মেজে দিয়ে যায়।

তেতলা বাড়ীর মেয়ে রেবা সকালে ঘরের গাড়ীতে স্কুলে যায়, ফিরে সন্ধ্যায় মাস্টারের কাছে পড়ে। বিকেলে স্কুল থেকে ফিরে এসেই কোনক্রমে বই খাতাগুলো রেখে মা'র কোলের কাছে ব'সে পড়ে। মা সস্নেহে কপালের চুল সরিয়ে দেন, মাঝে মাঝে বলেন, 'তুই যেন খুকি হচ্ছিস্, হাত মুখ ধো—'

মেয়ে হাসে। মাকে জড়িয়ে ধরে বলে, 'খুকি নয় বুঝি—একটাই মেয়ে ত বাপু'।

ও বাড়ীর ছোট মেয়ে দুর্গা সমস্তদিন সংসারের কাজ করে; সকালে ঘরের বাসি পাট সারা— ধোয়া, মোছা, বাবার ভাই-এর ছাড়া কাপড় কাচা, বাবাকে তামাক দেওয়া, পান সাজা ইত্যাদি, বিকালেও ঐরকম—সন্ধ্যায় পিসীমাকে মহাভারত শোনানো।

দুই বাড়ীর দুই মেয়েতে খুব ভাব। খাবার খেয়েই রেবা দোতলায় পড়বার ঘরের জানলায় দাঁড়ায়—সাথীর প্রতীক্ষায়—দুর্গা কাজের ফাঁকে একটু ছুটি নিয়ে একতলার ছাতে দাঁড়ায়। দুর্গা তার স্কুলের গল্প শোনে, রেবা ওদের বাড়ীর কথা শোনে। সময় বেশী পেলে কি অনুমতি পেলে এ যায় ওর পড়বার ঘরে—নয়ত ও আসে জীর্ণ বাড়ীর চিলে-কুঠুরীতে। রেবা খুব কথা কয়, দুর্গা শুধু শোনে। যেখানে রেবা উচ্ছ্বাসিত হয়ে হাসে, দুর্গা ঈষৎ হাসে।

রেবার দাদা বিনয় বি এস্-সি পড়ছে—দুর্গার দাদাও ওর সঙ্গে পড়ে ছোট থেকেই।

এমনি করে দুটি বাড়ীর দুটি মেয়েতে, দুই ছেলেতে খুব অন্তরঙ্গতা, কিন্তু দুই বাড়ীর কর্তা-গৃহিণী বিশেষ ক'রে তেতলা বাড়ীর ওরা তাদের আনন্দ মিলনে বাধাও দেন না, যোগও দেন না।

ইতিমধ্যে রেবার পনের বছর পার হয়ে এল। দুর্গারও তাই। পিসীমার তাড়ায় দুর্গার দিদি তারার সম্বন্ধ খুঁজতে লাগল। বড় দুই মেয়েকে গৌরী নয়, কন্যাদান করা হয়েছিল— তৃতীয়ার সময়ে— 'কন্যা' নয় তেরো বছরের মেয়ের বিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ক্রমশঃ এদের বেলা দক্ষিণান্তের অব্যবস্থা দেখে দান কেউ নিতে আগ্রহ দেখালে না— কাজেই ঢেউয়ের মতন বছরের স্রোত বয়ে যেতে লাগল। মা ভাবেন, তাই তো কি করে কি হবে— বাবা বলেন, থাক্ না কুলীনের ঘরের মেয়ে, আর এখন তো ওরকম

থাকেও—। শুধু পিসীমার নির্বন্ধ, তোদের কেমন কথা—ও আবার কেমন কথা—ও আবার কি হয়।—

রেবা এল বেড়াতে, 'ভাই আজ ছাতে উঠিস্ নি ?'

'নদিদিকে কা'রা দেখতে এসেছিলেন।'

পিসীমা বললেন, 'বস মা।'

'কারা দেখলেন পিসীমা ? পছন্দ হল ?'

'হ্যাঁ, পছন্দ ত করলে মা। কিন্তু দোজবরে চার ছেলেমেয়ে—আমার তারার মতন মেয়ে—।'

রেবা চুপ করে রইল। বিবাহ সম্বন্ধে ওরকম পাত্র যে খুব বাঞ্ছনীয় নয়, সেটা বোঝবার বয়স তার হয়েছে।

'জান দাদা—' রেবা এসে দাদার ঘরে ঢুকল।

'কি ? আজ স্কুলে মায়া কি বললে আর বেলার জামাটা কি বিশ্রী দেখতে ?'

বই থেকে মুখ না তুলেই দাদা অনুমান-শাস্ত্রের ওপর নির্ভর করে বোনের কথাটাই বলবার চেষ্টা করলে।

'আঃ—না গো, তুমি এমন জ্বালাও! পাশের বাড়ীতে একজনরা আজ দেখতে এসেছিল।'

'কাদের ? হুগিকে ?'

'না, না—'

'বলেই ফেল না, এত গৌরচন্দ্রিকা করছিস কেন ?'

'যাও— পড়ছেন তো—।'

বই থেকে মুখ তুলে দাদা বললেন, 'তুই বুঝি তবে পড়া জেনে নিতে এসেছিস ? উত্তর ত সব কথারই দিলুম, বল কি বলবি বল।'

'নাঃ— আমার তো খেয়েদেয়ে কাজ নেই—তোমার কাছে পড়ব তাই—' তারপর মুখটা যথাসম্ভব করুণ গম্ভীর ক'রে রেবা বললে, 'ঐ তারাদিদিকে দেখতে এসেছিল আজকে—একটা অনেক বুড়ো বর।'

দাদা হেসে ফেললে, 'তাতে তোর কি ? তুই কেন মুখটা ওরকম পেঁচার মতন করছিস—তোর জন্যে ও'রকম সম্বন্ধ আমরা করব না আশ্বাস দিলাম।'

এবারে রেবাও হেসে বললে, 'তা কি বলছি তুমি এমন কর। কিন্তু তারাদিদির জন্যে আমার এমনি দুঃখ হচ্ছে।'

দাদা ওরকম খবরে কোনও রকম কিছুই ভাবান্তর বোধ করে নি···বোনকে ভেঙিয়ে 'আচ্ছা তাই তো' ব'লে বইএর দিকে তাকালে।

'যাও—কি ছেলে তুমি···একটু মায়া-দয়াও নেই।' রেবা মার কাছে গেল। বাবা ইজিচেয়ারে শুয়ে কাগজ পড়ছেন,— মা খাটের কাছে বসে দৈনিক খরচের হিসেব নিচ্ছেন চাকরের কাছ থেকে।

'কি, খিদে পেয়েছে?' মেয়ের অসাময়িক আগমনে মা জিগ্‌গেস করলেন।

'না' ব'লে মেয়ে মা'র কোলের ওপর ঝুঁকে খাতা দেখতে লাগল।

'জান মা, আজ ওদের বাড়ীতে তারাদিদিকে দেখতে এসেছিল।'

'হুঁ শুনেছি। (চাকরকে) তারপর কি বললি? ঠাকুরঘরের মিষ্টি, ফল পৌনে পাঁচ আনা, (কন্যাকে) তা পছন্দ করেছে তো?'

মুখভঙ্গি ক'রে রেবা বললে, 'তা আর করবে না? তার তো চারটে ছেলেমেয়ে আছে।'

'দোজবরে? তা কি করবে—তিনটি মেয়ে পার ক'রে তারার বাপ বুড়োর মতন হয়ে গেছেন, দেনা ত হয়েছে কিছু শুনেছি।'

'আমার এমন দুঃখ হচ্ছে মা,···বেশ মেয়ে ওরা না মা?'

'কপাল আসল কথা···। বেশ আর নয় কে বলছে।

কর্তা বললেন, 'কি রে খুকি, কে বেশ?'

রেবা পালাল। মা হাসলেন, 'ঐ ওদের মিত্তিরদের বাড়ীর মেয়েরা।'

'ওঃ!' কর্তা তামাকের নলটা মুখে তুলে নিলেন, ওদের সঙ্গে এদের বাড়ীর কি সম্বন্ধ!

২

ওখানে তারার বিয়ে হল না। এদিক ওদিক খোঁজ করতে খবর নিতে নিতে হঠাৎ একদিন তারার বাবা আপিস থেকে অসুস্থ হয়ে ফিরলেন, তারপর সাত দিন মাত্র কাটল···দুটি অবিবাহিতা মেয়ে, স্ত্রী, বোন সবগুলিকে কুড়ি বছরের ছেলের ওপর দিয়ে তিনি চোখ বুজলেন।

তিন মেয়ে শ্বশুরবাড়ী থেকে এল, মার লক্ষ্মীমূর্ত্তিটিকে দীন নিরাভরণ দেখে তাদের আর একদিনও বাড়ীতে ভাল লাগছিল না।

দুর্গার দাদার পড়া আর হল না, বাবার আপিসে একটা ছোট কাজ নিতে হল।

তেতলাদের পয়সার অভাব নেই, রেবার বেশ ভাল ঘরে ততোধিক ভাল বরে বিয়ে হয়ে গেল।

দাদা এখন এম. এস-সি পড়ছে। বাবা-মা ছেলের বিয়ের কথা প্রকাশ্যে ভাবেন মাঝে মাঝে, রেবার নেপথ্য উক্তিতে তা দাদার কর্ণগোচর হয়, বিনয় অন্যদিকে চেয়ে

স্বগত বোনকে ভেঙায়, রেবা রাগ করে। দাদা বলে, 'তোকে কি বলিছি?' দুজনেই হাসে।

তেতলায় এমনিধারা আনন্দের স্রোত বয়ে যায়। কিন্তু রেবার যাতায়াত এক-তলাতেও আছে।

শ্রাবণের সন্ধ্যা, প্রায় রাত্রি। বিনয় মাত্র তার টেনিস্ র‍্যাকেটটি বেশ ক'রে লাগিয়ে স্ক্রু দিয়ে এঁটে রাখছে। বাইরে মৃদু বর্ষণ আরম্ভ হয়ে গেছে আবার।

'কি বিষ্টি—না দাদা? আচ্ছা কি ক'রে খেললে আজ? পিছলে পড়ে যাও না?' রেবার অজ্ঞ প্রশ্নে বিনয় হাসলে।

'সে কিনা আমাদের বাঙালী বাড়ীর শ্যাওলাপড়া উঠোন, তাই তোর মত যেতে আসতে আছাড় খাব। ঘাস যে রে—তা ছাড়া বিষ্টির দিনে খেলা হয় না। ভেবে-ছিলাম শুকিয়ে যাবে, তাই ওটা নিয়ে গিয়েছিলাম।'

রেবা চেয়ারখানি টেনে নিয়ে বেশ গুছিয়ে বসল। বিনয় শঙ্কিতভাবে বললে, 'বসলি যে, আমি পড়ব এখন, যা! পালা।'

রেবা বললে, 'আর মোটে তিনটি দিন আছি, তাও সইতে পারছ না, কি মানুষ বাবা! শোন শোন একটা কথা আছে।...জান, ওদের সেই তারার এখনও বিয়ে হয় নি। কত বয়স হল জান? এই আমার চেয়ে চার বছরের বড়—মানে প্রায় একুশ বছর। ওর মা, পিসিমা কত দুঃখ করছিলেন আজ।'

'তা কি আমার জন্যে ঠিক করেছিস ওকে?'

'যাও, কি যে কথার ছিরি, ও যে প্রায় তোমারই বয়সী।' কিন্তু আবার একটা বিদ্যুৎ খেলে গেল, সে বলতে এসেছিল, যদি তার দাদার কোন সদয় বন্ধু ওদের দয়া করে উদ্ধার করে, 'আচ্ছা দাদা, কর না তুমি বিয়ে,—তোমার তো এবার বিয়ে হবে।'

'কাকে, ঐ তারাদিদিকে!' দাদা সকৌতুকে হাসলে।

'আঃ না গো, দুগিকে। বেশ মেয়েটা, না? তুমি দেখ নি ভাল করে আজকাল? ...ওরা তো আমাদের ঘর, না? দেখতে তো ভালই, আর গুণও খুব।' বিনয় ভাবছিল চুপ করে...দুর্গাকে সে অনেকবার দেখেছে ছোট্ট থেকে! রেবার কথায় সব যেন ফুটে ওঠে। আজ প্রথম দেখার মতন ভেসে উঠল...স্নিগ্ধ উজ্জ্বল মুখখানি বুদ্ধিতে উদ্ভাসিত, রং কেমন, সে সম্বন্ধে ওর কোন ধারণাই নেই। মনে হল দুর্গাদের অবস্থা... সহিষ্ণুতা, দুঃখ...ইত্যাদি।

'তুই জ্বালাতন করিস এমনি, তুই শ্বশুরবাড়ী গেলে আমি বাঁচি।'

'হুঁ, তা বাঁচ বই কি। না দাদা, সত্যি তুমি দেখ না ওর বোনের জন্য কারুকে। আর আমি তোমার জন্য মাকে বলি দুগির কথা...বলি? তোমার মত আছে?'

'যাঃ, পাগল আর কি ! আমি ছেলেদের বলব'খন। এখন যা দেখি।'

রেবা নাচার হয়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। বললে, আচ্ছা ভুলো না কিন্তু।'

মা'র আদুরে মেয়ে হলে কি হয়—আদরের হলেই তো অভিমান কম হবে না,—কাজেই কিছু বলতে গেলে মনে হয় মা যদি বিরক্ত হন।

সকালে জল খেতে বসে কথাটা পাড়লে—'মেয়ে তো ভালই···দাদাও অপছন্দ করবে না।'

মা একেবারে অগ্নিমূর্তি, 'তাই বলি, ঐ পিসি মাগী এই ফন্দি ক'রেছে···তোকে ভাল মানুষ পেয়ে তোকে দিয়ে আবার ছেলেকে অবধি বলিয়েছে, ··ওমা কি আস্পর্ধা ? তাই কি ঘরের মতন ঘর···বলার একটা ছিরি আছে কি !'

'না মা,—ওরা কিচ্ছু জানে না, আমিই তোমাকে বলছিলাম।'

অনুনয়ের সুরে মাকে থামাতে চেষ্টা করতে করতে অভিমানিনী মেয়ের চোখে জল এল।

'না রে তুই জানিস না, আজকাল অমনি সব ধরন হয়েছে,—দেখ তো পাশাপাশি থাকা—পটল তুগিকে সর্বদা দেখছে—'

রেবা অভিমানে স্তব্ধ হয়ে কেনক্রমে খাওয়া সেরে উঠে পড়ল।

কথাটা কর্তার কানে উঠল। একতলা বাড়ীতেও পৌছল কেমন ক'রে কে জানে। এ বিষয়ে গৃহিণীর সঙ্গে কর্তার মতভেদ হল না। হঠাৎ তিন মাসের জন্য বরানগরের বাগানবাড়ীতে যাবার আয়োজনে বাড়ীর মাছি টিক্‌টিকিটি অবধি বিচলিত হয়ে উঠতে লাগল, গোছগাছ, বন্ধ-খোলার জ্বালায়।

একতলার লোকেরা শুনলেন যে ওঁরা নাকি ছেলেমানুষ রেবাকে দিয়ে এই সব অভিসন্ধি সিদ্ধ করবার চেষ্টা ক'রেছেন,···তা'ও যদি কর্তাকে বলেন, গৃহিণীকে মিনতি করেন তো দয়া হয়। না হয় জানাশোনা কোন ছেলের জন্য দেখেন, শোনেন—না একেবারে "ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস' ! ওঁরই ছেলেকে ভোলাবার চেষ্টা ইত্যাদি।

দুর্গা মাটিতে মিশে গেল।—তারা স্তব্ধ হয়ে রইল। মা আর পিসিমা ঘৃণায় ধিক্কারে প্রতিবাদও করতে পারলেন না—দারিদ্র্যের লজ্জা দুঃখই যথেষ্ট তাদের ঘিরে আছে—তার ওপর এ অপবাদ মর্মান্তিক··· ।

রেবা বেচারা এসব শোনবার আগেই চ'লে গিয়েছিল। সেখান থেকে খবর পেলে মা'র শরীর খারাপ তাই ওখানে যাওয়া হচ্ছে।

বিনয়ের বন্ধুরা উৎফুল্ল হয়ে প্রশ্ন করতে লাগল, 'হ্যারে, ব্যাপার কি ? চিরটাকাল তো খোকাই ছিলে, হঠাৎ একি সব ?'

'কেমন মেয়েটি হে ? লেখাপড়া জানে ? তুমি তো শুনি গুড্‌ বয়, এমন ডুবে ডুবে

জল খেতে শিখলে কেমন ক'রে ?

মা'র বিরক্তি—বাপের উপেক্ষা,—রেবা অবধি নেই, বিনয় এত অভিভূত হয়ে উঠেছিল···একেবারে বলে বসল, 'না ভাই, সব বাজে মিছে কথা, কে জানে কেমন···।'

'কথা কানে হাঁটে' এবং সব কথাই যেখানে পৌছান উচিত নয় সেখানে আগে পৌছয়। এটাও যথাকালে যথাস্থানে পরিবেশিত হয়ে গেল।

অঘ্রাণ মাসের প্রথমে বাড়ি এসে যথোচিতের চেয়ে বেশী সমারোহে বিনয়ের বিয়ে হয়ে গেল। মেয়ে যাকে বলে বাঞ্ছনীয়,—তাই। বাপ হাইকোর্টের উকীল, ছোট মেয়ে, সুন্দরী বলা যায়,—স্কুলের পড়া শেষ করেছে ইত্যাদি। ইত্যাদি। এবং গৃহিণীর সাধ-আহ্লাদ পরিপূর্ণ হল।

পরিবর্তন সব জিনিসেরই আছে—ঘর-কন্নার ব্যাপারেও তা থাকে। একতলাতে কিন্তু এযাবৎ কোনও রকম পরিবর্তন আসে নি, যা উল্লেখ করা যায়। তারা-দুর্গাদের বিয়ে হয় নি, দাদাও বিয়ে করে নি। মা আর পিসিমা দ্রুতগতি বার্ধক্যের পথে চলেছেন। জীর্ণ বাড়িখানি, ততোধিক জীর্ণ মা, পিসিমা। অজানা ভয়ে-ভাবনায় ভারাতুর মন—তিনটি ভাই বোন। যেন অজ পাড়াগাঁর পোড়ো বাড়িতে জরাগ্রস্ত নিঃসন্তান দম্পতি। নিত্য কাজ সেরে স্তব্ধ মূক হয়ে পড়ে থাকে।

বোনেরা সকালে উঠে রান্না করে আপিসের ;—মার সেবা, পিসিমার পরিচর্যা করে। ভাই আপিস যায়, এসে কোন দিন বিনয়ের কাছে একটু বসে, কোনোদিন আপিসের বাড়তি কাজ নিয়ে পড়ে।

ভাই বোন সকলেরই যেন আপিসের কাজ, আকর্ষণ, আনন্দ, আকাঙ্ক্ষা, উৎসব কিছুই নেই। মাঝে মাঝে দিদিরা আসে, তাদের ছেলেমেয়েগুলি মনে জাগিয়ে দেয় যে ওরা মানুষ, কলের কুলীমজুর নয়, সত্যি ঘরের মানুষ। মা সেদিন ভাবেন, আহা ওরাও কারুর ঘরের লক্ষ্মী হ'তে পারত—মিথ্যে মা-বাপ হওয়া।

রেবা আসে, তেমনি হাসিমুখ মধুর উজ্জ্বল মূর্তি। সেদিন দুর্গা হাসে, তারা কথা কয়,—পিসিমা উঠে আসেন, মা কুশল প্রশ্ন করেন। তেতলাদের কিন্তু বদল হয়েছিল—বিনয়ের বাপ মারা গেছেন। সব চেয়ে বেশী ওলোট-পালোট হয়ে গেছে হঠাৎ বিনয়ের স্ত্রী তৃতীয় সন্তানজন্মের সময় তার জীবনের সমস্ত সাধ-আশা অসমাপ্ত রেখে চ'লে যাওয়ায়।

অনেকদিন পর এবারে রেবা এ বাড়ীতে এসেছে। ঈষৎ বিমর্ষ। ভাইপোটিকে কোলে নিয়ে নিজের ছেলের হাত ধরে সে এল।

'এটি বুঝি বিনুর খোকা ?'

'হ্যাঁ, মাসিমা !—রেবার চোখ ছল্ ছল্ করতে লাগল।

মা জিগগেস করলেন; তারা, দুর্গা এসে ছেলেদের কোলে নিলে, আদর করতে লাগল।

সন্ধ্যের পর রেবা উঠল।…কাল আসবি ভাই? উৎসুক দুর্গা প্রশ্ন করলে। রেবা ফিরে দাঁড়াল—একটু থেমে জিগগেস করলে, তুই যাবি না? দুর্গা স্তব্ধ হয়ে রইল তারপর মিনতির স্বরে বললে, 'না ভাই, তুই আসিস্।'

রেবা অপ্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল। দুজনেরই পুরান কথা মনে পড়েছিল।

রেবার মা বিনয়ের বড়ছেলেকে খাওয়াচ্ছিলেন।…'তুই এলি আজ তাই, তবু জেগে আছে, দুটো মুখে দেবে ওদের সঙ্গে ব'সে। আমার যে কি বিড়ম্বনা ক'রে গেছে,—কি আর বলব! আর কি শরীরে শক্তি আছে—না মনের বিলি-ব্যবস্থা আছে…আর এই এক বছরের ওপর হল সে গেছে। পটলই কি কিছু মুখে দেয় বিকেলে…ছেলে যেন বুড়ো হয়ে যাচ্ছে।'

'তা তুই বললি ও-বাড়ীর গিন্নীকে?'

'না মা, আমি পারলুম না।'

'তোদের সবই অনাছিষ্টি…জানা ঘর, মেয়েটি ভাল, তাই বলা, নইলে মেয়ের কি অভাব? কাল বলিস্।'—মা'র বৌয়ের সাধ মিটে গিয়েছিল। এখন দরকার জানা মেয়ে…মৃতার সন্তানদের স্নেহশীলা পালিকা, বিনয়ের সেবাপরায়ণা পরিচর্যাকারিণী স্ত্রী, তাঁর সেবিকা বধূ…। সে হিসেবে দুর্গার মত মেয়ে কোথায় তিনি আর পাবেন…গলার স্বরটি অবধি শুনতে পাওয়া যায় না,…কর্মপটুতাও কম নয়,—নিতান্ত ছোটও নয়। আর নিঃস্ব ছোট ঘর বলা মনে নেই (যা তাঁর প্রথমে আপত্তির হয়েছিল)'। তা তাঁর তো আর সে-সব সাধ নেই। বধূকে মনে পড়ে তাঁর চোখে জল এল, সত্যই ভালবাসতেন তাকে।

রেবা ভাবছিল, মা কি পূর্ব-প্রত্যাখ্যান একেবারে ভুলে গেছেন…গরীব ব'লে কি ও'রা দুঃখও পায় না—কি ভাব্বে! ছিঃ।

কিন্তু দুর্গার পিসিমা রেবাকে আশীর্বাদ ক'রে চিবুক স্পর্শ ক'রে চুম্বন ক'রে কথার ভাবে এতই আনন্দ প্রকাশ করলেন যে রেবা ভাববার অবধি অবকাশ পেল না যে, সে কিভাবে কথাটা ব'লেছিল। মা'ও চুপ ক'রে রইলেন, অমত তাঁরও ছিল না…শরীর মন ভেঙে পড়েছে, নিঃসহায়—ভেবেও প্রতিকার হয় না…করবারও উপায় নেই। এ তো আশার অতীত।

আর যে যার বরকনে—নইলে আগেই বা কথা হয়েছিল কেন? বৌটিই বা যাবে কেন? সবই ভবিতব্য…খণ্ডান কি যায়…আশ্বস্ত ভাবে ভাজে ননদে দু'চারটি কথা হল।

. সকালে দুর্গারা খেতে বসেছে, সেজদিদি এসেছিল,—তিন বোনে হাসিগল্পে খাওয়া হচ্ছে। মা সেজ মেয়েকে উদ্দেশ ক'রে বললেন, 'রেবা এসেছে যে, আহা, ওদের বিপদের কথা জানিস তো···ছোট দু'টি ছেলে নিয়ে ওবাড়ীর গিন্নী একেবারে অস্থির হয়ে যাচ্ছেন, ···বিনুরও বড় কষ্ট হচ্ছে···তা রেবাই কি আসতে পায়···এই এতদিনে আবার এসেছে। সেই তখন এসেছিল।'।

সেজ মেয়ে মা'র দিকে চাইল। তার রেবার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা খুব বেশী ছিল না, সমবয়সীও নয়, তবে জানাশোনা আছে।···সহজভাবেই শুধু বললে, 'বিনুর বৌটির কথা বলছ মা? এবারের ছেলেটি বুঝি নেই?'

'হ্যাঁ। আহা, গিন্নী অনেকদিন ধরে ছেলেকে বলছেন, তা মত আর হয না···।

মেয়েরা যে যা'র খাওযাতেই মনোযোগ দিয়েছিল···। সব চুপচাপ। মা আপন মনে কথা কইছিলেন, 'তা ওরা দুগ্‌গাকে চায়,···ভবিতব্যি কে খণ্ডাবে বল, ওর সঙ্গে একবার কথাও হযেছিল। আর ওদের একটা হিল্লে না হলে তো আমি মরেও নিশ্চিন্ত হব না।'

'ওকি রে, উঠলি যে? অম্বল নে!'

'আমার খাওয়া হয়ে গেছে মা।' দুর্গার আঁচান হল। 'সেজদিদির খোকা কাঁদছে যেন।'

'বৌ যেন কি—মেয়েটার খাওয়া অবধি হ'তে দিলে না। একি আর সেকাল আমাদের! ওরা সব বড় হয়েছে—', ননদ এদের দুজনকে অম্বল দিতে দিতে রাগ করলেন।

মা বললেন, 'তা আর কি ওঁরা পাবেন!' তাঁর অবসাদ-ক্লান্ত মন, ভাঙ্গা শরীর ভাবনাব ভার আর বইতে পারে না।

দুর্গা ঘুমন্ত খোকাকে জাগিয়ে কোলে নিয়ে নানারকম ঘুমপাড়ানী ছড়া গেয়েও কিছুতে সামলাতে পারলে না। চোখটি মুছে মুছে লাল হয়ে উঠল।

সেজদিদি এসে খোকাকে নিলে। তারা আর ঘরে ঢুকল না।

স্তব্ধ দুপুর। মা, পিসিমা ঘুমুচ্ছেন। সেজদিদি তার খোকাকে বুকের কাছে নিয়ে ঘুমুচ্ছে। তারা বোনের মুখ দেখে সব বুঝতে পারছিল, সে-ও বই পড়ার ভান করে একখানা মাসিক হাতে নিয়ে শুয়েছিল। বাসনওয়ালা ঢং ঢং করে চলে গেল—দূরে কোন বাড়ীর ঝি এসে কড়া নাড়ছে। দুর্গা ভাঁড়ার ঘরের আচার—আমসত্ত্ব—বড়ির হাঁড়িকুঁড়ি শিশি হাতে নিয়ে ব্যস্ত, কতক ছাতে রৌদ্রে ছড়ানো, কতক ঘরে ছত্রাকার। ···নির্মল নীল মুক্ত আকাশ···অনেক দূরে বোসেদের বাড়ির দুটি পেয়ারা গাছ—অসংখ্য বাড়ির ভিড় থেকে সবুজ হয়ে দেখা যাচ্ছে। ···পথে লোক নেই, দু'একটি পথিক

এক-আধবার দেখা যাচ্ছে···ক্লান্ত শিথিল মন কখনও ক্ষিপ্রহাতে কখনও অলসভাবে সব নাড়াচাড়া করছে। তারা চুপি চুপি উঠে এল, বোনের পিঠে হাত রাখলে—।

'দুগি।'

দুগি দিদির কাঁধে মুখটা লুকিয়ে ফেললে।

রেবা এল রাত্রে। দাদার খোকা ও'কে ছাড়ে না, তাকে নিয়েই এল। দুর্গা রান্নাঘরে রুটি বেলছে।

মা ইঙ্গিতে রেবাকে ডাকলেন, 'আমি তো কিছু বুঝলাম না মা। ওরা বড় হয়েছে ···তবে আমার তো অমত নেই···আর চিরকালটা ভাবতে পারি না।' মার চোখ ভরে এল।

রেবা বুঝতে পারলে, একটু চুপ ক'রে থেকে বললে, 'সে কোথায় মাসিমা?'

'এই তো রান্নাঘরে ছিল, হয়ত ছাতে গেছে।'

দুর্গা ছাতের আল্‌সের উপর হেঁট হয়ে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে পথের দিকে তাকিয়ে ছিল।

রেবা এসে তাকে জড়িয়ে ধরলে, তার পর কানের পাশে মুখ রেখে বললে, 'আমার ওপর রাগ করিছিস্ ভাই?'

দুর্গা চোখটা মুছে ফেলে বললে, 'না ভাই।'

'যাবি নি ভাই আমাদের ঘরে?'

দুর্গা অনেকক্ষণ সখীর কাঁধটা জড়িয়ে থেকে শেষে বললে, 'নদি'-কে হয় না?'

'কেন ভাই? তোকেই আমরা চাই।'

দুর্গা চুপ ক'রে রইল।

'মার বড কষ্ট হচ্ছে, আর মাও তোকেই চান। দাদা আগে মত করে নি তো—এই ক'বছর কত বলেছেন। এবারে তোর কথায় আর অমত করে নি।'

রেবার হাতের ওপর টপ্ টপ্ ক'রে ক'ফোঁটা জল ঝরে পড়ল। রেবা স্তব্ধ হয়ে রইল। সমস্ত কথা দুজনেরই দু'বাড়িরই মনে আছে—শুধু দুই বাড়ির মা ছাড়া—

'তুই আগের কথা ভাবছিস্ ভাই?···মার ভয়ে সে-সব কথা হয়েছিল। ও চিরকালই তোদের স্নেহ করে শ্রদ্ধা করে···থাক্ গে ভাই···তোর মার কথাও ভাব।

খোকারা ঘুমিয়ে পড়েছে···মেয়েরা নেমে এল।

সাধের কাজ তো নয়, এবারে সমারোহ উৎসবের কিছু উদ্যোগ নেই।

বিনয় বোনের কাছে সব শুনেছিল। চুপ করে রইল। তার মনের ভাব শুধু অন্তর্যামীই জানলেন। মার তো নির্বন্ধ, অথচ তার কোন সংকোচ লজ্জা কিছুই নেই। যেন উচিত মূল্যে বাজার করা।

রেবার স্বামী এলেন। জিগগেস করলেন, 'তা'হলে এতদিনে তুমি মত করালে।'

'যে ক'রে হয়েছে! সব কথাই তো জান, ওরাও সব শুনেছিল।'

'আহা! মেয়েটি বেশ বুদ্ধিমতী, না? তা দেখতে কেমন?'

'বেশ। আমার চেয়ে ঢের ভাল। দেখতে পাবে'খন।'

'বটে, তোমার চেয়ে যখন—।'

'হয়েছে, থাম তো। আচ্ছা দেখবে? এস, ঐ যে।'—স্বামীর বাহু স্পর্শ ক'রে ইঙ্গিতে জানলা দিয়ে পাশের বাড়ির একতলাতে দেখালে। একটি মেয়ে মাথা নীচু ক'রে রুটি বেলছে। রান্নাঘরের উনুনের আঁচ আর প্রদীপের আলো মুখে পড়েছে। রাঙাপাড় শাড়ীর আঁচলখানা গলাবেষ্টন ক'রে বুকের পাশে গুটি-তিন-চারি চুলসুদ্ধ পড়েছে। চুলগুলি অযত্নরচিত, যেন জড় করে জড়ানো, নত মুখখানি বিষণ্ণ মাধুর্যের আভাসে ভরা যেন। ঘন পল্লবনত চোখ, দূর থেকে মনে হচ্ছে ঘুমের দেশের প্রতিমা, —জেগে নেই।

'বাঃ, বেশ মেয়ে! তা তোমরা এঁকে পছন্দ কর নি তখন? অবশ্য তোমাদের সে বৌ-ঠাকরুণও ভাল ছিলেন। তবে বাড়ির পাশে এমন মেয়ে—।'

মৃদু নিঃশ্বাস ফেলে রেবা বললে, 'মার মত হয় নি।'

মিশ্র একটা মনোভাবের মাঝে শুভ কাজের দিন এগিয়ে এল। আনন্দ নিরানন্দ দুই বাড়ীতেই। সবচেয়ে বড় কথা, সেটা সকলেরই মনে ছিল, দুই মা এবং পাত্র পাত্রী দু'জনেরই,—শুধু নিশ্চিন্ত হওয়া।

বিনয় ভাবে একরকম, কত কি,—যেন যুগযুগান্তর, কত জীবন, কত জন্মান্তর···।

দুর্গা ভাবে আকাশপাতাল, কি করে বাঁচবে ওখানে গিয়ে,—রেবা তো থাকবে না···। চোখে জলও আসে না। ওরা তো চায় নি কখনও। আবার হাসি পায়, কেউই তো কখনও চায় নি · ।

'ও রেবা মা, তুমি আজকে সন্ধ্যেবেলা সব শুভকর্ম করিয়ে যাবে। থাকবে এখানে', দুর্গার মা ডাকলেন।

রেবা হাসল, 'আচ্ছা মাসীমা।'

'কি হে, অমন মুখ করে রয়েছ কেন? খাসা মেয়ে!' ভগিনীপতি শ্যালকের পিঠ চাপড়ে দিলেন।

কনের চার বোন, বরের এক বোন, নিকট-সম্পর্কীয়া আত্মীয় দু'চারজনই,—কিন্তু ছোট্ট বাড়ী, বরযাত্রী আর ঐ ক'টি লোকে ভরে উঠেছে।

স্ত্রী-আচার···শুভদৃষ্টি···চারদিকে মেয়েপুরুষের ভিড়। দুই পক্ষের ভগ্নীপতিরা পিঁড়ি নিয়ে,···মাথার ওপর কাপড় ঢেকে দিল। নাপিত ছড়া বলতে লাগল···।

রেবা উঁকি মারলে, বিনয়ের চোখ নীচু।

'ওকি দাদা, মুখ তোল ? চোখ তোল্ ভাই, শুভদৃষ্টি করতে হয় ‥।'

বিনয় চাইলে, দেখলে হঠাৎ নাড়া-পাওয়া সকালবেলার শিশির-ভেজা গাছের মতন দুর্গার মুদিত চোখ থেকে বিন্দু বিন্দু জল ঝরে পড়ল। বিনয়ের দৃষ্টি আপনিই নীচু হয়ে গেল।

রেবা মৃদু স্বরে, 'ছিঃ ভাই' বলে সরে এল।

বরকনেকে সম্প্রদানের জায়গায় নিয়ে আসা হল।

বিজলী, ১ম বর্ষ, ১৩২৭

প্রতিলোম

অবশেষে সুনেত্রা রায়ের বিয়ে ঠিকঠাক হয়ে গেল ব্রজেন্দ্র বোসের সঙ্গে।

সেই ব্রজেন্দ্র, যার শিক্ষিত মেয়েদের ওপব শ্রদ্ধা ও মোহের অন্ত ছিল না। মফস্বল শহর থেকে পাস-করা-ছেলে কলকাতায় এসেছিল বি. এ-পড়ার সময়ে। পথেঘাটে কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে মেয়েদের ভিড়ে সে অবাক হয়ে গেল, মুগ্ধ হয়ে গেল।

কি করে আলাপ হবে, কেমন করে চেনা-পরিচয় হবে, ভাবতে ভাবতে অবশেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে এসে এম. এ-পড়বার সময়ে চেনা হল সুনেত্রা রায়, সাবিত্রী সেন, রমা মিত্র, আশা মুখার্জিদের সঙ্গে, আরও কত কে জানে।

কারও বা দরকার বই, কারও নোট, কারুর বা বোনার পশম, কারুর বা বিশেষ নম্বরের বোনার কাঁটা, কারুর কালোবাজর থেকে যোগাড় করা কিছু জিনিস—এমনি অধ্যবসায়ে ব্রজেন্দ্র প্রায় সকলের চেনা হয়ে গেল। যার যা দরকার হয় তারা হয় ব্রজেন্দ্রকে বলে, আর নয় তাদের বন্ধুরা বলে যে ব্রজেন্দ্রবাবুকে বল না ঠিক খুঁজে এনে দেবেন।

সুনেত্রারও অমনি করে একদিন পরিচয় হয়েছিল কি একখানা বই কেনবার দরকারে। পড়ার বই নয়, গল্পের বই। যুদ্ধের বাজারে পেঙ্গুইনেরও অনেক নাম করা বই এসে পৌঁছত না, সবই সৈন্যদের জন্যে চলে যেত বোধ হয়।

সে বইখানা "এথেল ম্যানিন্"এর। তারপর আরেকখানা আরও কোন এক খ্যাতনামা লেখকের। এমনি করে পরিচয় হয়ে গেল। ব্রজেন্দ্রের মুগ্ধ-ভক্ত দৃষ্টির সামনে সুনেত্রার নিজেকে খুব বড় মনে হয়েছিল পড়াশুনায় ও শিক্ষায়। আর একটু হাসিও এসেছিল ব্রজেন্দ্রের গ্রাম্য ধরনে, সরল মুগ্ধতায়। তিন চার বৎসরের কলকাতা

বাসেও তার সেই প্রথম কলকাতা দেখার আশ্চর্য হওয়ার মোহ কাটে নি। নতুন সবই তার কাছে এখনও যেন নতুনভাবেই দেখা দেয়। সে কলকাতার সাধারণ ছেলের মত অনায়াসে কোনও কিছুকে অবজ্ঞা করতে পারে না বা নিরাসক্তভাবে দেখতে পারে না। তা মানুষই হোক, আর তার শিক্ষাই হোক আর কোন জিনিসই হোক আর বই-ই হোক।

স্থনেত্রা অন্যমনস্ক হয়ে অবাক হয়ে ভাবে। তার সঙ্গিনী-সহপাঠিনীদের কথা মনে পড়ে। তারা বলে, "ব্রজেন্দ্রবাবু কিন্তু আশ্চর্য মানুষ—সব দেখলেই অবাক হয়ে যান। সত্যি কি এত সরল ?"

সাবিত্রী সেন বলেছিল, "উপকারে খুব লাগেন বটে—কিন্তু যেন বড় পানসে লোকটি। যেন ওঁর নিজের কিছুই নেই।"

রমা মিত্র বলেছিল, "এতদিন শহরে থেকেও যেন কোনখানে ওঁর একটা মফস্বল ভাব রয়ে গেছে, যেটা ওঁর একেবারে জন্মগত।"

আশা বললে, "সেইটেই তো ওঁর সরলতা, যা দিয়ে উনি সর্বত্র এগিয়ে আসতে পারেন !"

স্থনেত্রা শুধু হাসছিল। তার যে কোন মোহ জন্মেছিল ব্রজেন্দ্রের ওপর তা নয়,—অথবা—ভাল লাগত তাও নয। কিন্তু সব সময়ে দরকারী কাজ করিয়ে নেওয়া,—যখন তখন উপকার পাওয়া, তারও তো একটা ঋণ আছে! প্রকাশ্য না হোক—উহ্য ঋণও তো থাকে।

কিন্তু···কিছু কিন্তুর পর তার মনে হয়েছিল সত্যিই কি ছেলেটির কিছু ব্যক্তিত্ব নেই ? উপকারে লাগেন বটে, কাজও করেন বটে, কিন্তু সেটাই কি সব ? মোহ জাগাবার জন্য, ভাল লাগার জন্য উপকার বা কাজ পাওয়াই সব নয়। উপকার তো কৃতজ্ঞতাতেই শেষ হয়ে গেল।

এই তো নীরেন মিত্র আছে, কাজ কিছুই করে না কারুর, পড়াশুনাও ব্রজেন্দ্রের চেয়ে কম, তবু ওই গায়ে-পড়া ভাব তো নেই। সেও তো মফস্বল থেকে আসা ছেলে। দোষ তা হলে গ্রামের না কিসের ? তার মনে হয় ব্রজেন্দ্র যেন ভাল মলাট দেওয়া খেলো বই। ভেতরে কিছুই নেই! কিন্তু ওপরেই বা কি আছে ?

সে যাক। স্থনেত্রা ভাবে ভাল তো ওকে কোনদিন লাগে নি, ভালোবাসেও নি। অথচ কেমন করে এই বিয়ের যে ঠিক হল! কিন্তু আসলে তো বিয়ের ঠিকও নয়! হাসি পরিহাসের মাঝখান থেকে সহপাঠিনীরা কি করে রটিয়ে দিল এ বিয়ের কথা!

ব্রজেন্দ্রেরও যেন অধ্যবসায়ের শেষ ছিল না। শেষ অবধি মা আর বাবার সঙ্গে পরিচয় হয়ে গেল, একদিন কি করে বাড়িতে। তারপর এবারে মা'র উপকার করা শুরু

হয়ে গেল। বাবার জন্যে ওষুধ, ছোট বোনের জন্য মাথার পাঞ্জাবী "চুটলা"—রেশমের চুলবাঁধার ফিতের গোছা, খোকার জন্য মার্বেল, লজেঞ্চুস, মেজভাই অসীমের পড়াশুনা দেখিয়ে দেওয়া। বিনা পয়সায় এম. এ. পড়া মাস্টার, মা বাবার কৃতজ্ঞতার শেষ থাকে না।

তারপর হঠাৎ তাঁরা আবিষ্কার করলেন, ব্রজেন্দ্র তাঁদেরই জাত এবং অন্য কোন বাধাও নেই গোত্র বা পর্যায় নিয়ে।

কি অদ্ভুত সৌভাগ্য সুনেত্রার! তাঁরা ভাবেন আর সকলের কাছে বার বার প্রকাশ্যে বলেন, স্বগত বলেন, নেপথ্যে বলেন।

হলই বা মেয়ে এম. এ. পড়া, আর বড়, আর অর্জনক্ষম এবং এখনকার "ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি"—শাস্ত্রোল্লিখিত নিয়ম এবং অলিখিত চিরকালের নিয়ম যে এখনওআছে।

"চাকরি করবে? চাকরি? কেন? ব্রজেন্দ্র কিসে মন্দ পাত্র? ওকে বিয়ে করতে তোমার কি আপত্তিটা জানতে পারি?" বাবা বললেন অতর্কিতে সকালে চা খাবার সময়। টেবিলে নয়, এমনি রান্নাঘরে সকলে বসে চা খাওয়া হচ্ছিল,—একখানা করে পাঁউরুটির টুকরো আর একবাটি করে চা নিয়ে। মাঘ মাস। বাবা ঘরেই চা খেয়ে দাড়ি কামাবার জন্য গরম জল দিতে বলতে এসেছিলেন, হঠাৎ সুনেত্রাকে আর তার মাকে ওই কথা বলে চলে গেলেন। আর সকলে তখন খেয়ে চলে গেছেন।

আগের দিন রাত্রে সুনেত্রা মাকে বলেছিল সে চাকরি করবে পাস করে। আর··· অনেক কষ্টে বলেছিল, ব্রজেন্দ্রবাবু বেশ লোক, কিন্তু এখন বিয়ে ও করবে না।

মা চোখ কপালে তুলে বলেছিলেন, "বয়স কত হল মনে আছে? পঁচিশের পর আর বিয়ে কোনদিন হবে? সকলে তোমার চেয়ে বয়সে ছোটই রয়ে যাবে। আর ব্রজেন্দ্রের মত ছেলে পথেঘাটে পাওয়া যাবে? তুমি বিয়ে না করলেই ওর বিয়ে হবে না ভেবেছ? কালই শুনবে বিয়ের ঠিক হয়ে গেছে!" মা রাগ হলে 'তুমি' বলেন। এবং অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে শেষে বললেন "জন্মে আর বিয়ে হবে? ওই সেবা-রেবাদের হল বিয়ে? দেখতে পাও না? চিরকাল বসে আছে আইবুড়ো হয়ে।"

সত্যি বিয়ে না হওয়া যে কতবড় পরাজয়, তা সেবা-রেবাদের দেখলে বোঝা যায়। পাসও করেছে, সম্মানিত মেয়েদের মত চাকরি-বাকরি করে না, সম্ভ্রমসহকারে ঘরেই বসে বাপ ভাইয়ের অন্ন খায়, দেখতে ভাল, কাজকর্মও জানে—কিন্তু তাদের যেন লজ্জার সীমা নেই। জীবনযাত্রায় মা বাপ থাকতে বিয়ে হল না আর বছরের পর বছর দুনিয়ার আজেবাজে মেয়েদের বিয়ে হয়ে যাচ্ছে, বোশেখ-জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়-শ্রাবণে, অঘ্রাণ-মাঘ-ফাল্গুনে!

মা আবার বিরক্ত হয়েই বললেন, "এমন কি সেবা-রেবাদের ছোট বোনেরও বিয়ে

হয়ে গেল।”

সুনেত্রা অপ্রস্তুত হয়ে চুপ করেই ছিল। তার মনে পড়ল ছোট বোনের বিয়ের দিনে সেবা রেবাদের কি রকম অপ্রস্তুত মুখ নিয়ে কাজ করা। যেন কি একটা লজ্জার কারণ পরাজয়ের ভাব রয়েছে কোথায়, তাদের মনে, মুখে গায়ে বেঁচে থাকায়। আর কি বিজয়িনীর মত দীপ্ত মুখের ভাব তাদের সেই বোন শুভার। যেন জগতে বুঝি বিয়ে প্রথম তারই হল।

কেমন যেন সুনেত্রার ভয় হয়। আচ্ছা, একেবারে বিয়ে হবে নাই বা কেন? হতেও ত পারে একদিন। আবার সাহস করে ভাবে—আর নাই যদি হয়? তা হলেই বা কি? ওই রকমই লজ্জিত অপ্রতিভভাবে যে বেঁচে থাকতে হবে তারই বা কি মানে? তবে সত্যি বিয়ে হওয়া শক্ত। কেননা, জাতে যদি না হয় মা মাবা রাগ করবেন, মত দেবেন না। আর সেও হয়ত করতে পারবে না! কিন্তু অনেকের তো হচ্ছে! তবু··· তাহলে? তাহলে কি এখনই ওই ভাবেই বিয়ে করা উচিত।

সকাল কেটে যায়, সন্ধ্যে কেটে যায়, রাত্রি শেষ হয়ে যায়। কিন্তু সুনেত্রার ভাবনারও শেষ হয় না। আর কোন মীমাংসাও হয় না। স্পষ্ট করেও বলতে পারে না,—বিয়ে করবেই না। পালিয়ে গিয়ে চাকরি করবারও সাহস নেই,—লোকে কি বলবে। লোকে যেন সবাই তারই দিকে তাকিয়ে আছে। জানে, তা নয়, তবু লোককে ভয়ের তার শেষ নেই। পৃথিবীর যত মাসী পিসী খুড়ো জ্যাঠা স্বজন বন্ধু সকলের কথাকেই তার ভয়। নিরুপায় সুনেত্রা সময় নেই অসময় নেই, কেবলই ভাবে।

আর ব্রজেনকেও দেখতে ভাল লাগে না, যতই সে ঘনিষ্ঠভাবে তার সঙ্গে মেশার চেষ্টা করে, তার কাজে লাগার সাধনা করে।

আগে সে যে ভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে আসত এখন তার চেয়ে সেজে পরিচ্ছন্ন হয়ে, হয়ত একটু দামী কাপড়-চোপড় পরে বা একটু সেণ্ট মেখে আসে। আর যেন সমস্ত অস্তিত্ব দিয়ে সুনেত্রাকে আরাধনা করে। কিন্তু সুনেত্রা সেই যে চোখ নামিয়ে নেয় বই-এর ওপর, খাতার ওপর, আর ক্লাস শেষ হওয়া অবধি তোলে না।

কিন্তু ব্রজেন্দ্রের অধ্যবসায় একেবারে ছিদ্রহীন। সে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সুনেত্রাদের বাড়ি যায়, সেখানেও তার তো কম কাজ নেই। মা বাবা ভাই বোনেরা তার অমায়িকতায় একেবারে মুগ্ধ। অসীমের পড়া বলে দেওয়া হয়, চা খাওয়া হয়, সামান্য কোনও দরকার থাকলে তাও করে দেয়। তবু সুনেত্রা ফেরে না! মেয়েদের হস্টেলে বসে থাকে, নয়তো কোন বন্ধুর বাড়ি যায়। কিন্তু কোন ক্রমেই কোন ফাঁক মেলে না, যেখান থেকে দুর্বলপ্রকৃতি নিন্দাভীত সুনেত্রা ছুতো করে সহজে বেরিয়ে আসতে পারে,—সকলের মত নিয়ে সকলের মন রেখে দুনিয়ার কাছে যথোচিত ভাল হয়ে।

মন মাঝে মাঝে অন্যদিক দিয়েও ভাববার চেষ্টা করে, কেন ব্রজেন্দ্র তো মন্দ নয় দেখতে বা লেখাপড়াতেও, কিংবা বংশগৌরবে, জাতে অথবা অন্য ছেলেদের সঙ্গে তুলনায়। কিন্তু কোনখান থেকে তার হাসি, না কথা, না তার অস্তিত্বই কে জানে কি, সুনেত্রার কেমন গ্রাম্য লাগে। কিছুতেই ভাল লাগে না। যেন তার চেয়ে অনেক বিষয়ে সে ছোট, কম।

আবার ভাবে, মেয়েরা কেন এমন? শিক্ষিত পুরুষ তো তার চেয়ে ঢের বোকা, নির্বোধ, একেবারে নিরেট অশিক্ষিতকে নিয়ে দিন কাটিয়ে দেয়, তার তো কোন ক্ষোভ জাগে না। মেয়েদের এই হীনমন্যতা পুরুষকে নিজের চেয়ে বড় করে দেখবার আকাঙ্ক্ষা —কেন? কোন মেয়েই কখনও তার চেয়ে নিকৃষ্টতর কারুকে ভালবাসতে পারল না কেন? তা হলে কি মেয়েদের স্বভাবই এমনি, যে সে নিজেই ছোট হযে থাকতে চায়।

সুনেত্রার ভাল লাগে না আর ভাবতে, অত্যন্ত ক্লান্ত লাগে নিজেকে। তবু ভাবে অসংলগ্নভাবে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ভাবে, জেগে বসে ভাবে।

হঠাৎ একদিন সন্ধ্যার পর বাড়ি এসে শুনল মা বললেন,—কাল ব্রজেন্দ্রের বাবা ওকে আশীর্বাদ করতে আসবেন। মা খুব বুদ্ধিমতী, তিনি জানতেন সুনেত্রার বড় ভয় নিন্দাকে, কথাকে, তাই তিনি সকলের সামনে, সুনেত্রার বাবা ভগ্নীপতি আরও কার কার সামনে ও কথা বললেন। আর বললেন—তাঁদের ইচ্ছে এই শ্রাবণ মাসেই বিয়ে হয়, এই সতেরই শ্রাবণ।

সুনেত্রা অবাক হয়ে চেয়ে রইল। বাবার মুখ গম্ভীর, মার মুখ স্মিত, ভগ্নীপতির মুখ হাস্যবিকশিত। তার মুখে কোন কথাই এল না। কারুরই আসে না, প্রবল বাবা, বুদ্ধিমতী কৌশলী মা, আর ঠাট্টা করবে এমন ভগ্নীপতির সামনে। তারপর চোখ নামিয়ে নিল, শুধু জিভটা বিস্বাদ হয়ে গেল, মনটা অসাড় হয়ে গেল।

আলো সানাই ফুল লোকজনের ভোজ ও সুনেত্রার উপবাসের মাঝে সতেরই শ্রাবণ এসে পড়ল। ষোলই তাঁরা ওকে গায়ে হলুদ দিয়ে দিলেন, ব্রজেন্দ্রের বাড়ি থেকে আসা রূপার বাটি করে তার গায়ে-ছোঁয়ান হল তেল-হলুদ-চন্দন দিয়ে। একখানা লাল পাড় শাড়ি ঝি-নাপতিনীদের মত খালি গায়ে পরে সে একটা হলুদ-দেওয়া পাড়ের মাদুরে মাথা নীচু করে বসেছিল অসাড়ভাবে, যেন সেকালের ছোট মেয়ে কনের মত। উলু আর শাঁখের শব্দের মধ্যে তার গায়ে ঐ ব্রজেন্দ্রপ্রসাদী হলুদটা ছোঁয়ান হয়ে গেল। তার একটা কি রকম অস্বস্তি হতে লাগল কিন্তু তার ভাববার মত কোন কথা আর স্পষ্ট হয়ে মনে থাকছে না, সব ভাবনা কাজের আর লোকের মাঝখানে হারিয়ে যাচ্ছে।

তারপর তাকে চন্দন পরিয়ে নতুন দামী শাড়ি ও গহনা পরিয়ে প্রদীপ জেলে, শাঁখ বাজিয়ে, সিন্দুকে তোলা প্রকাণ্ড সেকেলে থালায় করে আইবুড়োভাত খেতে বসান হল।

মা জিজ্ঞাসা করলেন কাকে, "আগে কি খাবে?"

বোধ হয় কোন ঠাকুমা হবেন, তিনি বললেন, "আগে মাছ আর পরমান্ন খাবে।" তারপর হেসে বললেন, "এই চব্বিশ বছরের আইবুড়ো থেকে ভাত খাওয়া আজ শেষ হল।"

সুনেত্রা বিশুষ্ক বিবর্ণমুখে একবার তাঁর দিকে চাইল। তারপর মনে হল—'আর কিছু করা যাবে না! সত্যি সত্যি সব শেষ হয়ে গেল।'

কে যেন বলে উঠল, "খেতে আরম্ভ কর্।" উলুধ্বনি আর শাঁখের শব্দের মাঝে সে থালায় হাত রাখল।

পরদিন অধিবাস এল। তাঁদের দেওয়া বারাণসী শাড়ি পরে সে তাদের পাঠান মাছ বাঁ হাতে করে তুলে ধরল। নান্দীমুখ হল। নানারকম ছোটখাটো কি সব বরণটরন হল।

তারপর রাত্রে বর এল। আর ব্রজেন্দ্র নয়। আজ থেকে বর হয়ে যাচ্ছে।

চণ্ডীর পুঁথি কোলে নিয়ে, "আভাঙা" জলে হাত ডুবিয়ে আলপনা দেওয়া পিঁড়িতে বসে রইল কাঠের মত সুনেত্রা। তার শুধু মনে হতে লাগল একই কথা—আর ব্রজেন্দ্র নয়,—'বর' এসেছে। বিয়ে হয়ে যাচ্ছে।

আচার অনুষ্ঠানেব নিয়মের মাঝে বাসর হয়ে গেল। তার পবের দিন ওদের বাড়ি।

কিন্তু সে বাড়ি আর নতুন মনে হল না,—নিজের বাড়িতেও তার আর নিজের পুরান কিছু মনে থাকছিল না। সে যেন হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিল। ওদের বাড়িতে 'কালরাত্রি' এল। সুনেত্রা অস্পষ্ট ভাবনার মাঝে ক্লান্তভাবে ঘুমোয় আর জেগে ওঠে। মনে হয় আজকের পর আর 'কালরাত্রি' নেই। 'চিরকাল' শুরু হয়ে যাবে!

ফুলশয্যার তত্তর থালা মাথায় করা লোকজন নিয়ে উনিশে শ্রাবণ এল পর দিন।

আবার সুনেত্রা সাজে। এবারে মা বাবার তত্ত্ব-দেওয়া দামী শাড়ি পরে, চন্দন পরান হয়, ফুলের গহনা পরতে হয়। অসংখ্য মেয়েদের ভিড়ের মাঝে, বাজে হালকা হাসি-রসিকতার মাঝে হাতের সুতো খোলা হয়, ছোট ছোট মেয়েলী আচার প্রথামত কি সব করায় তারা।

আলপনা পিঁড়িতে ফুলের গহনা পরা সুনেত্রা নিস্তব্ধ বিবর্ণমুখে বসে থাকে ব্রজেন্দ্রের পাশে। ব্রজেন্দ্র খুশী মনে কথাবার্তা কয় মেয়েদের সঙ্গে।

রাত্রি গভীর হতে থাকে। ব্রজেন্দ্র হাই তোলে, আর মেয়েরা অসভ্যের মত হাসে। পিঁড়িতে বসে সুনেত্রা ভাবে অনাদিকাল থেকে চলে আসা এই বিয়ের কথা, কোটি কোটি মেয়ের কথা। হঠাৎ ছোট হয়ে যায়—সেই কোটি কোটি মেয়ের শ্রেণী,—মনে

হয় মা, ঠাকুমা, তার মা, তারও মা, প্র-প্র-প্রপিতামহী, মাতামহী অন্যসব স্বজন জানা অজানা সকলেরই কথা, এমনি করেই যাদের বিয়ে হয়েছে। তাদের ভাল লেগেছিল? তারা ভালবেসেছিল?

সহসা চমক ভেঙে যায়,—দেখে, ঘরে মেয়েরা আর নেই। আর, ব্রজেন্দ্র উঠে দাঁড়িয়েছে। দরজা বন্ধ করে সিল্কের পাঞ্জাবীটা সে ছেড়ে টাঙিয়ে দিল আলনায়। গেঞ্জির ওপর গলায় তার বাবার পাঠানো ফুলের মালাটা পরা, হাতের বিয়ের আংটিটা ঝকঝক করে উঠল।

সুনেত্রা তার দিকে চেয়ে রইল।

ব্রজেন্দ্র আলো নিভিয়ে দিয়ে তার পাশে এসে দাঁড়াল, তার গায়ের সেন্টের আর গলায় মালার গন্ধ সুনেত্রার নাকে এল। সে চকিত হয়ে সরে দাঁড়াল।

ব্রজেন্দ্র একটু অবাক্ হয়ে গেল, তারপর বলল, "শোবে না?"

যে সাহস অনেকদিন আগে করা উচিত ছিল, যা করতে পারে নি সে তখন, আজ একেবারে নিরর্থক বৃথা সেই সাহস তার মনে এল।

পথের দিকে একটি জানলায় বসে পড়ে সে শুধু বলল, "শুতে ইচ্ছা করছে না।" অন্ধকারে ব্রজেন্দ্র তার মুখের কিছুই দেখতে পেল না।

একবার মৃদুভাবে বললে, "আমিও বসি?"

সুনেত্রা কিছুই বললে না। কলেজের বইতে মুখ ডুবিযে বসে থাকার মত পথের দিকে চেয়ে রইল।

আধো অন্ধকার ঘরে ধাতুমূর্তির মত কঠিন বিমুখ সুনেত্রার দিকে চেয়ে ব্রজেন্দ্র যেন সহসা বুঝতে পারলে, এতদিন পরে, সেই মাথা নীচু ক'রে পড়ার, বই খাতাতে মুখ নীচু করে বসে থাকা ওর লজ্জা নয়, সঙ্কোচ নয়! ও তাকে সহ্য করতে পারত না,— পারে না।

সুনেত্রা শুষ্কভাবে ভাবতে থাকে, অনাদিকালের পূর্বপিতামহীদের কথা, যাঁরা এমনি-ভাবেই বিবাহিত হতেন···।

ব্রজেন্দ্র যে তার কাছে বসবার চেষ্টা করেছিল এবং উঠে গেছে কখন, কিছুই সে জানতে পারল না।

গল্প ভারতী—১৩৫৫

পিতা খেতে এলেন। বামুনঠানদিদি ভাত বেড়ে তরকারী সাজিয়ে নিয়ে থালা হাতে এলেন। পিঁড়িতে কর্তা বসেছেন।

ঠানদিদি ডাকলেন, 'ও মধু আয়। দাদা খেতে বসলেন।'

একটি কুড়ি-একুশ বছরের মেয়ে নরুনপাড় সাদা কাপড় পরা ভাঁড়ার ঘর থেকে বেরিয়ে এল, হাতে দইয়ের বাটি আর মিষ্টির রেকাবী নিয়ে।

মুখখানি সুন্দর রং পরিষ্কার, পাতলা শরীর।

পিতা খেতে বসলেন।

এটাসেটা কথা জিজ্ঞাসা করলেন। বললেন, 'তোমাদের রান্না হয়েছে তো!'

বাড়ীতে আর কেউ নেই, পিতা আর কন্যা। কিছুদিন আগে কর্তার স্ত্রী বিয়োগ হয়েছে। বছর শেষ হয়ে গেছে।

কর্তার বয়স প্রায় চল্লিশ।

মেয়ে কাছে বসল।

পিতা বললেন, 'কেমন লাগল ননদের বাড়ী?'

মেয়ে একটু হাসল। বললে, 'ভাল। তুমি গেলে তোমারও ভাল লাগত। বেশ জায়গা। আর ওদের ঠাকুর দেবতা আছেন রাধাগোবিন্দ। ঝুলনে খুব উৎসব হ'ল পাঁচ দিন ধরে।'

পিতা কন্যার কোমল মুখখানির দিকে তাকালেন। বেশ গিন্নি-বান্নির মত কথা বলছে তো। ঠাকুর দেবতা ঝুলন রাস দোলের উৎসবের কথা সে এত শিখেছে এই ক'বছরেই!

গৃহিণী গেছেন বছর দেড়েক হবে। তার তিন বছর আগে মধুমালতী দুর্ভাগ্য নিয়ে ফিরে এসেছে বাপের ঘরে। ষোলো বছর বয়সেই। সন্তান হয় নি।

গৃহিণী থাকতে সে এত কথাবার্তা বলত না পিতার কাছে বসে। খাওয়ার সময়ও বসত না, জননীই বসতেন। এখন বিপত্নীক পিতা আর বিধবা কন্যা। মেয়ে বাপের মন ভোলাবার চেষ্টা করে গল্পে, রান্নার খাবার তৈরীতে। বাবার মনে যেন কোনও অভাব না হয় মা যাওয়ার জন্য।

আর পিতা ভোলাতে চান মেয়ের মন তাকে নানা কথা প্রশ্ন গল্প করে। দুজনে দুজনকে দুটি পরম বিয়োগবিচ্ছেদের বেদনা ভুলিয়ে রাখার চেষ্টা করেন। অথচ সেটা নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের মত মনে মনে শরীরে জুড়ে বসে রয়েছে। যেন ভোলা যায় না বলেই

এত ভোলবার চেষ্টা। এত ছল! এত নানাকথার অবতারণা!

পিতা দই মিষ্টিতে হাত দিয়েছেন।

বললেন, 'দইটি তো ভারি সুন্দর জমেছে আজ। ঠিক আগের মতন।' অর্থাৎ গৃহিণীর সময়ের মতন।

মেয়ে বললে, 'হ্যাঁ মা যেমন জমাতেন তেমনি হয়েছে। এতদিনে বোধহয় আস্বাদ ঠিক করতে পেরেছি। আর এবারে তোমার গরুটার বাছুর বড় হয়েছে, দুধ তাই খুব ঘন হয়েছে তো।'

'কোনটি? মঙ্গলা না কালী?'

কন্যা একটু হাসলে বাবা সব ভুলে গেছেন। মা থাকতে গরু গোয়াল, গোলায় ধান, খেজুর রস, খেজুর গাছ, বাগানের আম কাঁঠাল কলা লিচু সব ফলমূল—লাউ কুমড়োর মাচা কোথায় কি দরকার, হিসেব, খোঁজ নিতেন মার কাছে। নিজেও দেখতেন।

মেয়ে বললে, 'কালীর বাছুরই বড় হয়েছে। মঙ্গলার এবার হবে বাচ্চা।'

সহসা আচমকা ভাবেই মেয়ে বললে, 'আমার ননদের একটি ভাগ্নীকে এবার দেখলাম। ভারি ভাল মেয়েটি। কি যে কাজের আর দেখতেও যেন দুর্গা ঠাকুরের মত। ওদের বাড়ীর গোয়াল গরু রান্নাঘর ভাঁড়ার ঠাকুর দেবতা সব কাজেই সে আছে।'

পিতার আহার শেষ হয়েছে। বললেন, 'বটে!' একটু হেসে বললেন, 'তোর খুব ভাল লেগেছে তাকে দেখছি।'

বামুনঠাকরুণ এসে দাঁড়িয়েছিলেন। বললেন, 'মেয়েটি সত্যিই ভাল দাদা। আমি সেবার রাসের সময় ওদের বাড়ীতে গিয়েছিলাম। ভারি কম্মের মেয়ে, দেখতেও খাসা। মধুও বলছে আরও নাকি সুন্দর হয়েছে।'

সহসা আচমকা ভাবেই মেয়ে বললে, 'আমি ননদকে বলে এসেছি বাবা, মেয়েটি আমরা নেব। ওরা খুব খুশী।'

বাবা আঁচাতে যাবার জন্য উঠছিলেন। একটু অবাক হয়ে গেলেন। মেয়েটিকে নেবে তুমি? কার জন্যে? তোমার ভাসুরপোদের কারুর জন্যে! তাতে তাদের বাবা মা'র মত নিয়েছ তো?'

'না, তাদের জন্য নয়। আমার শ্বশুরবাড়ীর সঙ্গে ওরা এক গোত্তর হবে।

পিতা বললেন, 'তবে'?

মেয়ের চোখ ছলছলিয়ে এল। একটু চুপ করে চোখটি মুছে ফেলে বললে, 'তুমি অমত করতে পারবে না বাবা। ওকে আমি এ বাড়ীতে নিয়ে আসব।'

পিতা সহসা মেয়ের চোখের জল দেখে অবাক হয়ে গেলেন, 'তা তুমি আন না। আমার অমত কেন হবে? পরে সুপাত্র দেখে বিয়ে দেওয়া যাবে। বড় একলাটি রয়েছ তুমি। নিয়ে এস মেয়েটিকে।'

মেয়েটি চোখ মুছে ফেলেছে। বললে, 'সেকথা নয় বাবা। আমি তাদের বলে এসেছি তাকে আমার মা করে বাড়িতে নিয়ে আসব। তুমি ওকে বিয়ে করবে। আমার কেউ নেই। তোমায় বিয়ে করতে হবে সেই জন্যেই।'

পিতা মেয়ের মুখে আচম্‌কা এমন প্রস্তাবে হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন একটু। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'তোর মাথা খারাপ হয়ে গেছে মধু! আমার বিয়ে! তোর এই দশা আর আমি বিয়ে করব!' তারপর চলে গেলেন।

২

কিন্তু মধুমালতী চোখের জল শুকোয় না। আর একে একে পাড়ার গিন্নিবান্নিকে দিয়ে পিতাকে বলায় বিয়ের কথা। এই শ্মশানের মত নির্বান্ধবপুরী, বাড়ীর কথা, পিতার জমিজমা বাগান পুকুরের কথা বলে। সব কার হবে এসব? কি হবে এসব? কে ভোগ করবে?

শেষে পিতার কাছে একদিন চোখ মুছতে মুছতে বলে, 'আর ভগবান না করুন তুমি যদি হঠাৎ মরে যাও আমার কেউ কোথাও নেই। আর আমিই যদি মরি তোমাকে দেখার কে আছে অসুখে-বিসুখে বিপদে-আপদে। তোমার জ্ঞাতিগুষ্টি তো আপন বলতে কেউ নেই। যারা আছে আমাকে মেরে হয়ত সর্বস্ব ভুলিয়ে নিয়ে নেবে। বিয়ে করলে আমার দু'একটা ভাই বোনও হবে। আপনার জন হবে।

বাপ বললেন, 'তা তোর জন্যে একটা পুষ্যিপুত্তুর দেখি না যে তোর আপন হবে!'

চোখ মুছে ফেলে মধু হাসলে। বললে, আমার জলপিণ্ড দেবার লোক শ্বশুরকুলে অনেক আছে বাবা। আমার পিতৃকুলের জন্যেই তোমাকে বিয়ে করতে বলা। তুমি তো আর বুড়ো হও নি। মা থাকলে সে যাহয় তিনি করতেন। আমার যখন কপালে কিছুই হল না। এবারের বিয়েতে যদি ভাই বোন হয় তাহলে আমার সব দিক বজায় থাকবে।'

বামুনঠাকুরাণী ছিলেন সামনে। বললেন, 'তা দাদা মধুর কথা ঠিক। যদি তোমার বিয়েতে সব দিক বজায় থাকে, তার চেয়ে আর কি ভাল আছে। মধুর ছেলেমেয়ে থাকলে সে এক কথা ছিল। আর সে মেয়েটি অনাথ তারও গতি হয়। সম্পর্কও বজায় থাকে সব দিকে, মধুর ননদের ভাগ্নী তো।'

শেষ অবধি বিধবা ব্রহ্মচারিণী মেয়ে যেন জননী হয়ে বসল বিবাহে একান্ত অনিচ্ছুক

লজ্জিত সঙ্কুচিত প্রায় প্রৌঢ় পিতার। পিতাকে সে এভাবে থাকতে দেবে না। বিবাহ সে দেবেই।

পাড়ার দু'চারজন মেয়েকে সমর্থন করলেন। কয়েকজন পিতার আপত্তি সমর্থন করলেন। কিন্তু বিয়ে হয়ে গেল।

৩

রোগা-কিশোরী ছোট মেয়ে উমা কনে সেজে বাড়িতে এসে দাঁড়াল।

মধুমালতীর আনন্দের সীমা নেই। যেন ছোটবেলা ফিরে পেয়েছে। পুতুল খেলার সঙ্গিনীর মত এসে দাঁড়িয়েছে উমা। পিতা যেন তার খেলাঘরে পুত্র আর বিমাতা হলেন কন্যার মত, পুত্রবধূর মত।

বিমাতাকে সে মা বলে। বিমাতাও তাকে মা বলেই ডাকে। সে তাঁকে কন্যার মত সাজায় বসনেভূষণে। খাওয়ায়। চুল বেঁধে দেয়। ভাল শাড়ী সিঁদুর আলতা আনায় পাড়ার লোকদের দিয়ে পিতাকে বলে।

পিতা লজ্জিত হন। মনে মনে যেন অপরাধী হন। তিনি আবার বিবাহ করে এত বয়সে সংসারধর্ম করছেন। আর মেয়ে সন্ন্যাসিনী হয়েছেন।

এমন সময় মধুমালতীর আনন্দের 'ভরা' পূর্ণ হয়ে উঠল। পিতার যেন লজ্জার 'ভরা'ও পূর্ণ হয়ে উঠল সেই আনন্দের মাঝেই। তিনি সংসারী হলেন দুঃখিনী মেয়ের সামনে।

তরুণী বিমাতার সন্তানসম্ভাবনার আভাস দেখা দিয়েছে।

তারপর একদিন পাড়ার লোকদের ভিড় শাঁখ বাজানো হৈ-হট্টগোলের মাঝে মধুর ভাই-এর জন্ম হল।

মধু এতদিনে একেবারে ঠিক ঠিক পিতার জননীর পদে সমাসীন হয়েছে। মায়ের আঁতুড়ের তত্ত্বাবধান করে বয়স্কা গৃহিণীদের মত। মাকে 'ঝালের নাড়ু' ঘি-মরিচ গব্যঘৃত খাওয়ানো না হলে নাড়ী শুকবে না! সকাল বিকাল দুপুরে পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থা কেমন করে শিখে নিয়ে নবীনা জননীর জন্য আয়োজন করে রাখে।

পাড়ার লোকেরা হিতৈষীরা মুগ্ধ। নিন্দুকরা বিচলিত আশ্চর্য।

হিতৈষীদের পঞ্চজিহ্বা মুখর হয়ে ওঠে মধুর প্রশংসায়। নিন্দুকের শতজিহ্বা মুখের মধ্যে আন্দোলিত হয়। কি যেন বলতে চায়। ক্রমে ভাই বড় হয়। নামকরণ অন্নপ্রাশন করার ব্যবস্থাও সেই করে বৃদ্ধা পিতামহীর মত।

তার নিরানন্দ পিতৃগৃহ আনন্দে ভরে ওঠে।

মধুর আরো তিন-চারটি ভাইবোনের জন্ম হ'ল।

মধু প্রবল প্রতাপে অকুণ্ঠ আনন্দে বিমাতাকে তাঁর সন্তানদের লালন করে যত্ন করে। মা যেন কিশোরী বালিকা বধূ। মাকে জল খেতে দিয়েছ? খাবার দিয়েছ?

যেদিন মার রাত্রে ঘুমের অসুবিধা হয় ভাইবোনগুলিকে নিয়ে আসে নিজের কাছে। মা আর বাবা তার গৃহদেবতা। খেলার পুতুল। তার সংসারের ধর্মকর্ম আনন্দলোক।

৪

পাড়ার গৃহিণীরা আসেন। বিমাতার কাছেই বসেন, মধুর তো মরবার অবসর নেই। গোয়াল-গরু, বাগান, পুকুর, ফল, তরকারী, ভাইবোন তাদের পাঠশালা খেলা সব মধুর দায়িত্বে। গল্প করবে কখন। তার মাঝে মাঝে পূজা আহ্নিক বার ব্রত উপবাস নিয়মও আছে।

উমাকে কেউ বলেন মধুর মা। কেউ বেশী ঘনিষ্ঠ হবার আশায় বলেন 'গোপালের মা'! তার নিজের ছেলের নামে।

একপক্ষ বলেন, মধুর কি কাজের সীমা নেই, শেষ নেই! বাপ্ রে! এতও পারে!

তারা চলে গেলে অন্যপক্ষ বলেন জনান্তিকে ইঙ্গিতময় ভাষায়, তা গোপালের মা, তুমি এখন চার-পাঁচটির মা হয়েছ। এখনও যেন কনে-বৌটি সেদিনের! একেবারে নিপাট ভালমানুষ বাছা তুমি।

জন দু'এক মুখরা। হ্যাঁ না যা করবে মধু। বড্ড কিন্তু যেন কেমন কেমন বোধহয়। তা তোমারই তো ঘরকরনা বাপু। গিন্নীবান্নি হবে না?

কখনও কোন কথার আভাস মধুর কানে যায়। কখনও বামুনমেয়ের কানে যায়। মধুমালতী বুঝতেও পারে না, না, শুনতে পায় না!

বামুনদিদি রান্নাঘরের দরজার বাইরে এসে দাঁড়ান।

একটু থেমে গিয়ে বলেন, কার কথা বলছ গো। তা মধুরই তো সব ছিল। এখনও তাই মধুই সব। লক্ষ্মীটি বল, গিন্নি বল, মেয়ে বল, মা বল, মধু না হলে সব অন্ধকার হয়ে থাকত। ও হ'ল মা-দুর্গা। ওদের মা।

বামুনদিদির উক্তিতে বিমাতা অপ্রতিভ। প্রতিবেশিনীর দল নীরব।

মধুমালতী ঘাট থেকে স্নান করে আসে। বলে, কি হল মা? এখনও ভাত খাও নি। কত বেলা হ'ল, মাকে খেতে দাও বামুন-মা। আমি একটু জপ সেরেই এখুনি আসছি। তারপর তুমি আমি বসব।

মধু ঠাকুরঘরে, বামুনমেয়ে রান্নাঘরে ঢোকে।

বিমাতা শয়নঘরে ঢোকেন কোলের শিশুটিকে নিয়ে শোয়াতে।

মেয়ে শুইয়ে উমা ভাবেন, তা অনেকটা সত্যি কথাই বলেছে ওরা, মধুই যেন গিন্নি।

কিন্তু মনে মনে মনের সব দিকে তাকান, সংসারের চারদিকে তাকান, আর স্বামীর মুখের দিকেও তাকান। সত্যই মধু ছাড়া সব যেন শূন্য! বামুনদিদির কথাই ঠিক—মধুই লক্ষ্মী, মধুই দুর্গা সব। দশহাতে দশদিক সামলাচ্ছে। নিজের আর ওর কি আছে: আহা! ওই তো তাঁকে ঘরে এনেছে বাপের সুখের জন্য—বাপের বংশ বজায় থাকার জন্য! আহা! ছেলেমানুষ বিধবা মেয়েটি!

উমার জননী-মন কর্তৃত্বলোভী গৃহিণী-মনকে ঠেলে দেয়। বামুনদিদি ডাকে, 'ও বৌদি, খাবে এস গো।'

৫

সমস্যার সমাধান এসে পড়ল অতর্কিতে।

মধুর শরীর ভেঙে পড়ছিল কিছুদিন ধরেই। তার মনের ভিতরের অন্তর্লোকের আশানিরুদ্ধ বেদনাতুর জীবনের কোনও পরিচয় কেউ জানে না। কিন্তু তার মুখের হাসিকে তার হাতের কাজকে মনের অসীম মমতাময় ত্যাগ-স্বীকারকে অকস্মাৎ একদিন শরীর জবাব দিয়ে দিল।

ক্রমে কাজে অবসাদ ক্লান্তি দেখা দিল।

মধুমালতী শয্যা নিলে।

পিতা বিমাতা উৎকণ্ঠিত মুখে এসে দাঁড়ালেন। বামুনদিদি বিচলিত। পরম অনুগত ভাইবোনেরা ব্যাকুল হয়ে বিছানার পাশে জড় হ'ল। পাড়াপড়শীও জমা হ'ল। দীর্ঘ কুড়ি বছরের মধ্যে মধুর এমন করে শয্যা নেওয়া কেউ দেখে নি। মায়ের বিয়োগের দিনও না।

পিতা জিজ্ঞাসা করেন, 'কি হল মা এমন করে শেষভাদ্রে জ্বরে পড়লে? পচা পুকুরে নেয়ে হল কি? সামনে পুজো। আর তোমার জ্বর হল মা।'

মধু জ্বরে আরক্ত চোখ মেলে পিতার দিকে চায়। চিরকালের মতই ঠোঁটে প্রসন্ন হাসির আভাস। কিন্তু চোখের দৃষ্টি বড় বিষণ্ন ক্লান্ত। যেন এতদিন পরে চোখে তার অন্তরের স্বরূপ ফুটে উঠেছে।

ডাক্তার এলেন। পিতাকে ডেকে কি বললেন।

পিতা আবার বললেন, 'গোপাল মেডিকেল কলেজে ভর্তি হল। বলেছিলে এবারে বিয়ে দেবে তুমি।'

মাথার কাছে গোপাল বসে দিদির মাথায় হাত দিয়ে দেখছে। পাশে বিমাতা।

সে ভাইয়ের হাতখানিতে হাত রেখে হাসল। বিমাতার কোলের ওপর মাথাটা এনে বললে, 'তোমরা বিয়ে দিও মা।'

আরও কয়েকদিন যায়। মধুর ভাল হয়ে ওঠার লক্ষণ দেখা যায় না।

রাত্রি জাগে ভাই মা আর বামুনদিদি।

কখনও কখনও পিতা এসে বসেন।

জ্বরের ঘোরে মধু ভুল বকে। ডাকলে কিন্তু ঠিক কথা কয়।

মধ্যরাত্রে পিতা এসে বসেছেন। সে চুপিচুপি বামুনদিকে বললে, 'মা এসেছেন!'

বুঝতে না পেরে বামুনদি বললে, 'কে এসেছে?' দোরের দিকে চায়।

সে সেদিকে না চেয়ে বললে, 'বামুনদিদি, মা এসেছেন। আর ও এসেছে!'

পিতা বললেন, 'তোমার মা শুতে গেছে।'

সে বললে, 'না, ওই যে দাঁড়িয়ে আছেন মাথার কাছে—ওঁরা।'

বিচলিতভাবে পিতা বললেন, 'কে দাঁড়িয়ে আছে? কই কেউ না তো!'

বামুনদিদি বললে, 'জামাইয়ের আর মা'র কথা বলছে।'

এত দীর্ঘকালের বৈধব্য-জীবনের মধ্যে মধুমালতীর মুখে সেই ক'দিনের দেখা ক্ষণিকের চেনা 'ও'—সেই 'মানুষটি'র কথা কেউ কোনোদিন শোনে নি। মাতা-পিতা নয়। বামুনদিদিও নয়। প্রতিবেশীরাও নয়।

বাপ স্তব্ধ হয়ে গেলেন। বামুনদিদি বললেন, 'আর থাকবে না ও।'

মধু শুনতে পেল। বিহ্বলভাবে চেয়ে পিতাকে দেখতে পেয়ে আবার চোখ বুজল। মনে পড়ে গেল কি যেন বলছিল। যা কখনও বলে নি। কার কথা বলছিল?

পিতা উঠে গেলেন ব্যাকুলভাবে।

ভাই এসে বসল।

ভায়ের হাত ধরে সহসা বামুনদিদিকে চুপিচুপি বললে, 'বাবাকে বোলো আমাকে 'আগুন' যেন গোপাল দেয়।'

ভাইয়ের চোখে জল আসে। বামুনদিদিও চোখ মুছে বলে, 'চুপ কর। বাজে কথা বকিস নি।'

সে আবার চারদিকে চায়। কাকে যেন খুঁজছে। কাকে?

ভোরবেলা তার অন্বেষণ শেষ হয়ে গেল।

বিমাতা এসে বসেছিলেন। গ্রাম্য নারীর মতই কন্যাকে জড়িয়ে ধরে বিলাপ করে চেঁচিয়ে কাঁদতে লাগলেন। রোদনরত ভাইবোনেরা ঘিরে দাঁড়াল।

পাড়ার লোক জড় হল। লোকে বললে যেন বামাচরণবাবুর মাতৃবিয়োগ হল।

প্রতিবেশিনীর দল এল। যারা গোপালের মা'র দুঃখে অতি কাতর হয়েছিল তারা চোখ রগড়ে মুছে বললে, যে যাই বলুক, মধু যে এ সংসারের কি ছিল তা লোকে এইবার বুঝবে। জানতে পারবে। অন্য প্রতিবেশিনীরা নীরবে অবাক হয়ে চেয়ে রইল তাদের

দিকে। কে বুঝবে? মধুর বিমাতাও তাদের দিকে বিহ্বলভাবে একটু চাইলেন। কিন্তু তাদের কথা বুঝতে পারলেন না কাকে বলছে।

মহিলা মহল—১৩৭২

একটি সেকেলে লেখক

বন্ধু গল্পের বইখানা ফেরত দিয়ে বললেন, 'মন্দ নয় গল্পগুলো···তবে একটু যেন সেকেলে ধরনের।' একটু থেমে তারপর বললেন, 'অমুকের লেখা কিন্তু বেশ—নয়? পড়েছেন তো?'

বন্ধু খালসা কলেজের একজন প্রফেসার। ইতিহাসের অধ্যাপক। বেশ বড় বড় ঐতিহাসিক প্রবন্ধ লেখেন মাঝে মাঝে। পণ্ডিত মানুষ। বাংলা বইও পড়ে থাকেন অবসর সময়ে।

আর আমি ঐখানকার একটা কম্বল ও কার্পেটের কারখানায় ছোট হিসাবনবিস। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় হিসাব বিভাগের একজন কনিষ্ঠ কেরানী। অবকাশ কালে একটু-আধটু লিখি আর পড়াশুনা করি। ঐভাবেই আমার অবসর যাপন হয়।

বন্ধু নতুন এসেছেন। বিদেশে প্রবাসে বাঙালী দেখলেই আলাপ করতে ইচ্ছা হয়। বাংলা কথা শুনতে এবং বলতে বড় ভাল লাগে। কাজেই মৌখিক আলাপটা প্রায় বন্ধুত্বের সীমায় এসে পড়েছিল। তারপর আবার আমার একটু লেখাটেখা আসে শুনে কৌতূহলী অধ্যাপক আমার গল্প-সংগ্রহের বইখানা পড়তে নিয়েছিলেন।

এখন লেখক হওয়ার একটু বিপদ আছে। সব সময়েই যেন শুনতে ইচ্ছে করে—'বাঃ, চমৎকার লেখা' বা 'বেশ লেখেন তো আপনি' কিম্বা অন্ততঃ 'আপনার এই লেখাটা আমার ভাল লেগেছে' ('খুব' না হোক)।

হেনকালে যদি কেউ অমনি বিরসমুখে নীরবে বইখানা ফেরত দেয় অথবা কোন অনুপস্থিত লেখকের রচনার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে নয়ত আমার বন্ধুর মত সেই সঙ্গে বলে বসে মুরুব্বিয়ানা ধরনে—'মন্দ নয় লেখাগুলো—তবে সেকেলে ধরনের'···

তখন লেখক মানুষটি হঠাৎ কেমন থমকে যায়। কিছু বলবার মত কথাও তো মুখে আসে না। বুঝুন বিপদটা। কি বলব? দেঁতো হাসিও তো আসে না।

আমিও থমকে গেলাম। কি বলি? নিজের লেখার ওকালতি করা যায় নাকি? জানিনে তো। বিশুষ্ক মুখে নীরস হেসে কি যে আবোল-তাবোল বললাম সেই লেখকটির সম্বন্ধে অথবা আর কিছু—তা আর মনে নেই। নিজের রচনার ওকালতি

অবশ্য করি নি।

অবান্তর দু'চারটা কথাবার্তার পর উঠলাম।

কানে কিন্তু ঐ 'সেকেলে' মন্তব্যটি যেন একঘেয়ে বেজে চলেছিল।

বহুদিন বাস করছি পাঞ্জাবে। বাংলাদেশের ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তনশীল আধুনিক সাহিত্যের গতিবিধি কোন ধারায় বইছে, সে তো সব সময় সব পত্রিকা মারফত সুদূর বিদেশে পৌঁছায় না। সামান্য একটু পড়লেও ওয়াকিবহাল হওয়া যায় না।

কিন্তু সেকেলে? কিরকম সেকেলে তাও তো বুঝতে পারলাম না। যে 'সেকেলে' ক্লাসিকের পর্যায়ে পড়ে নিশ্চয়ই তা নয়—এ সেকেলেটা তাহলে কোন বস্তাপচা বট-তলীয় সেকেলে?

মনটা বেশ একটু বিমর্ষ হয়ে গেল।

বিমনা ভাবে খালসা কলেজের একটা পাশের দিকের বাগানের পথে ঢুকে পড়লাম। মনে অন্য ভাবনা আর নেই 'সেকেলে' ছাড়া।

সন্ধ্যে হয়-হয়। গরমের দিন। গাছে জল দিয়েছে মালীরা খুব। পথটাও বেশ ঠাণ্ডা হয়েছে।

হঠাৎ গাছপালার আড়াল থেকে আমার নির্জন বিচরণের পথে দেখা গেল, একটি নীলরঙের একটা পাগড়ি আর একটা সাদা ওড়না মাথায় দুটি বিজন-বিহারীকে। কাছেই একটা গাছেব পাশে দাঁড়িয়ে কথা বলছে।

আমাকে কাছাকাছি দেখতে পেয়ে একটু থমকে তটস্থ ভাবে দাঁড়াল। দুজনেই। ছেলেটির সঙ্গে পরিচয় ছিল। মেয়েটির মুখ চিনি ঐ কলেজে পড়ে, পাড়ারই মেয়ে।

ছেলেটির নাম শার্দুল সিং। সে আমাকে দেখে চিনতে পেরে একটু হেসে অভিবাদন জানাল 'সৎশ্রী অকাল' বলে। 'সৎশ্রী অকাল' অর্থ কালাতীত চিরন্তন সুন্দরের স্মরণ মনে হয়। যিনি 'অলখ নিরঞ্জন' আগোচর নিরঞ্জন পুরুষ। যাই হোক, মেয়েটিও মৃদুস্বরে 'সৎশ্রী অকাল' বললে। আমিও বললাম।

ছেলেটি একটু হেসে বললে, 'বাবুজি, সয়েল (বেড়াতে) করতে এসেছেন? যা গরম আজ।'

আমি হাসলাম। বললাম, 'হ্যাঁ।'

তারা কিন্তু বেশ চকিত হয়ে উঠেছিল যেন। যা হোক তারা অন্য পথে চলে গেল। আমিও নিজের কথা ভাবতে ভাবতে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরলাম আর কোন জায়গায় না গিয়ে।

২

শুনেছি রবীন্দ্রনাথ যে অদ্বিতীয় পুরুষ তিনিও তাঁর সম্বন্ধে বিরূপ বিরুদ্ধ সমালোচনা বা মন্তব্যের কথা কেউ বলতে এলে বা কাগজে বেরুলে শুনতে চাইতেন না, পড়তেনও না। বোধহয় মন বিক্ষিপ্ত তাঁরও হত।

তাহলে আমরা তো কোন ছার।

আর লিখতে বসতে পারলুম না ক'দিন। লেখা আসে না মনে হয় সত্যিই 'সেকেলে' লেখা হচ্ছে।

কাজেই সকাল বিকাল শুধু ঘুরি, ফিরি, পড়ি হয়ত।

আর দুপুরে আপিস করি। সন্ধ্যাবেলায় ঐ খালসা কলেজের নির্জন দিকের পথে বেড়াই। বন্ধুসঙ্গ বাদ দিয়ে চলি একেবারেই।

কিন্তু আমার বিজন বনপথের কোন না কোন খোঁজে কোণে প্রায়ই দেখতে পাই, সেই তরুণ শার্দূল সিংকে আর মেয়েটিকে।

আর তারাও চকিত হয়ে ওঠে। বলা বাহুল্য, বন্ধু-অভিহিত 'সেকেলে' মানুষ হলেও বুঝতে পারি তরুণ তনুমনের তপোভঙ্গের চিরন্তন অতনু দেবতাটির রহস্যময় এক লীলা আরম্ভ হয়েছে খালসা কলেজের বিজন পথে।

তারাও সহজ হবার কথা ভাবে, যেন পড়তেই এসেছে, 'সৎশ্রী অকাল' বলে পুঁথি-পত্র নিয়ে আর এক বিপথ বা পথ খোঁজে। আমিও লজ্জিত হয়ে অন্য পথে না পালিয়ে পারি না।

সহসা একদিন ঐ নীল-পাগড়ি-পরা তরুণ শার্দূল সিং আমার সেই অন্য পথে আমার পাশে এসে দাঁড়াল। আজ আর সঙ্গে তরুণীটি নেই।

থার্ড-ইয়ারের ছাত্র হলেও তখনও তার শিখজনোচিত ঘন দাড়ি-গোঁফের সমারোহে মুখের তরুণ বয়সের সৌন্দর্য ব্যাহত হয় নি। আর চেহারাটি সুশ্রী সুন্দরও বটে।

'কালাতীত'-এর অভিবাদন-বাণী উচ্চারণ করে দুজনে শিষ্টাচার বিনিময় করলাম।

আমি বললাম, 'কি খবর সর্দারজি? কেমন পড়াশোনা হচ্ছে? ফোর্থ ইয়ারে উঠলে তো, এবার কেমন লাগছে?'

সে বিনীত হাসিমুখে বললে, 'হ্যাঁ, বাবুজি। ভালই লাগছে।'

পাশে পাশে ঘোরে। আকাশ পাতাল, আবহাওয়া, গরম, লু সব কথাই শেষ হ'ল। সন্ধ্যাও ঘনিয়ে এল গাছের তলায় তলায়।

সহসা সর্দারজি বললে, 'এক থোড়ি বাত থি, বাবুজি। আর আমাকে সর্দারজি বলবেন না। আমার নাম ধরে ডাকবেন। আমার নাম তো জানেন।'

কি মুশকিল। আমি হাসলাম। বললুম, 'নাম জানি বইকি, কিন্তু তোমার শার্দূল

সিং নামের চেয়ে সর্দারজি-টা ভালোই লাগে বলতে। শার্দুল সিং কি সোজা নাম, বাপরে। তা বাড়িতে তোমাকে কি বলে ডাকে?'

সেও হাসল আমার কথায়, বললে, 'হ্যাঁ, বড় কড়া ধরনের নামটা। খুব তেজওয়ালা নাম কিন্তু। আমাদের দেশে ঐ ধরনের নামের খুব কদর ছিল। যেমন বিক্রম সিং, বীর সিং, জোরাবর সিং। এখন কিন্তু বাঙালী ধরনের নাম দেখা যাচ্ছে অনেক জায়গায়। যেমন সুশীলকুমার, সুভাষচন্দর, বিনয়, সুরেশ। তবে আমাদের তো "দরবার সাহেব" (সোনার মন্দির) থেকে কোন গুরু এসে নামকরণ করে যান। তাই নিয়ম মানা হয় শৌখিন নাম রাখলেও। আমাকে বাড়িতে "কাকা" (খোকা) বলে ডাকে।'

তা আমাদের দেশেও তো ডাকনাম, ভাল নাম, রাশনাম বা 'রাশিনাম' আছে। বাঙালীর ললিত-কোমল মিনমিনে নামগুলো এখন ওদের বেশ পছন্দ হচ্ছে! ভাল। তবে ওদের ওই বিশাল কলেবর আর কেশ-কাঁখ-কৃপাণ-কড়া-কাছেড়া-দাড়িগোঁফ-সুদ্ধু ও-নাম মানাবে কেমন তাই ভাবছি। কেশ, কাঁখ্ (চিরুনি), কৃপাণ, কড়া (হাতের লোহার একটি চুড়ি বা বালা) আর কাছেড়া (একটা অন্তর্বাস) এগুলি শিখধর্মের আনুষ্ঠানিক অপরিহার্য বেশভূষা নরনারী নির্বিশেষে। যা হোক বললাম, 'ও! কি তোমার কথা বল তাহলে শুনি। কোথাও বসবে?'

শার্দুল সিং বললে, 'চলুন ঐ ঘাসটার ওপর বসি।'

বসলাম। শার্দুল সিং একটু দ্বিধাভাবে বললে, 'আমি একটা পরামর্শ চাইছি। আমরা অকালী শিখ জানেন তো? এই যারা নীল পাগড়ি পরে—"দরবার সাহেব" দেখে থাকবেন।

'তা তো দেখেছি আর অকালী শিখ দলের নামও শুনেছি। 'বাবা অটলে'ও (একটি বিশেষ মন্দির) দেখেছি। কিন্তু তোমাদের যে কোন নিয়মকানুন আলাদা আছে তা তো জানি না। তা তাতে কি ব্যাপার হয়েছে?'

তরুণ যুবক শিখ—তার দাড়িগোঁফ-সুদ্ধু মুখ বেশ একটু সলজ্জ হয়ে উঠল যেন। তারপর বললে, 'বাবুজি, ঐ যে মেয়েটি যাকে আমার সঙ্গে রোজ বেড়াতে দেখেছেন—তাকে চেনেন তো?'

'না, এমন চিনি না। তবে পাড়ার মেয়ে, দেখেছি। ওর বাপ তো মিলিটারির একজন বড় অফিসার, না? ওর নাম হরবংশকুমারী—নয়?'

'হ্যাঁ, কুমারী নয়, কওর। হরবংশ কওর-ই ওর নাম। ওর সঙ্গে আমার অনেক-দিনের চেনা…।'

কুমারী আর কওরে কি প্রভেদ তা নিয়ে আর মাথা ঘামালাম না।

বললাম 'তারপর ?'

সর্দারজি আবার তরুণ নবীন দাড়িগোঁফের আড়ালে লাল হয়ে উঠল। তারপর বললে, 'তা আমরা বিয়ে করতে চাই। কিন্তু এখন তো "অকালী দল" আর সাধারণ শিখদের মধ্যে দলাদলি বড়ই বেড়ে উঠেছে। তাতে বাবা আবার অকালী দলের একজন চাঁই। কিন্তু বাবার এ বিয়ে হলে অমত হয়ত হবে না। কিন্তু হরবংশের বাবার মোটেই মত নেই এই ধরনের কুটুম্বিতায়। ওরা অবশ্য জানে না। কিন্তু ওদের কথাবার্তায় সেই আভাস পাওয়া যায়—হরবংশ বলেছে।'

'সে কি ? তোমাদের শিখধর্মে তো কোন জাতি বা শ্রেণী মানা অবধি নেই। তা আছে সত্যি এত ভেদাভেদ ?'

'আগে তো এত ছিল না। ক্ষমতা নিয়ে দলাদলি বড় বেড়েছে এখন।'

'তা কি করতে চাও ?'

'তাই জিজ্ঞাসা করছি আপনি কবি মানুষ (ওসব দেশে এখনও অনেক জায়গায় লেখক হলেই "কবি" বলে অভিহিত হন), আপনি কিছু পরামর্শ দিতে পারেন কি ! হরবংশ তো বলে, এ বিয়ে না হলে, ও অন্য কোথাও বিয়ে তো করবেই না, ওর বাবা যদি জোর করেন সে আত্মহত্যা করবে।'

'তুমি কিছু ব্যবস্থা কর।'

'তা আমি তো এখন পড়ি মাত্র। বাবা আছেন বটে, কিন্তু রোজগার না করলে জোর করে বিয়ে করিই বা কি করে ? এদিকে হরবংশের বাপ কি করে কানাঘুষোয় জানতে পেরেছেন—শীগ্গির বিয়ে দেবার চেষ্টা করছেন। ও আবার তাঁর একমাত্র মেয়ে। তার উপর মা নেই ওর ছোটবেলা থেকে।'

কবিমানুষ আমি তো ভাবনায় পড়লাম। গল্পটল্প লিখি, পড়ি বটে। হয়ত প্রেমের কথাও থাকে তাতে। কিন্তু বয়স হল চল্লিশের কাছাকাছি, আজও বিয়ে করি নি বা করতে পারি নি। করব কিনা জানিও নে। এই 'লয়লামজনু' ভাবিত প্রেমের আমি কি বুঝি যে তাকে একটা 'উচক্কা' পরামর্শ দেব। 'লায়লা-মজনু'র গল্প পাঞ্জাবে কেন সারা হিন্দুস্থানে না জানে কে ? সেক্সপীয়রের রোমিও-জুলিয়েট আর লায়লা-মজনুর প্রেম আর দুইয়ের পরিণাম একই।

কি বলি ? বললাম, 'আচ্ছা ভাবি সর্দারজি। তবে তুমি বলছ তোমার বাড়িতে এ বিয়েতে অমত হবে না। তোমার বাবা-মার মত আছে ?'

সর্দারজি বললে, 'আমার মাকে বলেছি। তিনি হরবংশকে দেখেছেনও। বাবার মত মা করিয়ে নেবেন যদি ওঁরা বিয়ে দেন। আর ওর বাবার তো অনেক টাকা সম্পত্তি আছে—মিলিটারিতে মস্তবড় পদে ছিলেন—এখনও মোটা পেনসন পান—সেটা

কম কথা নয়।'

ভারি খুশির কথা তাহলে তো। 'বাবা-মাকে বল কোনও বন্দোবস্ত করতে, সেই ভাল হবে।'

'কিন্তু বিয়েটা হবে কোন্‌খান থেকে? অবিশ্যি হরবংশের একজন মাসী আছে, সে আমার মার "সহেলী" (সই)। সেখান থেকে হলে হয়ে যেতে পারে। কিন্তু ওর বাবা আর বাড়ির লোকেরা একেবারে ক্ষেপে যাবেন।'

শার্দুল সিং বিমনা ভাবে বসে থাকে। বলে, 'আপনাদের একটা ছবি "দেবদাস" আমরা একবার দেখেছিলাম। ফির পার্বতী কা এক বুঢ্‌ঢাকে সাথ সাদী হুয়া। হায় হায়। এ ছবি হরবংশও দেখেছে। লয়লা-মজনুর কাহিনীও তো জানেন। হরবংশ যদি জান নিকাল (আত্মহত্যা) দেয়…'

মনে মনে হেসে ফেললাম, বললাম, 'না না, দেবদাস হল গল্প। লয়লা-মজনুর কাহিনীও বোধহয় গল্পই। ওসব কেন ভাবছ তোমরা। তোমার মা যেন তাঁর সহেলীর সঙ্গে পরামর্শ করে শুভ কাজটার ব্যবস্থা করে ফেলেন।'

'তার পর? ওর বাবা ওকে যদি ত্যাগ করে দেন? বড্ড সেকেলে ধরনের শিখ ওঁরা। আজকালকার "জমানা" ওঁরা বোঝেন না।'

'ত্যাগ করার ভয় কর না। আমি তো তাঁকে পাড়ায় দেখেছি, তিনি মেয়েকে ভীষণ ভালবাসেন। মাতৃহীনা একমাত্র মেয়ের উপর রাগ করে ক'দিন থাকতে পারবেন? মেয়ের বাচ্ছা হলেই ভুলে যাবেন। আর তোমাদের তো জাতকুল যাবার ভাবনা নেই। ওঁর তো আর কেউ নেইও।'

কলেজের গেট পার হয়ে পথে পড়লাম। দেখি, সামনে পথের ওপারে রঙীন চুন্নী বা ওড়না মাথায়, সুন্দর দামী সেলাওয়ার কামিজ পরা হরবংশ কওর কার সঙ্গে কথা বলছে। কিন্তু চঞ্চল উৎসুক দৃষ্টিটা খালসা কলেজের দিকেই বার বার পড়ছে।

আমি বুঝলাম শার্দুলের জন্যেই সে অপেক্ষা করছে। 'সৎশ্রী অকাল' বলে আমি নিজের পথ ধরলাম।

প্রশস্ত রাস্তার ধারে একটা তুন্দুরখানায় বা হোটেলে, যেখানে আমি প্রতিদিন খাই, সেখানে একটা গ্রামোফোন-রেকর্ডে গান দিয়েছে তখন—"থোড়ি থোড়ি বাত হোগী… থোড়া থোড়া প্যার হোগা…ছম্‌-ছমাছম্‌-ছম্‌"—নৃত্যময় গীত। গানটার মানে "একটু একটু কথা হবে…একটু একটু প্রেম হবে"…গায়িকা অন্তরীক্ষে রেকর্ডে নেচে উঠল। তন্দুরখানা বা হোটেলের ভোক্তা ও শ্রোতার দল ভারি খুশী। চিরকালের পুরাতন এই সেকেলে প্রেমের কথার ব্যাখ্যাতে।

ভাবতে থাকি বন্ধুর 'সেকেলে' মন্তব্যটির কথা। প্রেম ব্যাপারটিও তো

চিরকালের সেকেলে।

কিন্তু এখন শার্দূল আর হরবংশের প্রেমকাহিনীই মনকে ভাবিয়ে তুলেছে।

সহসা হাসি পেল। মনে হল, আচ্ছা, শার্দূল সিং হরবংশ কওরকে ডাকবে কি বলে? ঐ বিরাট নামখানি দিয়ে 'বহুদিন মনে ছিল আশা' মেটার পর 'হৃদয়ের সুর দিয়ে নাম ধরে ডাকা'টুকু ওদের কিভাবে হবে?…এই 'হরভজন' 'গুরুবচন' 'ত্রিলোচন' কওরদের ওদের বরেরা ডাকে কি বলে? এত পৌরাণিক নাম সীতা, শকুন্তলা, গৌরী উমা, পার্বতী, লক্ষ্মী, কুন্তী, রাধা…নামের কি শেষ আছে। নাঃ, ওরা এ ধরনের কোন নামই রাখে না।

কিন্তু নিজেই নিজের মনের কাছে লজ্জিত হলাম এরকম হাসি ও প্রশ্নে। নিশ্চয় ওদের প্রিয়জনকে ডাকার মত নাম থাকে, আছে। আর নাই যদি থাকে, তাতেই বা কি? কবির কথাই তো আছে। নাকি—গোলাপ নাম না হলেও, গোলাপ রূপেগুণে সুন্দরই থাকে। 'হরবংশ' 'হরিভজন' বলে ডাকলেও প্রেম বা ভালবাসা তাতে নিশ্চয়ই আটকায় না।

৩

বাড়ি ফিরে এসে দেখি মা'র চিঠি। ছোট বোনের বিয়ে ঠিক হয়েছে। কিন্তু টাকা নেই। টাকার ব্যবস্থা করতে হবে। শীগ্‌গির এস। অর্থাৎ এবারে দেনা-পাওনার হিসাব-নিকাশের পালা—আপিসে নয়, ঘরেই করতে হবে।

ছুটি নিলাম। দেশে গেলাম। এবং দেশে এসে আর মনেই রইল না লেখা বা ওদের কোনও কথা।

তারপর আরও ছুটি নিলাম। এবং মা'র অনুরোধে (?), নাঃ, মিথ্যে বলব না, কিছু ইচ্ছা কিছু দায়ে ও অনিচ্ছায় পড়ে বিয়ে করে ফেললাম। মেয়েটি সাদাসিদে। কিন্তু বঙ্কিমবাবু বলেছেন, 'বাঙালী নিজের স্ত্রীকে পরমাসুন্দরী দেখে'—আমি তত সুন্দরী মনে না করলেও খুবই ভাল মনে হল। এবং বোনের বিয়ের ঋণভারটাও কিছু লাঘব হল শ্বশুরের অর্থে।

পাঞ্জাবী গানের মতে ফুলশয্যাতে 'থোড়ি থোড়ি বাত'ও হল। 'প্যার' (প্রীতি) পরে আসবে গীতকার বলেছেন।

অমৃতসরে ফিরে বাড়িঘর দেখে নতুন সংসার পাততে বিশেষ ব্যস্তও রইলাম। খুশিও হলাম, বলা বাহুল্য।

আর খালসা কলেজে একলা বেড়াতে হয় না।

সন্ধ্যার পর পাঞ্জাবীদের মত সস্ত্রীক বেড়াতে বেরুই, অচেনা পাড়ায় বা পথে দূরে

দূরে। তখনও নতুন বিয়ের উপক্রমণিকা পর্ব শেষ হয় নি তো। 'বাত' বা আলাপ-পরিচয়ের যুগ শেষ হয়ে, 'প্যারের' বা প্রেমের এলাকায় পৌঁছে গেছি।

৪

কোথা দিয়ে কত বছর কেটে গেছে জানি না। এদিকে পুত্রকন্যারও সমাগম হয়েছে বাড়িতে—'প্রবল বন্যা'র মত না হলেও। বিয়ের পরের ঠিক 'বাহা বাহা রে' (কবির ভাষায়) মনের ভাবও নেই আর। এখন আর গৃহিণীর সঙ্গে বেড়াতে বেরুতে পারি না। তিনি রন্ধনশালায়, নয়ত সন্তান-শালায় ব্যস্ত ও নিযুক্ত থাকেন।

আমি বড় ছেলেটিকে পড়াই এবং মাঝে মাঝে তাদেরই কারুকে নিয়ে বেড়াতে বেরোই গরমের সন্ধ্যায়। সেটা পথেই হোক বা খালসা কলেজের বাগানেই হোক।

একদিন বেরিয়েছি। সহসা পথে একটি চেনা-চেনা চেহারার আবির্ভাব হল। কাছে যেতে দেখি শার্দূল সিং। এই ছ'সাত বছরে তার বিরাট বিশাল আকার হয়েছে। মিলিটারিতে বেশ বড় কাজ পেয়েছে—চেহারায় বিশালতা, শ্বশুরের প্রভাব ও শিখ জাতিত্বে। 'দাড়ি-গোঁফ-কেশ, কৃপাণ-পাগড়ি' নিয়ে বেশ গুরুগম্ভীর অফিসার জনোচিত ব্যক্তিত্ব। তার চেহারার বিশালতার কাছে একটি ক্ষুদ্র কারখানার ক্ষীণ ক্ষুদ্র আকারের বাঙালী কেরানী নিজেকে যেন একটি নগণ্য তুচ্ছ প্রাণীর মত মনে হল।

কিন্তু সেও চিনে হেসে এগিয়ে এসে দাঁড়াল। আমিও হাসলাম। সেই পুরোনো 'সৎশ্রী অকাল' অভিবাদনও বিনিময় হল।

সে ভারি খুশি। আমিও খুশি হলাম তার আন্তরিক ভদ্র ব্যবহারে। কেননা শুনেছিলাম সে এখন মস্ত অফিসার হয়েছে। হয়ত খুব পদ সম্বন্ধে সচেতন হয়েছে বা।

সে বললে, 'কোথায় আছেন? সেই বাড়িতেই? চলুন আমার বাড়িতে। বাড়িতে বিবি আছে। মনে আছে তো হরবংশীকে? বেশীদিন ছুটি নেই। শীগ্‌গিরই কাশ্মীর বদলি করবে শুনতে পাচ্ছি। চলুন আমার সঙ্গে। আমার বিয়ের খবর পেয়েছিলেন তো?'

একটু হেসে বললাম, 'মনে আছে বইকি তোমাদের দুজনকে। তা আর তো দেখা হয় নি শেষ অবধি। তোমাদের বিয়ে হয়েছিল সেই মাসীর বাড়ি থেকে, আর দু-পক্ষের বাবাই তোমাদের ওপর বেশীদিন রাগ করে থাকেন নি খবর পেয়েছি। হরবংশ কওর ভাল আছে তো? তার বাবা কোথায়?'

শার্দূল সিং যেতে যেতে জবাব দিল, 'তিনি মারা গেছেন। সেইজন্যেই আমরা এখানে তাঁর সম্পত্তি-বিষয় সামলাতে এসেছি। তিনি আমাদের কাছেই থাকতেন।'

আমি বললাম, 'আচ্ছা, আজ আর যাব না। পরে একদিন যাব, আজ বাড়িতে

কাজ রয়েছে।'

শার্দুল সিং বললে, 'আচ্ছা তাহলে নিশ্চয়ই একদিন যাবেন, একটু কথাবার্তাও আছে।'

আমি হেসে বললাম, 'আবার কি কথাবার্তা? তোমাদের তো সব সমস্যা মিটে গেছে।'

শার্দুল সিংও একটু হাসলে। বললে, 'নিজের না-হয় মিটেছে, কিন্তু অন্যের ভাবনা আছে তো!'

বললাম, 'তোমার আবার অন্য কে আছে?'

সে হাসলে। বললে, 'আছে বাবুজি, আছে।'

কয়েকদিন বাদে একদিন গেলাম শার্দুল সিং-এর শ্বশুরের বাড়িতে। সহসা গিয়েছি। মনে হল ক'জনে মিলে তর্ক-বিতর্ক হচ্ছে। পাঞ্জাবীদের বাড়িতেও সবারই অবারিত দ্বার, আমাদের দেশের মত অনেকটা। দরজাও খোলা। ঢুকে পড়েছি।

দেখি হরবংশ একটা খাটিয়ার ওপর বসে রয়েছে তার ছোট ছেলেকে কোলে নিয়ে। কে বলবে সেই তন্বী রূপসী হরবংশ কওর। এ এক বিশাল-কলেবরশালিনী মোটাসোটা পাঞ্জাবী ললনা। রংটা আরো ফরসা হয়েছে। কিন্তু মুখে গালে চিবুকে এত মাংস লেগেছে যে, না বলে দিলে আমি ঠিক ভাবতাম হরবংশের অন্য কেউ আপনার লোক। মাসী-পিসীদের কেউ!

অন্য আর একটা খাটিয়াতে শার্দুল সিং বসেছিল। তার কাছে একটি অজানা মেয়ে বসে ছিল! আমাকে দেখে যেন তিনজনেই একটু থমকে গেল। হরবংশ বললে, 'আসুন বাবুজি, সৎশ্রী অকাল। কতদিন পরে দেখা হল।'

শার্দুল সিংও পাশে বসল, অন্য মেয়েটি গিয়ে হরবংশের কাছে বসল। তাকিয়ে দেখলাম মেয়েটির মুখটা বিষণ্ণ। দেখতে ভাল। হরবংশ বললে, 'যা বিবি, একটু চা পানি বানা বাবুজির জন্যে।'

বিবি অর্থাৎ মেয়েটি চলে গেল।

হরবংশ বললে, 'বাবুজি, আপনি ঠিক তেমনই আছেন!'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ, কিন্তু তুমি একেবারে খাঁটি পাঞ্জাবী মহিলা হয়ে গেছ। এত মোটা হলে কি করে এই বয়সে? এই সাত-আট বছরে?'

হরবংশ লজ্জিত ভাবে হেসে বললে, 'আমাদের দেশের কথা ছেড়ে দিন। এই তিনটে বাচ্চা হতে এত দুধ ঘি আর গঁদের লাড্ডু ঘি দিয়ে তৈরি করে সকলে খাওয়াল শরীর সারবে বলে যে শরীর একেবারে বন্যার মত ফুলে উঠল। আর কমবার নাম নেই। কি মুশকিলে যে পড়েছি… !'

শার্দূল সিং হাসতে লাগল, 'ঠিক বলেছে হরবংশ। আমাদের মেয়েদের বিশ-বাইশ থেকে চল্লিশ অবধি প্রায় একই বয়স একই চেহারা দাঁড়ায়। বোঝাই যায় না তারা কে কত বয়সের।'

এমন সময় চা নিয়ে এল সেই মেয়েটি—সঙ্গে কিছু 'খতাই' বা নান্‌খতাই—শোন-পাপড়ীর মত একটা মিষ্ট। ওরা ঘরে তৈরি করে প্রায়ই দেখেছি।

এবারে হরবংশ ছেলেটিকে তার কাছে দিয়ে বললে, 'তুই একটু "কাকা"কে নিয়ে খেলা কর, আমি বাবুজির সঙ্গে একটু গল্প করি।'

খানিকক্ষণ আমার স্ত্রী ছেলেমেয়ে নিয়ে প্রশ্নোত্তরের পর শার্দূল সিং হরবংশকে বললে, 'কি বল—বাবুজিকে বলি নানক কওরের কথা?'

হরবংশ বললে, 'সেইজন্যেই তো নানকীকে এখান থেকে সরালাম। ভারি বিপদ হয়েছে বাবুজি এই মেয়েটিকে নিয়ে আমাদের। এই মেয়েটা আমার চাচার মেয়ে। চাচাও মিলিটারিতে ভালো কাজ করতেন। এখন চাচা মারা গেলে এই নানকীকে বাবা কাছে আনেন। চাচী বেঁচে নেই, কিছুদিন হল মারা গেছেন। আর কেউ আমাদের ছিল না। ওকে আমাদের কাছেই রাখতে হয়। ছিলও তাই।'

এবারে শার্দূল সিং বললে, 'এখন আমার অধীন রেজিমেন্টের একটি নীচুপদ সেপাইয়ের সঙ্গে ওর বেজায় ভাব হয়েছে। আমি তো প্রায়ই এখানে-ওখানে ঘুরি, বদলিও হই। হরবংশ ছেলেমেয়ে নিয়ে ব্যস্ত। শ্বশুরও অসুস্থ ছিলেন, মারাও গেলেন। হঠাৎ জানতে পারি যে, ওরা বড় বাড়াবাড়ি ভাবে মেলামেশা করছে…।'

হরবংশ বললে, 'এখন ঐসব দেখেশুনে আমি ওদের নিয়ে এখানে চলে এলাম। ভাল ঘরে বিয়ের সম্বন্ধ করলাম। ওর বাবার অনেক টাকা আছে। বেশ ভাল জায়গায় বিয়ের ঠিকও করেছি, কিন্তু ও একেবারে কেঁদেকেটে রসাতল করছে।'

শার্দূল বললে, 'আর সেই সেপাইটা বা ছোঁড়াটা একেবারে কিচ্ছু নয়। বাজে পরিবারের নিতান্ত জাঠ চাষা ঘরের ছেলে। আমাদের ঘরের মত কুলমর্যাদাও নেই…।'

হরবংশ বললে, 'আসলে কি জানেন বাবুজি, সে তো জানে আমার চাচার টাকাকড়ি বেশ আছে, আর নানকীই সব পাবে। ভালবাসা না আর কিছু! টাকার লোভ তো কম কথা নয়। বোনটা আমার একদম বোকা। সে বলে ইকবাল সিং তাকে খুব ভালবাসে। টাকা না থাকলেও সে ওকে বিয়ে করত।

শার্দূল সিং চিন্তিতভাবে বললে, 'এখন একটা সামান্য সেপাইয়ের সঙ্গে আমাদের ঘরের মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ কি করে করি। ওরা একেবারে গাঁয়ের ক্ষেতখামারওয়ালা চাষা জাঠ। হরবংশের পিতৃকুলের মত বড়ঘর তো নয়ই।'

বিরক্তভাবে এবার হরবংশ বললে, 'আমি এ-বিয়েতে মত দিতে পারি না একে-

বারেই। আমি খুব ভাল সম্বন্ধ করেছি সেখানেই বিয়ে দেব।'

দুজনেই এবারে চুপ করে আমার দিকে চাইল।

শার্দুল সিং বললে, 'শুনলেন তো সব বাবুজি। কি করতে পারি কিছু পরামর্শ দিতে পারেন?'

বাবুজি অর্থাৎ আমি কি আর বলব, শুধু ছ'সাত বছর আগের ওদের দুজনের কথাই মনে পড়ল। কিন্তু নিজেদের কথা তো নজীর দিলে ওদের মনঃপূত হবে না।

বললাম, 'ছেলেটিকে দেখেছ তো? লেখাপড়া জানে?'

শার্দুলাবলল, 'হ্যাঁ, দুটো পাস করেছে। কিন্তু খুব ছোট পদে আছে।'

'তা পরে তো উন্নতি হতে পারে গ্রেড অনুসারে। বাপ মা বাড়িঘর কেমন?'

হরবংশ তিক্তভাবে বললে, 'একেবারে গেঁয়ো। নিজেরাই ক্ষেতেখামারে কাজ করে। আমাদের বাড়িতে এলে বসতে-দাঁড়াতেও শেখাতে হবে।'

শার্দুল বললে, 'এরা বড় আধুনিক হয়ে উঠেছে। বড় বাড়াবাড়ি মনে হয়। খানদানী বলে একটা জিনিস আছে তো!'

আমি একটু হাসলাম, একেলে হওয়ার কথায়। ওদের কথাই মনে পড়ল আবার। বললাম, 'ছেলেটি তো মূর্খ নয়—পদেও উন্নতি হবে। তোমরা কিছুদিন অপেক্ষা করে দেখ না। যদি তোমাদের মন বদলায়—বা নানক বিবিরই মন বদলে যায়। জোর-জবরদস্তি না করে আর পাঁচটা সম্বন্ধও দেখতে শুনতে দাও।'

ইতিমধ্যে ক্রন্দনশীল 'কাকা'কে নিয়ে নানক কওর এসে দাঁড়াল। সন্ধ্যা তখনও হয় নি। দেখলাম বেশ সুশ্রী সুন্দরী মেয়েটি। ছিপছিপে গড়ন। মুখটা চিন্তিত ও বিমর্ষ বটে, কিন্তু সেজন্যই দেখতে বেশী ভাল লাগল।

জিজ্ঞাসা করলাম, 'বিবি, তুমি কি পড?'

একটু হেসে সে সলজ্জে বললে, 'এইবারে ম্যাট্রিক দেব।' বোনকে বললে, 'কাকা কাঁদছে—আর আমার কাছে থাকছে না।'

আমি উঠলাম।

শার্দুল সিং বললে, 'বাবুজি আমি তো দু-একদিনের মধ্যে চলে যাচ্ছি। আপনি মাঝে মাঝে হরবংশের কাছে আসবেন।'

বললাম, 'আচ্ছা।'

* * *

আমার গল্প কিন্তু এখানে শেষ হয়ে গেছে। পাঠক-পাঠিকাদের উপর ভার দিলাম তাঁরা কল্পনা করে নেবেন শার্দুল সিং-হরবংশকুমারীর মত ইকবাল সিং-নানক কওরের প্রেমের পরিণতি হল, কিম্বা নানক বিবি দুর্ধর্ষ নির্দেশে আর কোন সম্ভ্রান্ত সিংজির সঙ্গে

বিবাহিত হয়ে সুখে-স্বচ্ছন্দে ঘরকন্না পাতল এবং ইকবাল সিং সামান্য সেপাই থেকেই একটি জাঠ কন্যাকে বিয়ে করল।

কিন্তু আমি যেন ওদের ও আমার নানা ভাবনা ও কল্পনার জঞ্জালের মাঝে আমার লেখার উপর বন্ধুর 'সেকেলে' মন্তব্যটির অকস্মাৎ একটি জবাব পেয়ে গেলাম।

সেটা হচ্ছে এই—মানুষ কত শীঘ্র 'সেকেলে' হয়ে। আশ্চর্যভাবে মনে হল, এই সেদিনের হরবংশ ও শার্দুল সিং-এর আধুনিক প্রেম করা—সেকেলে মতামতকে গোঁড়ামি বলা, নিজেদের কত একেলে ভাবা মন···আজ ইকবাল-নানক বিবির প্রেমকে বড়ই আধুনিক অনাচার ভাবছে।

মানুষের 'সেকেলে' হতে তবে ক'বছর লাগে? আশ্বস্তভাবে মনে হল তাহলে হয়ত সেকেলে ও একেলের মধ্যে সময়ের বেশী ব্যবধান নেই।

তাহলেও বন্ধুকে আর এ-গল্পটা দেখাবার দরকার নেই।

বসুধারা—আষাঢ়, ১৩৬৭

তেপান্তরের মাঠ

শৈলর একতলার শোবার ঘরের জানলা দিয়ে নীচে চাইলে দেখা যায় শুধু গলির একটুখানি টুকরো; আর ওপরে চাইলে দেখা যায়, এক ফালি মেঘ বা কুয়াশা কি নক্ষত্র-ভরা নীল আকাশ; তেপান্তরের মাঠও নয়, মাঠের ওপর রাজপুত্রের ঘোড়াও নয়, দিগন্তরের দৃশ্যও নয়। কিন্তু চোখ বুজলেই একটা তেপান্তরের মাঠ আকাশ বাতাস গলিপথ ভরে জেগে ওঠে।

কিন্তু সে মাঠে রাজপুত্রের স্বপ্ন সে কোন দিন দেখে না, কেননা সে রাজপুত্রের গল্পই শোনে নি ভাল করে কখনও। বিধবা মায়ের একমাত্র মেয়ে, যাকে নিয়ে বাড়িসুদ্ধ সকলের প্রকাশ্য এবং জননীরও স্বগত ধিক্কারের অবধি ছিল না,—যদি ছেলে হত! ছেলে হলে কি হত, তা অবশ্য জানা নেই, কিন্তু বিয়ে দিতে তো হত না। না, শৈল বিধবা নয় চিরকালকার গল্পের প্লটের বিধবার মতন, শৈলর বিয়ে হয় নি। বয়স এবং রূপ? বয়স একটা বিয়ের বয়সের সীমায়ই ছিল—ষোল থেকে চব্বিশ পর্যন্ত হতে পারে, যাই হোক। রূপ? রূপ শতকরা পনরোজন মেয়ের যেমন চেহারা হয়, তেমনি ছিল। অর্থাৎ বাংলার 'পাঁচ'ও নয়, আবার অলোকসামান্য অপরূপও নয়। ঘষলে মাজলে যাকে রূপ বলা চলে, আর না হলে একরকম থাকে। শৈল বিয়ের কথা ভাবতে শেখে নি, কেননা সে জানত (সেটা সে শুনে শুনে বুঝেছিল), আর পাঁচটা ব্যবহার্য জিনিসের

মত স্বামী সংগ্রহ করতেও খরচা লাগে। জিনিসটা একটু বেশি দামীও। পয়সা না থাকায় আর পাঁচটা বিলাসের মতন স্বামীর বা বিয়ের বিলাসের ধ্যান শৈল করে নি। অন্তত সচেতন মনে করে নি।

সবাই হয়ত ভাববেন, ওর কি তা হলে কেউ ছিল না? ছিল নাই তো। শাস্ত্রো-লিখিত রক্ষণাবেক্ষণ করবার অধিকারী তিনজনের মধ্যে পিতা তো শৈশবে গত হয়েছিলেন, পতির কথা তো বলছিলামই—হন নি, আর পুত্রের কথা তো উঠেই না। আর মাও বাল্যেই অর্থাৎ দশ বছরের মেয়েকে রেখেই গত হয়েছিলেন। শাস্ত্র আর কোন অভিভাবকের কথা উল্লেখ করে নি। কিন্তু শ্লোকের শেষের লাইন অনুসারে জ্যাঠতুতো ভাইয়ের সংসারে ছিল। নিয়ম করে দুবেলা খেত, বছরে দুখানা কাপড় আর চারটে শেমিজ পেত। সকালের রান্না সেরে বেলা দুটোয় এসে ঘরের কোণটিতে শুয়ে আকাশের পানে চাইত, আবার পাঁচটায় আগুন পড়লে রান্নাঘরে ঢুকে রাত্তির পৌনে এগারোটায় ছাড়া পেত।

বাড়ীর কর্ত্রী ছিলেন বিধবা দিদি। তিনি ওর মায়ের চেয়েও বয়সে বড় ছিলেন। আর তিনজন বোন আর ক'টি ভাজ। তারা কেউ ওর চেয়ে ছোট, কেউ বা বড়, মেজবউ, বড়বউ, তাদের সব ছেলে মেয়ে, কারুর তিনটি, দুটি, চারটি। জ্যাঠতুতো ভাই দুজন। ছোট যারা, 'শৈলদি'ই বলে; অমান্য তারা প্রকাশ্যে কেউ কিছু করেন না।

কিন্তু শৈল একদিন দিদিকে কাকে বলতে শুনেছিল,—সে বুঝি জিজ্ঞেস করে, ও মেয়েটি কে?

দিদি বলেন, ও? ও এই একজন।—বলে একটা মুখভঙ্গি করলেন। সে বললে, আহা, বিধবা?

দিদি বললেন, মূলে মা রাঁধে নি, তার আবার পান্তা! জ্বালাস নি—বিয়ে হবে, তবে না বিধবা!

বিধবা হলে একটা সুবিধা ছিল—কৈফিয়ৎ দেবার বিড়ম্বনা থাকত না, উপরন্তু আশ্রয়দাতৃত্বের উদারতার মর্যাদাও লাভ করতেন। প্রশ্নকর্ত্রী প্রসঙ্গান্তর চর্চায় মনোনিবেশ করলে। শৈল রান্নাঘরে বসে খুন্তি দিয়ে উনুনের অনেকখানি অনাবশ্যক মাটি চেঁচে দিতে লাগল। ও কথাতে অভিমান দুঃখ করবার মতন ভরসাও ওর নেই; ভাববার, কথা কইবারও ওর কেউ নেই। মাটিগুলো ঝরে ঝরে উনুনটা বেশ সুশ্রী হয়ে উঠতে লাগল। শৈল খানিকক্ষণের জন্যে সেই কাজই যেন করছিল—এমনই মনে হল, দিদির কথাটা যেন অবান্তর।

গল্পের বইয়ে পড়া যায় যে, কত মহাপ্রাণ যুবক, সদয় তরুণরা ঐ রকম অনাথাকে একেবারে উদ্ধার করে সমাদরে বরণ করে নিয়ে যায়। তা যায় হয়ত। কিন্তু শৈলর

জ্যাঠতুতো ভাইদের শালারা, বন্ধুরা ভাইফোঁটায় এসে কত রকম খাবার, এমনই বেড়াতে এসে ডিমের সিঙাড়া, মাছের কচুরি, কত কি বিশিষ্ট নোস্তা মিষ্টিও তৈরিই খেয়ে যায়। খেয়ে বোনের ননদদের, বোনেদের জয়জয়কার করে। শৈলর আঁচলখানি রান্নাঘর থেকে দেখা যায়—শৈলকেও ; কিন্তু এ তো আর গল্পের বই নয়।

শৈলও শুধু ভয়ে ভয়ে ভাবে, যদি নুন বেশি হয় কচুরিতে বা কম হয় তো কি হবে? যেন পৃথিবী রসাতলে যাবে। হল, হলই বা বেশি। কিন্তু ও কেবলই ওই রকমই ভাবে।

কিন্তু ওরা খেয়ে বলে, বাঃ, চমৎকার দিদি! কে করেছে?—'আপনি', নয়ত 'তুমি'?

কথার উত্তর না দিয়ে দিদি এবং বোনেরা সহাস্যে বলেন, নে না আর ছুটো ; কিই বা খেলি? বাড়ি গিয়ে না হয় আজ খাস নি।

সেদিন না হয় ওঁরা করেন নি, কিন্তু শৈল শিখল কার কাছে? শৈল জানত কি? আজকে ও করেছে বটে, কিন্তু শেখা? সেটা তো মানতে হবে। সে হিসেবে ধরতে গেলে ওঁদেরই করা।

শৈল 'চমৎকার' শোনে, ভাবে, বললেন বুঝি, শৈল করেছে। কিন্তু কিছুই আর শোনা যায় না।

তা হোক, রান্না ভাল হয়েছে তো? তা হলেই হল। ওর চেয়ে বেশি আশা শৈলর মনেই জাগে না।

দোতলার ওপরে জ্যাঠতুতো ভাইদের শোবার ঘর, তারা গল্প করে, গান গায়। ওদের ঘরের পাশ দিয়ে পা টিপে টিপে শৈল রাত্তিরে এক একদিন দোতলায় ওঠে। কিন্তু দোতলায় স্বর্গের ধ্যান সে করে না। ওর বুকের বালিকা শৈল এখনও মনকে রূপকথা বলে ভোলায়। সেদিন ওর আকাশটা বড় হয়ে যায়। এক আকাশ তারাসুদ্ধ যেন হাসিতে ভরা কার মুখ ওর পানে চায়। তারা যেন ওকে রূপকথা বলে, যে রূপকথা ও মার কাছে শোনে নি, যা তিনি শেষ করে বলেন নি, যা কেউ বলে নি কখনও। ভাই, আর পারুল বোনটি। ওর যদি একটি ভাই থাকত! শৈল শুয়ে শুয়ে স্বপ্ন দেখে। তেপান্তরের মাঠ কি রকম দেখতে হয়? শৈল বই বেশি পড়ে নি, মানে ও সব কথার মানে জানে না। ভাবতেও খুব গুছিয়ে পারে না, হিংসে করতে পারে না, রাগ করতে ভরসা পায় না, কাঁদতে অভিমান করতেও পারে না, ও শুধু ভয় পায় সবাইকে। কেউ কিছু বললে ও শুধু ফ্যালফ্যাল করে চায়। ভুলে যায়। রাস্তা নিঝুম হয়ে গেল, পথিকের যাওয়া-আসা ক্রমশ কমে এল, পাশের বাড়ির বুড়ো কর্তা কেবলই কাসেন। পাড়ার বাড়ির আলোগুলো নিভে আসে, ওর চমক ভাঙে, ও আবার তেমনই নেমে আসে।

দোতলার ঘরের কাছে একটু দাঁড়ায়। বউয়েরা সবিস্ময়ে বলে, কি শৈল ঠাকুরঝি?

ভদ্রলোকেরা একটু হাসলেন শৈলর বোধ হল, কিন্তু ও তো মুখ তোলে নি। পরীক্ষা হয়ে গেল। বোবা নয়, নাম বলতে পারে; খোঁড়া নয়, চলতে পারে। আর কানাও নয়, চোখ দুটি পদ্ম-চোখ না হোক, পরিষ্কার দুটি চোখ।

ওঁরা বললেন, নিয়ে যান। ও চ'লে আসতে আসতে শুনলে, দাদারা বলছেন, বোনটি আমাদের খুব কাজকর্ম পারে—ইত্যাদি। ভেতরে এসে কাপড়-চোপড় ছেড়ে তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে ঢুকল ভাতের ফেন গালতে। তারপর সব দাদারা ভেতরে এলেন, দিদি বললেন কি হল, পছন্দ হল? জবাব এল, না! ওরা বললে, বড় ছোট মনে হচ্ছে। ঐ বুড়ো ভদ্দরলোকটিই বিয়ে করবেন কিনা—মাস কতক হ'ল স্ত্রী গত হয়েছে, চারটি ছেলে তিনটি মেয়ে—সুন্দরীগাঁয়ের স্টেশন-মাস্টার। একটু বেশি বড় চান—আমার কেমন ভুল হল, নইলে বয়স ওর কুড়ি হ'ল না? তা আবার খবর দেব। কিছু দিতে পারলে হ'ত। দিদি বললেন, ও: তা আর কোথায় পাবি? ভাজেরা বরের বর্ণনায় মুখ টিপে হাসলে।

কিন্তু আর তাঁরা খবর দিলেন না এবং বরের বা স্বামীর কথায় নিজের সম্বন্ধে প্রৌঢ় ভদ্রলোক ছাড়া আর কারুরই কথা মনে আসে না, আর মনে হ'লেই কেমন ওর হাসি পায়, ও ভেবেছিল যে, তিনি 'মা' ব'লে কথা কইবেন। যথাসময়ে বোনদের বিয়ে হয়ে যেতে লাগল, তা যাক। শৈলর নীল আকাশটুকু ঝাপসা হয়ে গেল; চোখের সামনে জেগে ওঠে প্রকাণ্ড দিক-দিগন্তহীন প্রান্তর—বাংলা দেশের মাঠের মত সবুজ নয়, শ্যামল নয়—এ মাঠ শৈল কখনও দেখে নি, এই যেন সেই তেপান্তরের মাঠ। অনেক দূরে এক দিকে পাহাড়ের সারি, বেঁটে বেঁটে বাবলাগাছ এখানে ওখানে, আর শুধু পুরীর বালির মত ধু ধু-করা বালি। যেদিকে তাকায়, সুমুখে পাহাড়ের ওপারে সাদা কি দেখা যায়—যেন বাড়ির মতন, সমতলে পেছনে দূরে মেটে ঘর। কোন্ দিকে যাবে, শৈল ভাবে। কিসের জন্য তা ও জানে না, শুধু ভাবে, আগে ঐ মন্দিরের দিকে যাবে—না কোথায় যাবে, কোন্ পথে এল তাও বোঝা যায় না। পাহাড়ে প্রান্তরে আকাশে আর অমিল নেই—সমস্ত শূন্য ভরে তারা ওরই পানে চেয়ে আছে শুধু।

ও দিদিমণি, আকা যে পুড়ে খাক হয়ে গেল, কত ঘুমতে লেগেছ গো দিনের বেলায়!—পরিষ্কার কাংস্যকণ্ঠে ঝির আহ্বান কানে এল।

শৈল ধড়মড়িয়ে উঠে বসল। দিদির গলা শোনা গেল, সকালে তিনমণ কয়লা পুড়বে, সন্ধ্যেয় দু-মণ পুড়বে তবে ঘুম ভাঙবে, অমনি! শৈলির দিনেও কি মড়ার ঘুম!

অপ্রতিভ শৈল কাপড় কাচতে কলতলায় গেল।

দুধ, বার্লি, সাগু, তারপর ডালের পরে ভাত, তারপর চচ্চড়ি, ডালনা, মাছ, রুটি, লুচি খানকতক। বড়দার বসবার ঘরের ঘড়িতে একটা একটা ক'রে কতগুলো বেজে

যায়। চাকি-বেলুন, হাঁড়িকুঁড়ি ধোওয়া-মোছা হয়। এক এক করে সকলের খাওয়া হয়ে যেতে থাকে। সবাই চলে যায়। ও নিজের ভাত ক'টি নিয়ে বসে। কেউ জিজ্ঞাসা করে না, কি আছে না আছে, সেও কিছু বলে না। সে বলেও না, ভাবেও না—কলটেপা পুতুলের মত কাজ শেষ করে চলে।

রাত্তিরে আবার জানলা দিয়ে নক্ষত্রভরা আকাশ—কোন্ অজানা দেশের রূপকথার বইয়ের পাতা মেলে ধরে ওর চোখের সামনে। ছায়াপথের একটুখানি দেখা যায়। ওর কাছে যেন আকাশ আর পৃথিবী একই—সবই সমান যেন। ওটা যেন আর একটা পৃথিবীর বিস্তৃত প্রাঙ্গণ; রাত্রে তার রোজ দেওয়ালি, সকালে সূর্যের আলোর ধারাস্নান, ওর সাজ নেই তাই মেঘের রঙের উৎসব। কিন্তু তেপান্তরের মাঠটা? কোন্ দিকে? কি রকম দেখতে? আচ্ছা, যদি কেউ ওকে নিতে আসত? রাজপুত্তুর? না, আগেই তো বলেছি, ও সে কথা ভাল করে শোনেই নি। তবে? মৃত্যু? না, ওর অভিমান নেই, রাগ নেই, কষ্ট নেই, ও শুধু সবাইকে ভয় করে, তাও শান্তভাবে, মৃত্যুকেও সে ভাবে না, মরণের মত অভিমান ওর মনে জাগেই না। তবে কে নিতে আসবে? তা সে জানে না। রাত্তিরের আকাশের ঝিকমিকে হাসিমুখ তার চোখের সামনে ঝাপসা হয়ে আসে, ঘুম-চোখে শৈল তেপান্তরের মাঠের একখানা ছক খুঁজে খুঁজে বেড়ায় যেন সব জায়গায়—যদি পার হতে পারে।

জয়শ্রী—অগ্রহায়ণ ১৩৩৯

মণিকর্ণিকা

হায় হায়, এ জান না? ব্রাহ্মণের মেয়ে—হিন্দুর মেয়ে! লোকে বলবে কি! এমন জানলে বুঝি আমি বিয়ে করতুম!—নৌকো বেশ স্রোতে চলেছে, স্বামী কপট গাম্ভীর্যে বললেন।

দশাশ্বমেধ ঘাট ভরা স্নানার্থী-স্নানার্থিনী। ঘাট থেকে মাঝে মাঝে একটা একটা নৌকো করে যাত্রীরা দেবদর্শনযাত্রায় বেরুচ্ছে।

স্ত্রী বললে, আচ্ছা আচ্ছা, না হয় ব্রাহ্মণ্যের একটু শিক্ষা স্বামীর কাছেই পেলাম। তোমার পুণ্যি ক্ষয় হয়ে যাবে না। জান, শাস্ত্রে বলে 'সস্ত্রীকো ধর্ম্মমাচরেৎ'। আমি জানলে তোমারই ভাগ ভারী হতে পারবে।

এদিকে তো দেখছি শাস্ত্রের জ্ঞানও আছে!

আহা, বলই না, কেবল জ্বালাতন করবে!

আচ্ছা, শোন। সুপুরি-টুপুরি নেই ?

কেন কি হবে? খাবে? আনি নি তো। এ তো মাঝ গঙ্গায়, আগে মনে করতে হয়।

হায় হায়, এত করেও কথা শুনতে হয় যে !

যাও! বলতে হবে না। এবারে স্ত্রী রেগে গেল।

আহা, শোন শোন, এবারে সত্যি বলছি, শোন। ভাল করে পা ঢাকা দিয়ে তবে বস, খানিকক্ষণের জন্যে অন্তত গুরুজন বলে মনে কর।

স্ত্রী মুখটা গম্ভীর করে বসে রইল।

পুরাকালে একটা এক গ্রীষ্মকালের সিতযামিনীতে দেবাদিদেব মহাদেব ভগবতী পার্বতীর সঙ্গে এই বারাণসীধামে ভাগীরথীতীরে সলিল-সিক্ত স্নিগ্ধ বায়ু সেবন করছিলেন। এই যেমন আমরা আজ সকালে—

আহা, কি বুদ্ধি! ঠাকুর-দেবতার কথার সঙ্গে নিজেদের কথা কইলে অপরাধ হয় না ?

হয় বুঝি ? ও, আচ্ছা শুধু বলছি, শোন।

অতঃপর রাত্রির গভীরতার সঙ্গে স্নিগ্ধতা লাভ না করে গ্রীষ্ম উত্তরোত্তর পরিবর্ধিত হতে লাগল। বারাণসীর গরম দেখছ তো , সেবার আদি-দম্পতি কৈলাসের শৈলাবাসে যান নি।

আবার! এমনি যদি কর তুমি, চাই না শুনতে ; আর যেন কালী সিংহীর মহাভারত পড়ছেন !—স্ত্রী রাগ করে মাঝির দিকে মুখ ফিরিয়ে বসল।

তুমি কালী সিংহীর মহাভারত পড়েছ ? শুধু এইটেই পড় নি ? আচ্ছা আচ্ছা, রাগ কর না, ভাল করে বলছি। কিন্তু ও হতভাগা কি তোমায় মর্ম বুঝবে, এই দিকেই অনুগ্রহ-নেত্র পাত কর।

তারপর—এদিকে স্বামীর সঙ্গে সপত্নীকে নৈশ-সমীরণ সেবন করতে দেখে গঙ্গা গরম হয়ে উঠেছিলেন ; বুঝতে পার আশা করি, অবশ্য তোমার সপত্নী নেই।

স্ত্রী সকোপে গঙ্গার স্রোতের দিকেই চেয়ে ছিল ; কথা কইলে না।

সুতরাং, সমীরণ যে স্নিগ্ধ না হয়ে উত্তরোত্তর 'লু'বৎ হয়ে উঠছিল, বলাই বাহুল্য। তখন ভূতভাবন ভগবান ধূর্জটি মহাদেবীকে বললেন, দেবি, বহুক্ষণ বিচরণ-ক্লেশে তোমার যথেষ্ট শ্রান্তি হয়েছে এবং গ্রীষ্মটাও কিছু উৎকট প্রকারের। অতএব যদি অনভিপ্রেত মনে না কর, তা হলে আমরা স্বচ্ছশীতলা ভাগীরথী-সলিলে কিয়ৎকাল অবগাহন করে শ্রান্তি অপনোদন করি।

দেবী তোমার মতন ভ্রূভঙ্গি করে বললেন, না, ঘাটে তোমার প্রেতরা রয়েছে, আমি

তাদের সামনে অবগাহন করব না। আসলে ভগবতী গঙ্গা কিনা দেবীর সপত্নী, তাই স্বামীকে তাঁর স্পর্শ লাভ করতে দিতে ইচ্ছে হচ্ছিল না।

টীকাটি কি কথক-ঠাকুরের স্বরচিত?—স্ত্রী একটু হাসলে।

বাঃ, বেশ তো কথা কইতে জান! নাঃ, টীকা আমার কেন? কেন, তোমাদের মনের কথা কে না জানে? এই সেদিন ওদের চায়ের আর পানের সুখ্যাতি করলুম, অমনই তুমি আর সেখানে গেলেই না।

সে কি, আমার সতীন?—স্ত্রী হাসলে। কি কথার বাহার? আমাকে তো আর ভূতে পায় নি যে, যাকে তাকে হিংসে করতে যাব! আর সে তো কত বড় আমার চেয়ে! বল, তারপর? এমন বাজে বকতেও পার!

স্বামী ঈষৎ হেসে বললেন, ওঃ, তোমার বয়সী হলে বুঝি করতে?

স্ত্রী উত্তর দিলে না।

শোন, ভূতনাথ শঙ্কর তখন ভাবতে লাগলেন। হঠাৎ কল্পনা স্থির হয়ে গেল। যোগবলে একটা ছোট্ট জলাশয় সৃষ্টি করে ফেললেন গঙ্গার ধারে, তারপর তো তাঁরা দুজনে স্নান-টান করে নিলেন। রাত্রি প্রায় তখন শেষ হয়ে এসেছে। পার্বতী ঘাটে উঠে মাথা মুছতে গিয়ে হঠাৎ বললেন, আমার কর্ণিকা? সেই যে মণি দেওয়া দুটোই তো পারছিলাম, মা দিয়েছিলেন সেবারে।

কর্ণিকা কি?—স্ত্রী বললে।

ইয়ারিং গো, কানের তোমাদের।

ভোলানাথ বললেন, কর্ণিকা—পুষ্পেরটা?

দেবী বললেন, আঃ, বড় ভুলে যাও সেই যে মণি দেওয়া জোড়া! ভোলানাথ ভুলেই গিয়েছিলেন, আর জলে নামতেও ইচ্ছে ছিল না। আমরা হলে হয়ত বলতুম, আবার কিনে নিও। কিন্তু সে সময় বোধ হয় কাশীর ট্রেজারি অন্নপূর্ণার হাতে।

যাই হোক, দেবী সিক্তবস্ত্রে চক্রতীর্থের সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে কাঁপতে লাগলেন।

আহা, এদিকে বলা হচ্ছে, গরম 'লু' চলছে!—স্ত্রী ভ্রূকুঞ্চিত করে বললে।

আঃ, শীতে কেন গো, রাগে; শীতেই শুধু বুঝি কাঁপুনি ধরে? না হয় একটু অলঙ্কার দিলাম। যাই হোক, তিনি শুধুই দাঁড়িয়ে রইলেন না হয়, কর্ণিকা না পেলে কাপড় বদলাবেন না। ভগবান ভোলানাথ কি করেন! ফের জলে নামলেন কিন্তু অনেক খুঁজেও পাওয়া গেল না। তখন নন্দীকে ডেকে এই সমূহ বিপদের কথা জানালেন। নন্দী জানত মায় ধাত। সে বুঝিয়ে মাকে কাপড় বদলাতে পাঠিয়ে দিলে; আর ইতিমধ্যে—ভূতভাবনের সব ক'টা ভূতকে দিলে সেই চক্রতীর্থে নামিয়ে।

তারা যার প্রসাদ-আকাঙ্ক্ষায় না পারে এমন কাজই নেই। খানিকক্ষণ পরেই কর্ণিকাটি পাওয়া গেল।

বুঝতেই পারছ, তখন দেবীর সন্তোষ হল এবং দেবাদিদেবের প্রাণ বাঁচল। দেবাদিদেব বুদ্ধিমান দেবতা, ভোলানাথ হতে পারেন। সেই অবধি ঘটনাটি অনেক অভাজনের দৃষ্টান্তস্বরূপ হয়ে থাকতে পারবে বিবেচনা করে চক্রতীর্থ একটি বড় তীর্থ, আর ঘাটটির নাম মণিকর্ণিকা—পুরুষজাতির মধ্যে এই প্রচার করিয়ে দিলেন।

হুঁ, সবই কি অনাছিষ্টি! এত কথা কইতে পার।

আহা, বিনা খরচে কথা শোনা হল তো? না হয় একটু গয়না পরিয়েছি, ঘাটের কথকরাও তো বলে, সেখানে শুনলেও যে একটি পয়সা দিতে হত! আমি বেচারা শুধুই বকে মরলাম।

আঁচল থেকে একটি পয়সা নিয়ে স্ত্রী গলবস্ত্র হয়ে প্রণাম করলে। মাঝি তখন একমনে দাঁড়ের দিকে চেয়ে ছিল।

স্বামী মৃদু হেসে 'এই ভক্তি তোমার অচলা থাক' বলে পয়সাটি কুড়িয়ে পকেটে রাখলেন।

মন্দিরের পর মন্দির, ঘাটের পর ঘাট ক্রমে অতিক্রম করে নৌকা অগ্রসর হতে লাগল।

এটি হল মাতৃঋণ-শোধ ঘাট। একজন ছেলে এই মন্দিরের ঘাট বাঁধিয়েছিল, উৎসবাদির পরই এটি হেলে পড়ল নাকি, লোকে বলে।

খরস্রোতা ভাগীরথী; ওপারে রামনগর, সবুজ ক্ষেত, দূরে ঘন বন। স্বামীর মাঝে মাঝে টীকা শুনতে শুনতে মণিকর্ণিকার ঘাটে নৌকা এসে ঠেকল।

দূরে—দত্তাত্রেয়ের চরণ-পাদুকা মন্দির; সম্মুখে চক্রতীর্থ; চারদিকেই জনতা, পাণ্ডা, শিষ্য, মন্ত্রপাঠ, মন্দির, সিঁড়ি।

ওই দিকে শ্মশান।—স্বামী বললেন। চল এবার বাড়ি।

একটু শ্মশানটায় চল না। চিতায় জল দিতে হয়, ঠাকুমা বলেছিলেন। এখানে নাকি সধবা ছাড়া আসে না। দেখে আসি।

অনিচ্ছুকভাবে স্বামী সেদিকে অগ্রসর হলেন।

সবে একটি মেয়েকে এনে রেখেছে। রাঙাপাড় শাড়ি, টকটকে লাল সিঁদুর কপালে ঢালা, পা দুখানি আলতা-রাঙা। সঙ্গে অনেক লোকজন।

স্বামী চোখ ফিরিয়ে নিলেন। স্ত্রী মুগ্ধ হয়ে, অবাক হয়ে দেখতে লাগল।

কখন কি আরম্ভ হল কে জানে। একটি যুবক, সম্ভবত মেয়েটির স্বামীই হবে, হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে বসে ছিল; তাকে আহ্বান করলে একজন। তার মুখ দেখে

স্বামী শিউরে উঠলেন। তার ওপরেই বোধ হয় অপ্রীতিকর কর্তব্যের ভার—

স্ত্রীও 'মাগো' বলে মুখ ফিরিয়ে নিলে, স্বামী তার হাতটা ছুঁয়ে ডেকে বললেন, চল আর নয়।

নৌকায় বসে আর কোন কথাই মনে হল না কারুর। দুজনেরই দুদিক দিয়ে একই ঘটনা মনে ছবি আঁকতে লাগল—ভয়ে, বেদনায়, আশায়, দুঃখে, বিভীষিকায়।

সাত আট বছর গেছে।

বাপ-মায়ের শরীর খারাপ; তাঁরা কাশীবাস করবেন। ছেলে তাই তাঁদের নিয়ে এসেছেন। একটি বাড়ি কিছুদিনের জন্য নেওয়া হয়েছে। ছেলে দুটি নিয়ে এসেছেন।

ওগো, যাবে আজ? একটি দিন যদি বেরুলে আমাদের সঙ্গে?—স্ত্রী এসে অনুযোগ করলে।

স্বামী টেবিলের কাছে বসে অনেক কাগজপত্র—স্ত্রীর মতে বাজে কাজ—নিয়ে কাজ করছিলেন, মুখ না তুলেই বললেন, তুমি তারকের সঙ্গে যাবার ঠিক কর, লক্ষ্মীটি। এইগুলো আপিসে আজই পাঠাতে হবে।

মণিকর্ণিকায়ও তোমার যেতে ইচ্ছে নেই? ও-ও কি দেখছ?

স্বামী চকিত হয়ে মুখ তুললেন, একবার বললেন, অ্যাঁ? তারপর 'না' বলে মুখ নীচু করলেন।

তুমি যাও ওদের সঙ্গে আজ, আমি তোমাদের সারনাথে নিয়ে যাব'খন।

তা হলে চারু রইল, দেখ, যেন একলা না রাস্তায় যায়।—স্ত্রী বেরিয়ে গেল।

বাবা, ও বাবা, দেখ এটা কি?—খানিক পরেই চারু ছুটে এল, হাতে একটি সুন্দর ছোট কেস। দেখ না কেমন সুন্দর?

বাপ সস্নেহে মুখ তুললেন, কি রে?

জিনিসটি দেখেই মুখ ম্লান হয়ে গেল, একটি সুন্দর কেসে ততোধিক সুন্দর মুক্তোর ইয়ারিং; পিতা কম্পিত অন্তরে সেটা খুলছিলেন।

কোথায় পেলে মা?

ঐ ঠাকুমার বাক্সে ছিল; টাকা বের করছিলেন, আমি নিয়ে নিলাম। এটা কি বাবা? কোথায় পরে?

ওটা? ওটা কর্ণিকা, মণিকর্ণিকা। কানে পরতে হয়।

কার বাবা?

ও তোমার মার।—ব্যাকুল পিতা কাতর হয়ে উঠলেন।

আমি পরব?

পর।

বাপ চুপ করে কাগজের দিকে চেয়ে রইলেন, কথা কওয়া যেন অসম্ভব মনে হচ্ছিল।

তুমি পরিয়ে দাও না!

বাপ আস্তে আস্তে মেয়ের কানে সেটা পরিয়ে দিলেন। কন্যা নতুন গহনা পরে আনন্দে নৃত্য করতে করতে দাসীকে দেখাতে চলে গেল। বাপের মনে পড়ল—সেই প্রথমা পত্নী, মণিকর্ণিকা দর্শন।

কলকাতায় ফিরে অনেক খুঁজে পছন্দ করে, একটি ইয়ারিং কেনা, তার নামকরণ, তারপর—তারপর তার সাধ মিটে যাওয়া—সেই মণিকর্ণিকার মেয়েটির মতন।

রাত্রি নটা।

স্বামী ওপরে এসে কাপড় পরছেন; কোথায় নিমন্ত্রণ, বন্ধুদের সঙ্গে সব একত্রে যেতে হবে।

খাটে চারুর মা ছেলেকে ঘুম পাড়াচ্ছে। চারু ঘুমচ্ছে।

হ্যাঁ গা, চারুর কানে আজ একটা কি দেখলাম, কিনেছ? কি কর্ণিকা নাকি। ও বললে মার, আমার তো নয়!

খোকা ঘুমিয়েছিল; স্ত্রী তাকে শোয়াতে শোয়াতে মৃদু ভাষণে স্বামীকে জিজ্ঞাসা করলে।

কি চারুর কানে? কই, না, কিনি নি তো কিছু। মনটা ব্যস্ত, মনে পড়ছে না, স্বামী পাঞ্জাবিটার বোতাম আছে কি না দেখছিলেন।

চমৎকার জিনিসটি! ও বললে, মার; তাই ভাবলুম, বুঝি কিনেছ বা। দেখ না, এই যে।—আস্তে আস্তে মেয়ের কান থেকে খুলে নিয়ে স্বামীর কাছে এসে দাঁড়াল।

স্বামীর আর বুঝতে বাকি ছিল না। তিনি নীচু হয়ে পাঞ্জাবিতে লাগাবার জন্যে সোনার বোতাম ক'টা তুলে নিলেন। স্ত্রী এসে সেটা তাঁর হাতে দিয়ে বোতাম ক'টা লাগাতে লাগাতে বললে, কি সুন্দর, না? কবে কিনলে?

ওটা এখন তো কিনি নি, ওটা তার ছিল।—স্বামী সেটি টেবিলের ওপর রেখে দিলেন।

স্ত্রী একেবারে চুপ হয়ে গেল। তার সপত্নীর ওপর ঈর্ষা ছিল না এতটুকু; নিজের তুলনায় সে যে অনেক বেশি আদরিণী ছিল, তাও সে জানত, বুঝতে পারত; আজও তার ওপর স্বামীর গভীর চিরস্তব্ধ গোপন প্রেমের কথাও জানত সে। সেজন্য স্বামীর ওপর বেশি শ্রদ্ধাই ছিল, যা ওকে ভালবাসা দেখালে হয়ত হত না; কিন্তু অভিমান নারীর—তাও তো ছিল। স্বামীর অর্ধভাগিনী সে যে নয়, সে তা জানত। পা যেন সেইখানেই থেমে গেল। বেদনায় সে মাথা নীচু করে টেবিলের ওপরের জিনিসপত্র

নাড়াচাড়া করতে লাগল। যে কথার কোনও উত্তর নেই, সে কথা একেবারে কোন্‌খানকার সম্ভ্রম বেদনা দুঃখের বার্তা বয়ে হঠাৎ দাঁড়াল এসে। তাকে এড়িয়েও যাওয়া যায় না ; এমন সম্পর্ক নয় যে, কিছু কথাও বলা যায়।

একটু থেমে নীচু মুখেই সে আস্তে আস্তে বললে, ফিরতে তোমার রাত হবে?

স্বামী তার দুঃখ জানতেন। একটু বিব্রতভাবে তার মাথার ওপর একবার মুখটা রেখে বললেন, হ্যাঁ, আমার তো আজ দেরি হবে, ওদের যে বিয়ে ; তুমি শুয়ে পড়।

টেবিলের ওপর মণিকর্ণিকাটিতে আলো পড়ে ঝিকমিক করছিল, স্ত্রী চুপ করে চেয়ারখানি ধরে দাঁড়িয়ে রইল। স্বামী নীচে নেমে গেলেন।

ভারতবর্ষ—অগ্রহায়ণ, ১৩৩৭

গঙ্গাফড়িং

খানিক আগে বৃষ্টি হয়ে গেছে। সন্ধ্যা বৃষ্টির মধ্যেই নেমে এল। বৃষ্টি যখন ছাড়ল, তখন বিকাল আর সন্ধ্যা দুই শেষ হয়ে ঘন অন্ধকার রাত্রি এসে দাঁড়িয়েছে।

খেলার সুবিধা আর রইল না। বন্দী বালক-বালিকার দল নিরুপায়ভাবে একবার অঙ্গনে বেড়িয়ে এল, তারপর একবার ঘরে বেড়িয়ে এসে শেষে ঘরের দালানেই জটলা করে দুরন্তপনার উপায় আবিষ্কার করতে লাগল।

ইতিমধ্যে খেলার উপকরণ পাওয়া গেল ঠিক হাতের পাশেই ; আলোর চারধার থেকে নিয়ে সমস্ত দালানটা নানাবিধ পোকা আর ফড়িং পিঁপড়েয় ভরে গেছে।

'ইঃ, সরে বস ভাই, তোর দিকে যাচ্ছে', 'মাগো, তাড়িয়ে দাও না ভাই', 'ওকি দাদা, ওদের মের না', 'উঁহু, খোকা, ধর না!'—নানারকম সুরের মাঝখানে হঠাৎ ঠক করে একটি ভারী ধরনের শব্দ হল।

খোকা শিউরে বলে উঠল, দিদিভাই, আমাল মাথায় কি? ততক্ষণে সেটা আবার একটা লাফ দিয়ে আর এক দিকে পৌছল। ঐ দেখ, কি পাখী!—খোকা বললে।

একটি বৃহদাকার গঙ্গাফড়িং। পাখীই বটে!

দাঁড়া দাঁড়া, মজা করি—পকেট থেকে লাট্টুর সুতো বের করে নিয়ে সন্তর্পণে অজিত পাখীটি ধরতে গেল। সেটি আবার দালানের ও কোণে গিয়ে পৌছল।

খানিকক্ষণ হৈ হৈ করে অজিত সেটিকে ধরে ফেললে।

বিরাট একটা কোলাহলে সকলে অজিতকে ঘিরে দাঁড়াল। সবুজ রঙের ডানা, দুটি কালো মরিচের মতন গোল চোখ, আর দেড় বিঘৎ লম্বা মোড়া দুখানি পা, দেখতে

দেখতে সে আবার লাফ দিলে।

এবারে একবারে তার কর্মসূত্র মানুষের হাতের লাট্টু-সূত্রে বাঁধা পড়ে গেল। লাট্টুর সুতোয় তার একখানি পা বেঁধে অজিত পরমানন্দে তাকে একটি পেরেকে টাঙিয়ে দিলে।

সে একবার করে লাফ দেয়, বোধ হয় দিয়েই বুঝতে পারে বাঁধা আছে, আবার স্থির হযে চুপ করে মরিচের মতন কালো গোল চোখে চেয়ে থাকে, কোন্ দিকে তা বোঝা যায় না।

অজিতের খুল্লতাত দিদি ফড়িংটির বন্ধন-দশা দেখে বার দুই বললে, ছেড়ে দে না রে, আহা! কি কষ্ট দিতে ভালবাসিস! ঠাকুমা বলেন, ওরকম করলে পাপ হয়। যদি পা-টা ভেঙে যায়?

পতঙ্গটার পাযের সুতো আলগা হয়ে গিয়েছিল, নীচু হয়ে সেটা ঠিক করতে করতে সে বললে, ঠাকুমাকে কে বলছে? আর দেখ না, পায়ের সুতো কত ঢিলে আর লম্বা— ও ভাঙবে কি করে?

ভাঙবে যে কি করে, তা দিদি বোঝাতে পারলে না। কিন্তু তার প্রতি লাফের সঙ্গে ভাঙবার সম্ভাবনা কেবলই মনে হচ্ছিল।

হ্যাঁ রে খুকীর মাথাটা ভিজে জুবড়ি, খেতে গেল দেখলাম। সব বুঝি ভিজেছিস?— বলতে বলতে একজন মা প্রবেশ করলেন। উ, কি কাণ্ড! নিদ্দুষী জীবের পা বেঁধে খেলা করা! দে ছেড়ে, মরে যাবে যে!

একটি ভৃত্য এসে দাঁড়িয়ে ছিল। সে স্বভাষায় বললে, ও অতিশয় নির্দোষী জীব এবং বিধাতার ঘোটকী, ওকে ছেড়ে দেওয়াই কর্তব্য।

সব ভূত! ছেড়ে দিয়ে খাবি আয়।—ভিজে খুকীর মা সমস্ত বালক-বালিকাদের নিয়ে প্রস্থান করলেন অজিতকে খুলতে আদেশ দিয়ে।

অজিত ছেড়ে দেবার ভান করেছিল মাত্র, ছেড়ে দেয় নি। সুতরাং বিধাতার মর্ত্য-জনরব-লব্ধ ঘোটকী আপাতত অজিতের লাগামেই আবদ্ধ রয়ে গেল। অন্ধকার দালানে বারম্বার লাফ খেয়ে সে পথ খুঁজে নেবার ব্যর্থ চেষ্টা করতে লাগল। অজিতেরা খেতে গেল।

এবারে নিদ্রাতুর পৌত্র-পৌত্রীদের ও অন্য শিশুদের চোখের ঘুমকে আর খানিকক্ষণের জন্য আনাচে-কানাচে বেড়িয়ে আসার জন্যে তখন রান্নাঘরের সুমুখে ঠাকুমা, রূপকথার অপরূপ আলো ছড়িয়ে দিয়েছেন।

ও ঠাকুমা, ঐ মেজদা আজকে একটি গঙ্গাফড়িং ধরেছে। বেঁধে ঝুলিয়ে রেখে দিয়েছে পেরেকে।—একটি ভগ্নদূত-মুখে বার্তা পৌঁছল।

অজিত তখন ঠাকুমার পাশে।

ওমা, ছি ছি! অমন করে জীবজন্তুকে কষ্ট দেয়? দিতে নেই। খুলে দিয়েছ তো?

অজিত অপ্রস্তুতভাবে না-সূচক মাথা নাড়লে।

যে যেমন কাজ করে, সে তেমনই ফল পায়। পাপ হয়। যে জীবকে কষ্ট দেয়, তাকে তেমনই কষ্ট পেতে হয়। কারুকে কষ্ট দিতে নেই। এক মুনির গল্প তোমাদের বলব'খন।—পিতামহী বললেন।

নানাবিধ পাপপুণ্য, মাণ্ডব্য মুনি, রত্নাকর মুনি, পাপের বয়স, তার ক্ষমা, বিশেষ বয়েসের বিশেষ ফল, পঞ্চম বর্ষের পর অপরাধ হওয়া—ইত্যাদি পিতামহীর জ্ঞানের ভাণ্ডারের সঞ্চিত কাহিনী বালকবালিকাদের গোচরীভূত হতে লাগল।

খাওয়া শেষ হল। চিন্তিত শিশুদল শয়ন করতে গেল। শুয়ে শুয়ে দিদি জিজ্ঞাসা করলে, হ্যাঁরে ছেড়ে দিয়েছিস?

না, আমার একলা ভয় করছে। কাল দেব'খন। তুমি চল-না।

দিদি বললে, আর পারি না, থাকগে। কালই দিস।

একজন জিজ্ঞাসা করলে পাপ কি ভাই? কি রকম দেখতে?

দূর, সে কি দেখা যায়!—দিদি জবাব দিল।

নানাবিধ ভাবনার মাঝে ছেলেদের তন্দ্রা আসতে লাগল।

দরজার পাশ থেকে, ছাদের কোণ থেকে ঝাঁকড়া রুক্ষ চুল ভরা মাথা কার দেখা যায় মনে হয়। কোনও বার বা সাদা কাপড় পরা ছায়ার আভাসে ভেসে আসে। পাপ কি রকম দেখতে হয়?

অজিতের ঘুমের ঘোরে মনে হল, কে একজন পাপ যেন সবুজ ঘোমটায় মুখ ঢেকে তার খাটের কাছে নত হয়ে কি দেখছে। অপ্রসন্ন মনে কেবল ঘুম ভাঙে।

দালানে শুধু অনেকক্ষণ পরে পরে, ঠক ঠক ক'রে শব্দ হয়।

সকাল:বেলা। শিশুরা এসে দাঁড়াল।

একটা শালিক ওদের দেখে উড়ে গেল ফড়িংটার কাছ থেকে।

দেখা গেল, সমস্ত রাত্রি এক পায়ে বাঁধা থাকায় লাফালাফি করে তার একটা পা একেবারে লম্বা হয়ে গেছে—যেন একগাছা খড়। অজিত কাছে এসে নীচু হয়ে দেখতে পেলে, একটা সবুজ ডানা মাটিতে পড়ে, আর পাখার আবরণী থেকে খুলে যাওয়াতে তার সমস্ত গা-টা শালিকটা ঠুকরে ঠুকরে তাকে প্রায় শেষ করে আনছিল।

অজিত শুষ্ক মুখে সেটাকে নেড়ে-চেড়ে একজনকে বললে, ভাই, একটু জল আনবি?

জল এল, পায়ের দড়ি খুললে, সে একটু নড়লও; কিন্তু উড়তে পারলে না।

দড়ি খোলার পর একটু অন্যমনস্কতার সুযোগে হঠাৎ সেই শালিকটাই সেটাকে নিয়ে উড়ে গেল।

বালক-বালিকারা বিমূঢ়ভাবে চেয়ে রইল।

২

ষোলো-সতরো বছর পরে।

'মাসীমা' বলে ডেকেই একটি যুবক বড় বাড়ির পাশের ছোট্ট বাড়িতে প্রবেশ করলে।

কে অজিত? এস বাবা।—'মাসীমা' আহ্বানে অভিহিতা নারী এগিযে এলেন।

রান্নাঘরের দরজায়ও একখানি স্নিগ্ধ স্মিত মুখ দেখা গেল।

আমার জন্য একটু চা করে পড়া দিবি আয়। আমি ছাদে বসিগে।—অজিত বললে।

বস বাবা। সুবি, চা করে দিয়ে আয়। আমি সন্ধ্যেটা সেরে নিই। মাসীমা রান্নাঘরে প্রবেশ করলেন।

সুবালা চা করে বই নিয়ে ওপরে উঠল। মা'ও ওঠেন কাজ সেরে।

পরিচয় হয়েছিল বছর ছয়েক আগে সন্ধ্যাবেলা, তখন সুবালার বাপ হঠাৎ একদিন হার্টফেল করে মারা যান।

তারপর এমনই ক'রে দিন যায়। অজিতরা দেখাশোনা করত, পাড়ার লোকে দয়া-শ্রদ্ধা করত। তখন সুবালা ছিল নয়-দশ বছরের বালিকা।

তারপর সুবালা পড়ে। মাসীমা, তন্ত্রা কন্যা, পড়া, গল্প, কদাচ কোন দিন চা খাওয়া,—স্রোতের মতন দিন কখন বয়ে চলল।

সুবালা সরলভাবে হাসে, সুন্দর দাঁতগুলি, হাসিটি মধুর; কথা কয়, গল্প করে, নির্ভীক মন কিছু ভাবে না।

মা ভাবেন, কি আর বড় হয়েছে, এখন একটু পড়ুক। যা কিছু পুঁজিপাটা আছে, বিয়ে দিয়ে তারপর চোখ বুজবেন।

অজিত ভাবে, কি সরল মুখ, সুন্দর হাসিটি!

অজিতও চব্বিশ বছরে পৌছল, সুবালাও ষোলতে। ও বাড়িতে অজিতের বিয়ের সম্বন্ধ আসে।

হঠাৎ মা ভাবলেন, সুবি তো দেখতে মন্দ নয়, ভালই। আর জুটিতে বেশ মিলও তো, ব্রাহ্মণের ছেলে স্বঘর।

তার আগে অজিত সেটা ভেবেছিল। ভাবনার ঐক্যে দুজনেই সন্তুষ্ট আহ্লাদিত হলেন। সুবালার কানেও সংবাদটুকু পৌঁছল।

তা বাবা, একবার ব'লে দেখ না।—বিধবা অজিতকে বললেন।

অজিত রোজই ভাবে, ভয় করে, ভরসা হয় না। বাপকে তার বলতে সাহস হয় না, মা নেই। অবশেষে সে সতীর্থ আর বন্ধু জিতেনকে দিয়ে বলালে।

বড় বাড়ির কর্তা যেমন হতে হয়। জিতেনকে তিনি বুঝিয়ে দিলেন, যা অসম্ভব তা অসম্ভবই থাকে। এটা ও বাড়ির বিধবার এবং তাঁর পুত্রের বোঝা উচিত। বাড়াবাড়ি করলে, উত্তরাধিকার, মানে—এই ঘর-বাড়ি, টাকা-কড়ি, গাড়ি-মোটর, সব আশা ছেড়ে দেয় যেন।

তখন সুবালার পড়া শেষ হয়ে গেছে। দুরাশামুগ্ধ তরুণ হৃদয় বেশ নিশ্চিন্ত মনে অজিতের বলিষ্ঠ হাতের মুঠোয় আপনার ছোট্ট কোমল করপল্লবটি ছেড়ে দিয়েছে। স্বপ্নলোকে আকাশকুসুম অনেক ফুটেছে; বাকি শুধু বাস্তবে ফুটে ওঠা।

অজিত!—মোটা গলায় কে ডাকলে।

সুবালার মা এসে তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিলেন।

কি রে?—ব'লে অজিত উঠে এল।

তিনজনে দাঁড়িয়ে যে কথা হল, তাতে বাকি আর কিছু রইল না শোনার।

অজিত বেরিয়ে, গেল, জিতেন একবার চেয়ে দেখে চলে গেল।

মনোভঙ্গের অসহ্য দুঃখে মাতা-পুত্রীর চার-পাঁচ দিন কাটে। অজিত ডাকলে, মাসীমা!

গম্ভীর মুখে বিধবা দরজা খুলে দিলেন।

অজিত যা বললে, তার মর্ম এই সে বাপের অগোচরে বিবাহ করবে কিম্বা তাঁর অবর্তমানে করবে, এখন করবে না।

বিধবা চুপ করে রইলেন। অবর্তমানে, সে কত দিন? অগোচরে, সে কেমন করে? এখন নয় তো সুবি কত দিন পড়ে থাকবে? এমনই ধারা প্রশ্ন মনে ওঠে। মনে হয়, অসম্ভব কথা বলছে অজিত। তবু দুরাশা উঁকিঝুঁকি মারে।

সুবালার সব বিশ্বাস হয় সম্ভব বলেই। কেন হবে না? হতে পারে সবই। সম্ভাব্য-অসম্ভাব্যতে সুবালার বিশেষ ভেদ ছিল না। নিজের অন্তঃকরণটির মতন, স্বচ্ছ চোখ দুটির মতন সবই নির্মল সহজ।

অজিত আসে যায়। সুবালার মনে হয়, ক্রমে সুবালার আরও মনে হয়, হয়ত সম্ভব সবই।

কিন্তু অজিতের বাবা যে ঢের বেশি বুদ্ধিমান অজিতের চেয়ে, তার প্রমাণস্বরূপ

সকলের অজ্ঞাতে একদা শুভলগ্নে অজিতের একসঙ্গেই আশীর্বাদ ও গায়ে হলুদ হয়ে গেল। তিন দিন পরে বিবাহ। বাল্যকালের দিদি, দাদা, কনিষ্ঠা, কনিষ্ঠদের এবং খুড়ীমা, জেঠীমা, পিসীমাদের আগমনের কোলাহলে সুবালার মা চকিত হয়ে প্রতিবাসীর ঝিকে প্রশ্ন করাতে সব সংবাদ জ্ঞাত হলেন।

সুবালা আড়ষ্ট পাথরের মতন চোখে চেয়ে রইল।

সন্ধ্যেবেলা। কে ডাকলে, দরজাটা খুলুন তো?

সুবালার মা দোর খুলে দেখলেন, জিতেন।

জিতেন বন্ধুর অবিশ্বস্ততায় বিরক্তি-প্রকাশ ও আক্ষেপ করে অনেক সমবেদনা প্রকাশ করলে।

সুবালার মা ব্যাকুল বেদনায় চুপ করেই বসে ছিলেন, অবশেষে বললেন, বাবা, আমাকে একটা জায়গা ঠিক করে দিতে পার, আমি আর এমন ক'রে থাকতে পারছি না।

মায়ের কথায় শুষ্ক ক্লান্ত চোখ তুলে সুবালাও একবার জিতেনের পানে চাইলে। স্বল্প জ্যোৎস্নায় শুধু দৃষ্টিটি চোখে পড়ল।

৩

পথের ওপারে মুড়ির দোকান, বেশ বড় দোকান। মুড়িও বোধ হয় বিক্রি ভাল রকম হয়। দিনরাত্রি ভিড় থাকে। গরিব জনমজুর, বড়লোকের ঝি-চাকর সবাই নিয়ে যায়।

এক ধামা মুড়ি নিয়ে একটি মেয়ে আসে একটি ছেলের সঙ্গে,—সেই মুড়ি দিয়ে যায়। বেশির ভাগ সন্ধ্যেবেলায় সে আসে, কোন দিন বা দুপুরের শেষে।

বন্ধুর ডিস্পেন্সারিতে ওষুধ নিতে এসে বসে অজিত গল্প করছিল। রাস্তার দৃশ্য যেন সিনেমা দেখার মত; তাতে ওপাশে পানের দোকান, খাবারের দোকান, চিঁড়ে-মুড়ির দোকান, ভিড় লেগেই আছে। কাজ না থাকলে বায়োস্কোপ দেখতে যাওয়া আর রাস্তায় লোক দেখা প্রায় দুই সমান—অজিতের তাই মনে হয়।

ওপারে পানের দোকানের প্রকাণ্ড আরশিতে দুটি কালো চোখের ছায়া পড়ল, বিদ্যুতের আলো সেই মুখে পড়েছে। মুখ সরে গেল। একখানা ভাড়া গাড়ির ছায়া। পান কিনতে এসেছে এক বাড়ির ঝি, তার হাত-মুখ নাড়ার ছায়া।

ও চোখ কার? মুখটা তো মনে পড়ে না, চোখ দুটি তো চেনা, কিন্তু—; কার? প্রশ্নে মন ভরে যায়। অজিত অন্যমনে ওষুধের শিশি টেবিলে ফেলে বন্ধুকে জিজ্ঞাসা না করেই উঠে পড়ল।

বাড়ি গিয়ে মনে পড়ল ওষুধের কথা। ঘরে ঢুকে আলো নিভিয়ে শুয়ে দৃষ্টি পড়ল

পাশের বাড়িতে। সেখানে ভাড়াটে এসেছে অন্য, যেমন তারা চেঁচায়, তেমনই ঝগড়া করে। মনে পড়ল, ও চোখ সুবালার।

মেয়ে ডাকলে, বাবা খাবে চল।

যাই মা।—বাপ উঠে বসল। মাতৃহীনা কন্যার সঙ্গে না খেলে মেয়ের খাওয়াই হয় না।

মেয়ের মা বিয়ের পর পাঁচ বছর প্রায় বেঁচে ছিল। অজিত তাকে ভালবেসেছিল কিনা কে জানে, কিন্তু তাকে তার ভাল লেগেছিল। সুবালার চোখ গভীর কালো, এর চোখ একটু নীলাভ। সে ছিল সরল, অপ্রস্তুত হাসিমুখ ; এ ছিল আদরিণী দুহিতা, তেমনই ধরনের সপ্রতিভ আদুরে মুখ।

রাত্রে জল খেতে উঠে সুবালাদের খালি বাড়ি চোখ পড়েছে। ব্যাকুলভাবে সে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বিছানায় ফিরেছে। পাশে নিদ্রিতা, একান্ত নির্ভরশীলা কিশোরী পত্নী। চোখে জল ভরে এসেছে। সে তার মাথায় মুখ রেখে জাগিয়ে দিতে চায়, সুবালার ওপর অবিচার যেন ভুলে যাবার পথ পায় না। স্ত্রী জেগে ওঠে, বিস্মিত হয়ে স্বামীর মুখপানে চাইতে যায়। অজিত তার মাথাটা নীচু করে দিয়ে বলে, জেগে উঠলে বুঝি? না, তুমি ঘুমও।

তন্দ্রাজড়িতস্বরে স্ত্রী বললে, আহা, জাগিয়ে তো দিলে! শুধু এইটুকু কিশোরী তরুণী নারী বুঝতে পারে, ওটা সোহাগ নয়, আদর নয়, তার চেয়ে গভীর কিছু, যার সঙ্গে ওর পরিচয় স্বামী করে দিতে চান না।

এমনই ভাবে সয়ে যেতে যেতে, ভুলে যেতে যেতে সহসা কন্যার জন্মের পর একেও হারিয়ে ফেললে।

বাপের বিছানার পাশে, ছোট খাটে মেয়ের বিছানা। খাওয়া হলে দুজনে এসে শুল।

বাবা, তুমি বুঝি আজ আর পড়বে না?

না।—মেয়েকে কাছে টেনে নিয়ে বাপ বললে, আমার কতগুলো পাকা চুল হয়েছে দেখ্ তো।

রাত্তিরে বুঝি পাকা চুল দেখা যায়? আর তুমি কি বুড়ো?

বুড়োই তো, দেখ্ না খুঁজে। এক একটা চুলের দাম এক এক টাকা।

ইঃ, রাজা যেন! আচ্ছা দেখি!—মেয়ে বালিশের পাশে বসে পাকা চুল খোঁজে।

না বাপু, নেই, মোটে তিনটে। আমার ঘুম পাচ্ছে!

পিতার মনে হচ্ছে, কি করে সময় কাটে, কোন্‌টা স্মরণীয়, কোন্‌টা ভোলা যায়!— আচ্ছা শো এবার, আমার পকেট থেকে কাল টাকা নিস।

বালিকা নিজের বিছানায় শুয়ে পড়ে। ঘর অন্ধকার করে অজিতও শুয়ে থাকে। সবুজ রঙের শাড়ি পরে মস্ত গঙ্গাফড়িং। সুবালার মত দেখতে চোখ দুটি, সেই যার ছোটবেলায় পা ভেঙে দিয়েছিল, তারপর শালিকে ঠুকরে মেরে ফেললে। খাটের পাশে পাশে সে বেড়িয়ে বেড়ায়। ঘোমটা সরে যায় যখন, একবার মনে হয়, সুবালা কি? একবার মনে হয় মৃতা পত্নীকে।

ঘর্মাক্ত হয়ে ঘুম ভেঙে গেল, জলের কুঁজো সুবালাদের বাড়ির জানলার দিকেই। জল খেয়ে, চোখে মুখে জল দিয়ে, আবার এসে শুয়ে পড়ল। মনে পড়ল, সেই বৃষ্টির দিনের গল্প—ফড়িং ধরা, পিতামহীর কাছে গল্প শোনা—পাপ কি? পীড়ন, না অসম্মান? না, অবিচার? না, কি? প্রায়শ্চিত্তই বা কি? কর্মফলই বা কি? কারটা কে ভোগ করে? অভিভূতের মতন কখন ভাবনার মাঝেই আবার ঘুম আসে।

৪

সেদিন থেকে অজিত প্রায়ই সেই ডিসপেনসারীতে এসে বসে। মনে হয়, যেন ও সুবালাই। ভেবে পায় না, কি জন্যে সে তাকে খোঁজে, তবু সমস্ত অন্তর কি একটা বেদনায় বিমূঢ়ভাবেই ওকে খোঁজে।

দিন পনেরো পরে আবার দেখা গেল, সেই নারী এক ধামা মুড়ি নিয়ে দোকানে দাঁড়িয়ে, আর ছেলেটি সঙ্গে।

অজিত ছুতো করে উঠে গেল, কিন্তু মুড়ির দোকানের সুমুখে কি সূত্রে যায় তা আবার ঐ দিনের মতন আলোকিত পথে?

ফিরে আসে। মুখ আর দেখা যায় না, স্পষ্ট চেনাও যায় না, তাই ভয়ও করে।

অবশেষে একদিন ছেলেটি একলা এল, প্রায় মাস দুই পরে।

অজিত তাড়াতাড়ি নেমে এল রাস্তায়। ভিড় কাটিয়ে রাস্তার ওপাশে গিয়ে ছেলেটির কাঁধে হাত দিয়ে ডাকলে। বালক সভয়ে ফিরে চাইলে।

অজিত জিজ্ঞাসা করলে তোমাদের বাড়ি কোথায়?

যে চোখ দুটি ত্রস্ত বিস্ময়ে ওর পানে চেয়ে ছিল, সে দুটি সুবালারই চোখ।

বালক ভীত ক্ষীণ স্বরে বললে, ঐ গলিতে।

অজিত তার চোখ দেখছিল, বললে, কোথায়?

বালক সভয়ে বললে, ঐদিকে। সে সরে দাঁড়াল।

উনি, ওই যে—তোমার কে?

কাঁদ-কাঁদ স্বরে বালক বললে, আমার মা।

অভিভূত অজিতকে আর জিজ্ঞাসার অবসর না দিয়ে বালক জনতার মধ্যে মিশে গেল।

বন্ধু জিজ্ঞাসা করলে তার পরদিন, তোমার হয়েছে কি, ঐ একটা ছোঁড়ার সঙ্গে খামকা কথা কইছিলে কেন? পকেট কেটেছে নাকি?

অজিত অপ্রস্তুতের হাসি হাসলে। কি উত্তর দিলে নিজেই সে বুঝতে পারলে না।

অনেকদিন আর ও সময়ে মেয়েটিও আসে না, বালকটিও না।

অজিতের বেদনাও ছাড়ে না, আশাও। অবশেষে গলিতে ঢুকে পড়ল একদিন। খানিক দূর গিয়ে একটি ছোট ঘরের সুমুখে বালকটিকে দেখলে পড়া মুখস্থ করছে পথের পাশের এক দোকানের আলোয়।

খোকা, তোমাদের বাড়ি কি এখানে? অজিতের প্রশ্নে বালক চকিত হয়ে চাইলে।

অনিচ্ছায়, ভয়ে সে দেখিয়ে দিল ঘরের দরজা। অজিত ঢুকে পড়ল উঠোনে, তার পেছনে বালকটি এসেছিল। প্রাঙ্গণবাসীরা আশ্চর্য হয়ে দুজনের দিকে চেয়ে রইল।

বালক ডেকে বললে, মা, একবার এস।

অজিত সেই দিকে এগিয়ে গেল।

একটি রেড়ির তেলের প্রদীপ জ্বালা, একটি নারী নত মুখে কাশীদাসের মহাভারত পড়ছে। চুলগুলো পিঠ ভরে ছড়িয়ে আছে, আঁচলের প্রান্তটুকু মাথায় দেওয়া মাত্র।

পুত্রের আহ্বানে জননী সাড়া দিলে, কি রে? কেন? কণ্ঠস্বর মৃদু, যেন চেনা।

অজিত এসে দাঁড়াল।

সুবালাই বটে। শুধু চোখ আর চুল তার; আর কিছু চেনাবার মত নেই।

সুবালাই অবাক হয়ে চেয়ে থেকে পরে চিনতে পেরে উঠে দাঁড়াল।

পুত্র জিজ্ঞাসা করলে মার পেছনে এসে, কে মা উনি? সেদিন তো দোকানের সামনে উনিই কথা কয়েছিলেন।

জননী সামান্য ইতস্তত করে আত্মসম্বরণ করে বললে, তোমার মামা হন। তারপর মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলে।

অজিত তার ক্ষীণ জীর্ণ দেহের পানে চেয়েছিল,—মুখের হাড় সব দেখা যাচ্ছে। অপ্রস্তুতভাবে জিজ্ঞাসা করলে, আমাকে কি চিনতে পার নি?

সুবালা ঘর থেকে একখানি ছোট মাদুর এনে পেতে দিলে।

৫

কেমন আছ? মা কোথায়?—ছেলের পিতার কথা জিজ্ঞাসা করবার প্রয়োজন হল না, কেন না সুবালার পরিধানে থান।

ভাল আছি। মা মারা গেছেন।—সুবালার দুটি কথায় উত্তর হয়ে গেল। আবার

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপ করে থাকে।

খোকার কি নাম ?—অজিত জিজ্ঞাসা করলে।

ওর নাম মাণিক।—মহাভারতের পাতা উলটোয় সুবালা।

অনেক চেষ্টার পর সহসা অজিত বললে, কোথায় চলে গেলে তখন ?

কখন ?

সেই সময়ে।

মুখ নীচু করে সুবালা প্রদীপটি উসকে দিতে লাগল। তারপর মনে হল, বড় আলো হল। আবার কমিয়ে দেয়। নত চোখ থেকে দু'তিন ফোঁটা জল ঝরে পড়ল। মাণিক বাইরের আলোয় পড়তে গেছে।

একটু থেমে সে জিজ্ঞাসা করলে, সত্যি তুমি সব কথা জানতে চাও ? চোখে মনে হল সাগর চকচক করছে, কিন্তু ঝরল না।

অজিত নীরবে উৎসুক জিজ্ঞাসু চোখে তার পানে চেয়ে রইল।

সুবালা আস্তে আস্তে এক সুরে সমস্ত বেদনা, গ্লানি, দুঃখ, অপমান, দারিদ্র্য, শোক, সান্ত্বনা সব কিছুকে—যেন বর্ষণের আগের শ্রাবণের আকাশের মতন থমথমে গভীর গম্ভীর ভাবের এক সুরেই বেঁধে নিয়ে এক এক করে বলে যেতে লাগল। সেই জিতেন-বাবুর আগমন, সমবেদনা প্রকাশ, জননীর ব্যাকুল দুঃখে পরদিনই সেই বাড়ি ছাড়া, অজিতের বিবাহের সকল সংবাদ পাওয়া, মায়ের মনোভঙ্গে পীড়িত হওয়া, জিতেনবাবুর সাহায্য গ্রহণ, অবশেষে তাঁর তাকে গ্রহণ করার স্বীকৃতি, জননীর নিশ্চিন্ততা, তাঁর আসা-যাওয়া, ঘনিষ্ঠতা। সুবালা একটু থামলে।

তারপর জিতেনবাবুর জননীর অমত।

অবশেষে মা বুঝলেন, তিনি প্রতারিত হয়েছেন। তারপর কথান্তর এবং জিতেন-বাবুর একেবারে প্রস্থান।

এক মুহূর্তের মধ্যে তার মুখ লজ্জিত বেদনার আভাসে আরও ছোট্ট হয়ে গেল। অজিত একদৃষ্টে তার পানে চেয়ে ছিল।

তারপর মাণিক হল।

অপমানিতা উৎপীড়িতা নারী মাথা নীচু করেই ছিল। কথার সুর এত মৃদু, যেন তার নিজের কানেও পৌছবার ভয় হচ্ছে।

অজিত চমকে উঠল, Coward, ইতর! পরক্ষণেই মাথা নীচু করে নিলে। শুধু কি জিতেনই ?

সুবালা মুখ নীচু করেই ছিল।

আমি ভেবেছিলাম, তোমার—। অজিত আর বলতে পারলে না।

না, আমার বিয়ে হয় নি।—প্রশ্নটি এই জবাবে সে শেষ করে দিলে।

তারপর বছরখানেক কি কিছু বেশি পরে মার মৃত্যু হল।—আবার বলে যায়। অজিত নিরতিশয় পীড়িত বেদনায় ওর মুখের পানে চাইলে। দৃষ্টিতে যেন 'আরও তারপর ?' জিজ্ঞাসা।

এবার সুবালা সহজভাবে মুখ তুললে।

তারপর অনেক কষ্ট পেলাম।

আমার খোঁজ একবারও কেন করলে না?

মনে হয় নি, বুঝতেও পারি নি। আর তুমি কি—। সুবালা থেমে গেল।

যাক। তারপর?—অজিত বললে। সে বুঝলে, সুবালা আসতে পারে এমন কিছু নির্ভরযোগ্য কাজ সেও করে নি।

তারপর ঐ রকমে দুঃখ পাবার ভয়ে অনেক পালিয়ে বেড়ালাম।

আবার কষ্ট পেলে?—সাশ্চর্যে অজিত জিজ্ঞাসা করলে।

আর পাব না? বুঝতে পারছ না?—বেদনা, তিরস্কার, অনুযোগ, অভিযোগ-ভরা কণ্ঠে সুবালা বললে।

অজিত চুপ হয়ে গেল।

শেষে ঐ কামার-গিন্নীর পায়ে ধরে, ধর্মমা বলে, এখানে রয়েছি এই ন বছর। প্রথম প্রথম ও মুড়ির চাল এনে দিত, ভাজা হলে দিয়ে আসত। এখন খোকাকে নিয়ে আমিই যাই।

চৌকো আঙ্গিনার মাথার ওপরের আকাশটুকু থেকে তারারা নীচু মুখে দেখছিল। হয়তো শুনতেও পাচ্ছিল সুবালার কথা। বাড়ির ওধারে তখনও কামার-গিন্নীর ঘরে খাওয়া-দাওয়া চলছে।

৬

অজিত অনেকক্ষণ পরে নিশ্বাস ফেলে বললে, সুবালা, চল আমার বাড়িতে।

সুবালা অবাক হয়ে অদ্ভুতভাবে ওর পানে চেয়ে রইল।

যাবে?—আবার প্রশ্ন করলে অজিত।

কোথায়?—মূঢ় দৃষ্টিতে সে জিজ্ঞাসা করলে।

আমার বাড়িতে। আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করি। তোমার সম্মান মর্যাদা সম্পূর্ণ বজায় রেখে তুমি আলাদা থাকবে।

সুবালা চেয়ে রইল নির্বোধের মতন।

কার কাছে থাকব?

আমার বাড়িতে। আমার মেয়ে আছে, তার অভিভাবকের মতন তুমি থাকবে।

সুবালার চটকা ভাঙল।

না। তোমার স্ত্রী কি বলবেন? আর—সে হয় না। তিনি কিছু না বললেও আমি যাব না।

তিনি নেই, থাকলেও তিনি কিছু বলতেন না।—অজিত বললে।

সমবেদনা-ভরা চোখে সে অজিতের পানে চাইলে। কিন্তু বললে, না, আমি যাব না।

আমাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে দাও। আমি আমার মেয়ের সঙ্গে মাণিকের বিয়ে দেব। তুমি চল। তুমি জান না, আমি নিজের কাপুরুষতায় কত কষ্ট পেয়েছি।

সে বিশ্বাস করছি! কিন্তু আমি যাব না।

তুমি কি আমাকে একটু শান্তিও পেতে—শান্তিও পেতে দেবে না? অজিত ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞাসা করলে। আমার প্রায়শ্চিত্ত করি—

বিয়ে দেওয়াতে কি আর হবে, আবার হয়তো তোমার নির্দোষ মেয়েটি আমার ছেলের হাতে কষ্ট পাবে। ওই কি বড় হয়ে—যাক্‌গে।

লজ্জিত অপ্রতিভ অজিতের অর্ধসমাপ্ত কথাটার শেষ বুঝতে বাকি রইল না। একটুখানি চুপ করে থেকে সে আবার বললে, তোমাদের এখন কি করে—? বলে থমকে গেল।

সুবালার মুখে একটু হাসির আভাসের মত দেখা গেল, ঐ মুড়ি ভেজে। একটু থেমে বললে, দরকার হলে কামার-মা দেন, আর অন্য কাজও করি—পাড়ার লোকের চাল কড়াই ভাজি, বাছি।

অজিতের চোখ তোলবার ক্ষমতা ছিল না। সুবালার শ্রান্ত উদাসীন চোখ দুটি তার পানে চেয়ে ছিল। অবশেষে বললে, তবে তুমি শুধু খরচের টাকাই আমার কাছে নাও।

না। আমার আর আশাও নেই, নেশাও নেই, কোন রকমে সোজা এই পথেই শেষ খুঁজে নিতে দাও।—সুবালা মৃদু দৃঢ় স্বরে বললে। আমার অচল আর হবে না। আর—তুমি এস না।—সুবালা উঠে দাঁড়াল।

অজিতও উঠল হতাশভাবে, গভীর দুঃখ-ভরা দৃষ্টিতে সে সুবালার দিকে চেয়ে রইল। সে নত হয়ে প্রণাম করলে, শুধু বললে, ভালর জন্যেই বলছি, আর এলে আমাকে উঠে যেতে হবে।

সে আর মুখ তুললে না।

উত্তরা—শ্রাবণ, ১৩৩৭

রাজযোটক

১

ব্যাপারটা কিছুই নয়, সরু চোঙে ভরা বুল্‌গেরিয়ার দধিবীজ মাত্র, এবং সেটা রাখা হয়েছিল ভাঁড়ারের তাকে, আর আনা হয়েছিল ডাক্তার অসিত চাটুজ্যের একটিমাত্র ছেলের জন্যে, যেটিকে ডাক্তাররা বলে 'রিকেটি', মায়েরা বলে 'মুখ-চাওয়া' রোগে ছেলে, পাড়ার গিন্নীরা বলেন,'পুঁয়ে পাওয়া' ছেলে।

ডাক্তারের ছেলে যে অমন হয় কেন, এ কথা ডাক্তারের বাড়ির লোকও ভাবে, পাড়ার লোকও ভাবে এবং বলে! সে হেতু-নির্ণয় এখন থাক।

ছেলে প্রায় তিন বছরের। বারো মাসের মধ্যে ছত্রিশ সপ্তাহ জ্বর থাকে, না থাকলে কাসি থাকে, তা না হলে সর্দি, অথবা অজীর্ণ, নতুবা অকারণ কান্না—এ থাকেই। আর তার মা বলে, সেটা অসুখ। আসলে আড়াই বছরের আড়াই মাসও তাকে আর তার রোগকে পৃথক করে দেখা যায় নি। যদি কোন দিন ভাল থেকেছে, 'শনি' 'মঙ্গল' 'নজর' 'দৃষ্টি' সমস্যার ভয়ে সেটা কেউ মুখে উচ্চারণ করে নি! অতএব সে রুগ্ন তো বটেই, তার ওপর নির্জীব ও নিরানন্দও।

বাপ বেচারা অনেক ভাবে, কিন্তু একমাত্র ডিসপেনসারীর ওষুধ আনা ছাড়া তার ডাক্তারি আর কোন কাজেই লাগে না। তার বিদ্যা হার মেনে গেছে কি অজ্ঞাত কারণে, সে নিজেই বোঝে না। ফলে মাঝে মাঝে তারও ঐসব অলৌকিক 'নজর' 'মাদুলি'তে বিশ্বাস আসে যেন। এবারে ছেলের মা বললে, বাড়ির ডাক্তারের এলাকাড়ির চিকিৎসায় কি রোগ সারে? আমার মার মাসীমা বলেন, বদ্যিকে পয়সা না দিলে অসুখ সারে না।—কথার বাঁধুনিতে ওর বয়স যত মনে হয়, তত পৌরাণিক মোটেই নয়, মাত্র উনিশ বছর বয়স।

ডাক্তারের ডাক্তার বন্ধু এল। এসে অবাক হল, আশ্চর্য হল এবং রাগ করলে। বললে, নাকে সর্ষের তেল দিয়ে এতদিন ঘুমোচ্ছিলে? ডাক্তার-বাপের ছেলে এমন বাদুড়ের মত হল কি করে? আরও অনেক কিছু যা বললে তা যথেষ্ট, আর যা না বললে তাও কম নয়।

চিকিৎসাপত্র লেখা হল।

শিশি শিশি ওষুধ, বোতল বোতল ফুড, গায়ে মাখার জন্য কডমাছের তেল, আর তার সঙ্গে এল বুল্‌গেরিয়ার দধিবীজ, অর্থাৎ আমরা যাকে 'দম্বল' বলি।

তখন কিছুদিন দেশময় বুল্‌গেরিয়ার দধিবীজের নতুন খ্যাতি উঠছিল। মাসিকপত্রের

পাতায় পাতায়, ডাক্তারদের মুখে মুখে, খাদ্যতত্ত্বজ্ঞদের নির্দেশে (এটা বর্ণাদ্যক্ষরিকা ভিটামিন যুগের আগের কথা), তার প্রচার ও পসারে রোগী এবং সুস্থ সকলেরই লক্ষ্য পড়ছে তার দিকে।

এতক্ষণ অবধি কোনও গোল ছিল না। গল্পে-শোনা হিন্দুস্থানী জননীর মত অনুপ্রভা ভেবে গর্ব অনুভব করছিল, তার ছেলে চিররুগ্ন, বাড়িটি হাসপাতাল, এবং তার 'ইলাজমে এত্‌না রুপৈয়া লাগা,' অর্থাৎ প্রচুর অর্থব্যয় হয়েছে চিকিৎসাতে। বিপত্তি হল হঠাৎ। রাত্রে ঠাকুর দই পেতে রেখেছিল চোঙ থেকে দম্বল নিয়ে অনুর শাশুড়ীর নির্দেশমত। সকালে সে দই বেশ জমেও ছিল। ছেলে ভোরে খাবে হরলিক্‌স, তারপর ঐ দইয়ের ঘোল, তারপর জীয়ানো মাছের ঝোল—পোরের ভাত সহ, তারপর আবার ঐ দইয়ে কাটানো ছানার জল ইত্যাদি ইত্যাদি।

অনু পূজো করে উঠল। চোখে পড়ল তাকের ওপর দইয়ের বাটি। বেশ জমেছে। অনুর মুখ প্রসন্ন। তারপর চোখে পড়ল দম্বলের চোঙটি। তার ওপরে অতি ক্ষুদ্রাক্ষরে লেখা—দই ও প্রস্তুতকারীর নাম ধাম ঠিকানা। অনু ইংরেজীতে চিঠিপত্রের ঠিকানা লিখতে ও পড়তে পারত। হঠাৎ কি মনে হল।

খানিকটা আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে তাকের ওপরের জিনিসপত্র নামাতে লাগল।

সামনের দালানে আশ্বিনের হিম লাগবার ভয়ে পায়ে গরম মোজা জুতো, গায়ে ফ্লানেলের জামা, মাথায় পশমের টুপি পরা, ঝড়ের সময়ে কম্পিতশিখা প্রদীপের মত ম্লানহাসিমুখ একটি ক্ষীণ শিশুকে কোলে নিয়ে ছেলের ঠাকুমা বসে ছিলেন ঘোল তৈরীর আশায়। ঘোল তৈরি না করেই বধূকে অন্য কাজে ব্যাপৃত দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, কি গা বউমা? ইঁদুরে কিছু তুলেছে?

বধূ বললে, না, মা। বুল্‌গেরিয়ার দম্বল।

তাতে কি মা?—আশ্চর্য হয়ে শাশুড়ী বললেন।

ছিষ্টি বিলিতী অনাচার! ঠাকুর একেবারে তাকে তুলেছে।

শাশুড়ী চুপ করে রইলেন। কথাটার যৌক্তিকতা অস্বীকার করা যায় না। আবার কেমন নতুনও মনে হতে লাগল। কিন্তু তর্ক করে লাভ নেই, এবং আচারনিষ্ঠায় নিজেকে পুত্রবধূর চেয়ে খাটোই বা কি করে করা যায়?

বেরুবার কাপড় পরে অসিত ওপর থেকে নেমে এল। নিজের মাকে আর ছেলেকে দালানের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে এগিয়ে এল। মৃদু হেসে ছেলের শীর্ণ রক্তহীন গালে টোকা মেরে জিজ্ঞাসা করলে, খেয়েছ কিছু?

ছেলে হাঁটতে না পারুক, কথা ভাল কয়। বললে, না, মা ঘর ধুচ্ছে।

অসিত আশ্চর্য হয়ে ভাঁড়ারের দিকে চাইলে, কেন? ওকে খেতে না দিয়ে ঘর

ধোয়ার দরকার ?

মা'র দিকে চাইলে।

মা চুপ করে রইলেন।

দইটা জমেছে ভাল হয়ে ?

মা বললেন, হ্যাঁ।

তা ওকে দিয়েছ ?

মা বললেন, কি বিলাতী দম্বল এনেছিস, সব ছোঁয়া-লেপা হয়ে গেছে।

মানে ? ডাক্তার অবাক হয়ে রইল।

মা জবাব দিলেন না।

ঘরের ভেতর হতে বধূ নির্লিপ্তভাবে ঝিকে নিয়ে কি সব ধোয়া-মোছা করছিল।

এবারে ডাক্তার মা'র দিকে চেয়ে বললে, পিসীমার চিঠিপত্র পাও ?

মা বললেন, কেন ?

একবার আসতে লেখ না। সন্তুষ্ট হবেন। খোকার অমন বাদুড়ের বাচ্চার মত চেহারা শুধু আমি দেখব ? দাও, দইটা আমাকে দাও, আমিই করছি।

চাকর এসে বললে, বাইরে সতীশবাবু এসেছেন।

অনুর ধোয়া-মোছা হয়ে এল। ওদের মাছ-মাংস অখাদ্য-অনাচার, আর অনুদের ঠাকুর-দেবতা, বিধবা-বামুন, আচার-বিচার,—অনু হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। মনে কর, কেউ যদি ঐ দইয়ের পঞ্চামৃতে ঠাকুরকে স্নান করায়! অনু মনে মনে ভাবে, ঐ জন্যেই আর দেশে দেবতার দয়া নেই, তাই না খোকা অত ভোগে!

২

আগের ঘটনাটা হচ্ছে এই।—

অনুর বিয়েটা সবর্ণ আর যথারীতি শাস্ত্রলোকাচারাদিসম্মতই হয়েছিল। মেয়ে সবর্ণা ও গৌরবর্ণাও, এবং বাপের দিক থেকে উজ্জ্বলরজতবর্ণচ্ছটার অভাবও হয় নি।

বিয়ের আগে পিসীমা আর জেঠিমা তাকে দেখে এসেছিলেন কোথায় নিমন্ত্রণে গিযে। পিসীমা বললেন, খাসা সুন্দরী মেয়ে—ছোটটি। আর বাপ যা পয়সা করেছে কি বলব! আমাদের অসি যেমন ডাক্তার হয়ে বেরুচ্ছে, সেও তেমনিই বড় ডাক্তার কিসের বুঝি। কলকাতার লোক পরেশ চক্রবর্তীর নাম না জানে কে! তুমি একবার দেখ না বউ, মেয়েটি। আমাকে মেয়ের মা আর পিসী যা ধরলে!

বলা বাহুল্য অসিতের জননীর উদ্দেশে এই কথাগুলো হচ্ছিল।

অসিতের মা বললেন, তুমি যে বলছ ছোট্ট! সাজবে কি? আর তা হলে

লেখাপড়াও কি জানে তেমন? অসির পছন্দ হবে তো?

ননদ ভ্রূকুঞ্চিত করে বললেন, তুমি জানতে লেখাপড়া? আমার বিদ্বান ভাইয়েব যুগ্যি তুমি কত বড় 'বিদ্বান' ছিলে? ওব বাপ যদি চিরকাল তোমাকে নিয়ে ঘর করেছে, তার ছেলেও করবে।

এ যুক্তির জবাব মা দিতে পারেন নি। চুপ করেই ছিলেন।

সেকালের লোক বাপের ব্যবসা করত, এখনকার লোক শ্বশুরের ব্যবসায়ের উত্তরাধিকার পেতে পারে কি না ভাবে। যাই হোক, সব দিক ভেবে পিসীমা জেঠীমা ঠাকুমা এবং মাতা ও পিতা সকলের সম্মতিতে অসিতের বিবাহের আয়োজন হতে লাগল।

মাসীমা বেড়াতে এসে বললেন, দিদি 'রাজযোটক' নাকি মিল হয়েছে! গণৎকার দেখিয়েছেন তোমার শাশুড়ী। এমন মিল নাকি সেই রাম-সীতার হয়েছিল!

জ্যোতিষশাস্ত্রমতে রাজযোটক মিল হল। গণ-বর্ণেও নাকি মিল চমৎকার। মেয়ে একেবারে শূদ্রবর্ণ। বর্ণশ্রেষ্ঠ মেয়ে! এ পর্যন্ত যাদের বিয়ে হয়েছে, দেখে এস গিয়ে (ঠাকুমা বলেন) তাদের দুর্গতি, তাদের নাম বলতে নেই!

অসিত শূদ্রবর্ণ শুনে একটা রসিকতা একবার করতে গিবেছিল, ঠাকুমার পরিহাস ও ধমকে চুপ হয়ে গেল।

যথাকালে যথারীতি অনুপ্রভার অসিতের বিবাহ হয়ে গেল।

সেই ছোট বউ দিনে দিনে বিয়ের জল পেয়ে শশিকলার মত অথবা বর্ষার কলাগাছের মত প্রবর্ধিত হয়ে উঠল।

ঘরবসতে এল শ্বশুরবাড়ি। ভাঁড়ারের উনকুটি-চৌষট্টি সব কাজ করে, পান সাজে। শুচিতা রক্ষা করে সর্বাংশে।

খ্যাতির শেষ থাকে না।

তারপর ঠাকুমা যথাকালে স্বর্গারোহণ করেছিলেন। পিসীমা প্রথম-স্থানীয়েব প্রশংসাপত্র দিয়ে তীর্থবাসিনী হয়েছিলেন। মাসীমা রাজযোটকের জোড় দেখতে আর আসতে সময় পান নি। অসিতের বাপও মারা গিয়েছিলেন।

বাড়িতে ছিলেন অসিতের মা আর তাঁর অন্য ছেলেমেয়েরা। আর অনু আর তাব ঐ ছেলেটি। আর অনু আর তার শুচিতা।

অসিতের অনুকে মনে করলে আচার বাদ অনুকে মনে হয় না, আর আচার মনে করলে (অসিত অবশ্য জানে না আচার-তত্ত্ব), শুচিতা মনে করলে অনু ছাড়া তার

অস্তিত্ব নেই, ওর মনে হয়। এই অসুখ আর ছেলের কথা হচ্ছিল এবং পিসীমার।

মধ্যপথে সতীশ আসাতে অসিতের রাগটা হজম করে নিতে হল, এবং হাসিমুখে বাইরে যেতে হল।

তারপর সহাস্যে চেয়ার টেনে বললে, বসবে? চা খাবে?

সতীশ বললে, না, বসব না। মেয়েটা সাত দিন একাজ্বরী হয়ে আছে। একবার দেখবি তুই?

ডাক্তারের গাড়ি বের করাই ছিল, সতীশের মেয়েকে দেখতেই আগে গেল। বছর দশেকের মেয়ে, জ্বর হয়েছে, রুগ্ন মনে হয় না, আচ্ছন্ন মোটেই না। সকালে জ্বর কম, বেশ সহজভাবে কথা কইলে।

মেয়ের মা পাশেই বসে ছিল, অপ্রস্তুতভাবে নমস্কার করলে।

ঘরে টিপয়ে ওষুধ-বিষুধ, টেবিলে প্রেস্কৃপ্‌শন-আদি, ছোট এক টুলে কুঁজো গেলাস, খাটের তলায় 'চিলিম্‌চি'। খান দুই চেয়ার, একখানা ইজিচেয়ার আর একটা ছোট ক্যাম্প-খাট মোড়া একধারে।

রোগী দেখা হল।

ডাক্তারের হঠাৎ মনে হল, রোগীর স্বাস্থ্য তো ভাল। রোগ এখনও কিছুই করে নি। নিজের 'পুঁয়ে-পাওয়া' ছেলেটিকে তৎক্ষণাৎ মনে পড়ে গেল, এবং তারপরেই মনে হল, এদের ঘরটি বেশ পরিষ্কার ঝরঝরে। না, দামী ছবি আসবাবপত্র বড়লোকের মত কিছু নেই, সব সোজাসুজিই।

কিন্তু ওর মনে হল, ওদের যেন বেশ পছন্দ আছে। আর মনে হয়, ওরা যেন বেশ সুখী। অবশ্য সুখ বা অসুখের প্রত্যক্ষ প্রমাণ সে জানে না, তবু—

ডাক্তার ওষুধ লিখলে, পথ্যের ব্যবস্থা দিলে, মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করলে, বন্ধুর সঙ্গে আলাপ্‌ করলে, বন্ধুর স্ত্রীকে ভরসা আশ্বাস দিলে রোগ সম্বন্ধে, অবশ্য একটু সহজভাবেই।

উঠল যখন, তখন ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখে নটা বেজে সাঁইত্রিশ মিনিট। প্রায় দু ঘণ্টা হল। ওর ডাক্তার মিত্রের সঙ্গে একটা রোগী দেখতে যাবার কথা আছে ঠিক দশটার সময়। ডাক্তার আর দাঁড়াল না। বললে, আবার ওবেলা খবর দিস।

ওবেলা খবর দেওয়ার আগে আপনি এল।

তারপর এবেলা ওবেলা করতে করতে কখন রোগটা হয়ে গেল টাইফয়েড এবং অবস্থা হয়ে এল সঙ্কট, আর সপ্তাহটা দ্বিতীয়ের শেষ সীমায় পৌছল, মেয়ের বাপের চিন্তিত এবং মা'র শঙ্কিত কাতর দৃষ্টি একান্ত করে ওর শরণ চেয়ে ওকে বাড়ির লোকের মত করে ফেললে, ও জানতেও পারলে না।

ওর মেয়েটির ওপর হল মায়া, বন্ধুর ওপর দয়া, বন্ধুর স্ত্রীর ওপর জন্মাল এমন একটা মনোভাব যেটাকে শ্রদ্ধা বলা যেতে পারে, সম্ভ্রমমিশ্রিত করুণাও বলা যেতে পারে এবং ভদ্রতামিশ্রিত মোহও বলা যেতে পারে। আসলে ওদের সাহচর্য লাভের একটা লোভও ওর ডাক্তারির কর্তব্যের দায়িত্বের চেয়ে ওকে পেয়ে বসল। সোজা কথা, ওদের ওর ভারী ভাল লাগল, এবং মুহূর্তে সেই ভাল লাগার মহেন্দ্রক্ষণ এল—যে সময়ে ওর বাড়িতে অত্যন্ত বিতৃষ্ণা জন্মেছিল। ফলে ওর বন্ধুর বাড়ির সব কিছুই যেন অতিশয় অভিনব মনে হচ্ছিল। অমুর সঙ্গে যেন কেবলই তুলনার কথা মনে ওঠে।

৩

দ্বিতীয় সপ্তাহের শেষ হল। তৃতীয়ের রাত্রি যত বাড়ে, রেণুর মা'র শঙ্কিত চোখ ততই ওর পানে কাতর হয়ে চায়। এটা-সেটা গোছায়, আর ঘর থেকে নড়ে না।

ডাক্তার নাড়ী দেখে, শ্বাসপ্রশ্বাসের সংখ্যা গোনে, রোগীর খুঁটিনাটির বদল লক্ষ্য করে। রাত্রি বাড়ে।

যেমন উঠতে যাবে, হঠাৎ নিরু বললে, আজকে অসিতবাবু থাকুন না। স্বামীর দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করে, যদি কালকের মতন বাড়ে?

সতীশ উৎসুকভাবে বন্ধুর দিকে চাইলে।

অসিত ডাক্তার-হিসেবে কি করে হাসিমুখে রোগীর স্বজনদের অনায়াসে মিথ্যা কথার আশ্বাস দেওয়া যায়, তাতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল। নিরুর মুখের দিকে চেয়ে তেমনই ভাবেই বলতে গেল, না, ভয় কি আর? ভয় তেমন যদি হয়, আমি আসব'খন ডাকলেই।

বলতে পারবার আগেই নিরু বললে, আপনার খাবার এখানে করতে বলে দিই না? নাই বা গেলেন আর। বাড়ীতে ড্রাইভার গিয়ে খবর দেবে'খন।

সতীশ বললে, আবার ডাকব কালকের মতন? তার চেয়ে থাক না আজ। কষ্ট হবে?

অসিত বললে, আচ্ছা। কিন্তু খাওয়ার ব্যবস্থা নয়, আমি এগারোটা আন্দাজ আসব। কিন্তু আজ দরকার হবে না বোধ হচ্ছে।

নিরুর মিনতি-কাতর চোখ ওর দিকে চেয়ে থাকে। অসিত হাসলে, আপনি তো আচ্ছা ভীতু! আসব'খন। ততক্ষণে মা'র দৃষ্টি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

পথের লোক-চলাচল কমে গেল। পাড়া নিঝুম হয়ে আসে। একটি আধাজাগ্রত অর্ধেক-আচ্ছন্ন শান্তি পল্লীর পথে জেগে থাকে! সতীশ আর নিরু পথ চেয়ে থাকে।

অসিত ডাক্তারখানা থেকে বাড়ি ফেরে। খায়, যথারীতি শোবার ঘরে গিয়ে ছেলের গা দেখে, আগামী সকালের কাজকর্ম, কেসেব কথা ডায়েরিতে দেখে রাখে, আরও কিছু বা টুকে রাখে।

ঘরের দক্ষিণের জানলা বন্ধ, মশারি-ফেলা খাটে ছেলে ঘুমোয়, বউ তখনও খেয়ে আসে নি। নিজের বিছানার দিকে একবার চাইলে। বিছানা ওর মনে কোনই মোহ জাগায় না, কর্মক্লান্তের আকর্ষণও না। ও মা'র ঘরে গিয়ে বলে, তা হলে মা আমার একটি রুগী দেখতে এখন যাচ্ছি। হয়তো আসতে পারব না।

কথার জবাব নেবার দরকার হয় না। তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যায়, দরজা পার হয়ে গাড়ি আপনি চালিয়ে বেরিয়ে যায়।

রোগীর বাড়িতে মেয়ের বাপ জেগে ইজি-চেয়ারে বসে সিগারেট খায়, আর মাঝে মাঝে হাই তোলে। ঘড়িতে সওয়া এগারোটা। মা ক্যাম্পখাটখানিতে মেয়ের পাশে শুয়ে, মেয়ের মাথার পাশে মাথা রেখে তার একটি হাত ধরে ঘুমিয়ে পড়েছে।

ডাক্তার এসে রোগীর রোগের বিবৃতিপত্র দেখে বন্ধুর কাছে এসে বসল।

ভাল আছে মনে হচ্ছে। তবে বলা যায় না কিছু, এসে যখন পড়েছি, তা হলে থাকি, ইত্যাদি।

আরও রাত্রি বাড়ে। বাপ হাই তোলে আর ঘড়ি দেখে। অবশেষে বলে, নিরুকে ডাকি ?

না, না তোমরা ঘুমোও। উনি ঘুমোন না, বড় ক্লান্ত হয়েছেন। আমি আছি।

বাপও ঘুমোয়—ইজি চেয়ারেই। ডাক্তার মাঝে মাঝে বই পড়ে, মাঝে মাঝে রোগীকে দেখে।

নিরু একবার চোখ খুললে, তারপর ডাক্তারকে দেখে আশ্বস্ত-ভাবে একটু হেসে আবার ঘুমল।

কিন্তু বিপদের রাত্রি আর বিপন্নের দুঃখ কি একটা, না একদিন ? সে রাত্রি ভাল কাটল তো অন্য রাত্রি আছে, দিন আছে। কোন দিন বা শেষরাত্রে গেল জর নেবে ৯৬'৪-এ, গা যায় হিম হয়ে। কোন দিন বা ১০৫'৮-এ এসে বিহ্বল করে তোলে। মা-বাপেরও বিহ্বলতা আসে ভয়ে। মা যেন মেয়ের মতই অসাড় হয়ে যায়।

ডাক্তার একমনে ইন্‌জেক্‌শনের ওষুধ ঠিক করে। আইডিন দিয়ে এটা মোছে, ওটা মোছে।

ডাক্তার যেন অনাসৃষ্টি দেরি করেন! নিরু ভাবে, রেণু কি হিম হয়ে যাচ্ছে! গলা থেকে যে স্বর বেরোয় 'ওগো,' তা কান্নার চেয়ে বিশ্রী।

ডাক্তার চমকে ফিরে তাকায়, তারপর রোগীর নাড়ী দেখে ধমক দিয়ে বলে, ছি, করছেন কি?

কিন্তু অত্যন্ত করুণা হয়। বাড়ি যাওয়া আর হয় না। এমনই করে ভয়াবহ তৃতীয় সপ্তাহ গেল; রোগ কমার মুখ নিলে। চতুর্থও যায় প্রায়।

ডাক্তারের নাইট ডিউটির দায়িত্ব আর যায় না।

যদি?—যদির কথা বলা যায়?

চতুর্থের শেষের দিকে সতীশ বললে, আচ্ছা ভাই, তুমি বাড়ি যাও আজ। ক'দিন না শুয়ে তোমার যা অবস্থা হয়েছে। দরকার পড়ে তো—বোধ হয় আর দরকার হবে না। কি বল?

ডাক্তার সান্ধ্য চা পান করতে করতে মৃদু হাসে।

নিরু বললে, আর কিন্তু আপনাকে কষ্ট দেওয়া অন্যায় হচ্ছে। স্বার্থপরের মত কাজ।

অসিত ভাবে, ভারী সব নিঃস্বার্থ হয়েছে আজ! একটু হেসে সে ওঠে।

৪

প্রথামত শোবার ঘরের খাটের বিছানা সাজানো পাতা থাকে। অসিত বাইরেও থাকে, আবার আসতেও পারে।

অসিত ঘরে ঢুকল। নিয়ম এবং অভ্যাসমত (যদিও কদিন অত নিয়ম ছিল না) মশারি তুলে ছেলের গা দেখে, মাথায় ঘাম হচ্ছে কি না দেখে। না, জ্বর নেই। অঘ্রাণ। কিন্তু ঘরটা কি বিশ্রী গরম! জানলা ক'টা সব বন্ধ। অনু অকাতরে ছেলের পাশে ঘুমচ্ছে। অসিত মাথার কাছে জানলাটা খুলে দেয়। এই বিশ্রীভাবে সব বন্ধ করে শোওয়া যে কত খারাপ, ও বলে বলে অনুকে পারে না। কিন্তু কি লাভ?

এখুনি খোকার কি হবে কে জানে, দিনের পর দিন আবার তাই নিয়ে ওকেই ভুগতে হবে।

কিন্তু ঘরের এই বন্ধ গরমে মশারির ভেতর অনু বেশ ঘুমচ্ছে। ওর আশ্চর্য মনে হয়, ওদের সবারই কি শোয়াও একরকম! নিরুও তো অমনই করে ঘুময়। সে বা সতীশ জাগে তো একেবারেই জেগে থাকে, ঘুমোয় তো নিজের কথাই মনে থাকে না, তা ছেলেমেয়ে!

সে যাক। কিন্তু নিজের বিছানায় শুয়ে, নিজের ঘরে শুয়ে ওর না হল ঘুম, না হল আরাম। যেন এর চেয়ে ওখানে ঘুম হত। ক'দিন বা ওখানে থেকেছে! কিন্তু কি অদ্ভুত, নতুন অভ্যাসেও পুরানোতে অনভ্যস্ত করে দেয়!

অসিতও ঘুময় না। মাথার কাছে খোলা জানলা দিয়ে আকাশের দিকে চায়।

আকাশের অন্তহীন জ্যোতির্লেখা আর মনের অনন্ত ছায়ালিপি মিশে যায়। মন কি বলে, কি ভাবে, ও যেন বোঝে খানিকটা। কিন্তু—কিন্তু, কি দরকার তাতে?

ও অত্যন্ত অভিভূতভাবে আড়ষ্ট হয়ে নিজের শয্যায় অপরিচিতের মত শুয়ে থাকে। ওর মনে হয়, ঐ ঘুমন্ত অনুকে চেনে না। ওদের কাউকে চেনে না। ও সন্ন্যাসী নয়। সুষুপ্ত যশোধরাত্যাগী সিদ্ধার্থও নয় সে। কিন্তু ওর যেন সমস্ত মন অসাড় হয়ে থাকে। ঐ রুগ্ন সন্তান? হ্যাঁ, ওরই। কিন্তু মায়া হয় না ওর ওপর। শুধু মমতাহীন দয়া হয় একটু।

নিজের এই অদ্ভুত মনের ভাবকে ওর ভাল লাগে না। কিন্তু আশ্চর্য, ওর খারাপও লাগে না। ওর সত্য মনে হয়। কি রকম একটা অতি অদ্ভুত শূন্যতা আর একটা অপূর্ব বিস্ময়ব্যথিত সজ্ঞান দুঃখ ওর মনকে মথিত করতে থাকে। হঠাৎ যেন টের পায় এতদিনে যে, অনুকে চায়ও নি, পায়ও নি এবং কোন মোহ-মমতাও ওর মনে নেই তার জন্যে।

অনুর দিকে একটুখানি চায়, সে বেশ ঘুময়।

খোকা উসখুস করে। একবার একটু কাসলে।

অসিত চকিত হয়ে উঠল। উঠল, আলো জ্বাললে। অঘ্রাণ মাস। বলা যায় না, হয়ত খোকার ঠাণ্ডা লাগতে পারে। ঘড়িতে তিনটে। এতক্ষণ জেগে ছিল, না একটুও ঘুমিয়েছিল, অসিত মনে করতে পারলে না। কিন্তু আর তো জেগে থাকা উচিত নয়। জানলা বন্ধ করে দিয়ে একখানা শতরঞ্চি আর গায়ের কাপড় বালিশ নিয়ে সে বারান্দায় বেরিয়ে এল। ডাক্তারি হিসেবে ঘুমনো উচিত।

বারন্দা থেকে যে আকাশ দেখা যায়, তার নীচে প্রান্তর অরণ্য না থাক, কলকাতার বাড়ির সমারোহই থাক, সে আকাশ অনেকখানি। অনেকগুলো তারা ওর দিকে চেয়ে থাকে। কিন্তু শীতের ঠাণ্ডায় একটা নিষ্ঠুর ঘুম-পাড়ানো স্পর্শ আছে। অসিতের ঘুম আসতে দেরি হল না।

যথারীতি অসিত সকালে বেরয়। সতীশের বাড়ি একবার যেতে হবে, কাল রাত্রে রেণু কেমন ছিল! ভালই অবশ্য, তবু ওর তো কর্তব্য।

সতীশের চা ও জলযোগের ব্যবস্থা টেবিলে রয়েছে।

নিরু চায়ের কথা জিজ্ঞাসা করে। ডাক্তার বসে।

সতীশ আর ডাক্তারে গল্প হয়। নিরু শোনে। ডাক্তারের মনে হয়, নিরু যেন সব বোঝে, বুঝতেও পারে। নির্মল বুদ্ধির দীপ্তি ওর মুখে ললাটে চোখে দেখা যায় যেমন, এমন তো কই আর সকলের মুখে লক্ষ্য করে নি ও!

সকলে আর কে? তবে?—যাক সে?

ডাক্তার চুপ করে একটু দেখে। নিরুর প্রতি যেন ওর শ্রদ্ধা-প্রশংসার শেষ থাকে না।

নিরু জানে। নিরু বুঝতে পারে ওর প্রশংসার ভাব। ওর অপ্রস্তুত মনে হয়। কিন্তু বেশ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সতীশ বুঝতে পারে, যেন একটু পরিহাসের ভাবে দেখে। নিরুও যেন ডাক্তারের ভক্ত, অবশ্য মেয়ের জন্যই। তবু সতীশের একটু যেন ঈর্ষাও হয়।

তোমার বেরুবার সময় হল না অসিত?—সতীশ জিজ্ঞাসা করে।

ডাক্তার জবাব দেয়, হ্যাঁ, এইবার উঠি। একটু রেণুকে দেখে গেলাম। এখনও তো নিয়ম দরকার।

নিরু প্রশ্ন করে, এখনও কি ভয় আছে নাকি অসিতবাবু?

স্নিগ্ধভাবে ডাক্তার বলে, না, ভয় আর নেই বড়। তবে ভয় হলে তো আমরা আছিই।

মা বলে, আর কাজ নেই আপনাদের—বাবা!

ডাক্তার অপ্রস্তুত হয়ে যায়। তার মনে হয়, এরা—রোগীব স্বজনরা কি অকৃতজ্ঞ। এতদিন ধরে এত কষ্ট স্বীকার করে ওর সন্তান বাঁচালাম, দরকার পড়লেই আসব, তবু—। অন্য রকমও তো বলতে পারত।

সতীশ জিজ্ঞাসা করে, হ্যাঁ হে, কোথাও একটু চেঞ্জে গেলে কেমন হয়? তা হলে বোধ হয় নতুনত্বে মেয়েটা একটু সারেও শিগগির, না?

প্রশ্নটা যেন ডাক্তারের মনকে আঘাত করে। সামলে নিয়ে সে বললে, কোথায় যাবে ভাবছ?

তুমিই বল না?

অসিত বলবার আগেই মেয়ের মা আর মেয়ে প্রস্তাব করলে, মেয়ের মামার বাড়ি অর্থাৎ মা'র বাপের বাড়ি—পাটনা।

পাটনা এ সময়ে বেশ, না?—নিরু প্রশ্ন করে।

সতীশ জিজ্ঞাসুভাবে চায়।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই দিন ও অন্য সব সুবিধা-অসুবিধার বন্দোবস্ত হয়ে গেল। দিন আষ্টেক পরেই যাওয়া। রেণু ততদিনে দুটি ভাত পেতে পারে।

সতীশের মুখ বেশ প্রসন্ন হয়ে উঠল। নিরুরও।

কিন্তু ডাক্তার গম্ভীর হয়ে গেল। সে গম্ভীর মুখে ওষুধ-পথ্যের কথা বলতে বলতে উঠল সেদিনের মত।

নিরু বললে, আবার ওবেলা আসবেন।

৫

ওদের যাত্রার দিন এসে পড়ল।

হাওড়া স্টেশনে ওদের গাড়িতে তুলে দিতে গেল অসিত। মেয়ের শোবার জায়গা করে, বিছানা পাতিয়ে, মা'র বসবার জায়গা করে দিয়ে, তখনকার স্বাচ্ছন্দ্য, রাত্রির সুবিধা, রোগীর ওষুধ ও আহার্যের নিয়ম,—নানা কথা বলে, নানা ব্যবস্থা করে সে। সব ঠিকঠিক করে।

সতীশ বসে সিগারেটের কেস খুলে অসিতকে দেয়।

ডাক্তার বসল রেণুর বেঞ্চিতে। নিজেরাই তো তিনজন, চতুর্থ বার্থটায় লোক নেই। গাড়ি ছাড়তে সামান্য দেরি আছে।

সতীশ চুপচাপ সিগারেট খেয়ে যাচ্ছে।

উল্লসিত রেণু অনর্গল বকে যাচ্ছে। তার মা কেমন অপ্রস্তুতভাবে প্ল্যাটফর্ম দেখছে।

ঐ দেখ মা, চীনেবাদামওয়ালা। কবে খেতে পাব চীনেবাদাম ডাক্তারবাবু? ওমা, আজ একটা খাই? ও বাবা?

মা বললে, না, ওকি?

বাপ জবাব দিলে না। ডাক্তার চুপ ক'রে হাসলে শুধু।

বাঁশী বাজল, ডাক্তার নেমে গেল। সতীশ উঠে প্ল্যাটফর্মে নেমে আন্তরিকভাবে ওর হাত ধরে খুব ঝাঁকানি দিয়ে একটা হাত ধরেই গাড়ির পাদানের ওপর পা দিয়ে দাঁড়াল। হঠাৎ যেন ট্রেন ছাড়বার উদ্দেশ্যে, ওর বন্ধুর ওপর যে একটু বিরুদ্ধ ভাব নিরুর কৃতজ্ঞতার জন্য জন্মেছিল, সব মিলিয়ে গেল।

গাড়ি চলতে আরম্ভ করল। বিদ্বেষ ও বিপদ মুক্ত বন্ধু এবারে আন্তরিক হেসে বন্ধুকে নমস্কার করলে। নিরুও নমস্কার করলে।

নিরু বললে, বড় ভাল আর ভদ্র, না?

সতীশ কাগজ পড়ছিল বোধ হয়, জবাব দিলে না।

ওধারে গেছে পঁয়ত্রিশ দিন রেণুর অসুখে। আর এদিকে দিন তিনেক।

অসিতের পুরনো নিয়ম, ধারাবাহিকতা আবার এসেছে। খোকা, অনু, মা—তাঁদের শুচিতা, চাকর, ঠাকুর, আর কাজ ও তার গোলমাল নিয়ে স্বচ্ছন্দে আছেন। পুরাতন প্রথায় একই ভাবে সংসার চলছে।

খালি মাঝে ক'দিন ও টের পায় নি। তাতেই ওর যেন গতিচক্রের ধরন একটু নতুন লাগছিল।

ঠাকুমার কোলে খোকা তেমনই রুগ্ন মুখে হাসে।

অনুর পক্ষে স্বামী যেন একটা অবান্তর বিষয়। সে কাজকর্ম আর আচার-শুচিতারক্ষা প্রথামত করে যায় তেমনই।

তার স্বামী এতদিন যে ছিল আর মাঝে ক'দিন যে ছিল না, তার কথা ভাববার ওর অবসর নেই। ও হচ্ছে সেই জাতের স্ত্রী, কাছে থাকলে অনুগত, অবশ্য স্বভাবানুগতা ভাষা, দূরে থাকলেও সেবাব্রত গৃহিণী, বিরহান্তরিতা দয়িতা নয়।

চিঠি এল। ওরা পৌঁছে খবর দিয়েছে।—রেণু বেশ ছিল, বেশ আছে। সকলেই বেশ ভাল আছে, আর খুব ভাল লাগছে ইত্যাদি।

অসিত চিঠিখানা পড়ে নির্লিপ্তভাবে ব্লটিং-প্যাডখানার তলায় রেখে দিলে। সে আর আশ্চর্য কি! ভাল লাগবেই, জানা কথা। কিন্তু ওর যেন ভারী দরকার সেটা জানা। আর রেণু ভাল আছে! বেশ, ভাল কথা। কিন্তু এ চিঠি তো জবাবের জন্যে নয়। রাখবার বা কি দরকার? তা থাকগে। চিঠি চাপা থাকে। ওর কেমন বন্ধু আর বন্ধুর স্ত্রীকে অকৃতজ্ঞ মনে হয়। মনের এক কোণে সে কথার প্রতিবাদ ওঠে। কিন্তু তবু মনে হয়।

অসিত উঠে পড়ে, বেরুতে হবে।

৬

বেশ শীত পড়েছে। রাত্রি অনেক হল। অসিত কি একখানা নতুন বই পড়ছিল। টেবিলের কাছে বসে পড়তে বেশ শীত করতে লাগল।

অনেক দিনের পর পুরনো নিয়ম মত উঠে ছেলের টেম্পারেচার নিতে যায়। না, জ্বর নেই। চেহারাটাও যেন ভাল দেখাচ্ছে। নাড়ী বেশ ভাল। নিরু একভাবে তেমনই একটি হাত ছেলের গায়ে রেখে ঘুমচ্ছে। ওর নিরুকে মনে পড়ে গেল।

আশ্চর্য, আজ আর ওর দয়া হয় না খোকার ওপর। বেশ মায়ায় স্নেহে মন পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। নিরুর দিকে চায়। মনে পড়ল, ওর আচার-বিচার, ছেলের অস্বাস্থ্য। মনে হল, সেই দধিবীজের বিরক্তিকর কথার পর আর ওর সঙ্গে বড় কথাবার্তা হয় নি। কিন্তু আশ্চর্য, সে কথা ওর মনেও ছিল না। যেন ঐ রকমই স্বাভাবিক। কিন্তু সে কি সম্পর্কহীনের মত উদাসীন? ওদের কি কথান্তর হয়েছিল? না, মনে পড়ে না তো।

অনুর ক্ষীণ দেহখানি কাত হয়ে ছেলের দিকে ঝুঁকে আছে। এখন চোখ বুঁজে, তাই মুখশ্রী বয়সের মতই কোমল, ছেলেমানুষ। নইলে সংসারের মধ্যে অনু যেন পিসীমার মূল্যবান পকেট-সংস্করণ—কথায় ও আচারে। ওর রকম মনে করে অসিতের হাসি পেল। নিরু সুন্দরী, ঘুমলে খানিকক্ষণ দেখতে ইচ্ছে করে। কিন্তু অন্য সময়ে?

তা হলেও আশ্চর্য, আজ ওর ওপরও অসিতের মায়া হয়।

অনুর গায়ের কাপড় সরে গেছে। কুঁকড়ে শুয়ে আছে। শীত করছে বোধ হয়। বিদ্যুৎ নিভিয়ে সে পাশের খাটে নিজের বিছানায় উঠে অনুর গায়ের কাপড় টেনে ঢাকা দিয়ে দেয়। ঠিক করতে লেপে টান পড়তে নিরু বললে, উঁ?

অসিত বললে, কিছু না।

লেপটা টেনে গলা অবধি ঢাকা দিয়ে দিলে।

অনু সেটাকে আরও টেনে মুড়ি দিয়ে পাশের খাটে ওর দিকে সরে এল। জড়িত স্বরে বললে, বড় শীত।

অসিত বললে, হ্যাঁ, লেপটা সরে গেছে যে।

অনু আরও সরে এল। ওর গরম নিশ্বাস অসিতের বুকের পাশে পড়তে থাকে।

কোণের আধখানা খোলা জানলা থেকে পথের আলো পড়ে ঘরেব অন্ধকারটা যেন একটু পাতলা হয়েছে।

নিদ্রাহীন চোখে সেই আলোয় পথের দিকে ও চেয়ে থাকে।

ঘরে শুধু দুটি ঘুমন্ত মৃদু শান্ত নিশ্বাসের শব্দ শুনতে পাওয়া যায়।

অসিত অন্যমনে ছেলেব বিছানার দিকে তাকায়।

হঠাৎ অসিতের মন কি রকম অদ্ভুত অজানা দুঃখে কোমল হয়ে ওঠে। পাওয়ার মধ্যে যার পরিচয় ও জানে না, সেও হয়ত জানে না, একেবারে অচেনা, অথচ দিনের সঙ্গে রাত্রির সম্পর্কের মত যার সঙ্গে সম্বন্ধ একান্ত নির্ভরশীল, আপেক্ষিক, অচ্ছেদ্য যেন,— সেই অপরিচিতা, অপরিচিত ওর ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরতায় কেমন নিশ্চিন্ত, তৃপ্ত।

ওর মন পরম করুণায় ভরে যায়। অনুর পিঠে হাত রাখে।

পাতলা ঘুম-চোখে অনু আবার বলে, কখন এলে?

যেন রোজই একভাবে কেটেছে, একটুও ফাঁক পড়ে নি, যতি ছিল না, ব্যতিক্রম হয় নি। স্বামীর মনের পরিচয়ও সে জানে না যে, তাও বোঝে না যেন।

সকরুণ আদরে অসিত তাকে বলে, ঘুমও।

আজ আর তার অনুর ওপর বিরাগ হয় না, বিতৃষ্ণা আসে না, এমন কি ওর বিপর্যয় আচারের কথাও মনে থাকে না।

নিছক দয়াতে ওর মন পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। তার মনের উদ্বেলিত করুণাসাগরের তরঙ্গের মাঝে কোন কিছুই, কাউকেই স্পষ্ট করে দেখা যায় না—অনুকেও না, নিরুকেও না। ও যেন সেই 'ঘরে বাইরে'র ভাঙা আরশি।

কি জানি কেন, অসিতের গোপন অজানা মন কেবলই বলে, আহা!

সে যেন আজ জানতে পারলে, ওই অনু তার দয়িতা নয়, প্রিয়া নয়, ও দয়ার পাত্রী।

আর আস্তে আস্তে সেই 'আহা'টা মস্ত হয়ে, বিরাট হয়ে ওর সমস্ত মনের মোহ, প্রেম, আকাঙ্ক্ষা, ভালবাসা সব ঘিরে ঢেকে ফেললে।

ওর বাহুর মূলে মাথা রেখে নিরুদ্বেগ ঘুমে আচ্ছন্ন অনু। অসিত নির্লিপ্ত উদাস ভাবে শুয়ে শুয়ে আকাশ-পাতাল ভাবে।

অপরিসীম শ্রদ্ধা, আনম্র প্রেম, দুর্বার মোহ, কোন কিছুই ওর নেই,—ও জানতে পেরেছে।

ছোটগল্প—পৌষ, ১৩৪০

তিন কন্যা

একটি নারী হলেন—স্ত্রীলোক, দুটি মেয়ে মানে—গল্পগুজব, কথালাপ; আর তিনটি নারী লেখা মানে—কলহ-কোলাহল। চীনে ভাষার অভিনব চিত্রকলা-পদ্ধতি-অনুগামী বর্ণমালা নাকি এই রকম।

মা ছিলেন না, ছিলেন বুড়ো বাপ, আর তিন মেয়ে। বড়টি বিধবা; মেজটিকে শ্বশুরবাড়িতে পীড়ন করে, সে যায় না, ছোট অবিবাহিতা। বড়র নাম কমলমণি, মেজ কাদম্বিনী, ছোট কুমুদিনী।

বাবাকে ওরা সকলেই খুব ভালবাসে এবং ভয় করে না একটুও। গল্প করে, শাসন করে, সেবা করে, যেন তিন মায়ের একটি ছেলে। ফলে, অসুখ করলে টক্কর দিয়ে সেবা করে। পিকদানিটা, চিলিমচিটা, জলের ঘটিটা নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে যায়। বিছানার চাদর কাপড় বদলানো নিয়ে, পায়ে মাথায় হাত বোলান নিয়ে তিন বোনে কথা কওয়া বন্ধ হয়ে যায়। বাপের শারীরিক অসুখ ভুলে গিয়ে মানসিক অবস্থাটা এমন প্রবলতম হয়ে ওঠে যে, বেচারা পারতপক্ষে কন্যাদের জানান না।

কুমুদিনীকেও ভালবাসে দুই বোনে। মেজর সঙ্গে ভাব, বড়র আছে কন্যাস্নেহ। মেজর খেলার সাথী, বড়র হাতে করে মানুষ করা—মাতৃহীনাকে। কুমু একবার ধাক্কা খায় মেজদিদির কাছ থেকে, আবার খায় বড়দিদির কাছ থেকে।

কুমুর হয় নি বিয়ে, আর বাপের ছিল স্থায়ী বাত; কাজেই আন্দোলন-দোলনের শেষ ছিল না। কথা হয় দুই বড়তে; সব বড়র কাছে পৌঁছয়; সব ছোট হয় সাক্ষী; বাপ সাক্ষীগোপাল হয়ে চেয়ে থাকেন।

ভাবেন, আহা, ও বিধবা মানুষ, চিরদুঃখী। মেজকে শাশুড়ী যা কষ্ট দেয়—কবে

যে স্বামীটা সুবুদ্ধি করে ওকে আগলাবে। দুই বোনেই রাগ করে, কাঁদে, কালবোশেখীর মতন আসে, বাপের মন অন্ধকার করে দিয়ে চলে যায়।

কুমু পান সাজছে। মেজদি রান্নাঘরের যোগাড় দিতে ব্যস্ত। বড়দি পূজায় বসেছেন।

হঠাৎ একটা 'উহুহুঃ' শোনা গেল। কুমুদিনী কাছের ঘরে ছিল। কি বাবা, কি হল?—বাপের ঘরে প্রবেশ করলে। গোলমালের ভয়ে বেচারা বৃদ্ধ দিন তিনেক অতি কষ্টে চুপ করে ছিলেন, কষ্টটা বেড়েছে—সেদিন মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল।

না রে, আবার হাঁটুর ব্যথাটা বেড়েছে।

কুমু ব্যস্ত হয়ে বললে, হাত বুলিয়ে দেব বাবা? সেঁক দেব?

না না। হৈ হৈ করিস নি। একটা মাষতেল আনিয়েছি, তাতেই কমবে'খন। কাজ নেই গোল করে।

বাতের ব্যথা, তখন অমাবস্যার কাছাকাছি, চিড়িক মারতে আরম্ভ করেছে, ওঠবার চেষ্টামাত্রেই একেবারে 'আহাহাঃ' বলে মুখটা কুঞ্চিত হয়ে উঠল।

কুমুদিনী বিনা বাক্যব্যয়ে রান্নাঘরের দিকে গেল, বড়দি তখনও পূজায়, মেজদি তবকারির ঝুড়িতে বেষ্টিত হয়ে বসে কুটনো কুটছিল।

ভাই, বাবার আবার হাঁটুটা টাটিয়েছে। একটু মালিশ করি?

মেজদি বললেন, একটু সেঁকও দে না, কমবে'খন। চল, আমারও হয়েছে।

একটা মালসায় করে কাঠকয়লার আগুন তৈরী হচ্ছে। কমলমণির পূজো হল, তাম্রকুণ্ডখানি হাতে করে তুলসীমূলে জল ঢালতে এলেন। মালসাটি একবার নিরীক্ষণ করে নীরবে সূর্যমন্ত্র পাঠ, সূর্যপ্রণাম করে জলটুকু তুলসীতলে ঢেলে বললেন, কি রে কুমু, আগুন কেন?

বাবার আবার এতদিন পরে বাতের বেদনাটা দেখা দিয়েছে। মেজদি বললে, সেঁক দিয়ে দি।

কুমু ক্ষিপ্র হাতে পাখার বাতাস দিয়ে আগুনটা গনগনে করে তোলবার চেষ্টা করছিল। বাবার চাকর পাশে দাঁড়িয়ে ছিল, কিন্তু সে নিজেই বাতাস দিতে লাগল।

কমলমণি বললেন, ও শুকনো সেঁকে তো বেশি কমবে না, ঠাকুরকে খানিক জল বসিয়ে দিতে বলগে। একেবারে কম্প্রেস করে দিইগে। বাবা কোথায়—ঘরে, না বৈঠকখানায়?

ঘরে আছেন।—বলে কুমু দিদির আদেশ প্রতিপালন করতে রান্নাঘরে ঢুকল।

কুমু ঠাকুরকে জলের কথা বললে। কাদম্বিনী বাবার জন্যে শাকের ঘণ্ট দেখিয়ে দিচ্ছিলেন, বললেন, কি রে কুমু, জল কেন? বাবা এই বাতের ওপর নাইবেন? ক্ষেপেছিস?

কুমু বললে, না, বড়দি বললেন, কম্প্রেস করতে! শুকনো সেঁক দিলে কমবে না।

আহা, চিরটাকাল গেল—লোকে সেঁক দেয়, মালিশ করে ব্যথার জায়গায়, আর আজ কমবে না? বলে, হারিকেনের আলোর ওপর নেকড়া তাতিয়ে কত সেঁক দিয়েছি, কমে নি তাতে?

পেছন থেকে বড়দি বললেন, তা, তাই দে না, এটাতে কমত, উপকার হত, এই আর কি!

কমলমণি গম্ভীর মুখে নিরামিষ-ঘরে প্রবেশ করলেন, ঠাকুরকে আদেশ দিলেন জল নামিয়ে নিতে।

বিকেল গেল, সন্ধ্যে কাটল, বড় মেয়ে আর ঘরে ঢুকলেন না। বৃদ্ধ ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, হঁ্যারে কুমু, তোর দিদি কই? কি হল আজ? কোথাও দেখাশোনা করতে গেছে নাকি?

বৃদ্ধ 'উহুহুঃ' করে উঠলেন।

কুমু ধুনো দিতে ঘরে ঢুকেছিল, তোমার কষ্ট কমে নি তো বাবা! দিদির কথা বলছ? আছেন তো।

ওঃ। ব্যথাটা আছে বইকি। বৃদ্ধ হাঁটুটিকে কোন রকম করে রাখবার চেষ্টা করছিলেন যাতে আরাম পান। কিন্তু প্রতিকারের প্রচেষ্টাতেই আরামের 'আঃ' স্থলে আর্তনাদের 'উঃ' বেরিয়ে আসে।

কুমু রান্নাঘরে প্রবেশ করলে, দিদি নেই, মেজদি আছেন, সান্ধ্য তরকারি কোটা হচ্ছে।

দিদি কোথায়, ভাই? বাবার এবেলাও কষ্ট হচ্ছে খুব।

কি জানি, বোধ হয় সন্ধ্যে করছে। তা তুই একটু বাতবিজয় তেলটা মালিশ কর না। আচ্ছা আমিও যাই।

আগুন এল কড়ায় করে, নেকড়ায় বেঁধে তুলো; দুখানি আসন পেতে দুই বোনে আগুনের দুধারে বসে গল্প করতে করতে একজন তেল-হাত গরম করে, অপরা তুলো গরম করে বেদনাস্থলে লাগিয়ে দিতে লাগল।

মৃদু গুঞ্জন, গল্প, হাসি আর বাপের সেবা চলতে লাগল।

কমলমণির সন্ধ্যে করা শেষ হয়েছিল। হাসি-গল্পের উচ্ছ্বাসে বিরক্ত হয়ে গম্ভীর মুখে ঘরে প্রবেশ করে কনিষ্ঠার দিকে চেয়ে শুষ্কস্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, বাবা কি খাবেন?

বৃদ্ধ বোধ হয় আরামে অথবা তন্দ্রায় চোখ বুজে ছিলেন, শশব্যস্ত চোখ খুলে বললেন, ব্যথাটা তো কিছু কমল না মা, কি করি বল তো?

ঐ তো সেঁক-তাপ বেশ হচ্ছে, ওতেই কমবে'খন। কি খাবে এ বেলা?

চিন্তিত মনে বললেন, শরীরটা ভাল নেই, এ বেলা আর কিছুই খাব না।

অপর দুই কন্যার দিকে চেয়ে বললেন, আমার গরম হচ্ছে, থাক এবার।

পিতা অভুক্ত থাকবেন, কমলমণির রাগ পড়ে গেল। না না, সে কি! শুকনো কিছু খেও না হয়, একটু দুধ-মিষ্টিই নয় খেও। জ্বর হয় নি তো?

বসনের শুচিতার জন্য অস্পৃশ্য না থেকে পিতার ললাট স্পর্শ করে দেখলেন, না, জ্বর কোথা? বুড়ো মানুষ রাত-উপসী থাকলে যে ঘুমতে পারবে না। একটু কিছু খেও'খন।

কুমু বলছিল কম্প্রেসের কথা, তা দিবি একটু করে? সেবারে তাতে কমেছিল। যদি কমে তো পরে খাব'খন।

স্নেহকাতর ব্যাকুল বৃদ্ধ অভিমানিনী দুহিতাকে একেবারে জল করে দিলেন।

আর রাগ চলে না।

চাকরকে জল চড়াতে বলে কুমুকে নিয়ে সেঁকের পর কম্প্রেস আরম্ভ হল।

এমনই করে একবার করে বাতের প্রকোপ, একবার করে কুমুর বিবাহের প্রচেষ্টা এবং ঐ বিষয়ে কথা আর কথান্তরে পিতা-পুত্রীদের দিনগত পাপক্ষয় হয়। মতের মিলে কাটে দুদিন, তো অমিলে এক পক্ষ কেটে যায়।

বাত যদি কমে তো কেমন হৈ হৈ করে সকালে কমলমণি, বিকালে কাদম্বিনী এসে বসেন বাপের কাছে; কুমুর দিকে আর চাওয়া যায় না, আঠারো পার হয়ে গেল, হলই বা এখনকার দিন, চুপ করে থাকাই কি ঠিক হচ্ছে ইত্যাদি।

ব্যাকুল পিতা অন্যমনে তামাক খেতে খেতে দিগন্তের পানে চেয়ে থাকেন। দূর বৃক্ষশ্রেণীর কুন্তলে দিক্‌চক্রবালে নীল আকাশের উত্তরীয় এসে ঠেকেছে, আর একটু এ নীচু আর ও উঁচু হলে এ এসে ওর ললাট স্পর্শ করে যাবে।

সাজা তামাক নিভে যায়, টেনেই ডাক দেন, ও বিষ্টু, একটু তামাক দে না রে।

কানে আসে তিন বোনের বিতর্ক-বিতণ্ডা। ব্যাকুলতায় অন্তর ভরে ওঠে, দীর্ঘকাল পরলোকগতা পত্নীকে মনে পড়ে। কবে একসঙ্গে পঠিত "তোমারে খুঁজিতে এসে চাব কার পানে" মনে পড়ে যায়। বার্ধক্যের শুষ্ক চোখে জলও আসে না; নিশ্বাস পড়ে শুধু।

ঠাকুর এসে ভাত দেয়, কমলমণি মা'র মতন পাখা হাতে বসেন, কাদম্বিনী ঠাকুরের হেঁসেলের তদারক করেন, কুমু দুধ মিষ্টি আনে—এই নিয়ম।

যেদিন ব্যতিক্রম হয়, অর্থাৎ বোনেদের মধ্যে একজন অনুপস্থিত থাকে, সেদিন আর বৃদ্ধের ভাল করে আহার হয় না।

এদিক ওদিক চান, কার প্রতীক্ষা করেন। কিন্তু ভয়ে জিজ্ঞাসাও করেন না। পাছে স্নেহের মানদণ্ডে কোন দিক ভারী মনে করে আবার কারও কিছু হয়।

যাই হোক, কুমুর বিয়ের ঠিক হয়ে গেল। দুই বোনের বাপের সমান আনন্দ।

হাঁ্যা মা, তা হলে এবারে চল, কাশীতে গিয়ে থাকিগে।

বালবিধবা জ্যেষ্ঠাকে 'মা' বলা তাঁর অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল।

মেজ চুপ করে উঠে গেলেন।

কমলমণি বলেন, পুঁটি কোথায় থাকবে? আদর দিয়ে মাথাটা খেলে বাবা ওর। দাও এবারে পাঠিয়ে—এখন তো আর ছেলেমানুষটি নেই।

বৃদ্ধ চঞ্চল হয়ে উঠলেন, সেখানে যে শাশুড়ীটা বড় দুর্দান্ত মা। তাই তো ওর কথা আমি অত ভাবি নি।

তা ওকে নিযে তো কাশীবাস হবে না। আমার তো সব চুকে গেছে আর থাকত যদি একটা কেউ পুড়িয়ে খেতে, তা হলে কি ছাই—

বাপ চারদিকে চেয়ে চঞ্চল হয়ে ওঠেন। মনে হয়, কাদম্বিনী বেচারা কি মনে করবে। খেতে আর দেরি হয় না, উঠে পড়েন।

কুমু ফিরেছে শ্বশুরবাড়ি থেকে।

নিরামিষের উনুনে পিতার আর জ্যেষ্ঠার জন্য রাত্রির দুধ মিষ্টি ক্ষীর ইত্যাদি করতে করতে কাদম্বিনীর চোখ অকারণেই সজল হয়ে আসে।

ক্ষীর যায় এঁটে; সন্দেশ কোন দিন হয় কড়াপাক, কোন দিন কাঁচাপাক, অন্য মিষ্টির ভিতর আঁটি জন্মায়।

কুমু এল পানের বাক্স নিয়ে, ভাই, কি করছিস? একটু সুপুরি কাট না। তোর চোখে ধোঁয়া লাগল কোত্থেকে?

কি জানি! মধ্যমা সুপারির পেতেটি নিলেন। চোখ আপনিই নীচু হয়ে থাকে।

কুমুর বোঝার বয়স খুব হয়েছে, তাই ছেলেমানুষ থাকা ভাল, এ জ্ঞানটাও আছে। কুমুর গল্পের স্রোত বইল। কাদম্বিনী শ্রোতা ভাল, নীরবে শোনেন। ওঁর মনের অতলাস্তিক সাগরের থই পাওয়া যায় না।

আচম্বিতে কুমু জিজ্ঞাসা করলে, হাঁ্যা ভাই, তোর শ্বশুরবাড়ি যেতে ইচ্ছে করে না? সিংগী মশাই তো লোক মন্দ নয়।

নামটা তার রমেশ, কিন্তু দিদির মুখে হাসি আনবার জন্যে কুমু তাকে সিংগী মশাই বললে।

দিদি একটুখানি হাসলেন, বললেন, তুই দেখ না ঘর করে।

যাঃ!—বলে কুমু পান নিয়ে উঠে গেল।

বাবাকে খাবার দেওয়া হল।

কমলমণির বার্ধক্যের সীমায় পৌঁছবার এতই সাধ যে, তিনি কুমুর বিবাহের পর মালা করতে করতে বৃদ্ধা পিতামহীর মত বাপের কাছে এসে দাঁড়ান। চুলগুলি দিন দিন আরও ছোট করে কাটেন। মুখখানি প্রসন্ন অথচ এমনই গম্ভীর, তাঁকে বাপ ভয় করতেন ভারি, এগারোয় বিবাহ এবং বিধবা হয়ে এক নিয়মে ত্রিশ বছর বয়স হল, তাঁর আর কিছুতেই নিজেকে ছোট মনে হয় না; যে ক'দিন মা ছিলেন সেই ক'দিন মাত্র তিনি দুহিতা ছিলেন। এখন একেবারে পিতামহীর আসনে বসেছেন যেন। তা হ'লে কি করবে ঠিক করলে?—মুলতুবী রাখা কবেকার কথা হঠাৎ এনে গম্ভীর মুখে তিনি বাপের দিকে চাইলেন।

কিসের মা?—বাপ জিজ্ঞেস করলেন।

এই কুমী তো যাবে আশ্বিন মাসে। পুঁটিকে কি করবে? আমাদের যে কাশী যাবার কথা বলেছিলে না?

পিতার তরকারি রইল প'ড়ে, ভাজা দিয়ে খেয়েই চট করে দুধের বাটিতে হাত দিলেন।

কুমু বললে, ওকি বাবা। তরকারিটা নাও, ও যে নতুন কুমড়োতে পটল দিয়ে তোমার জন্যই করেছে।

বাবা নীরবে দুধ সরিয়ে আবার তরকারিতে হাত দিলেন।

তা তুমি একখানা ওদের চিঠি লেখ—রমেশকে। এই তো সেদিন কুমীর বিয়ের সময় এসেছিল, কেমন কথাবার্তা। মা ছাই তো—বউ ঘর করবে না! এমন কথাও শুনি নি! আমি তো বুড়ো হয়ে গেছি, আজ বাদে কাল কাশীবাস করব, ওকে নিয়ে কোথায় যাবে?

বাপ বর্ষীয়সীপদাভিলাষিণী আবাল্যব্রহ্মচারিণী দুহিতার মুখের পানে একবার চাইলেন।

কাদম্বিনী এসেছিলেন মিষ্টি নিয়ে, একবার বাপের মুখপানে চাইলেন।

বাপও চেয়ে চোখ নীচু করে ছিলেন।

কুমু গেল পান দিতে। কাদম্বিনী অন্ধকারে চুপ করে বসে ছিল। আমাকে তাড়ালেই তোরা বাঁচিস। দিদি ভাবেন, আমার জন্যেই সব অসুবিধে।

দিদি এসে পড়লেন, কুমী, বাবার থালাখানা নিয়ে এসে খেতে বস।

মধ্যমার দিকে চেয়ে বললেন, কি মন্দ বলিছি! ঘরকন্না করতে হবে তো! বুড়ো বাপকে ভাজাভাজা করলি—ভাবিয়ে মারছিস, বুঝিস না?

আমিই কি সব দিকে ভার হয়েছি!—কাদম্বিনী উঠে গেলেন।

কুমুর বিয়ে যদিও হয়ে গেছে তো কাদম্বিনী-সমস্যা বাতের প্রকোপের সঙ্গে পাল্লা দেয়।

দুই বোনে কথা বন্ধ হয়ে যায়, কুমু একবার এদিক একবার ওদিক চায়। আবার কেমন করে মিল হয়ে যায়।

আশ্বিনের প্রভাত। বর্ষার ধারাস্নানজলে দীঘি পুকুর ভরে গেছে। গাছপালা তখনও অপরূপ স্নিগ্ধ ধৌত শ্যাম।

কুমু সকালের ডাকে একখানা চিঠি পেয়েছে। সেই নিয়ে চিলের কুঠুরির পাশে দাঁড়িয়ে পড়ছে। মেজদিদি স্নানান্তে সিক্ত বস্ত্র শুকতে দিতে উঠল।

আস্তে আস্তে ভগিনীর পেছনে দাঁড়িয়ে স্নেহমধুর হাস্যে বললে, তাই বলি—এখনও নাস নি তো ?

দিদি ডাকলেন, ও কুমী, নেমে আয়। পুঁটিকেও ডাকলেন।

রমেশের পত্রোত্তরে পুঁটির শাশুড়ীর সংবাদ এসেছে বাপের কাছে ওকে আজই যেতে হবে। ঘোষালকাকা দিয়ে আসবেন। এই ব্যাপার।

কাদম্বিনী অসহায়ের মতন ব্যাকুলভাবে চুপ করে রইল। দীর্ঘনির্বাসিত শ্বশুরালয় বেচারীকে ভয় ভাবনা ভয়সাতে সমানভাবে অভিভূত করতে লাগল।

কুমু বাক্স গোছাতে, কাপড় খুঁজে রাখতে বসল। আপনার জামাকাপড় এনে সে দিদির বাক্স গোছাতে লাগল।

কমলমণির মনে হল, পুঁটি ছোটবেলায় টেঁপারি খেতে ভালবাসত, ইলিশ মাছ, ভেটকিমাছের ঝাল, বড়ার অম্বল, ভাজা বড়ি, কুলের আচার, কাঁচামিঠে আম, ওঁর হাতের মিষ্টি আমের আচার—আহা, কুল তো সে মাঘ মাসে! এবারে কি ছাই আচারই কিছু করা হল যে, থাকবে ঘরে! কুমীর বিয়ের হুজুগে কি নিশ্বাস ফেলবার সময় ছিল!

কবে একদিন পুঁটি বলেছিল, দিদির মত ঘণ্ট রাঁধতে কেউ পারে না, ছানার মুড়কি কবে কতদিন আগে একবার করতে বলেছিল! পোড়া বুদ্ধি, একদিন দুদিন সময় দেয় লোকে, তা না আজই! সেই কাশীতে সে আর পাঠাবে! দিদির অন্যমনে থরে থরে তরকারি কোটা হল।

কুমু এসে বললে, একি দিদি! জামাইবাবু আসবেন নাকি ?

জ্যেষ্ঠার দুর অতীত স্বপ্নে ভরা দৃষ্টি সজল হয়ে এল, বললে, না, এমনি।

তিন বোনে খেতে বসল।

কোথায় চিরসঙ্গোপন স্নেহকাতর মনটি কেবলই কি যেন বলতে চায়। কথা খুঁজে পায় না। পুঁটি, আর দুটি ভাত নে ? মাছ আর একটু দিতে বলি ? হ্যাঁ রে, টকটা

কেমন রেঁধেছে? ঘণ্ট ভালবাসিস, তা তেমন আর মনের মত মোচা পেলাম না। হ্যাঁ রে কুমু, দিদির আলতা সিঁদুর রেখেছিস গুছিয়ে? সবটা দই পাতের করিস নি যেন, আর তোর একটা রাঙাপাড় কাপড় পরিয়ে দিস। ওরে, আচারটুকু নে, ও যে বোস-গিন্নীর কাছ থেকে চেয়ে আনালাম।

দিদি একলাই বক্তা। কুমু কাদম্বিনী উঠে পড়ল নীরবেই। চোখ আর ওঠে না। তিনটের গাড়ি, ঘোষালকাকা দেড়টা থেকে তাড়া দিচ্ছেন, সেই কাটোয়া—

কাদম্বিনীকে চুল বেঁধে আলতা পরিয়ে সিঁদুর পরিয়ে দেওয়া হল।

বাপকে প্রণাম করে কাদম্বিনী দাঁড়াল, বাপ কম্পিত স্বরে কি বললেন, কি আশীর্বাদ করলেন, বোঝা গেল না। কুমু জড়িয়ে ধরল।

কমলমণি এদিক ওদিক জিনিসপত্র—বাতাসা মিছরি ফল ওর রোগা শাশুড়ীর জন্যে সব দিতে ব্যস্ত। ঠিক পূর্ব মুহূর্তে এসে দাঁড়ালেন। বোন প্রণাম করে চোখ মুছে গাড়িতে উঠল।

ঠিক ততখানিই উৎকণ্ঠার সঙ্গে কমলমণি এসে ভাঁড়ারে ঢুকল, কোথায় কি তিনি তো জানেন না, সেই সব রাখত যে!

সন্ধ্যে আর হয় না। সন্ধ্যের আগেই কাপড় কেচে ঠাকুরঘরে ঢুকলেন। জপ হল আজ দ্বিগুণ, মালা কতবার কে জানে!

কিন্তু মুহূর্তগুলি মন্থর হয়ে—তিন বোন, বাল্যকাল, মা বাপ, সুখ, দুঃখ, কলহ, শান্তি, বেদনা, স্বপ্নের স্মৃতি বয়ে ক্রমাগত কমলমণিকে পরিক্রমণ করে যেতে লাগল।

বিজলী—১ম বর্ষ, ১৩২৭

চিরকালিনী

ভাদ্র মাসের সন্ধ্যা। সারাদিন এলোমেলো বৃষ্টি পথিকদের এলোমেলো ভাবেই ভিজিয়েছে। অতর্কিত ভাবে এসেছে ও থেমেছে।

অসিত সরিৎ সুধাংশু ও অমল বেরিয়েছিল। অকস্মাৎ বৃষ্টি এসে পড়ায় ঐ পথের ধারে একটি পানের দোকানের পাশে তারা মাথা বাঁচাবার জন্য দাঁড়াল।

সরিৎ ঝোলান দড়ির আগুন থেকে সিগারেট ধরাবার চেষ্টা করল, অসিত পান কিনলো!

বৃষ্টি জোরে নামল। অন্ধকারও ঘনিয়ে এল।

সহসা তাদের চোখে পড়ল দোকানের অন্য পাশে একটু অন্ধকারে দুটি মেয়ে

দাঁড়িয়ে। বৃষ্টি থেকে বাঁচবার জন্য একটু এগিয়ে এসে ঘেঁযাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে আছে। হাতে রয়েছে পান আর একটা কি। পরিধানে ধূপছায়া রংয়ের বাগেরহাট শাড়ি, গোলাপী রংয়ের আর নীল রংয়ের চকচকে কাপড়ের জামা বাক্সওয়ালাদের কাছে কেনা। কপাল অবধি নামান পাতাকাটা চুলের নীচে ভ্রূর মাঝখানে মস্ত বড় কালো টিপ, হাতে গোছা-করা কাঁচের আর কেমিকেলের চুড়ি, কানে সোনার আধুনিক ঝুমকো, মাথার কাপড খোলা। খুব সঙ্কুচিত ভাবে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে তারা এই আকস্মিক বৃষ্টি আর এদের দৃষ্টি এড়াবার চেষ্টা করছে। অবশ্য দুইই নিরর্থক হচ্ছে।

এরাও অস্বস্তিভরে এদিক ওদিক চেয়ে দেখল, যদি অন্য কোথায়ও দাঁড়ান যায় অথবা বৃষ্টি কমে এল কি না।

না, বৃষ্ট পানের দোকানের টিনের ছাত বেয়ে সশব্দে তাদের জুতো আর কাপড় ভিজতে আরম্ভ করে দিল, আর মেয়ে দুটির শাড়ি।

ওদের পান খাওয়া সিগারেট ধরান হল। কিন্তু বৃষ্টি ধরল না।

সকলেই অতিশয় আডষ্টভাবে নানাদিকে চাইছিল মেয়ে দুটির দিক বাদ দিযে—তবু প্রত্যেকেবই তাদেব দিকে মাঝে মাঝে ঘুরে ফিরে চোখ পড়ছিল।

হঠাৎ সরিৎ বললে, 'চল, এক কাজ করি।'

সকলেই উৎসুক হয়ে তার দিকে চাইল, জিজ্ঞাসা করল, 'কি?'

সরিৎ মেয়ে দুটির দিকে একবার চাইল, তারপর বললে, 'ওদের বাড়ি গিয়ে বসবি?'

বন্ধুবা ওর দিকে আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে নির্বাক হয়ে রইল কযেক মুহূর্ত। তারপরে অমল বললে, 'তোর মাথা খারাপ হয়েছে?'

সুধাংশু বললে, 'ক্ষেপে গেছিস?'

অসিত বললে, 'না, চল রাস্তার ওপারে গিয়ে দাঁড়াই।'

সরিৎ বললে, 'কেন দোষ আছে কিছু? এদিকে তো সব মানুষ সমান, অনেক বড বড় কথা বলিস? সত্যিই চল না, দেখে আসি ওদের থাকা।' বন্ধুরা কেউ নড়ল না। অপ্রস্তুত ভাবে দাঁড়িযেই রইল।

সরিৎ বললে, 'তাহলে আমি যাচ্ছি।' সরিৎ এগিয়ে গেল মেয়ে দুটির দিকে। আর তারা লজ্জা ও ভয়ে প্রায় যেন মিশেই গেল দেয়ালের গায়ে। সরিৎ জিজ্ঞাসা করলে, 'এই—আপনাদের বাড়ি কোথায়? আমরা একটু···' মেয়ে দুটি থমকে হতবুদ্ধির মত বললে, 'আমাদের বলছেন?'

সরিৎ বললে, 'হ্যাঁ।'

পানওয়ালাটা প্রগল্‌ভ ভাবে একটা অন্ধকার গলি দেখিয়ে বললে, 'ঐ দিকে যান বাবু।'

সরিৎ এগিয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে বন্ধুরাও গেল।

অন্ধকার গলি, তার দুধারে অন্ধকার ও স্তিমিত-আলো-জ্বালা কাঁচা পাকা বাড়ি, মাঝে মাঝে সরু রক। একটা সরু রকের ধারে একটি ছোট বাড়িতে মেয়ে দুটি ঢুকল। তাদের সংকোচের সীমা নেই। এদের কি করে সম্ভাষণ করতে হয় তারা জানে না। একটা ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। একটি মেয়ে বললে, 'আসুন ভেতরে।'

অত্যন্ত বিরক্ত ভাবে বন্ধুরা ও নির্লিপ্তভাবে সরিৎ ঘরে ঢুকল।

ছোট ঘর, ছোট একটি চৌকি, বিছানা পাতা। ঘরের কোণে একটি জলচৌকির ওপর ঝকঝকে পানের বাটা আর বাসন-কোসন। মেজেতে একটি মাদুর পাতা। দেওয়ালে মা কালীর, তারকনাথের আর অন্য দু'একখানা ঠাকুরদের পট ও ক্যালেণ্ডারের ছবি। একটি পরিষ্কার হ্যারিকেন জ্বালা এককোণে।

'আসুন'-বলা মেয়েটিই বললে, 'বসুন।' ওরা মাদুরে বসল। মেয়েটি একটু চুপ করে থেকে তারপর বললে, 'পান খাবেন? যুঁই, পান সাজ।'

ওরা বললে, 'না। পান আমরা খাই না।'

'খাবেন না? খাবার আনব কিছু?'

ওরা বললে, 'না না, খাবার দরকার নেই।'

এবারে 'যুঁই'-বলা মেয়েটি কি বললে চুপিচুপি। আবার অন্য মেয়েটি বললে, 'আমাদের পান না খান, বাজার থেকে এনেই দিই?'

এবার অসিত বললে, 'না, পানের দরকারই নেই, আমরা খাই না।'

অমল বললে, বৃষ্টি থেমেছে মনে হচ্ছে, চল যাই।'

সরিৎ জিজ্ঞাসা করলে কথা-বলা মেয়েটিকে, 'তোমার নাম কি?'

সে বললে, 'মল্লিকা।'

দুটি কালো মল্লিকা আর যুঁই···অপ্রস্তুত ভাবে দাঁড়িয়েছিল। নামের সঙ্গে তাদের কোনখানটাই মেলে না। তবু সরিতের মনে হল যেন মেলে কোনখানে। রূপে নয়, সৌন্দর্যে নয়, সঙ্কোচে অপ্রস্তুত নত মুখটিতে যেন মেলে যুঁইয়ের।

অসিত জিজ্ঞাসা করলে, 'এ ঘরটি কার?'

মল্লিকা বললে, 'যুঁইয়ের।'

তারপর সকলে চুপ করে থাকে।

হঠাৎ সরিৎ জিজ্ঞাসা করলে, 'এখানে তোমাদের আর কে আছে?'

এবারে যুঁই বললে, 'মা আছে।'

ওরা অবাক হয়ে বললে, 'মা আছে?'

এবারে মল্লিকা হেসে ফেলল—'নিজের মা কি বাবু! আমাদের যে নিয়ে আসে

তাকেই মা বলি।' সে বোধহয় একটু বড়ই হবে কিছু, কিম্বা বেশী চটপটে যুঁইয়েব চেয়ে।

আবার বন্ধুরা চুপ করে গেল কিছুক্ষণ।

'আচ্ছা তোমরা লিখতে পড়তে জান?'

এবারে যুঁই কথা কইলে, বললে, 'একটু একটু জানি।'

মল্লিকা চুপ করে রইল, সে জানে না।

'কি কি পড়েছ?' ছেলেদের মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, জিজ্ঞাসা করে।

'পেরথম ভাগ পড়েছি।'

'তারপর আর কিছু পড় নি?' অসিত বলে।

লজ্জিতভাবে যুঁই বলে, 'না।'

অমলের ও সুধাংশুর মুখে হাসির আভাস ফুটে ওঠে যেন। প্রথম ভাগ? লেখাপড়া? পড়তে জানা? সরিৎ আর অসিত চুপ করে থাকে। আর প্রশ্ন আসে না মনে।

দরজার বাইরে দু'একটি আরও কৌতূহলী অন্য ঘরের অধিবাসিনীর আবির্ভাব হয়েছিল। হঠাৎ তাদের মনে হয়, এদের অনেকটা সময় নষ্ট করে ফেলেছে! ওরা উঠে পড়ল। সরিৎ পকেটে হাত দিল। দেখাদেখি সকলেই হাত দিল। সকলের ব্যাগ ও পকেট খুঁজে কয়েকটি টাকা আর কিছু ভাঙানী পাওয়া গেল।

লজ্জিতভাবে সরিৎ গিয়ে ওদের মাদুরে রাখল, বললে, 'তোমাদের অনেক সময় নষ্ট হয়ে গেল, আমরা এবারে যাই।'

অপ্রস্তুত যুঁই চুপ করে রইল। মল্লিকা বললে, 'এখনও বিষ্টি পড়ছে বাবু।' তাদের কি মনে হতে লাগল এবং কি বলবে, তারাও বুঝতে পারল না। শুধু বুঝতে পারছিল, এরা অন্য সকলের মত নয়, যেন কারুর মতই নয় যাদের ওরা চেনে।

দুর্গোৎসবের মহাষ্টমী। সার্বজনীন পূজামণ্ডপে ঠাকুর দেখতে যাবার কথা ওঠে।

যুঁই মল্লিকার দল গঙ্গাস্নান করতে যায়। বিকেলে বসে প্রসাধন করতে করতে গল্প জমে ওঠে। ভাই 'সর্বজননী' ঠাকুর দেখতে যাবি? কোথায় কোথায় কত দূরে কে ঠাকুর দেখেছে কত, বাড়ীর কর্ত্রী কোথায় কোথায় ঘুরে এসেছে সব গল্প হয়।

যুঁই বলে, 'ভাই সর্বজননী বলে কেন?'

বিজ্ঞভাবে কে জবাব দেয়, 'সকলের মা কিনা, জননী কিনা তাই। তাই এখন আমাদের ও সব জায়গায় দাঁড়াতে দেয়।'

মুক্তনেত্রী বা বাড়ীর কর্ত্রী বলে, 'নাও গল্প রাখ, যারা দেখতে যাবে সব ঠিক

হয়ে নাও।'

পূজা-মণ্ডপের ভিড় ভেঙে অসংখ্য ভদ্রমেয়েদের সঙ্গে তারা মিশে যায়। চোঙের মধ্য দিয়ে চেঁচিয়ে কার গলা একঘেয়ে নানা কথা বলে যাচ্ছে, কার ছেলে হারিয়েছে, কার ছেলে পাওয়া গেছে, কাকে ডাকছে সে শীঘ্র অমুক গেটে আসুক, সকলে সাবধানে টাকা পয়সা গহনা রাখুন, গলার হার সামলে নিন, ইত্যাদি ইত্যাদির মাঝে তারা ভিড় পার হয়ে যায়। হঠাৎ বেরুবার পথে চোখে পড়ে সরিৎ দাঁড়িয়ে দু'তিনটি সুবেশ সুশ্রী মেয়ের সঙ্গে। একটি মেয়ের কোলে একটি সুন্দর ছেলে।

যুই মল্লিকাকে বললে, 'দেখ ভাই, সেই বাবুটি না! আর কি সুন্দর ছেলেটি দেখ মেয়েটির কোলে।' রাজকন্যার মত সুন্দর সুশ্রী মেয়ে দুটি সরিতের সঙ্গে হেসে হেসে কথা কইছে। যুঁই অবাক হয়ে চেয়ে থাকে, অজানতেই যেন সেদিকে এগিয়ে কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়ায়। হঠাৎ দলের নেত্রী ডাকে, 'এই, সব দলছাড়া হচ্ছিস্ কেন? আ মর্ যুঁই, হাঁ করে দেখছিস কি?'

সরিতের আর তার সঙ্গিনীদের ঐ নারী-বাহিনীর দিকে চোখ পড়ে, যুঁই তখন মেয়ে দুটির কাছে। অমেধ্যস্পর্শের মত তারা দুজন বিতৃষ্ণাভরে চকিতে সরে দাঁড়ায় যুঁইদের পাশ থেকে।

তাদের কানে আসে, 'একেবারে ঘাড়ে এসে পড়েছে। আর কি করে খোকার দিকে চাইছে! যেন গিলে খাবে। নজর দিচ্ছে না তো?'

একটু হেসে সরিৎ বললে, 'কে? চল, চল, যত সব বাজে কথা।'

অপ্রতিভ যুঁই পেছিয়ে এল। মল্লিকা ধমক দিলে। দলনেত্রীও ধমকালে, বললে, 'আ মর, ভদ্রলোকের মেয়েদের ঘাড়ে গিয়ে পড়েছিস্? ছেলে কি কখনও দেখিস্ নি? শুনলি নি বললে নজর দেবার কথা?'

যুঁই ভাবে, বাবুটি কি চিনতে পেরেছে, সেই বাবুটিই কি? না অন্য কেউ?

পুজা শেষ হয়ে গেল। অপ্রতিভ নির্বোধ যুঁই ভাবতে জানে না, কিন্তু তবু অনেক কথা মনে হয়। সেই বাবুদের কথা···আচ্ছা, তারা পড়াশোনার কথা জিজ্ঞাসা করলে যে? তা ও তো পড়তে জানে। আচ্ছা ছেলেটি কার, বেশ ছেলেটি, নয়? ওই মেয়েটি কে? বাবুটির বৌ না আর কে? কি রকম কটমট করে চাইল মেয়ে দুটি তার দিকে। ও তো ওদের কাছে শুধু দাঁড়িয়েছিল, কিছুই করে নি, ছেলের গায়ে হাতও দেয় নি। কিন্তু কি সুন্দর ছেলেটি···ভদ্রলোকদের বাড়ি আর বৌ-ছেলেমেয়ের কথা ভাববার চেষ্টা করে···

দুপুরবেলা ফিরিওয়ালা ডেকে যায়, পেরথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ, ধারাপাত, লক্ষ্মীর

কথা, শ্রীকৃষ্ণের শতনাম, চণ্ডীর কথা। সহসা যুঁই সচেতন হয়ে ওঠে। মল্লিকাকে নিয়ে আসে দ্বিতীয় ভাগ প্রথম ভাগ কিনতে।

মল্লিকা হাসে, বললে, 'দূর আমাদের পড়েশুনে কি হবে, তুই পাগল!'

'কিন্তু সেই অন্য বাবুরা যে বলাবলি করছিল পড়ে চাকরি করা যায়।'

'আ বুদ্ধি। সে বুঝি ওই পেরথম ভাগের পড়া!' মল্লিকা হেসে লুটিয়ে পড়ে সঙ্গে সঙ্গে, আরও অন্য ঘরের মেয়েরাও।

তবু যুঁই বই কেনে, লুকিয়ে লুকিয়ে দুপুরে পড়ে, 'জল পড়ে', 'পাতা নড়ে,' 'অকুতোভয়', 'পরিবেশন'। লেখবার চেষ্টা করে শ্লেট নিয়ে। তার যেন মন ভাবতে জানে না, সেইখানে অস্পষ্টভাবে তার আশা ফুটে ওঠে, আবার কোন সময়—ঐ বাবুরা এলে সে দেখাবে সে পড়তে জানে, শিখেছে আরও!

তার সঙ্গিনীরা কিন্তু বুঝতে পারে সব, হেসে বলে, 'তোর রাজপুত্তুররা আর আসবে না। বৃষ্টির জন্যে একদিন এসেছিল।'

তাদের কথায় যুঁই চকিত হয়ে ওঠে। তার মনে হয় কিন্তু আবারও একদিন ঐরকমই বৃষ্টি হতে পারে, তারা আসতেও পারে। কিন্তু তারপরে কি? যুই শুধু স্বপ্ন দেখে তাদের পরিচ্ছন্ন সুশ্রী দীপ্ত মুখ আর শান্ত গম্ভীর কথা।…যেন কোন দেবলোকের লোক তারা।

তার পড়া ঐ 'জল পড়ে' 'পাতা নড়ে'তেই থেমে থাকে। যুঁই এখন ভাবে অনেক কথা। অকস্মাৎ এক দুর্দমনীয় কি ইচ্ছা তার মনে জাগে, মনে হয় সে ঝিয়ের চাকরি করবে। তাহলেই বেশ দিন কেটে যাবে। টাকার অভাব থাকবে না।

সঙ্গিনীরা হাসে, পরিহাস করে—বাড়িওয়ালী মাসী বকে।

সে তবু বলে, 'হ্যাঁ, কাজ করব।'

সবাই বলে, 'করুক, করুক, বাসন মেজে মরুক! গালাগাল খেয়ে মরুক!'

সঙ্গোপন কোন সাধ মনে নিয়ে সে চাকরি খুঁজতে যায়। যদি হঠাৎ সেই বাবুটিকে দেখতে পায়? যদি তাদেরই বাড়িতে কাজ পায়? কিম্বা সে-বাড়িতে যদি সে বেড়াতে আসে!…সব ভাবনা সে স্পষ্ট জানে না, তবু মনে ভাবে অনেক আকাশ-পাতাল।

মল্লিকার সঙ্গে বেরিয়ে পড়ে চাকরি খুঁজতে।

রাস্তায় ঝিয়েদের সঙ্গে দেখা হয়, তাদের কাছে খোঁজ নেয় কাজের। ঝিয়েরা তাদের দিকে চেয়ে দেখে আপাদমস্তক। তারপর বলে, পারবে কি বাছা অত খাটতে? কেউ বা ইঙ্গিতময় ভাবে হাসে। কেউ সরলভাবে বলে, অমুক অমুক বাড়িতে কাজ আছে।

তারা খালি কাজের বাড়িতে যায়।

ঝিয়েদের মত গৃহিণীরাও তাদের দিকে চেয়ে থাকেন। তারপব কেউ বলেন, 'না বাছা, আমার লোক এসেছে।' কেউ বলেন, 'তোমাকে দিয়ে হবে না বাছা।' কেউ বলেন, 'বড় কম বয়স, পারবে না তুমি।' কেউ বা এমন কাজের তালিকা দেন যে সে ভয়ে পেছিয়ে যায়।

কাজ খুঁজে খুঁজে যুঁই ফিরে আসে। আর তারপর দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়ে।

সঙ্গিনী রাত্রিচারিণীদের কোলাহলে ঘুম আসে না। আর নিদ্রাহীন চোখের সামনে ভাসে, কাজ খুঁজতে যাওয়া গৃহস্থ বাড়ির গৃহিণীদের, তাদের পুত্রবধূ, মেয়েদের, তাদের বাড়ির ছোট ছেলেদের ছবি। কেমন বাড়িগুলি! মনে হয় ওরা কেমন সুখে আছে। বৌটি কেমন 'মা' বলে এসে দাঁড়াল, মেয়েটির মনে হয় ছেলেপিলে হবে। কিন্তু ওর দিকে তারা কিরকম ভাবে চেয়ে রইল, কেন? গিন্নি কেন বল্লেন, 'না বাছা, তুমি পারবে না!' ও পারত—পারত নিশ্চয়। তার সুপ্তিহীন লুব্ধ মুগ্ধ মনের চোখের সামনে স্বামী-সন্তান-পরিজন পরিবেষ্টিত মধুর জীবনযাত্রার ছবি ভেসে আসে। সিঁদুর-শাঁখা-শাড়ি পরা মেয়ে-বৌ, মোটা বালা-পরা গৃহিণী, সুশ্রী দীর্ঘকায় তরুণ যুবক 'মা' বলে বাড়ি ঢুকল একদিন দেখেছিল এক বাড়িতে, তাদের জীবন তাদের কথা···তারা কেমন···

ঘরের দরজায় ধাক্কা দেয় কে!

সে নিঃসাড়ে শুয়ে থাকে। আবার ধাক্কা পড়ে।

তারপর কে ডাকে, সে সাড়া দেয় না।···

একদিন দুদিন করে দিন কেটে যেতে থাকে।

যুঁইয়ের হাতের টাকা ফুরিয়ে যায়। খরচ কমিয়ে ফেলে, তবু মল্লিকার কাছে ধার হয়ে গেল ঘর ভাড়ার টাকা। ঝুমকো বাঁধা রেখে আবার ধার করে—অন্য খরচও তো আছে।

আর আবার দুপুরে কাজ খুঁজতে যায়!

এক বাড়িতে ঢোকে। গৃহিণী তাকে নিরীক্ষণ করে দেখলেন, তারপর বল্লেন, 'না বাছা, লোক দরকার নেই।'

তার পাশে আর একজন বর্ষীয়সী দাঁড়িয়ে ছিলেন, তিনি বল্লেন, 'এত গহনা পরা কেন বাছা? কাজ করতে এসেছ! লোকজনের গায়ে অত গহনা দেখলে গা কেমন করে!'

যেন কাজ করলে গহনা পরতে নেই। মুখরার মত মল্লিকা কি বলতে গেল, কিন্তু কি বলবে? তোমরা কেন পর? না—আমাদেরও তো পরতে ইচ্ছে হয়? না,

পরলে দোষ আছে? কিন্তু কিছুই বলতে পারল না। শুধু বেরিয়ে গেল তারা।

মল্লিকা বলে, 'আর চাকরি খুঁজতে হবে না। শুনলি তো কেমন কথা। আমি আর তোর সঙ্গে যাব না। মরণ তোর! গেরস্ত বাড়ি তোকে রাখবে না।'

যুঁই চুপ করে থাকে। কিছু বলে না বা বলতে পারে না। কিন্তু এতদিনে সে কি ভাবতে শিখেছে? সেকথা জানে না, আর কেউই জানে না। শুধু কাজ খুঁজতে আর বেরয় না।

রাত্রে বান্ধবীরা ডাকাডাকি করে, সঙ্গে যাবার জন্য, গল্প করার জন্য। যুঁই চুপ করে শুয়ে পড়ে। ঘুমের ভান করে।

দিন রাত্রি যেন আস্তে আস্তে মন্থর গতিতে কাটে, হাতে পয়সা নেই, অনেক ধার হয়েছে, সঙ্গিনীরা আর ধার দেয় না। রাগ করে, ঠাট্টা করে, বিদ্রূপ করে বলে, রাজপুত্তুরদের ধ্যান করছে ও, ওর সব মন্ত্রীপুত্তুর কোটালপুত্তুররা এসেছিল যে একদিন! আসবে না, তারা আসবে না, এলে এতদিন আসত।

ভাবনায় ও বিতৃষ্ণায় অবসন্নভাবে যুঁই শুয়ে থাকে। কেউ আসে না ওর ঘরে।

সহসা অনেক রাত্রে কে ধাক্কা দেয়। ডাকে, 'দরজা খোল।'

গলাটা চেনা। খাবারওয়ালার দোকানের সরকার চিনে মশাই। অনেক টাকা তার। মাঝে মাঝে আসে। কালো, মোটাসোটা, খোঁচা খোঁচা দাড়ি-গোঁপওয়ালা থেবড়া মুখ, চিনে মশাই ওকে ভালবাসে। ওর ঘরে আসে। তার টাকা আছে, ওর ঘরে আসে বলে বাড়ির সবাই ওকে হিংসে করে।...ওর তখন খুব অহংকার ছিল কিন্তু এখন আর উঠে দরজা খুলে দিতে ইচ্ছে করে না। আজও করল না।

সে নিঃসাড়ে শুয়ে থাকে। চিনে মশাই হয়ত ফিরে যায়, নয়ত অন্য কারুর ঘরে গিয়ে বসে। আজ তার জন্য উদ্বেগ নেই তার।

রাত্রি গভীরতর হয়, রাত্রিজীবিনী নিশাচারিণীদের ঘরে কোলাহল থেমে আসে। অস্পষ্ট ব্যাকুল ভাবে বিনিদ্র চোখে সে শুয়ে শুয়ে ভাবে, নানান্ সব গৃহস্থ বাড়ির কথা যেখানে তারা রাত্রে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোয়, দিনে কাজকর্ম করে...। শান্ত নিস্তব্ধ তাদের রাত্রি আর কোলাহলময় দিন...সে কেমন লাগে?

আবার কে আসে, ধাক্কা দেয় দরজায়, সে সাড়া দেয় না।

হঠাৎ মনে পড়ে যায়, ভাড়া বাকি পড়েছে একমাসের। মল্লিকার কাছে ওমাসের ভাড়াটা ধার করেছে, মল্লিকা কাল টাকা চেয়েছিল। ও ভেবেছিল চাকরি করে শোধ দেবে, মল্লিকাও তাই ভেবে দিয়েছিল। চালও বাড়ন্ত। গহনা? চুড়ি? সেই যে সে-বাড়িতে বলেছিল গহনা পরার কথা! সব কেমিকেল সোনার! ওর হাসিও

আসে, চোখে জলও আসে।

দরজার বাইরে পায়ের শব্দটা অন্য দিকে চলে গেল।

সে চকিত হয়ে উঠে বসল। তারপর দরজা খুলে দিয়ে বললে, 'এস।' হাতে তার একটিও পয়সা নেই।

না, কেউ নেই। কে এসেছিল, চিনে মশাই? সাধুচরণ?

সে যেন বাঁচে, আশ্বস্ত হয়, কেউ তাহলে আসে নি। পরক্ষণেই মনে পড়ে যায়, চাল বাড়ন্ত, ঘরের ভাড়া, আর ধার। চৌকাটের উপর নিস্তব্ধ হয়ে বসে থাকে। যদি তারা ফিরে আসে!

আকাশ ভরা অসংখ্য তারা আর আঙিনার ওপর অন্ধকার পৃথিবী···যুগ-যুগান্তর ধরে কোটি কোটি ওর মত মেয়ে হয়ত তারা এমনি দেখেছে···আজকে ওর দিকে মিটমিট করে চেয়ে আছে। তাদেরও হয়ত সেদিন চাল ছিল না ঘরে, পয়সা ছিল না হাতে।

গল্পভারতী—১৩৬৫

দর ও দস্তুর

পর, পর মা, গয়না পর।

ওরা কনে দেখে ফিরে গেল, গহনা কাপড় সব ছেড়ে ছাতের কোণে এসে বসে নিভার চোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়ছিল।

সূর্যাস্তের সময়। রাঙা হয়ে উঠেছে পশ্চিম দিগন্ত। কালো কালো মেঘ, একদিকে গোটাকতক সোনালী-পাড় কাপড়ের মতন পড়ে আছে। অন্য সময় ঐ শোভা দেখাতে সে ছোট বোনকে মেজ বোনকে ডাকে, আজকে তার চোখে ওসব শোভা হিসেবে পড়ছিল না আর। এমনই চেয়েছিল।

আজকে ওরা আবার—বড়রা কেউ ছিল না—সব নাকি ছেলেটির বন্ধুরা,—ওকে ইংরিজী বাংলা লেখালে।

ওরা কি জানে না, ও লিখতে জানে? কেন, ছোটকা তো বললেন ওর সামনেই যে, ওকে সেকেন ক্লাস অবধি পড়িয়ে আমরা স্কুল ছাড়িয়ে নিয়েছি, বড় বড় মেয়ের স্কুলে যাওয়ার প্রথা আমাদের বাড়িতে নেই কিনা। তারপর ওরা বললে, গান জানে?

কাকা বললেন, জানে; কিন্তু ওর লজ্জা করবে মশাই, ছেলেমানুষ কিনা। একটা ছেলে একটু মুখ টিপে হেসে বললে, ছেলেমানুষই মেয়ে হয় মশাই।

গান গাইতে গলা কেঁপে গেল, ছাই হল গান। অত ছাই ও কোনদিন গায় না, এমন কি বিচ্ছিরি করে চেষ্টা করলেও ও রকম হয় না। কাকা কেন বললেন না, গান ও জানে না!

ওর চোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়তে লাগল। ওরা নাকি সভ্য, ওরা নাকি সব বিদ্বান! ওদের বোনকে এদের কেউ অমনই করে দেখে!

মেজদি এল কাপড় কেচে, ছাতে কাপড় শুকুতে দিতে।

ওমা, তুই বুঝি এখানে বসে, আর মা সারা পৃথিবী খুঁজছেন! খাবার খাস নি যে? কাঁদছিস কেন?

ও রাগ করে বললে, কই কেঁদেছি? চোখ দুটো সঙ্গে সঙ্গে জলে ভরে এল।

ওরে, এ দুঃখ সবারই করতে হয় রে, তোর একার নয়। আমাকে আবার আমার মামাশ্বশুর সমস্ত দালানটা হাঁটিয়ে নিয়েছিলেন। আর একটা কে ছিল, সে বললে, চুলটা খুলে দেখান নি কেন মশাই? বড় খোঁপা দেখে ভাবলে বোধ হয়, গুছি দিয়ে চুল বাঁধা। ও তো ভাল। সেই প্রতিমার—আমার ননদের মেয়ে রে, খুব সুন্দর দেখতে, মনে আছে তো? তাকে আবার দেখতে এসে সব বলে, মশাই, হাতে মনে হচ্ছে কড়া পড়েছে! নন্দাইয়ের রাগে মুখ লাল হয়ে গেল, তবু বললেন, টিপে দেখুন হাত। ছেলেটি এম. এ. পাস করেছেন, বাড়ি আছে নিজের, বাপ মা আছেন, কি করা যায়, সবই সহ্য করলেন। কিন্তু এখন যদি হাত দুটো দেখিস তার! শাশুড়ী ঝি-চাকরের জল-বাটনা নেয় না। রোজ তাল তাল বাটনা বাটে, জল তোলে। মুখখানি কচি টুলটুল করছে, হাত দুখানা যেন কার! তা হলে কড়া পড়া তখন কেন যে বলেছিল, কে জানে!

কথাগুলো খুব আশাপ্রদ নয়। নিভা অবাক হয়ে শুনছিল। সে বললে, দিদি, তোমাকে তারাই পছন্দ করলে, যাঁরা হাঁটালে?

মেজদিদি বেশ স্বচ্ছন্দভাবেই হাসলে, হাঁটালেন তো বাড়ির কেউ নয়, মামাশ্বশুর।

নিভা আরও অবাক হয়ে বললে, জামাইবাবুর মামা তো! তা তুমি সেখানে গিয়ে রাগ কর নি, কিছু বল নি কারুকে? জামাইবাবুকেও না?

ওঁর দোষ কি? আর এ যে রেওয়াজ, সবাই এই করে।

নিভার রাগে গা জ্বলে যায়। কিন্তু মেজদির যেন সবই খুব সহজ মনে হচ্ছে।

পাশের বাড়ির ছাতে কে উঠলেন, বললেন, তোমাদের নিভাকে আজ দেখে গেল? কি বললে?

মেজদির উপদেশ-স্রোত থামল। কথার গন্ধ পেয়ে পুলকিত হয়ে আলসের ধারে গিয়ে দাঁড়াল, হ্যাঁ, দেখে তো গেল, এখনি কি বলবে, কিছুই বলে নি। (ঈষৎ মৃদুকণ্ঠে) আর শ্যামবর্ণ কিনা তাই, সহজে কি পছন্দ করে? বাবা এই দুটি ছোট বোনের

বিয়ে দিতে জেরবার হয়ে যাবেন ভাই। যে দেখছে সেই বলে, সব ভাল মশাই, কিন্তু রংটি যদি একটু ফরসা হত। গান গাওয়ালে, লেখা দেখলে, কত কি।

প্রতিবেশিনী একটু মুখভঙ্গি করে বললেন, লেখা নিয়েই বা কি করবেন? গানেই বা কি করবেন? সেই সুনীরার কথা মনে আছে তোর? সেই যে আমার ছোট পিসীমার মেয়ে? কি চমৎকার গলা, পাড়ার লোক দাঁড়িয়ে যেত গানের সুরে তার। রং তেমন ছিল না, ঐ গানের আর বাপের টাকার জোরে বিয়ে তো হল, এখন শুনি নাকি বর কারুর কোন জায়গায় গান গাওয়া পছন্দ করে না। বড্ড খপিশ! বলে, মেয়েদের আবার বিয়ের পরে গান কি! কোনখানে পাঠায় না। মেয়ে-যজ্ঞিতেও গাইতে বারণ, কাজের বাড়িতে পাঁচটা পুরুষ আসে তাই।

মেজদি বললে, অথচ মরবে সব বিয়ের সময় সব জিজ্ঞেস করে। যার হাতে পড়বে সেই যদি ওসব না চায়—ছাই দরকারেও লাগে না।

তা দরকারে লাগে না বটে, কিন্তু সুনীরার মেয়েটি যে কি চমৎকার গায়!

মা এলেন, কথায় বাধা পড়ল।

হ্যাঁরে, নিভা কই? কি সব ঢং বল তো, খাবার খেল না অবধি! চিরকালকার জিনিস, তারা নিয়ে যাবে—দেখবে না? দেখেছে তো মেয়ে অমনি গলে গেলেন!

মার পেছন দিয়ে নিভা নেমে গেল।

ভাল লাগে না জানি, তা কি করব ছাই!—একসঙ্গে এত কথা এবং এত রাগ গলার কাছে জড় হল যে, মার আর কথা বেরুল না মুখে।

অনেক রাত্রি।

ছোট ছেলেরা সকলে খেয়ে-দেয়ে ঘুমিয়েছে। পুরুষদেরও খাওয়া চুকেছে, মার কাজ সারা হল।

পাশের ঘরে মেয়েছেলেরা ঘুমচ্ছে, নিভাদের বাবা এ ঘরে চুপচাপ শুয়ে আছেন।

নিভার জননী জলের ঘটি, দুধের বাটি, পানের ডিবে, মিছরি বিস্কুট নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। একে একে সবগুলি যথাস্থানে নামিয়ে স্বামীর বিছানার পাশে এসে বসলেন।

তারপর?

স্বামী বললেন, কিসের?

এই যে গো, নিভাকে দেখে কি বললে? পছন্দ করেছে ছেলে?

স্বামী বললেন, কাল ওর বোনেরা, মা আর ঠাকুমা আসবে দেখতে। ছেলের ছোট ভাই ছিল, বলে গেল।

মাতা পিতা দুজনেই জানলার পথে রাস্তার গ্যাসের দিকে চেয়ে অনেকক্ষণ চুপ

করে রইলেন।

অবশেষে মৃদু নিশ্বাস ফেলে মা বললেন, মেয়েটার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল, কতবার যে সব দেখলে!

বাপ চুপ করে রইলেন।

মা বললেন, দেখ না, সেবার নরেশবাবুরা হাঁটালে, বিষ্টুবাবুরা কি সব বলে গেল! তারপর জগন্নাথবাবুরা মুখের ওপর 'কালো' বললে!

মা আবার বললেন, ওরা নাকি বলে, আমাদের চেয়ে বাজারে মাছের দর আছে।

নিভার পিতা অন্যমনে শুনছিলেন, শেষ কথাটায় একটু হাসলেন; বললেন, মিছে বলে না।

খানিক চুপ করে বাপ জিজ্ঞাসা করলেন, ওরা ঘুমচ্ছে?

মা বললেন, হাঁ।

রাত্রি গভীর হয়ে এল, ক্লান্ত স্বামী ঘুমলেন।

নিভার মার চোখে আর ঘুম এল না। মনে হয়, বারে বারেই নব অভিজ্ঞতায় এই একই অভিনয় দেখছেন। অসম্মান, সম্মান, অবমাননা, অত বোঝে না মন, শুধু একে একে মনে পড়ে কত বিয়ের কথা, জানাশোনা, স্বজন আত্মীয়—কত কথা।

কারও বা গহনা, কারও বা গহনার ওজন, কারও বা গহনার রং, কারও বা নিজেরই রং; কারও বা তুচ্ছ কথা, কারও দরিদ্র পিতামাতা, যা হোক অমনিই তো হয়ে থাকে। বলে, লক্ষ কথা না হলে বিয়ে হয় না।

ছোট বোন সুধারই তো বিয়ের পরদিন কুশণ্ডিকার আগেই গহনা ওজন করে দেখেছিল তারা। ষাট ভরিতে দেড় ভরি কম ছিল। কাঁটা হয়ে ওঠে নি। তাঁদের বাপ গিয়ে তাড়াতাড়ি কাঁটার ত্রুটি সেরে নিলেন কাঁটা দিয়ে।

হয়তো তখন সুধার মনে একটু কাঁটা ফুটেছিল।

তা হোক। আজ সুধার ঐশ্বর্য দেখে কে! ছেলে মেয়ে সুখ ঐশ্বর্য ঘর বাড়ি হীরে মুক্তা!

আহা, তা বেঁচে থাক। আহা, বাবা দেখে যান নি। কিন্তু—

তা কি হবে, এই রকমই তো সব ঘরে!

রাত্রি গভীর হয়ে আসে। ছেলেমেয়েরা সব ঘুমচ্ছে। মা তাঁর কালো মেয়েটির মুখের দিকে একবার চান। গ্যাসের আলো ঘরে পড়েছে, তারই সামান্য আলোয় দেখা যায়, খোকার গায়ে চাদর নেই, নিভার মাথার বালিশটা কোথায় সরে গেছে। ঠিক করে দিয়ে মা শুয়ে পড়েন।

আকাশে নিস্তব্ধ শান্তি। এক আকাশ তারা ঝিকমিক করে ঘুমের রাজত্বে

চেয়ে আছে।

পরদিন বৈকালে ছেলের মা আর অন্য পরিজনরা দেখতে এলেন ভেতরে, আর বাইরে এলেন বাপ, মাতুল, কাকা।

পূর্বদিনের চেয়ে বেশি করে সাবান স্নো ঘষে রংটা অনেকটা খসখসে করে, মাথা ঘষে চুল খুলে মাথাটা মাথার তেলের বিজ্ঞাপনের মতন করে শাড়ির সঙ্গে জামার রঙে মিল করিয়ে, ভেবেচিন্তে অনেক পরিশ্রমে শ্যামা মেয়েটিকে সবাই সাজাল।

অবাধ্য অপমানবোধ কেবলই নিভার চোখের কোলে উপছে জল পড়ে। আর দিদিরা ধমক দেয়।

কাকে আবার না দেখেছে, কে আবার না দেখে! তোর রকম দেখে বাঁচি না—চোখমুখের কি ছিরি হবে!

মেজদি বললে, বেশ দেখাচ্ছে এবার। নিভার মুখখানি যে বেশ।

যথারীতি প্রণামাদি ও শিষ্টাচারের কথা সমাপ্ত করে মেয়ে দেখা। মেয়ে অন্দরে প্রেরণ করাও হল।

খোশগল্পে আসর জমে ওঠে। যথারীতি দেশের কি অবস্থা, বেকার-সমস্যা, ঘি-দুধের দুর্মূল্যতা, পাস করার নিষ্ফলতা এবং না-পাস করা কেঁইয়াদের উপার্জনে কৃতিত্ব ইত্যাদি প্রসঙ্গে এসে ছেলের মাতুল পৌঁছলেন।

বলবেন না মশাই, রাম রাম, কি যে সব দাঁড়াচ্ছে ব্যাপার, আমরা তবু রোজগার করছি, ছেলে ব্যাটারা আর খেতে পাবে না।

পাত্রীর পিতা 'আজ্ঞে হ্যাঁ' বলে সমর্থন করলেন। তারপর কন্যাদায় ও তারপর পাত্রপক্ষের নানা রকম অভদ্রতার কথাও ওঠে।

এবার পাত্রীর পিতা কিছু বলতে পারেন না। কে জানে, যদি কারও গায়ে বাজে।

কিন্তু মশাই, আসল ব্যাপার হচ্ছে এই কালোকে ফরসা করতে জানা। মাতুল ডাক্তার, বেশ নাম-করাও। উৎসুক হয়ে শ্রোতারা মুখের দিকে চেয়ে রইল, ভদ্রলোক কিছু ঔষধ বলবেন না কি?

অট্টহাস্যে মাতুল বললেন, তা হচ্ছে মশাই এই—রং অনুপাতে রৌপ্য মুদ্রা, ওষুধ-বিষুধ নয়; এই আমাদের পাড়ায় সম্প্রতি একটি যজ্ঞাকালো মেয়ের বিবাহ হল। বাপ বেশ বড় কাজ করে। মেয়ের মুখ তাকিয়ে দিলে মশাই। বলব কি, আট হাজার নগদ দিলে। ছেলেটি সোনার চাঁদ—যেমন রূপ, তেমনই গুণ। খরচ করলে যেমন, পেলেও তেমনই। বুঝলেন কিনা? মাতুল আবার উচ্চহাস্যে ঘর ভরিয়ে দিলেন। অবশ্য আমরা অর্থাৎ আমার ভগ্নীপতিদের টাকা নগদ নেওয়ার প্রথা নেই; তবে—

বিমূঢ় অপমানিত বেদনায় অনুজ্জ্বলবর্ণা মেয়ের পরিজনরা হাসবার চেষ্টা করলে তাঁর

সঙ্গে, পাছে ভদ্রতার লাঘব হয় আর তাতে মেয়ে-পছন্দতে ত্রুটি ঘটে।

নিভা ওপরে উঠে এল। এবার মা জলটল খাওয়াবেন ওদের। আর চোখে জল এল না। যা হোক একটা নিষ্পত্তি—এস্পার কি ওস্পার হয়ে চুকে গেলে ও বাঁচে।

এ বাড়ির ও বাড়ির চিনু বিনু রুনু রেবা আশা সব বারান্দায় ছাতে দাঁড়িয়েছে।

নিভা উদাসীনভাবে ছাতের অন্য এক কোণে দাঁড়ায়। গল্পের কথা কানে টুকরো টুকরো ভেসে আসে।

জান ভাই, আমার বে'তে পাঁচবার দশবার দেখাদেখি কিছু হয় নি। যেমন শাশুড়ী দেখলেন, অমনই সব কথা ঠিক হওয়া।

তা ভাই, তোমার বাবা যে তেমনই ছ'হাজার করে খরচ করেছিলেন! তোমাদেব ঐ সুধার কেন অত নাকাল?

দেখতে তো সুধা ভাল নয়। আর কাকা তেমন খরচ করলেন কই?

এইবার একটি মুখরা মেয়ের গলা শোনা গেল বেশ জোরে, তা বলে তোরা যারা রূপসী তাদেরই সব ভাল হবে? তা হলে তোদের লীলার কেন ভাল ঘর-বর হল?

সে যে তার বাপের একটিমাত্র মেয়ে, অত বিষয় সেই পাবে। আর কালো, তা মুখখানি সুন্দর! স্বামী খুব আদর-যত্ন করে।

মুখরা মেয়েটি শ্যামা, বিদ্রূপ-হাস্যে সে বললে, তাই বল, আসল কথা টাকা, তাই মুখখানি ভাল, তাই তার শ্বশুরবাড়ির যত্ন!

যে তর্ক করছিল সে বললে রাগ করে, তা টাকা তো কি? যাব বাবার আছে, তিনি দেবেন না?

কেউ হারে না, নানামুখী তর্ক চলে।

রাত্রি হল। অন্ধকারে নিভা একলা ছাতে শুয়ে ভাবে।

মনের এক পাশে দাঁড়ায় আকাশভরা তারা, অন্য ধারে পৃথিবী-জোড়া অন্ধকার।

সেদিন দিদি এসেছিল। ওপরে এল তারা।

হ্যাঁরে, ওপরে একলা?

নিভা উঠে বসে।

সেই একই কথা। দিদি বেশ করে বসে সান্ত্বনা দেবে ভাবে, বলে, এমনিই হয়েছে ভাই। সে তাদের পাড়ার কার কন্যাদায়ের নিদারুণ মর্মস্পর্শী ব্যাখ্যা দেয়। আর উপসংহারে বলে, কি করবি, এমনই ঘরে ঘরে।

তারপর মেজদি তার মামাশ্বশুরের শ্বশুরবাড়ির কার এক কন্যাদায়ের ভয়াবহ অথচ

উজ্জ্বল ব্যাখ্যা দেয়; অর্থাৎ কৃষ্ণা মেয়েটি বিয়ের পরে নাকি আত্মহত্যা করে। তার উপসংহারে সে বলে, তার চেয়ে আমাদের নিভা ঢের ফরসা—

রাত্রিও বাড়ে, গল্পও বাড়ে। আসর জমে ভূতের গল্পের মত। নিজ নিজ নিতান্ত নিরীহ নিরপরাধ হৃদয়বান অথচ পিতৃমাতৃভক্ত স্বামীদের বাদ দিয়ে—অন্য সকলের ভদ্রতাহীন বিয়ের কথা বলে। শ্বশুরালয়ের খোঁটার কথা বলে।

নিভা আড়ষ্ট হয়ে শুয়ে থাকে। বর এবং বরপক্ষীয়দের সম্বন্ধে তার ধারণা তো খুব ভাল হয়ই না, বরং বেশ ভীতিপ্রদ হয়ে ওঠে।

অনেক রাত্রে দিদি গেল ছেলে শোওয়াতে।

চুপ করে থেকে থেকে সে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে বসল, আচ্ছা ভাই মেজদি, মেজ জামাইবাবুরাও তো অমনই করেছিলেন?

মেজদি সোজাসুজিই বললে, দেনা-পাওনার কথা আবার কোন্ বিয়েতে না হয়? হয়েছিল বইকি। তা সে তো আমার দিদিশাশুড়ী আর শ্বশুর করেছিলেন। উনি তার কি জানেন?

মেজদির স্বামীকে ভাল বলবার সরল প্রচেষ্টায় নিভার হাসি পেল। সে একটু চুপ করে থেকে বললে, তা হলেও ভাই উনি তো মা-বাপের ছেলে, বলতে পারতেন না কি?

মেজদি বললে, তা কি করে বলবেন? মাথার ওপর গুরুজন বাপ মা, তাঁরা যা করবেন ভালর জন্যেই তো? আর এ তো সবাই করে।

নিভা অপ্রস্তুতভাবে বললে, তা হলেও অত বিদ্বান জামাইবাবু—

মেজদি বললে, তাতে কি?

নিভার অন্তরে বিদ্বান পুরুষসমাজের ওপর ঈষৎ শ্রদ্ধা ছিল তখনও। সে ভাবত, বোধ হয় তারা পৌরুষে দীপ্ত, আকাশের মত উদার, অচলের মত দৃঢ়, সমুদ্রের মত গভীর। নিত্যকার ছোট ছোট দৈন্য, ক্ষুদ্রতা, লোভ তাদের স্পর্শ করে না।

আবার সে বলে, আচ্ছা ভাই, তোমার শাশুড়ী নাকি বড় খোঁটা দিয়েছিলেন বাবাকে, তাতেও জামাইবাবু চুপ করে রইলেন?

তা কি করে বলবেন?—তুই এক পাগলী। মা-বাপকে বলা যায়? হলই বা শোনালেন আমার শাশুড়ী। তাঁদের হল গিয়ে ছেলে, আমার বাবার মেয়ে! লোকে কত কথা বলে, তাঁরা আর এমন কি বলেছেন? বিয়েতে লক্ষ কথা হবে, আর ছেলের পক্ষ মেয়ের পক্ষকে বলবে, এই হল ধারা।

যুক্তিসঙ্গত জবাব পেয়ে নিভা চুপ করে গেল।

আকাশের এক প্রান্ত থেকে কৃষ্ণা-তৃতীয়ার বাঁকা সোনার থালার মত চাঁদ উঠল।

মা ডাকলেন, ওরে ও মেয়েরা, কত রাত্তির হল, ছেলে-মেয়েকে খাইয়ে নে না? নিভাকেও খেতে ডাক।

নিভা উঠল।

এবারে সে কুণ্ঠিতভাবে জিজ্ঞাসা করলে, আচ্ছা দিদিভাই, তোমাদের জামাই-বাবুদের ভাল লেগেছিল?

তার ষোলো বছর পার হয়ে গেছে, গল্পের বই পড়ারও প্রচুর সময় ছিল, কাব্য-জাগতিক আদর্শ স্বামী সম্বন্ধে কল্পনার যথেষ্ট অবকাশ ছিল।

মেজদিদি উঠছিল, হেসে গড়িয়ে পড়ল, স্বামীকে ভাল লাগবে না? কেন? শোন একবার মেয়ের কথা! হাসিয়ে পাগল করতে পারে ও! মাগো, ওদের তো বিয়ে হয়েছিল সব, কই, এসব কথা তো ভাবেও নি! মেজদিদি এবার দিদি আর মার কাছে এত হাসির কথা বলতে নেমে গেল।

অত্যন্ত অপ্রস্তুত হয়ে নিভা দিদিদের ছোট ছেলেদের ঘুম পাড়াতে মার কাছ থেকে নিয়ে এল।

আদর কাড়াতে নিভা পারে না, আদরই পায় নি। দর থাকলে আদর থাকে। বোনেদের প্রথম নয় শেষ নয় সে, আদর কাড়াতে অপ্রস্তুত মনে হয়।

তবু অনেক রাত্রে যখন দিদিরা ঘুমল, ছেলেরা ভাইয়েরা ঘুমল, মার পায়ের শব্দে নিভা উঠে বসল। সবাই ঘুমচ্ছে।

জননীর চোখ পড়ল, কি রে?

একটু জল খাব।—উঠে এসে কুঁজো থেকে জল খায়।

কলকাতার আকাশ ঝাপসা জ্যোৎস্নায় তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে মহানগরীর দিকে চেয়ে আছে। পাড়ার প্রায় সব বাড়িই অন্ধকার।

মা তখন ভাবছিলেন, স্বামীর কাছে গিয়ে কিছু পরামর্শ করবেন, জিজ্ঞাসা করবেন।

নিভা এসে দাঁড়াল কাছে।

কি রে?

আমার ও রকম করে বিয়ে দিও না মা।

কি রকম করে?—মা ভ্রূকুঞ্চিত করলেন।

ঐ কেবলই টাকা আর গয়না দিয়ে। আমি ওদের ভালবাসতে পারব না। তার চোখ ছলছল করে এল।

শোন কথা! ওরা টাকা নিয়ে বিয়ে করবে, তার সঙ্গে তোর সম্বন্ধ কি? পাগল আর কি! এঁরাও তো টাকা নিয়েছিলেন।—

তাঁর নিজের ভালবাসার কথা মা আর বললেন না।

রাত হয়েছে, যা শুগে।

বাপ জেগেই প্রায় ছিলেন ; জিজ্ঞাসা করলেন, নিভা কি বলছিল ?

মা বললেন। নিভার বাপ একটু চুপ করে থেকে একটু হেসে বললেন, তা ভালবাসার ব্যাঘাত হয় না। দৃষ্টান্ত যা দিয়েছ, তার জবাব দেবার উপায় ওর আর নেই, আমারও নেই।

স্ত্রী অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন।

কথা উল্টে বললেন, ওরা কি বললে ? জবাব কবে দেবে ? পছন্দ হয়েছে ?

স্বামী বললেন, ওরা বলে গেল, মেয়ে পছন্দ হয়েছে ওদের, রং ফরসা করার উপায়ও একটা বাতলে দিয়েছে, সেটা হলেই ওরা বিয়ে সামনের বৈশাখে দেবে।

উৎসুক নিভার মা জিজ্ঞাসা করলেন, সে কি উপায় ?

কিছু বেশি টাকা। নগদ ওরা নেয় না, কিন্তু রকম নেয়।

খানিক চুপ করে থেকে পত্নী বললেন, তা কি করবে ?

তাই দেব আর কি। ছেলেটি ভাল, স্বাস্থ্য ভাল, বাপের অবস্থা ভাল, বাজারে দর আছে। তা ছাড়া মেয়েকে গয়নাগাঁটি দেবে, আদরও করবে। তারপর একটু থেমে ঈষৎ হেসে বললেন, আর তুমি তো বলেছ ঠিকই—ভালবাসতে কোনই বাধা হয় না।

ভারতবর্ষ—অগ্রহায়ণ, ১৩৩৯

স্ত্রীধন

অঙ্গনে শ্রাবণধারার ঝমঝম শব্দের বিরাম নেই। বেলা যে কতটা কিছুই বোঝা যায় না, পূর্ব-পশ্চিম সমান অন্ধকার, দশটা থেকে বিকেল পাঁচটা যে কোনও সময় হতে পারে—মনে হচ্ছে।

দালানে, ঘরেও ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা মল-পায়ে ঝমঝম করে বেড়াচ্ছে। কান্নার কোলাহলে, ভূরিভোজনের আয়োজনে, ধারাবর্ষণে বাড়ি মুখরিত।

ফুলের মালায় খোঁপা জড়ানো, হাতের কাজললতাখানি কখনও মাথার গোঁজা, কখনও হাতে, উপবাসক্লিষ্ট কোমল মুখখানিতে চন্দন-তিলক আঁকা, একটি ঘরের এক কোণে কনে বসে আছে। আশেপাশে সম-অসম-বয়সী সখীরা দিদিরা বধূরা নানাবিধ কথার চর্চায় মশগুল। বেশির ভাগই আপনার আপনার বিয়ে, বিয়ের দিনের কথা—

কি রকম গোলমাল, বিষ্টি পড়া, কত রাত্রে লগ্ন, কি ভীষণ ঘুম পাওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি।

একটু বড় জনকতক এলেন।

খাওয়া হল তোমাদের দিদি?

দিদি মাথা নাড়লেন। বোঝা গেল বেলা তিনটে পার হয়ে গেছে।

কি কি দেওয়া হল রে সুকু? সবই কি পরে আছে?—দিদি-সম্বোধিতা, একটি কিশোরীকে জিজ্ঞাসা করলেন।

সুকুমারী বললে, না, রাত্তিরে পরানো হবে, এখনও সব পরানো হয় নি; আমি জানি না সব কি কি।

তোরা কে কি দিলি?—আর একজন প্রশ্ন করলেন।

বছর দেড়েক আগে মাত্র বিয়ে হয়েছে। সুকুমারী ভাবনায় পড়ল। আলাদা কিছু দিতে হয়, সে তো জানে না, সে জানে কুটুম্বরাই দেন। দিদিদেরও দিতে হয়?

অপ্রস্তুতভাবে বললে, জানি না তো।

কথার স্রোত অন্য দিকে বইল, সুকুর বিয়েতে অনেক খরচপত্র হল কিনা, জ্যেঠা-মশায়ের রাগ হল।—দিদি বললেন একজনকে। কনে, কনের দিদি সুকুমারী যেন নেই সেখানে।

তাইতে বুঝি সুনীতির গয়না কম-কম হল?—অপরা জিজ্ঞাসা করলেন।

হবেই তো। ওকে যে বেশ ভাল ঘরে দিলেন, প্রথম মেয়েটি। মানুষ আর কি বারে বারে পারে? দেখি রে তোর চুড়িটা?

দিদি সুকুমারীর হাতখানি টেনে নিলেন, চমৎকার দুগাছি চুড় অর্থাৎ একটু চওড়া চুড়ি।

কে দিয়েছে? শাশুড়ী?

না, বাবাই তো দিয়েছিলেন।—সুকু জবাব দিলে।

সকলেরই চোখ কনের মণিবন্ধে পড়ল, কনেরও চোখ দিদির চুড়ির দিকে পড়ল। কনের হাতে সোনার সরু সরু চুড়ি ক'গাছা করে।

সবাই চুপ করেই রইল। আবার অন্য পথে কথা চলল।

বাপ রে, কি বিষ্টি নেমেছে! বলে, ধারাশ্রাবণ, ঠিক তাই। আজকেও দেখছি, কাঁথা-চাদর কিছু শুকবে না, কি করে যে শোবে সব!

সকালবেলা বর-কনে-আশীর্বাদের সময় দেখা গেল, সুকু তার চুড় দুগাছি বোনকে দিলে।

সঙ্গিনী একজন জিজ্ঞাসা করলে, হ্যাঁরে ওটা দিলি যে? শাশুড়ী জানেন? বলেছেন?

ওটা ওর ভারী পছন্দ। আর শাশুড়ী আর কি বলবেন? সুকুমারী নতমুখী কনের অনাভরণ অঙ্গের দিকে চেয়ে ছিল।

হ্যাগা বউমা, তোমার দুগাছা চুড় দেখছি না, তোমার বাবা যে দিয়েছিলেন সেই ? ফেলে এসেছ ? মাকে চিঠি লিখে দাও। কি অসাবধান বাছা! শাশুড়ী বধূর গহনা লোহার সিন্দুকে তুলছিলেন।

বধূ অপ্রতিভ মুখে এসে দাঁড়াল, সেটা মা সুনীতিকে আশীর্বাদ করেছি।

অবাক!—বলে শাশুড়ী আধমিনিট চুপ করে রইলেন। অবাক হবারই কথা।

বলা নেই কওয়া নেই, দিয়ে দিলে? আমাকে একবার বলতে হয়, মরি নি তো! আর, কেমন আক্কেলই বা তোমার মা'র, তোমার জিনিস নিয়ে নিয়ে দেয়?

বধূও অবাক হয়ে গিয়েছিল। সে ভেবেছিল, তার জিনিস হলেই বুঝি সে দিয়ে দিতে পারে।

আমি তো জানতুম না মা, আমি ভেবেছিলাম, ওটা তো আমারই—

বাধা দিয়ে শাশুড়ী বললেন, আমারই হলই বা। তোমারই বলে কি বড়দের একটি জিজ্ঞেসাবাদ নেই? তা না হয় তুমি জান না, ছেলেমানুষ, তোমার মা-বাপেরও তো একটা বিবেচনা আছে!

মা তো জানেন না, মা।—অতি মৃদু স্বরে বধূ বললে। তার প্রায় চোখ ভরে এসেছিল।

হ্যা, মা জানে না! তোমার বাছা সব তাতে জবাবটি দেওয়া চাই। শাশুড়ীর অনেক বিরক্তিতে মনে মনে নানাবিধ কথা উঠছিল—এই বে-আক্কেলে নেকামি আস্পদ্দা গোছের।

কি মা?—ননদ এসে দাঁড়ালেন।

যথা-প্রথা সমালোচনা-আলোচনা হল। মা পাঠালেন ছেলেকে, সব কথা বলে বিহিত করতে।

বিহিত হল। সুকুর বাবা এলেন, হাতে দু'গাছা নতুন সেই গড়নের চুড়।

শাশুড়ী বললেন, হ্যা তাই তো, উনি হলেন গিয়ে জ্ঞানমান ব্যক্তি। তুলে রাখ এখন তোমার কাছে।

ঘরে এসে ছলছল চোখে মেয়ে বলল, বাবা, আবার কিনলে? ও যে আমার ছিল, তুমিই দিয়েছিলে।

বাপ হেসে মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন, পাগলী, হলই বা তোর, এদের না জিজ্ঞেস করে হল কিনা—

মানে বুঝতে পারা যায় না, মেয়ে চুপ করে রইল একটুখানি। কিন্তু এ তো ওঁদের দেওয়া নয় বাবা, আর আমার জিনিস আমি কাউকে দিতে পারব না? চোখ ছাপিয়ে উঠল। তবে আর শুধু পরে কি হবে?

বাপ তেমনই হেসে মেয়ের মাথায় মৃদু মৃদু আঘাত করতে লাগলেন, এই রকম করতে হয় মা, তুমি ছেলেমানুষ, জান না।

বাপের সার্থক ঘরে দেওয়া হয়েছিল। যাকে বলে, ধনে-পুত্রে লক্ষ্মী থাকা। সুকুমারীর গহনার পর গহনা, কাপড়-চোপড়, বাড়ি-ঘর, গাড়ি-ঘোড়া, ঐশ্বর্য, তিন ছেলে, এক মেয়ে।

অনেকেরই ঈর্ষার ভাগ্য।

মেয়ের আর দুটি ছেলের বিবাহ হয়েছে।

সুকুমারী সিন্দুক খোলেন, সব জিনিস নাড়াচাড়া করেন, গোছগাছ করেন। ভেতরে বাইরে সব জমজম করছে।

সুনীতির পর যাদের বিয়ে হয়েছে, শাশুড়ী স্বামী তাদের মাকড়ি কিনে দিয়েছেন, আংটি কিনে দিয়েছেন, কখনও বা মাথার ফুল-কাঁটা দিয়েছেন। মনের কোনখানে কখনও বেজেছে ; কিন্তু সব অভ্যেসেই কড়া পড়ে তো।

কিন্তু যাই হোক, ঘর-কন্না তার, স্বামী পুত্র তার, ঐশ্বর্য—ঐশ্বর্যের যদি আনন্দ থাকে, গর্ব থাকে, সব তার ;—মুষ্টিভিক্ষের চাল থেকে লোহার সিন্দুকের চাবি তার।

সুতরাং পুরানো কথা ভাববার অবসর নেই, বেদনাবোধও নেই।

চাল সে যত ইচ্ছে খরচ করতে পারে, তারই তো! টাকাও সে খরচ করে, তা পাঁচ থেকে পনরো কুড়ি টাকা অবধি নিজেই খরচ করতে পারে ; তারপরে অবিশ্যি জিজ্ঞেস করতে হয়, কিন্তু তারই তো! আর কারুর তো নয়!

অবসরহীন দিন। ডায়ার্কি-প্রণালীতে সংসার চলে ; দায়িত্বপূর্ণ পরিচালনায় সমস্তক্ষণ নিযুক্ত থাকতে হয় ; ষোলআনা ভার। স্বামী অবধি মাঝে মাঝে পরামর্শ নিয়ে কাজ করেন, ছেলেরা সুবিনীত।

লোকজন, চাকর-ঝি, স্বজন-কুটুম্ব, দান-ধ্যান গৃহিণীপনাতে নিরবসর দিন কাটে।

ভাই-বোনদের কখনও মনে পড়ে, কখনও পড়ে না। মাঝে মাঝে বাপকে মনে পড়ে—মধুর আনন্দে, নির্মল কৃতজ্ঞতায়। ক্ষোভের অবসর নেই। সরল গর্বে আনন্দময় হয়ে দেখে! তারই সুখস্বাচ্ছন্দ্য বাপ দেখেছেন, স্বামী দেখছেন, ছেলেরা দেখে।

চাকাটা অন্য দিকে ঘুরল। কর্তা গেলেন। সুকুমারীর শরীর-মন ভেঙে পড়ল।

কালের নিয়মেই, ভাঙা শরীরে সুকুমারী আবার ওঠেন।

কিন্তু 'কিন্তু' জাগে অনেক। তবে মন মায়ার বশ, ভুলেও যায় সব।

পশ্চিমের দিকে সুকুমারীর আয়ুর চাকা ঘোরে। ছেলেরা এসে কাছে বসলে

মাঝে মাঝে বলেন, বাবা, শরীর তো বড় খারাপ, এইবার তোমাদের সব ভাগ-যোগ করে দিই।

ছেলেরা বলে, তাড়া কেন মা?

ছেলেরা কিন্তু ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস পেয়েছে।

বউদের ভোট দেবার অধিকার, অর্থাৎ ঝি-চাকর ছাড়াবার রাখবার ক্ষমতা।

বউয়েরা নিমন্ত্রণে যাবে, শাশুড়ীর শোবার ঘরে এসে দাঁড়াল, শাশুড়ী চাবি দিলেন।

সিন্দুক খুলে দুই বউয়ে গহনা নিতে বসল।

ভাই, দেখ, মা'র চুড়গুলো কি চমৎকার!

মেজবউ বললে, কে বলবে সেকেলে গড়ন, যেন ঠিক এখনকার মতন। আমি সেদিন জাস্টিস মিত্তিরের বউয়ের হাতে দেখেছিলাম।

মেজবউয়ের বাপ বেশ বড় উকিল।

মার কানে গেল, বললেন, তা তোমরা পর না বাছা, যার যা ইচ্ছে হয়। সীতাহারটি মেজবউমা পর। বড়বউমা, চুড় দুগাছা পর। আর ওপর-হাতের তাবিজ আর বাঁক, দুজনে দুজোড়া পর।

তোমার সব গয়নাই কিন্তু মা বেশ শৌখিন, একেলে ধরনের।—বড়বউ বললে।

মেজবউ বললে, মা, তোমার সব গয়নাই কি বাবা দিয়েছিলেন তোমায়? এই সব চুড়, মুক্তোর মালা?

না, চুড়জোড়াটা আমার বাবা দিয়েছিলেন। তিনি খুব সূক্ষ্ম পছন্দর লোক ছিলেন। কোন্ বিলিতী দোকান থেকে করিয়ে এনেছিলেন। আরও অনেক গয়নাই দিয়েছিলেন তিনি। আর কতক আমার শ্বশুর, কতক তোমার শ্বশুরও দিয়েছিলেন ইদানিং! মুক্তোর হারছড়াটি আমার শ্বশুর আশীর্বাদ করেছিলেন।

অতীতের সুখের ছায়াপথে মন একবার থমকে দাঁড়াল।

সুনীতিকে চুড় দেওয়া, তাই নিয়ে কথা শোনা, বাপের কথা, তারপরে শত শত জায়গায় যাওয়া-আসা; বসনভূষণের, শ্রী-গড়নের প্রশংসালাভ। কৃতজ্ঞ, ব্যথিত আনন্দে মা-বাবাকে মনে পড়ল, স্বামীর কথা মনে হল।

বউয়েরা নিমন্ত্রণে চলে গেল।

গহনাসূত্রে অনেক কথাই মনে পড়তে লাগল।

সন্ধ্যের পর ছেলেরা এসে মা'র কাছে বসল। মা'র মনে হল, আর দেরি করে কি হবে? ইচ্ছেটা প্রকাশ করলেন।

বড় বললে, তোমার কি নেহাত ইচ্ছে? তা হলে হোক।

বাড়ির ভাগ, বাসনের ভাগ, চুল চিরে কড়াক্রান্তি ক'রে হয়। পেতল, কাঁসা,

তামা, লোহার বাসনই কি কম? আট সিন্দুক বাসন-কোসন—দোল-দুর্গোৎসব সবই আছে। রূপার বাসনই এক সিন্দুক—বিয়ে, অন্নপ্রাশন, পৈতে-ক্রিয়াকাণ্ডে সব বেরোয়।

তবু মা কি ভাবেন কেবলই। শেষে একদিন জপের পর রুগ্ন দেহে বারন্দায় বসে ভাবতে ভাবতে মনে হল, আর দেরি করা নয়।

ছেলেরা এল।

মা বললেন, দেখ বাবা, সব তো করলাম, এইবার আমার দু-চারখানা যা গয়না আছে আর কিছু নগদ টাকা আছে, তার ভাগ করলেই নিশ্চিন্ত হই।

কি রকম ভাগ করতে চান? ছেলেরা চুপ ক'রেই রইল।

বলতে আর পারেন না, ইতস্তত ক'রে শেষে বললেন, সরিকে ভাল ঘরে দিতে পারি নি, তেমন কিছুই ওর নেই, আমার নগদ টাকা ক'টি আর গয়নার অর্ধেক ভাবছি তাকে দিই, আর যা থাকবে বাকি, তা থেকে শৈলেনের বউয়ের জন্যে, আর কিছু কিছু এ বউমাদের থাক। এইটি হলেই নিশ্চিন্ত হই।

খানিকক্ষণ ছেলেরা চুপ করেই রইল।

বড় ছেলে খানিক পরে বললে, শৈলর বিয়ে হলে বউমাকে দিতে হবে বইকি, তা তো সত্যি; কিন্তু সরিকে আবার কি দেবার দরকার? তার কি বিয়ে দাও নি? আর সে সময় তো খুবই দিয়েছিলে। সরিকে দেবার কোন মানে আমি খুঁজে পাই না।

মা সঙ্কুচিতভাবে বললেন, ওর বিয়ের সময় তিনি খুব দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু ওরা যে নিতান্ত গেরস্থঘর কিনা, আর স্ত্রীধন তো দেওয়া যায় মেয়েকে, তাই—তাই ভাবছিলাম—

ছোট ছেলে বেড়িয়ে ফিরল, সে এসে বসল মার কাছে।

ঈষৎ উচ্চ স্বরে বড় ছেলে বললে, গেরস্থ আর কি! আর স্ত্রীধন বলে তো বিলিয়ে দিতে পার না? টাকা কিছু দিতে চাও দাও, তাই বলে ওটা আমার মনে হয় না। আর এরাও কি তোমার মেয়ের মতন না?

মা লজ্জায় অপ্রস্তুতে পড়লেন। তা এদের তো সবই রইল বাবা। তোমরা বেঁচে থাক, কত আনবে, দেবে, তোমাদের বাড়ি-ঘর-টাকাকড়িও তিনি করে গেছেন, অভাব নেই।

উষ্ণভাবে বড় ছেলে বললে, ওকে কি সৎপাত্রে দাও নি? পয়সা কপালে করে। আজ যদি কিছু ভালমন্দ হয় ওর, আমাদেরই তো দেখতে শুনতে হবে।

ষাট ষাট, ও কি কথা বাবা!

অপ্রস্তুত হয়ে বড় ছেলে বললে, সে কথা বলছি না আমি। কিন্তু আমাদের ভালমন্দ

হলেও তো ও দেখবে না।

বালাই, কি বলিস সব!

কথা কেমন থেমে গেল। মনের ভেতর তার নানা অঙ্কুর বেরতে লাগল! কিন্তু সকলেই চুপ করে রইল। মারও শ্রান্তি বোধ হচ্ছিল, চোখ বুজে চুপ করে রইলেন, বধূকালের সুনীতিকে চুড় দেওয়ার কথা মনে পড়ল একবার।

তা মেজবউ, যাই বল তুমি, এ মা'র ঠিক হয় নি কিন্তু।

সকালবেলা ভাঁড়ার-ঘরে দুই জায়ে কথা হচ্ছিল।

কিন্তু আমি ভাই শুনেছি বাবার কাছে, এ রকম নিয়ম আছে।

মেজবউয়ের বাপও উকিল, মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর শখও ছিল।

তা হতে পারে, কিন্তু দেওয়া তো ঠাকুরঝিকে কম হয় নি। উনি তো বংশছাড়াই গোত্রছাড়াই হলেন। মেয়ে তো হাজার হোক। কোন কাজে উনি লাগবেন? দিলেই তো সব পরে পরে গেল। বিয়েতে হাজার বারো তেরো বাবা খরচ করেছিলেন, রায়চাঁদ-প্রেমচাঁদ-পড়া ছেলে বলে।

মেজবউয়ের মনে ছবির মতন বাড়ি-গাড়ি-মোটর ঐশ্বর্যময় শ্বশুরবাড়ির চিত্র ভেসে গেল, সে কিছু আর বললে না। মনে হল, আমাদেরও তো দিয়েছিলেন, আর রইলও তো সবই।

বড়বউ বললে, আমাদের বাপ তো আমাদের দেন নি বাপু ছেলেকে বঞ্চিত করে। এ উচিত নয়।

মেজবউ চুপ করেই রইল। এবং উচিত কথা বলাও উচিত নয়, সর্বত্র সত্যি কথা বলা যায় না।

যাই হোক, ভাগ হল।

মা'র রোগশয্যার পাশে লোহার সিন্দুক উজাড় করে গহনা পড়ল।

কন্যাকাল, বধূকাল, কিশোরীকাল, তারপর সমস্ত জীবনের নানাবিধ গড়নের নানা রকমের ছোট বড় অজস্র গহনা—মুকুট, সিঁথি, টায়রা, কপালপাটি, ঝাপটা, কান, ইয়ারিং, মাকড়ি কানবালা, ফুলকাঁটা, চিরুনি, সাতনর, সীতাহার, নেক্লেস, চিক, দড়িহার, বিছেহার, মুক্তোর মালা, কলার, তাবিজ, বাঁক, অনন্ত, জসম, বাজু, রুলি, বালা, ব্রেস্লেট, চুড়, মুক্তোর চুড়ি, সোনার চুড়ি, রতনচুড, আংটি, তারপর গোট, চন্দ্রহার ইত্যাদি সব কত কি ছোট-বড় স্তূপাকারে পড়ল রূপোর থালায়। তিনখানা থালায় ভাগ হতে লাগল।

তিন ভাগ হল—বড়, মেজ, শৈলেনের ;—সব ভাগের পর সরযূর জন্য রাখা হবে কিছু।

ভালমন্দ—সেই অকল্যাণের কথার পর মা আর কিছু বলেন নি, আজও বললেন না। যুক্তি-বিচার-তর্কের অবকাশ মনে নেই—শুধু শ্রান্তিভরে চুপ করে দেখতে লাগলেন।

মেজ আর বডর ছেলেমেয়েরা সব জিনিস নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল। তা হলে মা, এই অনন্ত, গোট, রুলি আর দড়িহার রইল সরির ? জিজ্ঞাসু চোখে ছেলেরা মার পানে চাইলেন, ভারী আছে—ওজন কম নয়।

ঝিয়ের মতন অনন্ত !

মা ফিরে দেখলেন। বললেন, আচ্ছা।

শুধু মনে হল, শাঁখা-সিঁদুর পরে মনের তৃপ্তিতে সে থাক , দিয়ে কে কাকে সমৃদ্ধ করতে পারে ?

ছেলেরা তৃপ্ত মনে কথা কইছিল। মার হল গিয়ে মেয়েলী বুদ্ধি , যা সম্ভব তাই করা উচিত ,—এইসব ধরনের কথা মনে উঠছিল। কথাও সেইভাবের—যেন স্পষ্ট নয়। মার বুদ্ধিকে ছোট করা হল ; না, মাকে কি—মেয়েমানুষের কবে বিষয়বুদ্ধি থাকে।

বউয়েরা অবগুণ্ঠন টেনে দরজার কাছে বসে ছিল।

বড়বউ উঠে দাঁড়াল, রান্নাঘরে ঠাকুর ডাকাডাকি করছে, মার পথ্য তৈরী করতে হবে।

সুকুমারী বললেন, তোমরা তুলে ফেল মা এবার এইসব।

বউয়ের মেয়ে বললে, এসব আমি নেব মা। একটা মস্ত চন্দ্রহার সে গলায় পরে মার সঙ্গে উঠল, আজকে সে সেইটে পরে থাকবে। তুমি পাবে না, সুরো পাবে না।

সস্নেহে বাপ একটু হাসলে, বললে, আচ্ছা, তুমিই নিও সব। এই বয়েসে বেটি গয়না চিনেছে দেখেছ মা ?

শাশুড়ী বললেন, ওগো বউমা, ওকে একটা হার পরিয়ে দাও। চন্দ্রহার পরেছে গলায়।

বাপ হাসলে, মেয়ের হাত ধরে বাইরে উঠে গেল। মেজ ছেলেও উঠল।

সুকুমারী মেজবউকে ডেকে বললেন, ও বউমা, তোমারটা তোল। মেজবউয়েরও কাজ পড়েছিল—শাশুড়ীর পুজোর যোগাড় করা, কাপড় ছাড়ানো, শরবৎ করে দেওয়া।—এসে দাঁড়াল।

তুলতে একটু ইতস্তত করতে লাগল ; তার পেলে ক্ষতি নেই, না পেলে বিরক্তি নেই, এই বোধ হয় ভাবটা।

ছোট ছেলে মার জন্যে ওষুধ ঠিক করছিল; বললে, মেজবউ, মাকে জল এনে দাও তো।

মা বললেন, তোরটা কোথায় রাখবি? বউমারা তুলবেন?

মেজবউ জল আনতে গিয়েছিল।

এবার ছেলে বললে, আমার থেকে আদ্ধেক সরিকে দাও না মা?

মা'র চোখ থেকে টপটপ করে জল পড়তে লাগল।

একটু থেমে বললেন, তুমিই দাও বাবা, ও তো তোমাকেই দেওয়া। আর নাই বা দিলে, দেওয়া তো হয়েছেও, হলও।

কই?

মেজবউ জল নিয়ে এল।

ওষুধটা খাও এবার।—ছেলে বললে।

দাঁড়া, কাপড় ছাড়ি, পূজো করি।—মা উঠলেন।

কি হে, হঠাৎ যে! সরযূর স্বামী গিরীন্দ্র ঘরে ঢুকে কনিষ্ঠ শ্যালককে দেখে বললে, মা ভাল তো?

শৈলেন বললে, এমনই, আপনার তো ছুটির দিনও দেখা পাওয়া দুর্লভ। মার অসুখটা কম আছে, সরিকে দেখতে এসেছিলাম।

সময় কোথায় হে? এক্‌জামিনের পেপার নিয়ে পড়েছি যে। ভগ্নীপতি বললে। শৈলেন খানিক গল্প করে চলে গেল।

টেবিলের ওপর স্তূপাকার খাতাপত্র। গিরীন্দ্র একমনে কাজ করছে।

ছেলের দুধের বাটি, পানের ডিবে, বিস্কুট, বাতাসা, ঝিনুক ইত্যাদি নানাবিধ নৈশ জিনিস হাতে নিয়ে সরযূবালা ঘরে ঢুকল।

তবেই হয়েছে, ঐ কাজ নিয়ে পড়েছ!—স্ত্রী টীকা করলে।

স্বামী অন্যমনে বললে, হুঁ, তারপর?

তারপর আবার কিসের? সরযূ বললে।

এই যে তুমি কি বললে না?—স্বামী মুখ তুললে।

সরযূ হেসে বললে, কিন্তু আজ শোনবার মতন কথা আছে। আজ ছোড়দা এসেছিল। গহনাভাগের সমস্ত পালা বলে সরযূ মৃদু হেসে বললে, তাই মা বলেছিলেন সরিকে গেরস্থঘরে দিয়েছি। সকৌতুকে স্বামীর মুখের দিকে চাইলে।

তারপর?—স্বামীও কৌতুকভরে জিজ্ঞাসা করলে।

তাই ছোড়দা সব গল্প করছিল, আর আমার কি কি ছিল দিয়ে গেল।

সত্যি? তা হলে আজ কিছু হয়েছে বল তোমার! সকালে মুখ দেখেছ কার? বিশ্বাস তো কর না। দেখলে আমার চেহারার 'পয়' ?

আহা, তা হলে তো রোজই পাওয়া উচিত।

ঝিনুক-বাটির কাঁসর-ঘণ্টা বাজিয়ে খোকাকে স-কোলাহলে দুগ্ধপাননিরত স্ত্রীর পানে চেয়ে বললে, কিন্তু গেরস্থদের বউ আজ গরিব গেরস্থকে পান দিতে ভুলে গেছে।

ওমা দেখেছ, একেবারে ভুলে গেছি! দিই। ছেলেকে শুইয়ে হাত ধুয়ে সরযূ পান নিয়ে স্বামীর চেয়ারের পাশে দাঁড়াল। স্বামী পানসুদ্ধ তার ডান হাতখানা নিজের বাঁ হাতে মুঠো করে ধরে নিলে, তা হলে গেরস্থঘরে পড়ে সরোর কিন্তু বড় দুঃখ, না?

যাও, কি যে কথার ছিরি! নাও পানটা। সরযূ টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে খাতার বহর দেখছিল, আজ আর খাতা দেখতে হবে না।

কেন বল তো? অনেক কাজ আছে যে! স্বামী হাসলে।

রোজ রোজ কি কাজ, পোড়া কপাল ছুটির!

স্বামী অন্যমনে তার দিকে চেয়ে ছিল, মুঠোটা ছেড়ে পান খাবার কিংবা কাজ করবার কোন আগ্রহই তাঁর মুখে দেখা যাচ্ছিল না।

সরযূর বাপের বাড়ির সংসারের কাজ সারা হল।

ছেলেপিলে, অসুখ-বিসুখ, ঝি-চাকর, দারোয়ান-কোচম্যান সব সমস্যা আলোচনা হয়ে থামল।

বড়বউ বললেন, ঠাকুরপো তার ভাগ থেকে আদ্দেক ঠাকুরঝিকে দিয়ে এসেছে, জান?

নগেন বললে, বটে? না তো।

তা মার যে সব উল্টো ছিষ্টি, একবার তো বাপু দেওয়া হয়েছে!

নগেন শুধু 'হ্যাঁ' বললে, আর কথা কইলে না। ফেনিয়ে অকারণে কথা কওয়া তার স্বভাব নয়—বিশেষ করে মা'র বিষয়ে। মা'র বুদ্ধিতে তার খুব শ্রদ্ধা না থাকতে পারে, কিন্তু তাই বলে সেটা আলোচনা করা!—

মেজবউ বললে, কিন্তু যাই বল, এটা তোমাদের ভাল কাজ হয় নি, হকের হিসেবে, আর মা তো আদ্দেকই দিতে বলেছিলেন, তোমাদের তো সব রইল।

কাগজ পড়তে পড়তে নগেন বললে, হুঁ।

মেজবউ আর দু-একটা কি বলতে গেল, উত্তর পেলে না, রাগ করে শুয়ে পড়ল।

সুকুমারীর পথের যখন হিসাবমতন মাইল কতক পথ আছে, আর মাস ছয়েক

হয়তো সময় আছে। হঠাৎ খবর এল, সরযূর ভাগ্য ভালমন্দের মন্দটা বেছে নিয়েছে।

মাইল এসে গজ কতকে ঠেকল, ছ'মাস এক মাসে দাঁড়াল ; সেই যে মা মুখ ঢেকে শুয়ে পড়লেন, আর সোজা হয়ে দাঁড়ালেনও না, ফিরেও চাইলেন না।

শাঁখা-সিঁদুর-সমৃদ্ধির পাশবন্ধন কাটিয়ে সরযূ মুক্ত হয়ে জগৎ-মিথ্যার পথে এসে দাঁড়াল।

বছর কতক কেটেছে—ইতিমধ্যে শৈলেনের বিয়ে হয়েছে, একটি ছেলেও হয়েছে।

সরযূ বেশির ভাগই এখানে থাকে। একটি মাত্র ছেলে—বছর সাতেকের।

সন্ধ্যার পর বউয়েদের কোথায় নিমন্ত্রণ আছে, তার জন্যে তারা ঘরের ভেতর ব্যস্ত।

সরযূ ছোট ভাইয়ের ছেলেকে কোলে নিয়ে বারান্দায় বসে ছিল।

ছোটবউয়ের প্রসাধন হল।

ওমা, তুই হাতে শুধু ঐ পরে যাবি ?—বড়বউ নিজের হাতে কি একটা গহনা পরতে পরতে বলল।

মেজরও হয়েছিল, সেও চেয়ে দেখলে, তাই তো, ছোটবউয়ের ও কি আজ হাল ? হাতটা যে নেড়া মনে হচ্ছে ! তোমার হাতের আর কিছু নেই ?

ছোটবউ জায়েদের হাতের আর গলার আধুনিক অলঙ্কারের দিকে চেয়ে ছিল, তাদের তুলনায় ওর নিতান্ত আস্থিকেলে গহনা।

হোকগে ভাই, হবে'খন এতেই।—সে বললে।

মেজবউ বললে, না, কেমন সং দেখাবে, না বড়দি ? আমরা বড়রা এত পরে যাব—

মাথার ঘোমটা ঠিক করতে করতে বড়বউ আরশির দিকে চেয়ে বললে, হুঁ, দেখি আমাদের আর কি আছে ?

সুবিধে মতন কিছু পাওয়া গেল না নিজেদের বাক্সে।

হ্যাঁ ভাই, তোমাদের হল ? রাত হল যে ! সরযূ এসে দাঁড়াল। বেশ হয়েছে। কই ছোটবউ, দেখি !

ছোটবউয়ের তেমন সুবিধেমতন কিছু পাওয়া গেল না।—বড়বউ বললে।

সরযূ বললে, আমার কিছু দেব ? এস তো দেখি।

গলার আর হাতের কি দুটো দিয়ে সম্পূর্ণ হল। ওরা চলে গেল।

অন্ধকার বারান্দায় সে খোকাকে ঘুম পাড়াতে বসল। অন্ধকারভরা বাগান, আকাশে কৃষ্ণপক্ষের তারা। 'আয় ঘুম, যায় ঘুম, বাগ্‌দী পাড়া দিয়ে,' খোকার জন্যে 'একশো টাকার মলমলি-থান সোনার চাদর' কিনে দিয়ে ঘুম এল।

অনেক রাত্রে তারা এল ফিরে, খোকার পিসীমা তখন শুয়ে পড়েছে। বারবার

ডাকায় কিন্তু ঘুম আজ বোধ হয় তার ওপর বিরক্ত হয়েছিলেন, তাই তার কাছে আব এলেন না।

বারন্দার এক দিকে মাদুরে সে শুয়ে ছিল।

শৈলেন তখন বই পড়ছিল। সুসজ্জিতা পত্নীকে দেখে একটু পরিহাসের হাসিভরা দৃষ্টিতে সে চাইল।

পতিব্রতা স্ত্রীরা সেকালে শুনেছি স্বামীর জন্যই সাজতেন, একেলে পতিপ্রাণারা নিমন্ত্রণবাড়ির সখীদের জন্য সাজেন।

হ্যাঁগো!—টেবিলের ওপর অলঙ্কারের স্তূপ জমা হচ্ছিল। আচ্ছা, এই চুড়দুটো কি মা'র?—প্রশ্ন করলে।

কোন্‌টি?—শৈলেন বললে।

ছোটবউ হাতে তুলে দিলে স্বামীর।

হ্যাঁ, মনে হচ্ছে, এটা মা'রই ছিল—কোথায় পেলে?

ঠাকুরঝি দিলেন পরতে! তাই দিদিরা বলছিলেন।

কি বলছিলেন?

ওঁরা বললেন, মা তো ওটা তোর জন্যেই রেখেছিলেন, ঠাকুরঝির কাছে কবে গেল?

শৈলেন ভ্রূকুঞ্চিত করে বললে, মা'র ইচ্ছে হয়েছিল, সরো তাঁর সব জিনিস না হোক খানিকটা পায়। যাক, সেটা হল না যখন, তখন আমি আমার ভাগের থেকে অর্ধেক সরোকে দিযে এসেছিলাম মা'র মত নিয়ে। ও মা'র মেয়েই তো।

আমি কি বলছি কিছু? দিদিরা বললেন, ঠাকুরঝিকে তো বিয়ের সময় কম কিছু দেওয়া হয় নি, আর ওঁর দরকারই বা কি এখন গয়নার? ছোটবউ মুক্তোর মালাটাও খুলে রাখলে। ওঁরা বললেন, হিসেবমতন মা ওটা তোর জন্যেই রেখেছিলেন।

তোমরা সব কি কথা কও!—বলে শৈলেন উঠে গেল। সুসজ্জিতা স্ত্রীর রাত্রিব সমস্ত মাধুর্য ঝরে পড়ে যেন একটা হাড়-বের করা সঙ্কীর্ণ লোলুপতা সুমুখে এসে দাঁড়াল।

সরযূর কানে পৌছল খানিক। মনে হল, একবার উঠে কোথাও সরে যায়, কিন্তু শৈলেনের বিরক্ত মুখের কথা পাশের ঘরে তার কানে পৌছল।

এত ইতিহাস সে জানত না। বহুদিন আগের সেই সন্ধ্যা মনে পড়ল।

গহনার দুঃখ আর কি হবে? হাসি এল একটু, কিন্তু পরক্ষণেই চোখ ভরে উঠল।

সমস্ত রাত্রি কি অন্যমনে, নির্বাক অদ্ভুত জটিল বেদনায় কেটে গেল, ঘুম আর আসে না।

শেষরাত্রে, তখন ভোরের পূর্ব-আকাশে শুকতারা জলজল করছে, বারন্দার মাদুরে

—ঘুম এল। ছেলে ঘরে ঘুমচ্ছে।

শৈলেন ডাকলে, সরো, এখানে যে? এত বেলা?

সরোর ঘুম ভেঙে গেল। ভোরের স্বপ্নটা কোথায় পথ হারিয়ে ফেললে, অপ্রস্তুত হয়ে সে উঠে বসল।

শৈলেন একটু আশ্চর্যভাবে তার দিকে চেয়ে রইল। সমস্ত রাত্রির ব্যাকুল জাগরণক্লিষ্ট মনের ছাপ মুখে পড়েছে। মুখের হাসির পাশে মনের সাগরে অশ্রু টলমল করছে।

সন্ধ্যার সময় বারান্দায় সুপারি নিয়ে সরযূ বসে ছিল। স্বপ্নটা সারাদিন ধরে মনে আব আনতে পারছিল না। নিরভিমান মনে আর কোন কথা ছিল না।

ছোটবউ এসে দাঁড়াল, কি করছ ভাই?

জাঁতি আপনার কাজে মন দিলে, সুপারি কাটা হতে লাগল। কিছু না, বসে ছিলাম সুপুরিগুলো নিয়ে। সরযূ সোজা হয়ে বসল।

তোমাব গয়নাগুলো নেবে? এখন তুলবে?—ছোটবউ দুটো গয়নার কেস হাতে করে জিজ্ঞেস করলে।

ননদ বললে, এগুলো তুমি রাখ না ছোটবউ, আমি তো তোমাকে কিছু দিই নি এমন।

সে কি ভাই?—সবিস্ময়ে ছোটবউ চেয়ে রইল ননদের দিকে। ঠাকুরঝি কি ওদের আলোচনা জানতে পেরেছে? কি করে জানল? কিন্তু কথা তো রাগ করবার মতন নয়, বেশ সহজই তো মনে হচ্ছে।

স্মিতহাস্যে সরযূ বললে, ভাবছ কেন, আমি তো দিতে পারি তোমাকে, বয়সে তোমার কত বড়, আর আমার কি হবে ওসব?

সে কি ভাই? তোমার নলিন বেঁচে থাক, তার বউ পরবে।

না রে পাগল, তখন তার মামারা দেবে।—সরযূ বললে। যাও, রেখে দাও।

ছোটবউ বিস্ময়ে আশ্চর্যে একেবারে ভরে গিয়েছিল, জায়েদের কাছে বলতে গেল সব কথা।

সরযূ হারানো স্বপ্নের খেই সকালের কাজের আড়ালে, দুপুরের স্তব্ধ অবসরে, এখন সন্ধ্যায় দৃষ্টিহীন অপরূপ অন্ধকারের বুকে ধ্যানের মধ্যেও খুঁজে পেলে না। অন্ধকার বারন্দায় বসে শুধু রাশীকৃত কাটা সুপারিতে পেতেটি ভরে উঠতে লাগল।

বিচিত্রা—ভাদ্র, ১৩৩৭

জননী

জাজ্জ্বল্যমান সংসার। চার ছেলে, দুই মেয়ে, পৌত্র পৌত্রী, দৌহিত্র দৌহিত্রীতে সাজানো, সমৃদ্ধ। ছেলেরা কৃতী—একজন প্রফেসার, একজন ডাক্তার, দু'জন উকিল।

সংসার চলে স্বচ্ছন্দে সচ্ছলে; সময় কাটে কাজে কোলাহলে; সুতরাং সাংসারিক অশান্তি শুধু বাক্যের পথ দিয়েই উঁকি মেরে যায়।

মোটের ওপর সব ভাল।

কিন্তু একটি চিরন্তনী গোল ছিল, সেটা ছিল বড ছেলের মাতৃহীন বালক যোগেনকে নিয়ে।

মায়ের অভাবটি পরিপূর্ণ করে দেবার প্রবল প্রচেষ্টাতে পিতামহী যে প্রচুর পরিমাণে প্রশ্রয় তাকে দিয়েছিলেন, সেইটেই পিতামহী আর পৌত্রের দুজনেরই কাল হয়েছিল। দ্বন্দ্ব, বিবাদ, বিরোধ, বচসা যা কিছু উঁকি মারত, তার যবনিকার অন্তরাল থেকে সপিতামহী যোগেনকে সকলেই চট করে আবিষ্কার করত।

মা'র পক্ষপাতিত্ব বাড়ির কাকপক্ষীও দেখতে পায়, এইটে ছিল বাড়ির মতামত।

নানা পথ দিয়ে বিরক্তি আসে, বিরক্তির সঙ্গে বিঘ্নও আসে। মাসের পয়লা থেকে হিসাব-নিকাশের সময় মুদী, ময়রা, গয়লা, ধোপা, দর্জী তো আছেই, তার ওপর গলির মোড়ের 'সর্বভাণ্ডার' দোকানের চায়ের টিন, বিস্কুটের বাক্স, দেশলাই, মোজা, জামা, শাড়ি, ধুতি, সাবান, কাপড়কাচা সাবান, কাগজ, পেন্সিল, কালি ও নানাবিধ দ্রব্যের অনাদ্যন্ত বিল আসে। চার বউ চার বাবুর ইনিশিয়েল সই করে দেন। মুদী আসে, ময়রা আসে, সর্বভাণ্ডার আসে সরবরাহ নিয়ে। দর্জী আসে গজ নিয়ে ছিট নিয়ে ইত্যাদি।

মাসকাবারি নানাবিধ বিল দেখতে দেখতে কারুকে দিয়ে কারুকে স্থগিত রেখে, কারুকে ভগ্নাংশ মাত্র দিয়ে, বিরক্ত মুখে বড় ছেলে উঠে এলেন, এই সেদিন আর বছর এত বিছানাপত্র করালে মা, আবার এবার?

অপ্রস্তুত মা বললেন, যগুর জন্যে করতে দিয়েছিলাম।

অপর ছেলেরাও এসে বসলেন।

সেদিনকার বিছানাপত্রগুলো? বিরক্তি জিনিসটা সংক্রামক। বিরক্ত তৃতীয় পুত্র বললেন, সেগুলো কার?

সেগুলো অন্য পৌত্রদের, তৃতীয় পুত্রের মেয়ের, বড় ছেলের ছেলের ইত্যাদির।

জননী নাম করলেন না।

মধ্যম পুত্র বললেন, মা, তোমার কেমন যগু যগু বাতিক! সেদিন তো যগুর কি একটা হল? আর লেপ?

জননী বললেন, সেটা বালিশ একটা যগুর। এবং একবার বলতে চাইলেন, সে লেপটা যোগেনের নয়, সেটা বিশুর; কিন্তু নিরর্থক হবে জেনে মৌন হয়ে রইলেন।

বড় খগেন্দ্র বললেন, দেখ না, এ মাসে দর্জীর বিলই কত হয়েছে! দুধের হিসেব দিয়ে গেল মতি, চল্লিশ টাকা এবার দুধের। সবই মোটা অঙ্কে বেড়েছে। দশ টাকা করে প্রত্যেকটায় বেশি আছে, কম তো কোনটাতে নয়।

মধ্যম জগদিন্দ্র বললেন, হ্যাঁ, আমি তো দেখছি, যেন কিছুরই মাত্রা নেই।

পাশের ঘরে বধূরা, কন্যারা ছিল, জননী ব্যাকুল হয়ে বললেন, ওরে, এ মাসে যে সব তত্ত্ব-তালাস আনা-নেওয়া মেয়ে-বউমাদেব করলাম, জামাইরা এলেন, ভাইদ্বিতীয়া গেল, ছেলেপিলে পাঁচটি এসেছে, খরচ তো হবেই, অত চেঁচাস নি।

আগে? এত কি তখনও খরচ হত?—কনিষ্ঠ পুত্র জিজ্ঞাসা করলে।

মা বললেন, ওরে, এখন যে সব মাগ্‌গিগণ্ডা হয়েছে। মুখে এল—তখন ছেলেপিলে সংসারে সকলের হয় নি, কিন্তু ষাট, সে তো মনেই আনতে নেই, মুখে তো দূরের কথা। তারপর হাসি-অশ্রুতে মিলিয়ে মনে এল তখনকার হিসাব।

কিন্তু তোমরা হিসেব বোঝ না।—তৃতীয় নরেন বললেন।

সকলেই বললেন, সেটা ঠিক।

মা অপ্রস্তুতভাবে একটু হাসবার চেষ্টা করলেন।

আর যোগেনের বজ্জাতির শেষ নেই, সে খবর তো মা রাখ না। পড়াশোনায় বাবু আজকাল বেজায় স্বাধীন, তুমি ওর মাথাটি চিবিয়ে খাচ্ছ মা।—কনিষ্ঠ পুত্র উষ্ণ স্বরে বললেন।

ষাট ষাট, তোমাদের কি কথা বাবা! কথা কি কইলেই হল?—যগুব পিতামহী ব্যাকুল হয়ে উঠলেন।

কনিষ্ঠের কথায় যোগেনের পিতা বললেন, বটে! এদিকে ছোঁড়া বাড়ছে যেন তালগাছ। খাবে আর বজ্জাতি করবে।—বিরক্ত স্বরে বলে আপনা হতেই যেন মা'র দিকে চাইলেন।

খাওয়ার কথাতেই জননীর মনটা পীড়িত হয়ে উঠল। যোগেনের সত্যই সুখাদ্যে অত্যধিক রকম রুচি ছিল। মাতৃহীন বালককে পিতামহী কোন দিন সে বিষয়ে কিছু বলেনও নি, এখন কিন্তু অন্যত্র তাকে সুখাদ্যের সঙ্গে খোঁটাও খেতে হয়।

খরচপত্র, আয়ব্যয়, পূজার পর কোর্টের কাজ, বাকি টাকা ইত্যাদি, যোগেন এবং অন্য বালক বালিকা, নানাবিধ আলোচনার পর ছেলেরা কেউ ঘরে কেউ বাইরে গেলেন।

স্তিমিতপ্রদীপ আলো-আঁধারের আভাসে ভরা দালানে বসে হরিনামের মালাটি হাতে নিয়ে জননী মনে মনে হয়ত বেদনার মালা জপ করতে লাগলেন।

তা তুমি যতই বল সেজবউ, ওর দোষ উনি দেখতে পান না। ওই বুড়ো হাতী ছেলে কি রকম যে করে ছোটদের সঙ্গে, তা মা যদি একটি কথা ওকে বলেন!—মেজবউ বললে, তার ছেলের সঙ্গে সেদিন যোগেনের ঝগড়া হয়েছিল।

সেজবউ বললে, মা তো ভাই কারুকেই কিছু বলেন না। তা ছাড়া ওর মা নেই। প্রথম নাতি। তার নিজের জননীরও ওই রকম পৌত্রের উপর ঝোঁক ছিল।

নাতি তো সবাই।—মেজবউ গম্ভীর অপ্রসন্ন মুখে বলে আরব্ধ কাজে মন দিলে।

প্রতিবাদ জিনিসটা যতই জনান্তিকে হোক না, যার নামে হয় তার কাছে একদিন এসে পৌঁছয়ই এবং শুধু পৌঁছয় না—অলঙ্কৃত সুসজ্জিত হয়ে আসে।

মা যেন মাটি হয়ে গেলেন।

বার্ধক্য আসে নি, কিন্তু স্থবিরতা এল।

আস্তে আস্তে সংসারের সব কাজ এবং দায়িত্বভার ছেড়ে দিযে সকালে নিভৃত ঠাকুরঘরের কোণ, আর সন্ধ্যায় শিশুদের রূপকথার মণ্ডল সৃষ্টি করে, বহু যত্নে বহু আয়াসে পরম মমতায় গড়ে তোলা সংসারকে জননী ছেড়ে দিলেন।

বধূরা মাঝে মাঝে ডাকে, মা এইটে বলুন, এইটে করে দেবেন। মা মৃদু হাস্যে স্বীকার করে নেন, কিন্তু দরকারের সময় ঠাকুরঘরেই থাকেন।

হিসাব-নিকাশ, গৃহিণীপনার স্রোত তার নির্দিষ্ট পুরাতন প্রণালী না পেয়েও ছোট ছোট নতুন প্রণালী দিয়ে সহজেই বয়ে যায়।

মা'র দিকে চোখ পড়ল সকলের, কিন্তু ধরা গেল না। বুড়ো হয়েছেন? শরীর ভাল নেই? বাঁচবেন না আর? সবাই—ছেলেরা ভাবে নিজের মত করে। মাকে আবশ্যক না থাক, বেদনাবোধ তো আছে। বহুকালের পুরাতন প্রপিতামহীর প্রতিষ্ঠা করা দীঘি, আজ হঠাৎ শুকিয়ে যেতে থাকে, মনের ভেতর কি যেন অভাব বোধ হয় হয়ত।

ছেলেরা বধূরা সব জিজ্ঞাসা করেন, মায়ের কি চাই? মায়ের শ্বশুর কি চাই? অভিযোগের অনুযোগের ভাবে নয়—আন্তরিক।

শ্বশুর? কি জানি, সবই তো আছে—দেখ'খন তোমরা। নিজের?—জননী মৃদু

হাস্তে বলেন, না বাবা, নিজের আর কি চাই? সবই তো আছে।

সংসার সুনিয়মে চলে। অন্তরে বেদনা কারু বাজে, কারু বাজে না, সেটা আছে হয়ত।

কবে জ্বর হয়েছে জান না?—বিরক্ত বড় ছেলে স্ত্রীকে বললেন।

আমরা কি করে জানব? রোজ নেয়েছেন, পূজো করেছেন, খেতে পারেন না শুধু। আজ সকালে যোগেন এসে বললে, ঠাকুমা ডাকছেন, জ্বর হযেছে। তাই টের পেলুম। আমাকে বললেন, ঠাকুররা উপোসী থাকবেন, তাই পূজো করতে।—যোগেনের বিমাতা উত্তর দিলেন।

চল, দেখে আসি, তোমরা আশ্চর্য মানুষ! বড় ছেলে বেরিয়ে এলেন।

একে একে চার ছেলে সব এসে বসলেন। জননী চুপ করে শুযে ছিলেন, যোগেন পাশে বসে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল।

বড় ছেলে মা'র মাথায় হাত দিলেন। ডাক্তার-ভাইকে ডেকে বললেন, সতু, দেখ, জ্বর বেশ।

জননী, ছেলের হাতখানি মাথায় সুশীতল মনে হওয়ায়, 'আঃ' বলে বললেন, না, জ্বর বেশ কোথায়? এই গায়ে কেমন বড্ড ব্যথা, তাই আর উঠি নি। তোরা মিছে হৈচৈ করছিস।

সকালবেলা হৈচৈ বলা সত্ত্বেও বিকালে চোখ আর মায়ের খুলতে চাইল না, আচ্ছন্ন হয়ে শুয়ে রইলেন।

দিন তিনেকের মধ্যে ওষুধে টিউবে ইন্‌জেক্‌শনের সাজ-সরঞ্জামে বিষে উত্তেজকে ঘরের টেবিল টুল ভরে গেল।

স্তব্ধ আচ্ছন্নমুখ জননীর মুখপানে চেয়ে ছেলেরা আসা-যাওয়া করেন, বার বার জিজ্ঞেস করেন, মাকে ওষুধ দিয়েছ? দুধ? আঙুরের রস? কতটুকু করে দাও? লেখ না কেন?

অর্থ, ব্যাকুলতা, সেবা নিরর্থক শত পথ দিয়ে বেরিয়ে যায়, যাঁর জন্য, তিনি কিছুই জানতে পারেন না।

ও মা, মা? দিদিকে আজ আনতে পাঠাব? ছোড়দি এসেছে।

জননী একবার চোখ খুলে বললেন, আচ্ছা।

যগু ঘুরে-ফিরে আসে, সেই ঘরে বেড়ায়, তার আকুলতা কারুর চোখে লাগে না। রাত্রে সবাই বিশ্রামের জন্যে একটু শুলে সে পিতামহীর বুকের কাছে মাথাটা আনে, তিনি অজানতেই ক্ষণচেতনে একবার তার মাথার ওপর শীর্ণ হাতখানি রাখেন।

তারপরেই আবার চোখ বুজে নেন, নয়ত আপন মনে কি সব বলতে আরম্ভ করেন।

কর্ম-অবসরে ছেলেরা এসে বসেন; মনের বিস্মৃত কোণ থেকে বাল্যকাল, খেলাধূলা, আবদার প্রশ্রয় থেকে আরম্ভ করে সেদিনের সম্প্রতি ছোট ছোট কথা, বাদানুবাদ বিসর্পিতগতি বেদনার বার্তা বয়ে এসে দাঁড়ায়; আঘাত? মাকে? মন স্তব্ধ হয়ে থাকে, জবাব দেয় না। তর্ক? দুঃখ দেওয়া? যগুর জন্যে? কই, না তো। কিন্তু যগুর জন্যে মা তো আর কিছুই কোনদিন বলেন নি। জননী কি আর সংসারের মাঝে ছিলেন না?

রোগিণীর ম্লান বিশীর্ণ মুখের পানে চেয়ে চোখ ভরে আসে, সকলেই আপনার কাছেই আপনার অন্তর গোপন করে নিতে চায়।

মাকে যত্ন করবার, জিজ্ঞাসা করবার, শুধু ডাকবার একটা আকাঙ্ক্ষা অন্তর মথিত করে ওঠে; কারণে অকারণে ছেলেদের আসা-যাওয়া জিজ্ঞাসার বিরাম নেই, শুধু জননীর চেতনা কখনও অল্পমাত্র সাড়া দেয়, কখনও দেয় না।

পিসীমাদের চতুর্থী সারা হতে না হতেই ছেলেদের মাতৃদায়ের আয়োজন শুরু হয়ে গেল।

খাট, পালঙ্ক, সাটিনের বালিশ, সুদৃশ্য ছিটের লেপ তোষক, নেটের মশারি, ঘড়া, গাড়ু, তৈজসপত্রে বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ ভ'রে গেল।

চার ছেলের চারটি, পৌত্রদের মধ্যে বড় এবং পিতামহী অত্যধিক ভালবাসতেন বলে যোগেনেরও একটা ষোড়শ।

পিসীমাদের, জননীদের, বাপ-কাকাদের নিরবসর দিন। জননীকে কেন্দ্র করে যে আয়োজন, তাতে জননীকে স্মরণ করবার অবসর নেই। শুধু ক্ষণে ক্ষণে অভ্যাগত কুটুম্ব সমাগমে সকলের মনের গোপন ব্যথিত অংশ একবার দেখা দিয়ে যায়।

যগু কি করে, কি খায় না খায়, কোথায় থাকে, কি ভাবে থাকে লক্ষ করবার সময় কেউই পায় না। মাঝে মাঝে ছোট কাকা এক একবার তাকে ডাকে; ঝড়ো কাকের মতন রুক্ষ চুল, দীর্ঘ শীর্ণ দেহে, সাদা উত্তরীয়ে থানে কিম্ভূত-কিমাকারদর্শন বালক; আহ্বান করলে মুখে দীন ম্লান অপ্রতিভ হাসি ভেসে ওঠে একবার, চোখে জল এসে পড়ে সঙ্গে সঙ্গে।

তৃতীয় প্রহর শেষ হয়ে এসেছে, ডাক পড়ল যগুর—ওরে যগু, যগু কোথা? ডাক ডাক, কাজ আরম্ভ করে দিক।

সুসজ্জিত সভামধ্যে কীর্তনের আসরে কুটুম্ব আত্মীয় বন্ধু স্বজনের সংখ্যা ছিল না।

কে এক ভৃত্য শীর্ণ, দীর্ঘকায়, তেরো বৎসরের বালককে ডেকে আনলে। কোথায় ছিলি? আয় আয়।—পিতা আহ্বান করলেন।

বিস্ফারিত চোখে বালক জিজ্ঞাসা করলে, কি?

আসনে বস।

পুরোহিত বললেন, এই যে এইখানে বাবা।

যণ্ডু বললে, কি করব?

তোকে যে ঠাকুমার দান উৎসর্গ করতে হবে—এই সব।—সুসজ্জিত দ্রব্যাদি দেখিয়ে পিতা বললেন।

বালক আশ্চর্য হয়ে বললে, কাকে?

আঃ, বস না, ঐ মন্ত্র পড় না।

নির্বোধের মত খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে দু'একটা উৎসর্গের মন্ত্রপাঠের পর কুশের আংটি, শ্বেত উত্তরীয় ফেলে লুটিয়ে পড়ে সে চেঁচিয়ে কেঁদে উঠল, ও ঠাকুমারে, তোমাকে ওরা তখন কেন এই সব একটাও দেয় নি রে—

কীর্তনের আসরেই জনতা বেশি, দু-একজন এদিকেও ছিল, তারা আর তার বাপ-কাকারাও ছুটে এলেন, কি রে? কি হয়েছে কি? কাঁদিস কেন?

বালক ততক্ষণে চোখ মুছে স্তব্ধ হয়ে উঠে বসল।

কি হল কি? জবাব দে না। এই?—পিতা রেগে উঠলেন।

অন্য পাঁচজন বললে, আহা, ওর মন কেমন করছে। ছোট কাকা নীচু হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, কি রে যণ্ডু?

যণ্ডুর টপটপ করে ধারা বয়ে চোখ থেকে জল পড়তে লাগল, মৃদুস্বরে সে বললে, তখন তো কেউ তোমরা ঠাকুমাকে এই সব কিছুই দাও নি। খালি সবাই রাগ করতে।

বালক আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, আমি মরা ঠাকুমাকে দিতে চাই না।

ছোট কাকায় চোখ করুণ হয়ে উঠল, চার ভাই স্তব্ধ হয়ে রইলেন।

উত্তরা—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪২

কর্ণ-কুন্তী কথা

মেডিকেল কলেজের শেষ পরীক্ষায় একেবারে ফার্স্ট হয়ে বেরিয়ে এল সুদেব সরকার। আগাগোড়া সে ভাল ছেলে ছিল, কিন্তু এবারকার চূড়ান্ত সফলতায় যত বা তার কাকার গর্ব-আনন্দ, তত তার মার গর্ব।

হাউস সার্জন হল, খ্যাতিও হল। আর বিয়ের সম্বন্ধও আসতে লাগল দেশ ও বিদেশ থেকে। সুন্দরী শিক্ষিতা মেয়ের ছবি, অশিক্ষিতা প্রচুর সম্পত্তিশালিনী মেয়ের খবর, উত্তরাধিকারিণী এক মেয়ের পিতার লোভনীয় প্রস্তাব, আর এমনি মেয়ের বাপ-মার আসা যাওয়ায় (যদি লেগে যায়) বাড়িতে যত বা লোকের ভিড় হয় তত বা চিঠি আসে।

গর্বিত ছেলে বলে, এখনি বিয়ে করব না কাকা, বিলেত যাই একবার।

কাকা বা মা বিয়ের প্রস্তাবে কিছুই বলেন না।

এই কথায় কাকা স্মিতমুখে চুপ করে থাকেন, মাও কিছু বলেন না। যেন আনন্দের বা গর্বের সঙ্গে ঐ বিয়ে করতে জোরজবদস্তি না করাটা খাপ খায় না। লোকে বলে, বিদ্যে তো কিছু কম হয় নি—না হয় বিয়ে করেই বিলেতে যাবে। আর বাড়িতে ঐ তো একলা ছেলে, খেতে পরতে টাকা অঢেল। তারক সরকারের কাগজের ব্যবসাতে তো টাকা কম জমে নি। মারই বা কি আক্কেল, কবে মরে যাবে, ছেলের বিয়ে দিয়ে নাতিপুতির মুখ দেখ। আর কাকাও তো বিয়ে করে নি, ওরও তো ছেলে বলতে ওই। এত লোককে ঘোরাচ্ছেই বা কেন। শেষে বিলেতে গিয়ে এক মেম বিয়ে করে ফিরবে সেই ঠিক হবে।

কিন্তু লোকের কথায় কে কান দেয়, আর সব কথা কানে পৌছয়ই বা কার।

শেষ অবধি সুদেব বিলেত গেল এবং বিলেত থেকে ফিরল মেম সঙ্গে না নিয়েই। লোক আশ্চর্য হয়ে যায়।

এবার আর মেয়ের বাপেদের ধৈর্য ও আগমন বাধা মানে না।

এখন মাঝে মাঝে ছবি আসে ছেলের নামেই, তারা ভাবে যদি কাকা না দেখায়, মেয়ের রূপগুণ দেখে ছেলে ঝুঁকে পড়ে তো কেল্লা ফতে আপনিই হবে।

ছবির প্যাকেট প্রায় সবই পড়ে থাকে, খোলা হয় না। হঠাৎ মাঝে মাঝে বন্ধুরা মিলে ছবি খোলে। হঠাৎ একটা ছবি দেখে তারা একেবারে মুগ্ধ হয়ে চুপ করে গেল, আর হাসাহাসি বা কোন কথা কারুরই মুখে এল না। যদি রং থাকে ওর সঙ্গে তা হলে রূপ বটে। যেমন গড়ন, তেমনি মুখশ্রী, তেমনি মুখে নিজের অজানা আভিজাত্য।

যেন তার নিজের অত রূপ সে জানে না। সরল সুন্দর মুখ। ডাক্তারও অবাক হয়েই দেখল।

বন্ধুরা চলে গেলে মেয়ের বাপের চিঠি পড়ল, বড়লোক নন তবে পড়তি বড় ঘর বটে, মেয়ে শিক্ষিতাও। লিখেছেন, কন্যার রূপ তো ইচ্ছে করলেই দেখতে পারেন, চিঠিতে ভূমিকা করে লাভ নেই।

সুদেব একটু ভাবলে, শেষে এক চিঠি লিখলে, আপনারা কাকা আর মাকে ছবি পাঠান, আমার অমত নেই যদি তাঁরা মত করেন।

কয়েকদিন পরে একদিন রাত্রে কাকার ঘরে ডাক পড়ল সুদেবের। দিনে অত সময় হয় না কথাবার্তার। চিরকাল সুদেব কাকার কাছে রাত্রেই খাওয়াদাওয়ার পরে মাঝে মাঝে গল্পগুজব করত। কাকার টেবিলে কয়েকটা চিঠি আর দু'খানা ছবি।

কাকা দরজা বন্ধ করলেন। বললেন, বস। একটু যেন চিন্তিত বিমনা ভাব।

কাকা বললেন, 'এই মেয়েটির বাপ ছবি পাঠিয়েছেন। তোমার নাকি এ বিয়েতে অমত নেই বলেছ তাই।'

সুদেব কাকার দরজা বন্ধ করা আর কথার মধ্যে কি একটা গাম্ভীর্য দেখে একটু আশ্চর্য হযে গিয়েছিল।

বললে, 'হ্যাঁ আমার কাছে ওই মেয়ের ছবি একটা এসেছিল। আমি আপনার কাছে লিখতে বলেছিলাম।' তারপর একটু দ্বিধাভরে বললে, 'আপনার কি মত নেই তা হলে?'

একটু চুপ করে থেকে কাকা বললেন, 'না, অমত আমার নেই। কিন্তু এ বিযে হতে পারবে না।'

আশ্চর্য হয়ে সুদেব তাঁর দিকে চেয়ে রইল। কি আপত্তি! একটু বিরক্তিও মনে এল। তবু কেন জিজ্ঞাসা করতে পারল না। খানিকক্ষণ কাকাও টেবিলের ওপরের চিঠিপত্র কাগজপত্র দেখতে লাগলেন। তারপর হঠাৎ বললেন, 'ওরা কায়স্থ।'

ওরাও তো কায়স্থ। অবাক হওয়ার শেষ ছিল না সুদেবের। কাকার কি মাথা বেঠিক হয়ে গেল হঠাৎ?

কাকা এবারে আচমকা বললেন, 'তোমরা ব্রাহ্মণ।'

মানুষ আকাশ থেকে কি করে পড়ে জানা নেই সুদেবের। কিন্তু সে আকাশ থেকেই পড়ল। কিছুই জিজ্ঞাসা করতে না পেরে তাকিয়ে রইল।

কাকা বললেন, 'তোমার বাবার নাম শশাঙ্কমোহন চক্রবর্তী। পিতামহের নাম সূর্যমোহন চক্রবর্তী। আমি তোমাদের রাস্তায় কুড়িয়ে পেয়েছিলাম।'

সুদেব আর একবার আকাশ থেকে পড়ল। তার মুখটা একটু কি বলবার মত হাঁ

হয়ে গেল। কিন্তু কিছুই বলতে পারল না।

কাকা বলতে লাগলেন,—তোমার এখন বয়স হবে তিরিশ। সে অনেক—প্রায় সাতাশ বছর আগে আমারও বয়স হবে তখন পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ। একদিন শীতের সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে দেখি, একটি ছোট পাতলা জামা পরা একটি ছেলে আর সাদা শাড়িপরা একজন মেয়ে আমার বাড়ির রকের এক কোণে গুটিসুটি মেরে বসে আছে। পৌষ মাসের আকাশ অস্পষ্ট কুয়াশায় না মেঘে ভরা, নীচের কলকাতা ধোঁয়ায় অন্ধকার। শীতটাও কন্‌কনে ভাবের পড়েছে। বাড়ির ভেতরে চলে গেলাম। বসবার ঘরের দরজা জানলা খুলে নিজের কাজ করতে লাগলাম। অনেকক্ষণ পরে একবার কি করতে বেরিয়েছি, দেখি তারা তেমনি বসে আছে।

মনে ভয় হল, অসুখ-বিসুখ কিছু নিয়ে বসে নেই ত। গিয়ে ডাকলাম, 'এই বাড়ি যাও, এখানে কি করছ!'

মেয়েটি তার গায়ের কাপড় টেনেটুনে ঢাকা দিয়ে দাঁড়াল ছেলের হাত ধরে। পথের আলোয় মুখটা দেখতে পেলাম।

অবাক হয়ে দেখলাম, ভিখিরি নয়, রোগগ্রস্তও নয়, নিম্নশ্রেণীর মতও কেউ নয়। সে রকম অদ্ভুত সন্ধ্যায় ওরকম দেখতে মেয়ে, যেমন ভদ্র সুন্দর চেহারা, তেমনি ভদ্রমেয়ের মতই ভয় ও লজ্জাভরা মুখ,—আশ্চর্য হয়ে গেলাম। বয়সও বেশী নয়, হয়ত বাইশ-তেইশ।

ছেলেটিকে কোলে তুলে নিয়ে সে রক থেকে নামতে গেল। সঙ্কোচ লজ্জায় আর শীতে সে যেন কুঁকড়ে গেছে।

কি মনে হল, যেতে বাধা দিয়ে বললাম, 'আপনি কে?' আপনিই মুখে এল, তুমি বলতে পারলাম না। 'আপনার কি অসুখ করেছে না রাস্তা ভুলে গেছেন? বাড়িতে দিয়ে আসব? কোথায় বাড়িটা বলুন?'

মেয়েটি মুখ তুলে আমার দিকে তাকাল। তারপর বললে, 'বাড়ি চেতলায়, বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে তারা।'

চেতলা থেকে বউবাজার এসে পড়েছে? তাড়িয়ে দিয়েছে এই শীতের দিনে ঐ ছোট ছেলে নিয়ে?

বিরক্ত হলুম তাদের ওপর আর মেয়েটির ওপরও। মুখে বললাম, 'সেইখানেই পড়ে থাকলেন না কেন? কি বলে রাস্তায় বেরিয়ে এতদূরে এসে পড়েছেন?' মনে মনে বললুম, 'এই এতখানি পথ চলে এতটা সময় ভদ্রলোকের মেয়ের একলা বাইরে থাকা এ যে কি তা কি বোঝাবার বয়স ওঁর হয় নি!'

তিনি কোনও উত্তর দিলেন না। এবারে চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। আশ্রয় ছাড়ার ভয়ঙ্কর দিকটা কেমন, তাঁর জানা ছিল না বুঝলাম। দয়া হল, বললাম, 'চলুন

বাড়িতে দিয়ে আসছি আমি।'

তিনি রাজী হয়ে ঘাড় নাড়লেন। আমি একটা ট্যাক্সি নিয়ে এলাম। চেতলায় তাঁদের বাড়ি পৌঁছলাম। রাত্রি তখন প্রায় ন'টা। কয়েকবার কড়া নাডতে একজন বেরিয়ে এলেন। মোটাসোটা ভদ্রলোক।

বললেন, 'কি মশাই?' তারপর মেয়েটিকে দেখেই চিনলেন। রূঢ়ভাবে তাঁকে বললেন, 'কোথায় গিয়েছিলে? এটি কে?' আমি বললাম সন্ধ্যার কাহিনীটা। ভদ্রলোক একটু অভদ্র নোংরা ধরনের হাসলেন মেয়েটির দিকে চেয়ে। তারপর বললেন, 'উনি তো চলেই গিয়েছিলেন ইচ্ছে করে। আর ট্যাক্সি ভাড়া করে এসে বডলোকী দেখানোর দরকার ছিল না। আপনার কাছেই নিয়ে যান।'

রাগে আমার গা রি রি করে উঠল। আমি গাড়িতে উঠলাম, বললাম, 'আমার সঙ্গে ওঁর কি সম্বন্ধ? বাড়িতে রাখুন বা যা খুশী করুন। আমি চললুম।'

ভদ্রলোক বিদ্রূপ করে বললেন, 'তা সম্বন্ধ না থাকে নেই, এখন ত চেনাশোনা হয়েছে। আমার বাড়িতে আর জায়গা নেই ওঁর।' বলে দরজা বন্ধ করে দিলেন।

হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম। খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে 'ও মশাই, ও মশাই' বলে ডাকাডাকি করে কোন সাড়া পেলাম না। শুধু বুঝলাম আশপাশের বাড়ির লোকেরা জানলা থেকে দেখছে।

তোমার মাকে বললুম, 'তা হলে আপনি এখানেই থাকুন, আমি যাচ্ছি।'

তিনি কিছু বলতে পারলেন না, কাঁদতে লাগলেন। শেষে বললেন, 'ওরা দরজা খুলবে না, আমি খোকাকে নিয়ে এই শীতের রাত্রে কি করে রাস্তায় থাকব। নিয়ে চলুন আমাকে, কাল এখানে এসে পায়ে ধরে থাকব।'

নিরুপায় হয়ে, খুব বিরক্ত হয়ে তোমাদের নিয়ে বাড়িতে এলাম।

আমার বাড়িতে মেয়েমানুষ নেই। আমার মা বাপ নেই। ভাই বোন কেউ ছিলেন না। একটিমাত্র চাকর আমার। আমি রাত্রে বাড়ি ফিরে তাকে আমার কাগজের দোকানে শুতে পাঠাই। মহা ভাবনায় পড়লাম। যাই হোক বাড়ি ফিরে চাকরটাকে বললুম, 'দেশ থেকে একজন আত্মীয়া এসেছেন, স্টেশন থেকে নিয়ে এলাম।'

তার পরদিন পত্রপাঠ আপদ বিদায় করব ঠিক করে শুয়ে পড়লাম।

তার পরদিন সকালবেলাতেই তোমাদের নিয়ে চেতলায় রাখতে গেলাম। সে যেমন হয়ে থাকে, লাঞ্ছনা খুব হল। তোমাদের হল, আমারও হল।

কাকা চুপ করলেন খানিকটা। তারপর বললেন, 'বুঝতেই পারছ, তারপর তোমরা আর কোথাও যেতে পার নি। একজন মেয়েমানুষের যতই রাগ হোক, লাঞ্ছনা হোক,

একটা দিন বা রাত্রি বাইরে থাকা তার চূড়ান্ত অপরাধ।'

সেই অবধি তোমরা আমার কাছেই রয়ে গেলে।

সুদেবের নিশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। অসংলগ্ন প্রশ্ন, প্রতি-প্রশ্নে, তার উত্তরে তার মন পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। সে মাথা নিচু করে বসেছিল।

তারপর কাকা বললেন, 'তোমার বোধহয় মনে হচ্ছে, আর কেউ তোমার আপনার লোক ছিল কিনা! ছিল না। তোমার মা মামার বাড়িতে মানুষ। বিয়ে দিয়ে তাঁরা দায়মুক্ত হয়েছিলেন। বিধবাকে বহন করার মত আত্মীয় কেউ ছিল না সেখানে। আর এখানে যিনি আত্মীয় তিনি তোমার বাবার কাকার ছেলে। যে কারণেই হোক তোমার মা আর তাঁর স্ত্রীতে বনিবনাও ছিল না। পরে বুঝেছিলাম।'

সুদেব উঠে দাঁড়াল, বললে, 'আমি যাই কাকা।'

কাকাও বিচলিত ভাবে বসেছিলেন। অসংখ্য নিঃশব্দ প্রশ্ন-উত্তরের যেন অদৃশ্য নীরব বিচারসভা বসেছিল ঘরে। কে বিচারকর্তা, সুদেব? কিসের বিচার? দয়া কবার? কার বিচার? আশ্রিতা আর আশ্রয়দাতার?

কাকা উঠে দরজা খুললেন। সুদেব দাঁড়াল, সহসা জিজ্ঞাসা করল, 'তা আমার নামের পিছনে চক্রবর্তী না দিয়ে 'সরকার' কেন দিলেন?'

কাকা বললেন, 'সরকার দিতাম না—তোমার মা বললেন—তিন চার বছর নিজের ভাইপো ভাজ বলে পরিচয় ছিল। স্কুলে ভর্তির সময় চক্রবর্তী বললে হয়ত তোমার মাকে আর তোমাকে নতুন জবাবদিহির অসুবিধায় পড়তে হবে তোমার বন্ধুবান্ধবদের কাছে।'

কাকা থামলেন একটু, তারপর বললেন, 'তার বছর কয়েক পরেই আমি বুঝতে পারলাম সেই ছোট অসুবিধার চেয়ে ঢের বড় অসুবিধায় আমাকে পড়তে হবে। যা আজকে হচ্ছে।'

সুদেব চলে গেল।

তার আধুনিক শিক্ষিত মনের কাছে এ সমস্যা হয়ত কিছুই নয়, হয়ত অসবর্ণ বিয়েই করবে কারুকে। হয়ত সকলকে বলতে পারবে সে সরকার বংশের সন্তান নয়—চক্রবর্তীর ছেলে। কিম্বা বিয়েই করবে না।

কিন্তু তার মন এসব কিছুই ভাবছিল না। সে লুকিয়ে লুকিয়ে ভাবছিল অন্য কথা···

মার কথা, কাকার কথা, কাকার অবিবাহিত থাকার কথা···মাকে এতদিন ধরে আশ্রয় দেওয়াতে ওঁর লাভ কি?···আর মা? মা কেন ছিলেন? কোথাও চলে যান নি কেন?···

সেই মনই আবার ভাবে, তার একথা ভাবার দরকার কি? অধিকার কি? মা ও কাকাই তো তাকে বড় করেছেন, দেখেছেন। অকৃতজ্ঞের মত আজ দোষ খুঁজবে কেন?

আর দোষই বা কি ও দেখতে পেয়েছে? আশ্রয় না পেলে কোথায় যেতেন মা? ...আরও খারাপ হতে পারত ঘটনা।

পুরাণের কথা ভাবে—কত কথা—ব্যাস-সত্যবতী, কর্ণ-কুন্তী, বৃহস্পতি-তারা, জবালা, অহল্যা। তবু মন নিষ্ঠুর হয়ে কেবলি সব কথা বিশ্লেষণ করে।

সারাদিন কাজকর্মে কাটে। বাড়ি এলেই তার কান কেমন জননীর সঙ্গে কাকার কথাবার্তায় উৎকর্ণ হয়ে ওঠে। শুনতে যেন ভাল লাগে না।

শেষে কাকাকে একদিন বললে, 'আমি একটা ভাল চাকরি পাচ্ছি। সরকারী। বেশ উন্নতি আছে।'

তারক সরকার অবাক হলেন একটু। পরে বললেন, 'তোমার মা?'

সুদেব সহজ ভাবে বললে, 'মা থাকুন না এখানে!'

তারক চুপ করে রইলেন। বুঝতে পারলেন, ও এই সংসার থেকে পালাতে চায়।

চাকরি ভাল। ইচ্ছা করলে উদয়াস্ত খাটা যায় হাসপাতালে। উপরওয়ালারা মুগ্ধ হয়ে যায় এই ধরনের এমন কর্তব্যপরায়ণ জীবন, একটা আদর্শ।

রাত্রে পড়ে নিজেদের পুরাণ, ধর্ম, বিদেশের ইতিহাস। কেউ যদি তাকে সান্ত্বনা দেয়। নজীর বা দৃষ্টান্ত অনেক, কিন্তু নজীর তো সান্ত্বনা নয়। থেকে থেকে ছোটবেলা মনে পড়ে, রেখাছবির মত। অন্যমনে ভাবতে ভাবতে সে সেই ছবিতে অনেক রকম রং লাগায়।

মনে হয়, ব্যাস যেন সত্যবতীকে ক্ষমা করেছিলেন। কিন্তু কর্ণ কুন্তীকে সহ্য করেন নি, ক্ষমাও করেন নি, স্বীকারও করেন নি। আর নিজের জীবনযাত্রাও স্বীকার করে নিতে পারেন নি, মৃত্যু বরণ করেছিলেন। আর কুন্তী? কুন্তী রাজ্য পাওয়া ছেলেদের কাছে থাকেন নি। বনে গিয়েছিলেন। দাবানলে পুড়ে মরেছিলেন। সে দাবানল কি মনের? কর্ণের ধিক্কারের?

একদিন খবর আসে কাকার খুব অসুখ। সুদেব গেল। কাকার সঙ্গে দেখা হল। কয়েকদিন পরে তার হাতের ওপর হাত রেখে তাঁর মৃত্যু হল।

তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর কাগজপত্র দেখল। তাঁর ব্যবসা তাঁর বাড়ি সব তার নামে।

শোক তার হল না। কিন্তু কি এক অপরাধ-বোধ তার মনে ছুঁচ ফোটাতে লাগল। জীবনধারণের সমস্ত ঋণ প্রকাণ্ড হয়ে তার সামনে ফুটে উঠল।

সুদেব কাছা গলায় দিল। একমাস ধরে নিয়ম করল। শ্রাদ্ধ করল সমারোহ করে।

কাজ শেষ হয়ে গেলে মাকে বললে এবারে সে চাকরির জায়গায় যাবে। সুদেব আর কাকার কোন কথাই মা শোনেন নি বা জানতেন না। কিন্তু এতদিনে যেন বুঝেছিলেন সুদেব যেন অন্য রকম হয়েছে।

তিনি বললেন, 'আমি কোথায় থাকব?'

সুদেব বললে, 'এখানেই থাকবে। আর ইচ্ছে হয় কাশী গিয়ে থাকতে পার। ব্যবস্থা করে দেব।'

মা চুপ করে রইলেন একটু। তারপর সঙ্কুচিতভাবে বললেন, 'তুই বিয়ে-টিয়ে করবি না?'

সুদেবের মুখ কঠিন হয়ে উঠল। মনে মনে বললে, 'বিয়ে? বিয়ের মত ব্যবস্থা রেখেছ!' মুখে সংক্ষেপে বললে, 'এখন তো নয়। আর সে কথা আমিই ভাবব।'

তার কঠিন মুখ, সংক্ষেপে উত্তর যেন জননীকে জানিয়ে দিল, এ বিষয়ে মার কিছু বলা বা ভাবা অনধিকার চর্চা।

মার কাশী যাবার ব্যবস্থা হল।

প্রচুর অর্থ, অজস্র অবসর, অপরিমেয় অবোধ্য অবসাদ আর সঙ্কুচিত অবজ্ঞাত অস্তিত্ব নিয়ে মা কাশী বাস করতে লাগলেন। টাকা নিয়মিত আসে। চিঠি কদাচ। দেখা! সুদেবের সময়াভাব।

বছর শেষ হয়ে গেল। সুদেব একসময় কাজ ছেড়ে দিয়ে কলকাতায় ফিরেছে। সহসা সুদেব বিয়ে করল। রেজিস্ট্রি করে। নিমন্ত্রণ নয়, অনুষ্ঠান নয়, উৎসব নয়।

বন্ধুরা বললে, 'এ আবার কি? মাকে আনলে না কেন? একটু হৈ চৈ করা যেত। আর স্বজাত তো—রেজিস্ট্রিই বা কেন?'

সুদেব বললে, 'এই তো ভাল। হিন্দু বিয়ের অনেক দায়। এ যখন ইচ্ছে স্বাধীন হতে পারা যাবে। মার কাছে যাব এক সময়। তিনি আবার এরকম বিয়ে পছন্দ করবেন না। সেকেলে মানুষ।'

স্ত্রীও মাঝেমাঝে বলে, 'চল না একবার দেখাই করে আসি। না হয় নিয়ে এস না তাঁকে?'

স্বদেব বলে, 'বড্ড কাজের ভিড়। আমরাই যাব। আশ্চর্য করে দেব।'

এতদিনে স্বদেবের জীবনের গতি বদলেছে। প্রাচুর্য ও প্রমোদময় জীবন। স্ত্রী আর সন্তান একটি।

কাজের আর নতুন নতুন প্রমোদের পরিকল্পনায় স্বামী-স্ত্রী ও বন্ধুবান্ধবদের নিরবসর দিনরাত্রি।

ছেলের ভাতের সময় স্ত্রী বললে, 'চল এবারে মাকে খোকাকে দেখিয়ে আনি।'

ছেলে কোলে নিয়ে স্বদেব অন্যমন হয়ে গেল একটু। নিমেষের জন্য মনে পড়ে গেল, কাকার কাছে শোনা, একটি সাদাজামা পরা শিশু আর একজন বিধবা জননী।

স্ত্রীকে বললে, 'হ্যাঁ যাব এবার। আর একটু বড হোক।'

ছেলে বড় হতে লাগল। আজ শীত, ঠাণ্ডা লাগবে খোকার। কাল বসন্ত, বসন্ত হচ্ছে দেশে। পরশু বেজায় গরম কাশীতে। বছর ঘুরে গেল আবার।

কাশী থেকে চিঠি এল। মার অসুখ, খোকা যদি একবার আসে। দেখতে ইচ্ছে করে।

স্ত্রী বললে, 'দেখ তো, কি অন্যায়। চল সকলে যাই একসঙ্গে।'

সমারোহে জিনিসপত্র গোছানো হতে লাগল। ছেলের পোশাক-পরিচ্ছদ, ফুড, নিজেদের প্রয়োজনীয় বিলাসদ্রব্য, বহু আয়োজন।

আবার ছেলের অসুখ হয় একটু, স্বদেবের রোগী ছাড়ে না, দিন কাটতে থাকে।

চিঠিও আর আসে না। হয়ত মা ভাল আছেন। একটু কাজের ভিড় কমলে যাওয়া যাবে।

কিছুদিন পরে চিঠি এল কাশীর বাড়ীর লোকদের কাছ থেকে, স্বদেবের জননী কাশীপ্রাপ্ত হয়েছেন।

স্ত্রী বললে, 'ছি ছি, কি করলে বল তো!' তার চোখে জল এল। মৃত্যুকালেও দেখা হল না। স্বদেব শুষ্কভাবে স্ত্রীর দিকে চাইল।

দিনটা গেল। তারপর স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করল, 'কবে যাওয়া ঠিক করব?'

স্ত্রী বললে, 'আমাদের যাবার আর দরকার নেই, যখন দেখাই হল না। তুমি একলাই যাও।'

স্বদেব একাই কাশী গেল। আবার নিয়ন-কানুন পালন করল, হবিষ্য করল যথারীতি।

শ্রাদ্ধ এসে পড়ল। গঙ্গাতীরে শ্রাদ্ধ হবে। কিন্তু ডাক্তার সুদেব সরকারের নাম বা খ্যাতি তো কাশীতেও কম নেই। সমারোহ করে ব্রাহ্মণভোজন হবে।

একটি পুরোহিত ব্রাহ্মণ দিয়ে শ্রাদ্ধ বসল। গঙ্গাস্নান করে দশাশ্বমেধে কাজ আরম্ভ হল। মন্ত্র পড়া হতে লাগল।

পুরোহিত বললেন, 'নাম বলুন আপনার, আপনার পিতার।'

সুদেব বললে, 'শ্রীসুদেব চক্রবর্তী, পিতার নাম ৺শশাঙ্কমোহন চক্রবর্তী, পিতামহের নাম ৺সূর্যমোহন চক্রবর্তী।'

পুরোহিত অবাক হযে চেয়ে দ্বিধাভাবে বললেন, 'আপনার নাম কি ডাক্তার সুদেব সরকার নয়?'

সুদেব সরকার বললেন, 'সুদেব চক্রবর্তী।'

সুদেবের আঙুলে কুশের আংটির পাশে হীরার আংটি, পাশে চামড়ার অফিস ব্যাগে নোটের গোছা। সামিয়ানার তলায় সাজানো রূপার ষোড়শ, বস্ত্র, ভোজ্য, পালঙ্কে রেশমের শয্যা, গোদানের মূল্য। পুরোহিত একটু ভাবলেন। ভাবলেন হবে বা। তারপর মন্ত্র বলে বললেন, 'শ্রীসুদেব চক্রবর্তী, তস্য পিতা ঈশ্বর শশাঙ্কমোহন চক্রবর্তী, তস্য পিতা ঈশ্বর সূর্যমোহন চক্রবর্তী।—পিতামহের পিতা এবং পিতামহীর নাম?'

অসহিষ্ণুভাবে সুদেব সরকার বললেন, 'যথা নামে বলে দিন সব।'

সুদেব কলকাতায় ফিরল।

অঘ্রাণের সন্ধ্যা নেমে এসেছে। আকাশ কুয়াশাচ্ছন্ন অথবা মেঘাচ্ছন্ন—সেই করে শোনা আর একদিনের মত। উপরে স্ত্রী ছেলে-কোলে জলযোগের আয়োজন নিয়ে বসে আছে। বছর দেড়েকের চমৎকার সুন্দর শিশু। লোকে বলে, ঠিক বাপের মত দেখতে। ছেলে তাকে দেখে হাত বাড়িযে এল। সে কোলে নিল। স্ত্রী জিজ্ঞাসা করল মৃদুস্বরে, 'মা কিছু বলে গিয়েছিলেন কি?'

সে মাথা নাড়ল শুধু। তার আকণ্ঠ কিসে ভারী হয়েছিল যেন। তার বুকের উপর আর একটি ছোট বুক স্পন্দিত হচ্ছিল, বহুদিন আগের একটি আশ্রয়চ্যুতা অনাথা মেয়ের বুকে আর একটি শিশুর মত।

গল্পভারতী—আশ্বিন '৫৮

পুত্রেষ্টি

যাচ্ছিলাম ট্রেনে। অনেক দূরের পথ, ভিড়ও খুব, গাড়ুর মত বসে থাকা ছাড়া আর কোনও উপায় যে রাত্তিরের মধ্যে হবে, আশা ছিল না। প্রায় সকলেই নামবে আমারই সঙ্গে হাওড়া স্টেশনে। ভিড় যখন চরম হয়ে গেছে,—আর নতুন লোক আসার উপায় নেই, দরজা আগলাবার দরকার নেই, কেননা দরজার সামনে বাক্স-বিছানা রেখে তার ওপর লোক বসে সেটাও আগল-বিশেষ হয়ে দাঁড়িয়েছে, তখন গাড়িসুদ্ধ লোকে কেমন ভাব হয়ে গেল। সকলে সকলের পাশের লোকের পরিচয় নিল। খবরাখবর জিজ্ঞাসা করল এবং গভীর ভাবে সুখ-দুঃখের কথা কইতে আরম্ভ করল—যারা খানিক আগে সূচ্যগ্র জায়গা নিয়ে দুর্যোধনের মত ঝগড়া করেছিল।

মাঝখানের সামনের বেঞ্চি ঠাসা, আমি একটা পাশের বেঞ্চির কোণে বসতে পেরেছিলাম। গাড়ি পুরো জোরে চলেছে, একেবারে পরের বড় স্টেশনে গিয়ে থামবে।

সহসা কানে এল—'ছেলেপিলে?' 'ছেলেপিলে নেই মশাই।' 'কি করা হয়?' তার পর কানে আসে—'কত পান?' এ সব সমাজে পরিচয় করাতে লাগে না। এবং এই সব অভব্য, অসভ্য প্রশ্নও লোকে সরল মনেই জিজ্ঞাসা করে—আর শ্রোতাও বিরক্ত হয় না—সহজ ভাবেই উত্তর দেয়। তাই এ সব জায়গায় প্রথমেই পৃথিবীর আদিম প্রশ্ন ওঠে খাদ্য-সংগ্রহের,—তার পর আসে সেই খাদ্য কাদের জন্য। কাজেই 'কত পান', 'কয়টি পুত্র', 'কোথায় থাকেন' কারুরই জানতে ও জানাতে সংকোচ নেই।

শুনলাম নিঃসন্তান লোকটি বলছেন, 'বেশ আছি মশায়। যদিও বুড়ো বয়সের কথা ভাবি। তবে পরিবারের মনে সুখ নেই। তাঁর জন্যেই এই কলকাতায় যাওয়া। কে এক সাধু আছেন তিনি নাকি পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করান, যজ্ঞ সফল হয়।'

অন্য লোকটি অর্থাৎ প্রশ্নকর্তা একটু চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, 'ও।'

নিঃসন্তান ভদ্রলোকের কাছাকাছি আর একজন ছিলেন. হঠাৎ আক্রোশের সুরে বলে উঠলেন, 'ও ঝামেলা আবার লোকে সাধ করে চায়? কি করে জানবেন যে, ছেলেই হবে আর মেয়ে হবে না, আর মেয়েও একটিই হবে—সাত বা ন'টা মেয়ে হবে না। আর বুড়ো বয়সে? এক বেটা-বেটিও দেখে না মশায়। সব নিজের নিয়ে থাকে। এই আমার ছ'টা মেয়ে, তিন ছেলে। পাঁচটা মেয়ের বিয়ে দিয়েছি, দুই ছেলেরও দিয়েছি। গত বছর থেকে স্ত্রী একেবারে 'চৌরঙ্গি' (চতুরঙ্গ?) বাতে

শয্যাগত, তা এক বেটা জামাইও মেয়ে পাঠালে না। আর বৌমারাও তাঁদের ছোট ছোট ছেলেমেয়ে ঘর-সংসার নিয়ে ছেলেদের কাছে। ছোট মেয়ে দু'বেলা রাঁধে—আমার আপিস, ভায়েদের ইস্কুলের ভাত দেয়, রুগীর সেবা করে। ধরুন, ওদেরও বিয়ে হয়ে গেছে, আর আমরা বুড়ো-বুড়ী দু'জনেই রোগে পড়িছি। তখন?' তিক্তভাবে চতুর্দিকের শ্রোতাদের দিকে চেয়ে আবার বললেন, 'তখন কি করবেন? আসল কথা থাকত টাকা, সবাই পিঁপড়ের মত আসত সারি গেঁথে। তা ছেলেমেয়েই বলুন আর ভাইপো-ভাগ্নেই বলুন। কিন্তু তখন আমার আপনার লোকও লাগত না! লোক রাখতে পারতাম! লোক রাখতাম মশাই! জানেন?'

নিজের সিদ্ধান্তে পরিতুষ্ট হয়ে দিগ্বিজয়ীর মত তিনি একবার সকলের দিকে বা গাড়ির চারধারে চোখ বুলিয়ে নিলেন।

একজন ক্ষীণ কণ্ঠে একটু প্রতিবাদ করতে চাইল, 'আপনার ছেলেমেয়ে আর লোকজন তুলনা হয়? আর লোকজন যে চুরি করে খুন করে পালাবে না—তাই বা কে জানে?'

দিগ্বিজয়ী বললেন, 'তা করতে পারে চুরি, করবে হয়ত খুন, কিন্তু পাচ্ছি কোথায় আপনার ছেলেমেয়ে? বলুন?'

ওদিকের এক কোণ থেকে আর একজন বলতে চাইলেন, 'তা সব জায়গায় সমান হয় না। বেশীর ভাগ জায়গায় ছেলেমেয়েরা সেবা-যত্ন করেই থাকে।'

থামিয়ে দিয়ে দিগ্বিজয়ী বললেন, 'আর অনেক সময় যে করে না সেটা দেখতে পেয়েছেন নিশ্চয়?'

তর্কের আড়াল থেকে কানে এল আগের 'ও' বলে নীরব প্রশ্নকর্তা তাঁর পাশের পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করার জন্য ইচ্ছুক লোকটিকে পুরাণ কথার সূত্র ধরে বললেন, 'আমি একটি পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করার কথা জানি।'

ভদ্রলোক আবার চুপ করলেন। তাঁর যেন খানিকটা বলার পর আর না বলা অভ্যাস। লোকে প্রশ্ন করুক, করলে বলবেন। সবাই ভাবছিলেন তিনি বলবেন। তাঁরা উৎসুকভাবে চুপ করে রইলেন।

ছেলেমেয়ের কর্তব্য আলাপনের বচসাটা তখন থেমে গেছে।

একজন সকৌতূহলে জিজ্ঞাসা করলেন, 'পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করে এখনও লোকে? রামায়ণেই পড়েছি দশরথ করেছিলেন। সে তো রাজা-রাজড়ার ব্যাপার।'

প্রথম ভদ্রলোক বললেন, 'হ্যাঁ করে বৈ কি। রাজা-রাজড়ার মতই কতকটা ব্যাপার বটে। তবে খরচেরও কম-বেশী তো আছে সব জিনিসের। আমি সেই পুত্রেষ্টির ছেলেটিকে দেখেছি।' আবার চুপ করলেন। যেন মনে কি দ্বিধা হচ্ছিল বলা উচিত

কি না। কিন্তু কোথা থেকে যেন রূপকথা না কথকতার গন্ধ এল ভেসে। গাড়িসুদ্ধ সবাই চুপ করে তাঁর দিকে চেয়ে রইলেন উৎসুকভাবে।

যিনি পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করার জন্য কলকাতায় যাচ্ছেন তিনি বললেন, 'দেখেছেন? তা হলে যজ্ঞ করলে ছেলে হয়?'

প্রথম ভদ্রলোক বললেন, 'হ্যাঁ, হয়েছিল তো।' তাঁর এ কথার মধ্যেও যেন অর্ধেক বলার মত কি ধরন ছিল। প্রায় সকলেরই মনে হচ্ছিল, তারপর কি? ছেলে তো হয়েছিল, আর ছেলেই তো বটে, মেয়েও নয়। তবে কি? বেঁচে নেই? না, কি?

আর একজন একটু অসহিষ্ণুভাবে বললেন, 'হয়েছিল তো মানে? আছে তো? বলুন না মশাই, ব্যাপারটা শুনি।' একগাড়ি শ্রোতা অবহিত ও উন্মুখ হয়ে ঐ লোকটির পানে চেয়ে রইলেন।

ভদ্রলোক একটু বিচলিতভাবে পুত্রেষ্টির জন্য যিনি যাচ্ছেন তাঁর দিকে একবার চাইলেন। কিন্তু আর গল্পটা না বলে উপায় ছিল না, বলতে আরম্ভ করলেন:

সে অনেক দিনের কথা, তখন আমারই বয়স এই সতেরো আঠারো বছর। আমার দূর-সম্পর্কের পিসেমশাই ছিলেন। কাজ করতেন বর্মা না কোথায়। অনেক সময় যেমন হয়, থাকতেন বিদেশে, উপায় করতেন প্রচুর, খরচও করতেন অনেক রকমে। স্ত্রী থাকতেন দেশে মা-বাবার কাছে। নিজে সেখানে থাকতেন ভীষ্মদেব বা শুকদেবের মতন নয়, বেশ খুশি মতই থাকতেন। মাঝে মাঝে দেশে আসতেন। দু'টি মেয়ে হয়েছিল, ছেলে হয় নি।

তারপর তাঁর বাবা মারা গেলেন, মাও কিছুদিন বাদেই গেলেন। নিজেরও বয়স পরিণত হয়েছে, মেয়েদের বিবাহ হয়েছে, আর স্ত্রীকে একলা ফেলে রাখা চলল না। ভদ্রলোক দেশে এলেন। সে একটা সমারোহ যেন। বর্মার সৌখীন জিনিসে সেই পাড়াগাঁর সেকেলে বাড়ির কাছারি-ঘর ভরে উঠল। ছোট ছোট কাঠের খেলনা, চমৎকার ছোট্ট প্যাগোডা বুদ্ধমূর্তিই কত রকমের, মোমজমানো কাপড়, চীনদেশী পর্দা, জাপানী চিক, ফুলদানি, 'ওঁ মণিপদ্মে হুঁ' জপের মালা, কাঠের হালকা চমৎকার বাক্স, বাসন—কি যে নয়! তার সঙ্গে এল দুটো কুকুর, দুটি হরিণ, একটি ময়ূর, তিনটি খাঁচাভরা ছোট্ট ছোট্ট পাখি ও লালচে রংয়ের কাকাতুয়া, আর একটি ছোট্ট বাচ্চা ভাল্লুক, তখনও বড় হয় নি। তার নাম ছিল টিপু।

আর বোধ হয় অগাধ টাকা। টাকা কি রকম ভাবে অগাধ হয় তা তো বোঝবার সে বয়স নয়। পিসিমার গায়ে সোনার বোঝা, চাকর-বাকর-দাসীর ভিড়, গ্রামের সকলের ও-বাড়িতে আসা-বসাতে এখন বুঝতে পারি টাকা ছিল বেশ।

মেয়ে দুটির বিয়ে আগেই হয়ে গিয়েছিল।

বছর খানেক কেটে গেল। মেয়েরা শ্বশুরবাড়ি গেছে। বাইরে পিসেমশাইয়ের খাবার ও গল্পের মজলিস আর ভেতরে পিসিমার তাসের আর তোশামোদের আসর—যেন আর জমাট বাঁধছিল না। বিদেশী জিনিস দেখে ও দেখিয়ে পুরান হয়ে গেছে। সে দেশের গল্পও অনেকবার করে বলা হয়েছে। পিসিমার গহনার জৌলুসও বোধ হয় পুরান হযে এসেছিল। কি আর-কিছু কে জানে! যেন মনের কোনখান একটু ফাঁকা ঠেকছিল।

তার পর দেখলাম, পিসিমার বাড়িতে গণৎকার, জ্যোতিষী সাধু-সন্ন্যাসীর যাওয়া-আসা, ভিতরে-বাইরে কথাবার্তা-আলোচনা—এত বিষয় সম্পত্তি কে খাবে, কার ভোগে লাগবে, মেয়ে মানে তো পাথর-বাটি, মিথ্যে সন্তান। বাপ-পিতামহের জলপিণ্ড লোপ পাবে—এই সব!

মাতুলী, কবচে পিসিমার হাতের সোনার তাবিজ, গলার হার, কোমরের চন্দ্রহার আরও ভারী হয়ে উঠল। আর পিসেমশাইয়ের মুখের মসৃণতাতে রেখা দেখা দিতে লাগল।

তারপর পিসিমার একদিন রাত্রে আবার একটি মেয়ে হল। পিসেমশাইয়ের মুখ ভারী হয়ে উঠল। পিসিমার চোখ জলে ভেসে গেল। যদিও লোকেরা সকলে নানা রকম সান্ত্বনা দিতে লাগল। তবু তাদের মাঝ থেকে অবশেষে কে একজন বললে, 'ওঁর মেয়ে-নাড়ী। ছেলে হবে না! আবার বিয়ে করুন মুখুজ্জেমশাই।'

কথাটা অনেকের মনঃপুত হল। যাঁরা পিসিমার সুখ-ঐশ্বর্যে ঈর্ষাতুর ছিল তাদের—আর যারা পিসেমশাইয়ের জন্য সত্য বংশধর চাইত তাদেরও। আবার অনেকে দুঃখিত হল। মেয়ে-জামাইরা রেগে গেল। আর পিসিমার চোখের জলে বিয়ের কথাটাও তখনকার মত ভেসে গেল।

বছর খানেক বাদে শুনলাম, এক নাকি মহা তান্ত্রিক সাধু এসেছেন পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করাবেন। ছেলে হবেই—মেয়ে নয়।

যজ্ঞের ফর্দ হতে লাগল—অনুষ্ঠানের দিন দেখা, আয়োজন, যোগাড়-যন্ত্র সব হতে লাগল। আর মোটা-মোটা হলদে পুঁথি দেখে সন্ন্যাসী ঠাকুর মন্ত্র নির্বাচন করতে লাগলেন। সব ঠিকঠাক হলে তবে সূর্য-ঘড়িতে লগ্ন দেখে (বিলিতী ঘড়ি নয়) যজ্ঞ হবে। হোমে আহুতি দেওয়া হবে।

সন্ন্যাসী ঠাকুর বহু পুঁথি ঘেঁটে দেখে এক দিন সন্ধ্যার পর বৈঠকখানায় এসে বললেন—'সবই ঠিক হয়েছে, পুত্র আপনার হবে। দিনও খুব ভাল পাওয়া গেছে, ক্ষণও মাহেন্দ্র। কিন্তু একটা জিনিস প্রয়োজন হবে।'

শীতকাল। পিসেমশাই বৈঠকখানার গদীর ওপর পায়ের ওপর পশ্চিমী বালাপোশ

ঢেকে কাত হয়ে শুয়ে দাবা খেলছিলেন। সাধুকে দেখে উঠে বসলেন সসম্ভ্রমে। সন্ন্যাসী ঠাকুর গালিচার ওপর আর একটি গালিচার আসনে বসলেন। সকলে উৎসুক হয়ে চেয়ে রইল সাধুর দিকে।

পিসেমশাই বললেন, 'কি জিনিস ?'

—'একটি জীবিত প্রাণী চাই।'

—'কি রকম ? বলি দেবার মত পশু ?'

—'হ্যাঁ, তাই অনেকটা। কিন্তু যে পশুটি উৎসর্গ করা হবে শিশু খানিকটা তার মতই আকার পেতে পারে, সেই জন্য চতুষ্পদ বা খেচর জলচর জাতীয় জীব উৎসর্গ করা সমীচীন হবে না। শাস্ত্রে বলেছে নরাকার জীব অর্থাৎ মানুষের সঙ্গে সাদৃশ থাকা চাই।'

পুরুত ঠাকুর ছিলেন, আমার বাবাও ছিলেন ঘরে, আমার তাঁদের কাছেই গল্প শোনা। তাঁরা অবাক হয়ে রইলেন, নরাকার জীব কি পাওয়া যাবে! পিসেমশাইও অবাক হয়ে গিয়েছিলেন।

পুরুত মশাই একটু ইতস্তত করে বললেন, 'নরাকার অর্থাৎ দ্বিপদ জীব বলছেন ?'

সন্ন্যাসী একটু হাসলেন, বললেন, 'হ্যাঁ, এই বানর জাতীয় জীব আর কি! ভয় পাচ্ছেন কেন ?'

পিসেমশাই নড়েচড়ে বসলেন। তারপর বললেন, 'সেই বা কোথায় পাই ?'

এইবার পুরুত ঠাকুর বললেন, 'তার অভাব কি আছে ? একটা বাঁদর বা হনুমান কিনে আনলেই হবে।'

সন্ন্যাসী আবার একটু হাসলেন, বললেন, 'তার দরকার নেই, সেও আমার ঠিক করা হয়েছে। এখানেই আছে। শুধু আপনার ইচ্ছা হলেই সেটি নেওয়া যাবে।'

পিসেমশাই ব্যগ্র ভাবে বললেন, 'নিশ্চয়। কোথায় আছে সেটি ?'

—'আপনার ভল্লুক-শাবকটি গ্রহণ করব। দ্বিপদও বটে, নরাকারও বটে, অপ্রাপ্ত-বয়স্কও বটে। একেবারে সবই শাস্ত্রানুগ পাচ্ছি।'

ভালুক-ছানাটি পিসেমশাইয়ের খুবই প্রিয় বা আদুরে ছিল। সকাল-সন্ধ্যা তাকে নিয়ে তাঁর একটু খেলা করা চাই-ই।

পিসেমশাই একটু চুপ করে রইলেন, তারপর বললেন, 'একটা না হয় কিনে আনাই কোন জন্ত ?'

সন্ন্যাসী বললেন, 'না, সে হবে না, তত সময় নেই। শুভলগ্ন যেটি পেয়েছি, সেটি এক বছরের মধ্যে আর নেই। তাছাড়া আমি আপনার যজ্ঞটি করে দিয়েই চলে যাব কুমারিকায়। সেখানে ৺মার কাছে আমার বিশেষ পূজা আছে। যদি সেখানে আমার

থাকা হয়ে যায়, আর না আসি, তবে আপনার কার্যোদ্ধার হওয়া শক্ত।'

পিসিমার কানে গেল। স্বামীর আবার বিয়ের ভয় যায় নি। পুরুষরা যে সত্তর বছরেও বিয়ে করতে পারে তা তাঁর জানা ছিল। একবার যে পুরুষ মানুষ নিমরাজী হয়েছিল বিয়েতে, তার বিয়ে করতে কতক্ষণ? সে পুত্রার্থেই হোক, আর ভার্যার্থেই হোক। ওঁর স্বামীর বয়স তো মাত্র পঞ্চাশ বছর।

তিনি স্বামীর অন্য জন্তু কিনে আনার কথা কানেই তুললেন না। সন্ন্যাসী ঠাকুরের সব প্রস্তাবেরই দৃঢ় ভাবে সমর্থন করলেন। ভাল্লুক-বাচ্ছা তো কিছুই নয় —হতাশায়, ভয়ে তিনি একটি পুত্রসন্তানের জন্য যে কোন জীবহত্যা করতেই রাজী হয়ে যেতেন, এমনি হয়ে উঠেছিলেন। এই মহেন্দ্রক্ষণ, এই তিথি, এই লগ্ন আর ঐ তান্ত্রিক সাধুর ক্রিয়া একটা গৃহপালিত জন্তুর জন্য খোয়াতে রাজী নন। তাঁর নিজেরও বয়স প্রায় চল্লিশ হয়েছে; যদি সাধুর ফিরে আসতে দেরি হয়, যদি না-ই আসেন? আর স্বামী যদি আবার বিবাহে সম্মতি দেন?

চার-পাঁচ দিনের মধ্যেই চারি দিক ঘিরে হোগ্‌লার উঁচু চাল করে বিরাট যজ্ঞ মণ্ডপ তৈরি হল। আশেপাশে হাজার ব্রাহ্মণভোজনের জন্য ঘিরে জায়গা করা হল।

তিন দিন ধরে যজ্ঞ হবে। প্রথম দিন পিতৃলোককে জলপিণ্ডদান, আভ্যুদয়িক নান্দীমুখ কৃত্য। তার পরদিন অর্ধরাত্রে জীবিত পশু উৎসর্গ আর হোম। শেষ দিনে এক হাজার ব্রাহ্মণ ভোজন।

ক'দিন ধরে আমরা আর বাড়ি যেতাম না। দ্বিতীয় দিনে রাত্রি বারোটা থেকে পূজা আরম্ভ হল।

বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ কে জাগিয়ে দিল। দেখি পিসেমশাই পিসিমা আর সন্ন্যাসী ঠাকুর তিনজনে হোমের কুণ্ডটির পাশে দাঁড়িয়ে আছেন হোমের কুণ্ডটি সাধারণ হোমকুণ্ডের মত নয়, একটা তিন-চার হাত গভীর গর্ত।

সেই গর্তটার মধ্যে সেই ভাল্লুক ছানাটাকে কয়েকজনে এনে নামাল। সে প্রথমটা নামতে চায় নি। অবশেষে মস্ত একছড়া কলা হাতে নিয়ে পিসেমশাইয়ের একটা হাত ধরে নামল।

গর্তের একধারে পিসেমশাই আর পিসিমা পাশাপাশি দুটি আসনে বসলেন। সন্ন্যাসী ঠাকুর সামনে বসলেন তাঁদের। সন্ন্যাসী ঠাকুরের পাশে নতুন নতুন ঝুড়িভরা নানা রকম ফল, নৈবেদ্য, একখানা পুষ্পপাত্র-ভরা ফুল-বেলপাতা, নতুন কাপড়, আরতির পঞ্চপ্রদীপ, পাণিশঙ্খ থেকে কাঁসর-ঘণ্টা, একটা পিলসুজ, একটা মঙ্গল-প্রদীপ, অর্থাৎ পূজার সব রকম যোগাড়ই ছিল। তার পর পূজা আরম্ভ হল।

সন্ন্যাসী মন্ত্র বলে একটা গাঁদা ফুলের মালা নিয়ে পিসেমশাইয়ের হাত দিয়ে ভালুকটাকে পরিয়ে দিলেন। তারপর একটা একটা করে ফল মিষ্টিও গর্তের মাঝে তার হাতে দেওয়া হতে লাগল। নতুন কাপড়খানাও তার হাতে পিসেমশাই দিলেন। শেষ কালে তার মাথায় একটি প্রদীপ জ্বেলে দিয়ে কি একটা বলে সন্ন্যাসী ঠাকুর কাকে যেন ইশারা করলেন।

আর দেখি ঝুড়ি ভর্তি করে মাটি নিয়ে প্রায় দশ-বারো জন সেই গর্তে ফেলতে লাগল। ভাল্লুকটা এতক্ষণ কি করছিল, ফলগুলো খাচ্ছিল কি না অত লক্ষ্য করি নি! এখন সে গাঁক-গাঁক করে চিৎকার করে লাফিয়ে ওঠবার চেষ্টা করল, কিন্তু ঝুড়ির পর ঝুড়ি মাটি পড়ে সে দেখতেই না পাক, বা চাপাই পড়ুক আমরা আর দেখতে পেলাম না।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই গর্তটা ভরে গেল। পিসেমশাই আসনে বসে, তাঁর কপালে বিনবিন করে ঘাম ফুটে উঠেছে। যে হাতে ভাল্লুকটির হাত ধরেছিলেন সেটা মাটিতে মাখা। এলোমেলো ভাবে ফ্যাল-ফ্যাল করে সেই গর্তটির দিকে তাকিয়ে তিনি বসেছিলেন। কোন দিকে চাইছিলেন না।

ইতিমধ্যে ঐ জায়গাটায় হোমের জন্য যজ্ঞিডুমুরের কাঠ সাজানো হতে লাগল। হঠাৎ আমাদের মনে হল মাটিটা নড়ে উঠল। কাঠগুলো চারি দিকে ছড়িয়ে গেল না কি যেন হল! বুঝতে পারলাম না। তখনি কাঠ আবার ঠিক করে দিয়ে আগুন জ্বেলে দেওয়া হল।

পিসেমশাই কি রকম ভাবে একবার চারিদিকে চাইলেন, যেন কি বলতে চাইলেন, কিন্তু কিছু বলতে পারলেন না।

তাঁর চোখ দিয়ে কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল। লোকে বললে, সে জল হোমের কাঠের ধোঁয়ার জন্য।

আগুন জ্বালার পরও হোমের কাঠ আবার নড়ে গেল দু-একবার আমাদের মনে হল।

'ওঁ স্বাহা স্বাহা' বলে আর মন্ত্র বলে সেই স্তূপ-করা বেলপাতা ফুল অর্ঘ্য মাটির মালসা-ভরা গাওয়া ঘিয়ে ডুবিয়ে হোম শুরু হয়ে গেল। কত হাজার তা আমি ঠিক জানি না—এক হাজার আট বোধ হয়। রাত্রিও শেষ হল হোমও শেষ হল।

লাল চেলী-পরা সাধু লাল চেলী-পরা পিসেমশাই আর পিসীমাকে নিয়ে হোমকুণ্ড প্রদক্ষিণ করিয়ে হোমের ফোঁটা কপালে দিয়ে, শান্তিজল দিয়ে বাড়ির মধ্যে গেলেন।

তার পরদিন শুনলাম, পিসেমশাই-এর খুব শরীর খারাপ, লোকজন খাওয়ানোতে এসে দাঁড়াতে পারবেন না। কিন্তু ব্রাহ্মণভোজনের সময় দেখলাম এসেছেন মালা-চন্দন, দক্ষিণার ব্যবস্থা করতে।'

বক্তা চুপ করলেন।

ট্রেন-ভর্তি ঠেসাঠেসি শ্রোতারা নির্বাক্ হয়ে গল্প শুনছিল।

কাছের একজন বললেন, 'তারপর ?'

'তারপর পিসেমশাইকে আর আমরা বড় একটা বাইরে দেখতে পেতাম না। জন্তুদের দিকেও নয়, বাগানেও নয়, যেদিকে যজ্ঞ হয়েছিল সেদিকেও নয়। লোকেরা বলাবলি করত, আহা, পোষা জীব, লোকটার মনে কষ্ট হয়েছে।

'আমি তো তারপর পড়াশোনার জন্য কলকাতায় চলে গেলাম। পরে শুনেছিলাম একটি ছেলে হয়েছে।'

সমবেত ভাবে সকলে বললে, 'ছেলে হয়েছে তা হলে ? আছে তো ?'

বক্তা ঘাড় নেড়ে বললেন, 'হ্যাঁ, আছে।'

পাশের পুত্রেষ্টি-ইচ্ছুক লোকটি বললেন, 'তবে কি ?'

বক্তা বললেন, 'এই এইবার গ্রামে গিয়েছিলাম এতদিন পরে—প্রায় ষোল বছর পরে। পিসিমা'র বাড়ি গেলাম দেখা করতে। পিসেমশাই নেই। পিসিমা আছেন, বুড়ো হয়েছেন। বসতে বললেন, জল খেতে দিলেন। পিসেমশাই-এর কথাও বলে দুঃখ করলেন। বাড়িতে একবাড়ি নাতি-নাতনী মেয়ে-জামাই সব। এমন সময় একটি চোদ্দ-পনের বছরের ছেলে একটি কাপড় কোমরে জড়িয়ে হাতে করে ধরে সামনে এল। জিজ্ঞাসা করলাম, 'তোমার ছেলে কোথায় ? কত বড় হল ?' পিসিমা বললেন—'এই তো ছেলে রে।' পিসিমা তাকে কাপড় পরিয়ে দিতে লাগলেন। অবাক হয়ে দেখলাম ছেলেটিকে। মাথাটি লম্বা মতন, হাতগুলো একটু বেশী লম্বা যেন, হাতে-পায়েও একটু বেশী লোম। চোখের দৃষ্টি বুদ্ধিহীনের মত। কথা অস্পষ্ট বলে। জিভটা খালি মুখের এপাশে ওপাশে নাড়ে। মানুষের মতই সব, অথচ যেন কি একটু অন্য রকম। অবশ্য হয়ত আমার ভ্রম সেটা। পিসেমশাই ওকে সাত-আট বছরের দেখে মারা গেছেন। মৃত্যুর আগে মেয়ে-জামাইদেরই আবার এনে রাখলেন ওঁদের দেখবার জন্য। গাঁয়ের লোকে কেউ বললে, তিনি নাকি ছেলে হওয়ার আগে কয়েক বার ভাল্লুকটিকে স্বপ্ন দেখেছিলেন।'

মাসিক বসুমতী—ভাদ্র, ১৩৫৮

আগাছা

১

পিঁপড়ে, পতঙ্গ, মাছি, মশা, ছাগল, গরু, মুরগী, মানুষ, কুকুর, বেড়াল যেখানে এক জায়গায় একসঙ্গে বাস করে, মনোরমার ছেলে সেই রকম একটা জায়গায় ঘুঁটে, কাঠ, টিন, কয়লা, ভাঙা হাঁড়ি, কলসীর টুকরো নিয়ে খেলা করছিল।

এক টুকরো ঘুঁটের একটুখানি মুখে পুরে সে ফেলে দিলে, তারপর হাত বাড়িয়ে একটা পিঁপড়ে ধ'রে মুখে পুরলে এবং তার পরেই কাঁদলে।

এবারে শশীর মা এল। মুখ থেকে পিঁপড়েটা টেনে বার করে ফেলে দিয়ে একবার কোলে তুলে নিলে। তারপর সামনের ঘরের একটি মেয়েকে ডেকে বললে, 'একটু দেখিস তো মা একে, একবার ঘুরে আসি মনিব-বাড়ি।'

খোকা একলা ব'সে এক টুকরো মিছরি চুষতে থাকে, নয়ত একখানা বাতাসা, তারপর আপনি ঢুলতে থাকে। তখন শশী বা অন্য কেউ কোন ঘরে তাকে তার মাদুরের ওপর একটা কাঁথা বালিশ দিয়ে শুইয়ে দেয়। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সে ঠোঁট চুষতে থাকে আস্তে আস্তে, যেন মায়ের কোলে ঘুমচ্ছে।

অন্ধকার ঘনিযে আসে। ঘরে ঘরে কেরোসিনের ডিবিতে সন্ধ্যা-প্রদীপ জ্বলে ওঠে। শশীর মা কাজ থেকে ফেরে এক বাটি দুধ হাতে, ছেলেটাকে খাওয়ায়। মেয়েকে জিজ্ঞাসা করে, 'হ্যাঁরে, কেঁদেছিল?' নয়তো 'দুষ্টুমি করেছিল?' ওর যেন মায়া হয়।

তারপর কোলে করে দুধ খাওয়ায়, কখনও বা আদর করে 'যাদু সোনা দুধ খা' বলে।

কিন্তু শশীর মা মনোরমা নয়; মনোরমা বা ছেলেটার মা একজন ছিল।

পিতৃ-পরিচয়? সে কথা থাক।

তার মার বা মনোরমার বিয়ে হয়েছিল, কিন্তু সে বিয়ের ঠিক কোন ইতিহাস জানা নেই। সম্ভবত তেরো-চোদ্দ বছর বয়সে বিবাহ তার হয়। সে বিবাহের আধিভৌতিক প্রয়োজন তার বরপক্ষে ছিল না, যেহেতু তাঁর সগৃহস্থালী একটি গৃহিণী ছিলেন। কন্যাপক্ষেও বিবাহের দায়িত্ব ছিল না, তাকে শুধু কন্যকা নাম থেকে নামান্তরিত করা হয়েছিল।

সুতরাং বিয়ের আগেও সে যেখানে ছিল, সেখানেই রয়ে গেল—তার মা'র কাছে। মা ছিল কোন দূর এক আত্মীয়ের বাড়ি রাঁধুনী। ওরা ছিল দুটি

বোন, বড়র বিয়ে আগেই হয়েছিল, সে স্বামীর ঘরে থাকত। ছোটর জন্য মা'র চিন্তার সীমা ছিল না, বিবাহ দিয়ে সে নিশ্চিন্ত হয়েছিল।

ব্রাহ্মণের মেয়ে, বিবাহ-সংস্কার না হলে সে ব্রাহ্মণই নয়, তার হাতের অন্নজল কে গ্রহণ করবে? অতএব বিবাহ তার হয়েই ছিল, এবং সেই বিয়ের চিহ্ন ছিল—তার কপালে সিঁদুর।

মা যথাকালে স্বর্গারোহণ করেছিলেন, এবং নির্লিপ্ত নির্বন্ধন বিবাহিতা মেয়ে মায়ের রান্নাঘরের কাজের উত্তরাধিকার পেয়েছিল।

তারপর আশ্রয়দাতার বাড়িতে থাকতে থাকতে একদিন সেও যত কাঁদলে, বাড়ির গৃহিণীও ততই কাঁদলেন।

তারপর? তারপর অনেক কথা। সেই তারপরের একটা স্তরে দেখা গেল মনোরমার ঐ ছেলেকে। তার মাঝের, আগের এবং পরেরও ইতিহাস কেউই প্রায় জানে না, অতএব প্রায় অজ্ঞাতই আছে সেটা।

যা হোক, তার পরেও দেখা গেল, মনোরমার ছেলে, তার চাকরি আর আত্মমর্যাদা, তিনই পৃথক পৃথক ভাবে এক রকম করে টিকে আছে।

২

আগাছা যেমনভাবে সতেজ হয়ে বাড়তে থাকে, অযত্নে অশ্রদ্ধায়ও তাড়াতাড়ি পুষ্ট হতে থাকে—বাইরের স্নেহজল তার জন্যে না থাকলেও মাটির স্নেহস্তন্যসুধা টেনে নিয়ে, মনোরমার ফেলা তেমনিভাবেই মাতৃস্তন্য আর মাতৃস্নেহহীন হয়েই শুধু অন্য দুটি জননীর অন্তরের করুণারস আকর্ষণ করে নিয়ে বড় হতে লাগল।

বাতাসা, খই, মিছরি, মুড়ি, ঘুঁটে, খোয়া, কাঁকর, কয়লা সবই তার সমান খাদ্য, শুধু কোনটা সে খায়, কোনটাকে মুখে দিয়ে ফেলে দেয়।

তাকে সশঙ্ক স্নেহে আগলাবার, মধুরসিক্ত আনন্দময় কৌতূহলে দেখবার, অথবা সেই আহার্যের কৌতুকলীলা দেখে হাসবার কেউ নেই।

বিশ্বপ্রকৃতির সন্তানের মত সে যেন প্রাকৃতিক নিয়মেই হাসে, কাঁদে, খায়, ঘুময়। সেই নিয়মেই কখনও বা সে পিঁপড়ে পোকা ধরে কামড় দেয়, কখনও বা পিঁপড়ে পোকারা তাকে কামড়ায়।

ধুলোমাখা দেহ, হৃষ্টপুষ্ট, ঈষৎ-মলিন গৌরবর্ণ ভদ্রঘরের ছেলেটি এই জীবনযাত্রার মধ্যে থেকেই একটির পর একটি করে বছর অতিক্রম করে পাঁচ বছরে পড়ল।

মনোরমার মনের কথা কেউ জানে না। সম্মান ও আশ্রয় তার বজায় ছিল, তারপরেও ছেলের কথা সে হয়ত ভাবে নি, অথবা ভেবেছিল গোপনে, তা জানা নেই।

সে নির্বিঘ্নে বেঁধেছে, বেড়েছে, খেয়েছে, ঘুমিয়েছে।

বাড়ির যিনি গৃহিণী ছিলেন, তিনি সন্তানের জননী, কি ভেবে কি জানি, তিনি ওই মা ও স্বজন পরিত্যক্ত বঞ্চিতকে, ওঁরই ঘরের শিশু বলে ধরে নিয়েছিলেন।

মনোরমার ছেলে কর্পোরেশনের অবৈতনিক স্কুলে ভর্তি হল। জামাকাপড় তার জোটে। খাতাপত্র স্লেট বইও পায়। আধা-ভদ্র আধা-বস্তিবাসী ধরনে সে পড়ে। তার পালিকা মা রেড়ির তেলের প্রদীপ জ্বেলে পড়তে বসিয়ে দিয়ে মনিব-বাড়ি যায় কাজ করতে।

শশীর মা'র মেয়ে-জামাই ঘরে থাকে। শশীকে সে দিদি বলে। শশীর মাকে মাও বলে, মাসীও বলে।

৩

আপন সন্তান ও পরের সন্তান মানুষ করার যে প্রভেদ থাকে, এক্ষেত্রেও তার অভাব ছিল না। দয়া ও কর্তব্যের দায়ে যে মানুষ হয়, সে মাসীকে মা বললেও, জানতে পারে তার জীবনযাত্রার ধরনটা। এখানেও তার ব্যতিক্রম হয় নি। পালিকা মাতার ভদ্রলোকের ছেলে মানুষ করার কর্তব্যের দায়ে, ফেলা দিনের বেলা ওই সব পল্লীর ছেলেদের মত সব সময় খেলা করতে পায় না, অশ্রাব্য অকথ্য কথা শুনতে পায়, কিন্তু বলতে পায় না; গাল দেওয়া, মারামারি করায় এগোতে পারে না। নিজেদের মায়ের স্নেহসজাগ দৃষ্টিতে থেকে পাড়ার ছেলেরা যা খুশি তাই করে, বলে, কিন্তু মাসীর তীক্ষ্ণ সচেতন লক্ষ্যের মাঝে থেকে ফেলার লেখাপড়া, খেলার, শোয়ার সময়ের বেশি নড়চড় হয় না।

ফলে সকলেই জানতে পারলে, ও ওদের ছাড়া বিশেষ কেউ, হয়তো ভদ্রলোকের ছেলে। বোঝা যায়, ওর জন্য খরচের টাকা আছে, খবর করার লোক আছে।

বয়স আস্তে আস্তে জ্ঞানের সীমায় এসে পৌঁছল।

সঙ্গী ছেলেগুলো কেউ কেউ বলে, 'তুই তো বড়লোক হবি। তুই ভদ্রলোকের ছেলে, পাস করবি।'

আর একটা ছেলে বলে, 'হ্যাঁরে, তোর মাসীর অনেক টাকা আছে, না? তোকে জামা কিনে দেয়, জুতো দিয়েছে সেদিন।'

আর একটা ছেলে বলে, 'করে তো ঐ গোঁসাইবাড়িতে কাজ, তা আর মাইনে কত! কি করে তোকে ওসব কিনে দেয় রে?'

ফেলা বড় হয়েছে, যেন একটু গর্বিত হয় মনে মনে, মুখে বলে, 'কেন? তোদেরও তো জামা আছে, জুতো আছে।'

'তোর মতন তো নয়।'

গর্বিতভাবে ফেলা চুপ করে রইল। হ্যাঁ, ওরই এই বস্তির মধ্যে অবস্থা ভাল, পয়সা আছে ওদের।

একটা ঘুঁটেওয়ালীর যোল-সতের বছরের মেয়ে একটু দূরে দিনান্তের শুকনো ঘুঁটে জড় করতে দেওয়াল থেকে খুলছিল। সে একটু হাসলে, 'জানিস নি তোরা? ও যে শশীদের মা'র বাবুদের পুষ্যিপুত্তুর হয়।'

তার কথায় তার পাশের একটা মেয়ে একটু হাসলে।

ফেলা ওদের হাসি বা শ্লেষের অর্থ বুঝতে না পেরে অন্য ছেলেদের ডাণ্ডাগুলি মার্বেল খেলার দলের মধ্যে মিশে গেল। সন্ধ্যের আর দেবি নেই, তারপরেই বস্তির পথ ঘোর অন্ধকার। তখন খেলা তো দূরের কথা, পথের কিছুই দেখা যায় না।

কিন্তু খানিকক্ষণের মধ্যেই একটা ঘর থেকে ডাক এল, 'ফেলা, ও খোকা, ঘরে আয়।'

ফেলার জুতো-জামার ঐশ্বর্যে ঈর্ষাকাতর বালকেরা বললে, 'ওরে, ও ভদ্দরলোক হয়ে পড়া করতে গেল, খেলবে না।'

ক'বছর গেছে। ইতিমধ্যে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা সাঙ্গ করে, কেউ বা আগেই, ফেলার সব সঙ্গীরা—বস্তির ছেলেরা কলে, কারখানায়, আপিসে, লোকের বাড়িতে মজুরিতে ঢুকেছে।

ফেলা সকলকে আশ্চর্য 'করে দিযে তাদের পুরনো সংশয় বাড়িয়ে দিয়ে হাইস্কুলে ভর্তি হয়েছে।

এ স্কুলে মাইনে লাগে। মাইনে দিয়ে লেখাপড়া করে ও করবে কি? বস্তির মেয়েরা মাঝে মাঝে প্রশ্ন করে, 'হ্যাঁ মাসী, কত মহিনে লাগে?' মাসী হাসে, তার মানে, তা লাগুক। এবং এখন মাঝে মাঝে শশীর মা বলে, 'যা তো বাবা, ওবাড়ির মাঠাকরুণের ঠেঁয়ে তোর ইস্কুলের মাইনেটা নিয়ে আয়। তেনাকে পেন্নাম করিস।'

চোদ্দ-পনরো বছরের ফেলা গিয়ে প্রণাম করে দাঁড়ায়। কিন্তু গৃহিণী চোখ তুলে না চেয়েই টাকা দিয়ে দেন বা দিতে বলে দেন। মনে তাঁর অস্বস্তির সীমা থাকে না।

মনোরমা রান্নাঘরের দরজার পাশ থেকে একদিন মাত্র দেখেছিল। আর দেখতে সাহসই করে নি. কিংবা লজ্জাতেই দেখে নি, বলা যায় না। কিন্তু দুটি জননীরই যেন অস্বস্তির শেষ ছিল না।

ফেলার পড়া যে সময়ে অদৃশ্য রহস্যজগতের চাবিবন্ধ দরজা একটি একটি করে খুলে দেবার উদ্যোগ করছিল, আর এই স্কুলের সঙ্গ ও আবেষ্টন যখন ফলহরিদাসকে ভদ্র-জীবনের ভদ্রসমাজের সামনের যাত্রাপথের দুরাকাঙ্ক্ষার দিক দেখিয়ে দিচ্ছিল, এমনতর

সময় ও-বাড়ির গৃহিণী বিষম অসুখে পড়লেন এবং হাওয়া বদল করতে গেলেন তার কিছুদিন পরেই। তারপর আর ফিরলেন না।

তিনি ফিরলেন না বটে, কর্তা কিন্তু ফিরে এসে কিছুদিন পরেই তাঁর স্থান পূর্ণ করে নিলেন।

নতুন গৃহিণী এসে সংসারের হাল শক্ত হাতে ধরলেন। নতুন বাজেটে ব্যয়সঙ্কোচ-সমস্যা প্রথামত জাগল। ঝি-চাকরের খাটুনির ওপর বসল ট্যাক্স, অর্থাৎ তাদের কাজ বাড়ল, লোক কমল। খরচ বাঁচল তাতে কিছু, এবং স্বভাবতই মনোরমার ছেলের জন্যে যে খরচা সংসারে বরাদ্দ ছিল, সেটাও বাঁচানো হল। ছোটলোকের ছেলের পড়ার জন্যে, বিশেষ করে ঝিয়ের বোনপোর জন্যে (ছেলে হলেও বা হত) এত শিরঃপীড়া কি জন্যে, মানেই হয় না।

সংসারের হিতৈষী-হিতৈষিণী দু-একজন ছিল, তারা বললে, 'ঐ রকম। তিনি কিছু বুঝে-সুঝে করেন নি কখনও, করলে কলকাতায় বাড়ি হয়ে যেত।'

শশীর মা বাড়ি এসে বললেন, 'খোকা, আর পড়ো না। এবারে কাজকর্ম কর।'

ফেলা সবিস্ময়ে বললে, 'সে কি মা! আমি আর তিন বছর পড়লেই একটা পাস হয়ে ভাল কাজ পাব। ততদিন পড়ি।' স্কুলে পড়ার উচ্চাকাঙ্ক্ষার মোহ ভদ্রলোকের ছেলের মত তাকেও আকৃষ্ট করেছিল।

দুঃখিতভাবে শশীর মা বললে, 'আমাদের ঘরে এইতেই কাজ হতে পারে। আমারই কাজ থাকে কি না ও বাড়িতে গিন্নীমা গিয়ে!'

গিন্নীমার জন্য ফেলার দুর্ভাবনা ছিল না! সে শুধু বললে, 'তা হলে তোমাদের ঘরে আগে পড়িয়েছিলে কেন?'

ওর চোখে জল আসে। শশীর মারও কষ্ট হয়।

পড়ার নেশা, উচ্চাকাঙ্ক্ষার দুরাশা ফেলাকে ছাড়ে না। ফেলা খুঁজে খুঁজে চাকরি নিলে।

এক চায়ের দোকানে দুবেলা বাটি-বাসন ধোয়া, চা দেওয়া, শরবত দেওয়া—সকাল থেকে দশটা পর্যন্ত, বিকাল থেকে রাত্রি দশটা পর্যন্ত।

ইস্কুল ছাড়ার দরকারও হল না।

যে জ্ঞানের কুঞ্চিকা ওর মনের চোখের সমুখে কল্পলোকের দু-একটি দরজা একটু মাত্র ফাঁক করে দিয়েছিল, এবারে ওর প্রতি একেবারে অন্ধ, নির্লিপ্ত, নিরাসক্ত আবেষ্টনে চায়ের দোকানের খদ্দেরদের আলাপ-আলোচনায় তার চেয়ে অনেক বেশি ওকে—ওর মনকে—ওর দুরাকাঙ্ক্ষাকে অভিভূত করে তুললে।

যারা চা খেতে আসে, তারা যেন ওর মনে বায়োস্কোপের মত কল্পনা জাগায়,

রোমাঞ্চ জাগায়। ওরা কত রাত্রি অবধি গল্প-আলোচনায় মজে ডুবে থাকে, মাঝে মাঝে একটা করে হাসির প্রবল উচ্ছ্বাস জেগে উঠে ফেটে পড়ে। তার পরেই ডাক আসে, 'ফলহরি, আর পাঁচ কাপ চা দাও, শিগগির।'

রূপকথার সঙ্গে ফেলার পরিচয় নেই, কিন্তু যা যার পক্ষে অসম্ভব, তাই তো তার কাছে রূপকথা। এই রূপকথা তার সর্বাঙ্গ শোনে। বাইরে প্রকাশ্যে সে শুধু চা দিয়ে যায়, নিঃশব্দ নত মুখে। হাতকাটা জামা পরা, সাবানকাচা ধুতি কোমরে জড়ানো, আধ-ফরসা রং, অতি সাধারণ মুখ, নীচু মুখে শুধু কাজ করে যায়, সর্বাঙ্গ আর সব মন দিয়ে শোনে এবং ভাবে ওদের কথা।

রবীন্দ্রনাথের কাব্য, মহাত্মা গান্ধীর ত্যাগ, বাজার-দর, বেকারদের কথা, স্বর্ণমান-সমস্যা, নব্য রুশ, উদিত জাপান, আধুনিক বাংলা সাহিত্য, নূতন বিলিতী বই, ছিটকে ছিটকে ওর কানে আসে খণ্ডবিখণ্ড হয়ে, ওর চারধারে হীরার মত, আলোর মত ঠিকরে পড়তে থাকে।

একটি কথাও দাঁড়িয়ে শোনবার জো নেই, কান পেতে শোনার ইচ্ছার সঙ্গেই হুকুম আসে, 'আর দু পেয়ালা চা। আচ্ছা, দু কাপ কোকো আরও।'

সূর্যাস্তের সময়ের ছেঁড়া রঙিন মেঘের মত ওর মনের আকাশে ছেঁড়া কথার টুকরোর ঐশ্বর্য মাত্র কয়েক মুহূর্তের জন্য জমা হয়। ওর মন সে ঐশ্বর্য কুড়িয়ে নিতে চায় বৃথাই। এই অসম্পূর্ণ কথা শোনার ফলে বালকের অর্ধেক শোনা রূপকথার বাকি অর্ধেকটা নিজেই রচনা করতে চায় বৃথাই। চা কোকো পৌঁছয়। কানে আসে, 'ছোকরাটি কাজের আছে হে।'

'হ্যাঁ, বেশ চটপটে।'—জবাব দেয় দোকানের কেউ।

চৌবাচ্চা থেকে বালতি করে জল তুলে ও এঁটো পেয়ালা-পিরিচগুলো ধুতে থাকে। তার অভিভূত বর্তমান তার অনাসক্ত ভবিষ্যৎকে জানে না, চেনে না, শুধু বীজমন্ত্রের মত সে নামগুলি জপ করে। কে গোর্কি, কে শেকভ, কে জওহরলাল, কে বিবেকানন্দ, ও জানে না কাউকে—নামের পর নাম—মনের পথে শুধু নামের পায়ের চিহ্ন পড়ে; আর কোনও ঠিকানা জানা নেই। কঠিন উচ্চারণে অপরিচিত নাম, মহাত্মা, রবীন্দ্রনাথের মত অত্যন্ত বেশি শোনা নাম, শুধু নামই—নামেরই লেখা পড়ে, কাপ-সসারগুলো ধুয়ে ধুয়ে চৌবাচ্চার ধারে মিলিয়ে মিলিয়ে সাজায়। মনের নামের সঙ্গে যেন হাতের কাজের ছন্দ মিলে যায়।

যখন ওর উচ্চাকাঙ্ক্ষা প্রায় একটা চরম সীমায় এসেছে, অর্থাৎ ও ফার্স্ট ক্লাসে উঠেছে, এমন সময় হঠাৎ একদিন বাড়ি গিয়ে ফেলা দেখলে, শশীর মা'র ঘরে তার মনিব বাড়ির রাঁধুনী-ঠাকরুণ এসে শুয়ে আছে।

রাঁধুনী-ঠাকরুণকে সে চিনতও না, শুনলে যে, সে-ই।

একে পড়ার জায়গা নেই, তাতে রাত্রের ঘুম ও পড়ার নিশ্চিন্ত নীরবতাকে একেবারে নষ্ট করে দিয়ে তার স্বপ্নের ধ্যানের একটি মাত্র জায়গা—ঐ ঘরে মূর্তিমান বিঘ্নস্বরূপ মনোরমার বিছানা হয়েছে।

ঘর থেকে বেরিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, 'ও কে ?'

শশীর মা বললে, 'ও বাড়ির বামুন-মেয়ে। জ্বরে ধুঁকছিল, ওরা সব বাড়ি বন্ধ করে হাওয়া খেতে গেছে, বললে, তুমি অন্য কোনখানে যাও। কোথায় যাবে, কাঁদতে লাগল, তাই নিয়ে এলাম। বামুনের ঘরের ভদ্রলোকের মেয়ে।'

অতিশয় বিরক্ত মুখে ফেলা বললে, 'তা তো বুঝলাম, আমি পড়ব কোথায় ?'

'ঐখানেই পড়িস না! কতটুকু বা থাক বাছা ঘরে, ইস্কুলে আর কাজেই তো কাটে।'

'আমি তা হলে ওখানেই শোব।'—ফেলা বললে।

তারপর বিরক্তভাবে বেরিয়ে গেল।

মনোরমা সব শুনতে পেল। লজ্জায় কাঠ হয়ে আচ্ছন্নের মত চোখ বুজে সে শুয়ে রইল। যতদিন বাড়িতে পুরনো গৃহিণী ছিলেন, ততদিন ডাক দিয়ে কাজ নিতেন, আগলাতেন, দয়া করতেন। তার জন্যে তাঁর থাকত ভাবনা দায়িত্ব, মনোরমার ছিল ভয় সঙ্কোচ। বাড়ির আশ্রিত মেয়ের মতই তার অবস্থা ছিল। নতুন গৃহিণীর তাকে আশ্রয় দিয়ে আগলাবার দরকারের কথা ভাবতে হয় নি, সেইজন্যে প্রচুর অবজ্ঞা নিয়ে তাকে দেখতেন। তারপর যখন শরীর তার মাঝে মাঝে খারাপ হত, তখন কর্মিষ্ঠা নতুন কর্ত্রী তাকে রাখার কোন দরকারই মনে করেন নি। এমনতর সময়ে মনোরমারও অসুখ হল, ওদেরও বেড়াতে যাবার কথা উঠল ছুটিতে, তখন বন্ধ বাড়িতে মনোরমাই একমাত্র সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। কর্তা প্রস্তাব করেছিলেন নিয়ে যাবার। আগের ছেলে-মেয়েরাও বলেছিল, কিন্তু হঠাৎ নতুন কর্ত্রী কর্তার ওপর করলেন সকোপ শ্লেষাত্মক উক্তি প্রয়োগ, আর মনোরমাকে বললে, 'তোমার তো রোজই অসুখ, তুমি দেশে তোমার বোনের কাছে চলে যাও, আমরা খরচ দিচ্ছি। আমার রাঁধবার লোকের দরকার নেই।'

জবাবের অপেক্ষা না রেখে তিনি টাকা এনে হাতে দিলেন, উদারতা দেখিয়ে দুই-এক টাকা বেশিও দিলেন। সকালের গাড়িতে তাঁরা বিদেশযাত্রা করলেন, বিকালের লোকাল ট্রেনে ওকে চলে যেতে আদেশ দিলেন। বললেন, 'শশীর মা দেশে পৌঁছেও দেবে দরকার হলে।'

বিকালবেলার দিকে দুর্ভাবনায় ক্লান্তিতে জ্বরে অভিভূত হয়ে মনোরমা শশীর মা'র ঘরে এসে বিছানা নিলে। ওর দেশ, ওর দিদি, ওর স্বজন, ওর আত্মীয় বন্ধু কাউকেই

ওর জানা নেই। পৃথিবীতে ওর কোনও কূল বা কিনারা নেই। উত্তরাধিকারে পাওয়া কাজ—রান্নাঘর, এই ওর সব। ওর মোহ, ওর দুর্বলতা, ওর ভয় আশ্রয় সমস্তই ওই বাড়িখানিকে, আর কোথায় ও যাবে? রোগের চেয়ে ভাবনায়, অপরিচিত পৃথিবীর ভয়ে সে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে রইল দিনের পর দিন। ফেলার বিরক্তি সত্ত্বেও তার শিগগির সেরে ওঠবার বা বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র যাবার কোন লক্ষণই দেখা গেল না।

উপরন্তু ফেলার দু আনা এক আনা বকশিশ চায়ের দোকানের মাহিনার ওপর, যেটা সে শশীর মাকে দিত, তাও সব খরচ হয় ওই রোগীর জন্যে, শশীর মা চেয়ে নেয়। শশীর মা'র ওই বামুন-বোনের ওপর ফেলার বিতৃষ্ণার সীমা থাকে না।

সাত-আট দিন ধৈর্য ধরে সে একদিন রাত্রে খাবার সময় শশীর মাকে বললে, 'ঘরটা জোড়া করে রেখেছ, পড়তে পাই না, শুতে পাই না, এগজামিন আসছে। খরচও বলছ কুলচ্ছে না, আমার হাতে খাবার পয়সাটিও নেই। ও কবে যাবে? তুমিই তো ওর খরচ যোগাচ্ছ?'

শশীর মা বললে, 'তা কি করব, আর কে খরচ করবে, ওর নেই যখন? মানুষটা মরতে বসেছে—'

'তাই বলে আমরা করব কেন?'—ফেলা বিরক্ত হয়ে উঠল।

এবারে শশীর মাও বিরক্ত হয়ে উঠল, 'তা দয়া করে করলেই বা।'

'আমি করব না দয়া।'

'তোর মা, তুই করবি না দয়া, আমিই সব করব?'—বিরক্তিতে রাগে শশীর মার মুখ থেকে বেরিয়ে গেল।

পাতের ভাত ডাল দিয়ে মাখতে মাখতে শশীর মার মুখের দিকে সে হতবুদ্ধিভাবে চাইলে, না, ঠাট্টা নয়, মিথ্যাও নয়, সত্য কথার স্থর আলাদা হয়। পাতের ডাল ভাত মাছ সব একাকার হয়ে মিশে গেল ঝাপসা চোখের সামনে। আলোর কুপিটার শিখা যেন দীর্ঘ হতে দীর্ঘতর হয়ে অনেক বড় হয়ে উঠল, চোখের সামনে অনেকখানি জায়গা রাঙা করে তুললে। এক নিমেষের মধ্যে বাড়িঘর, শশীর মা, মনোরমা, তার স্কুল, পড়ার খরচ, বাল্য-সঙ্গীর ঈর্ষা, আলোচনা সমস্ত যেন সেই শিখার আগুনে ধরে উঠে ওর মনের চারিদিকে আগুন জেলে দিলে। সেই আগুনের আলোয় তার উনিশ বছরের জীবন, বস্তির পারিপার্শ্বিক-অভিজ্ঞ মনের চোখের আশেপাশে কত কি লেখা ফুটে উঠতে লাগল! ফেলা দেখতে পেলে না, যেন দেখতে ভরসা হল না।

ব্যাকুল হয়ে সে জলের গ্লাসটা মুখে তুলতে গেল, গলার স্বর বন্ধ হয়ে গেছে গলার কাছে কি জড় হয়ে। কিন্তু মুখে তুলতে গিয়ে পারলে না। হঠাৎ তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, 'না না না, মিথ্যে কথা। তুমি মিথ্যে কথা বলছ, ও তো বামুনদের

মেয়ে—'। কথাটা গলায় আটকে গেল।

হাতের জলের গ্লাসটি ভাতের থালার ওপর উপুড় করে দিয়ে ভাতমাখা হাতেই সে ঝাপসা চোখে উঠে দাঁড়াল। ঝরঝর করে কয় ফোঁটা জল চোখ থেকে পড়ল, 'তুমি যে বলতে মা মরে গেছে, মা নেই!'

ফেলা বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল।

বাবুরা তখনও দোকানের বাইরের ঘরে কথা কইছিলেন।

ফেলা বিমূঢ়ভাবে ভেতরের চৌবাচ্চার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। চৌবাচ্চার পাশে বালতির কাছে কয়েকটা চায়ের বাসন পড়ে ছিল। ধোয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু পারলে না। দুটো ধুয়ে রেখে ক্রমাগত মুখ আর মাথায় জল দিতে লাগল। ছপছপ করে অঞ্জলি ভরে ভরে জল নিয়ে সে মুখে আর মাথায় দিতে লাগল। যেন পাগলের মত কি সব করতে যায়, ভুলে যেতে চায়, নাকি ধুয়ে ফেলতে চায়। কি যে তার দরকার! মাথাতেই শুধু জল দেয়—ছপ ছপ ছপ।

কতক্ষণ মনে নেই।

এদিকে লাইট জেলে দোকানের বাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি করছ অত জল নিয়ে? আমরা দরজা দিচ্ছি।

তার চমক ভাঙল। অপ্রস্তুত মুখে কি জবাব দিতে গেল, বলতে পারলে না। দরজা বন্ধ করে বাবুরা চলে গেলেন।

ফেলা ভিজে মাথায় ভিজে কাগড়ে স্থিরভাবে ভাবনাহীন, কল্পনাহীন, নিস্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে রইল সেইখানেই। যেন এক পা নড়লে, সরলে, এখনই সমস্ত স্থিরতা মূঢ়তা স্তব্ধতা চঞ্চল হয়ে উঠে বিশ্বের প্রশ্ন করবে তাকে।

কতক্ষণ গেল। শ্রান্তিতে শীতে যখন দেহ অবসন্ন হয়ে এল, কোন রকমে একটা শুকনো কাপড় টেনে নিয়ে পরে সে তার মাদুরে শুয়ে পড়ল।

মা! মৃদুস্বরে আপন মনে বলতে গিয়ে তার চোখ দিয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় আস্তে আস্তে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল।

তার তো কেউ ছিল না, সে তো জানত না, চিনত না কাউকে! তা হলে? তা হলে ওই তার—? আর একটি কথাও তার আলাদা করে ভাববার ছিল না। একসঙ্গে নাম স্থান জাত পরিচয়—অনেক কথা মনে পড়ে। তারপর?

তার আগে? তাই? তার চোখ দিয়ে খুব আস্তে আস্তে জল পড়তে লাগল।

সকাল গেল কাজের মধ্যে। সেই শান্ত স্থির অভিভূত মনেই দুপুর গেল, বিকেল গেল, গভীর রাত্রি কাটল।

তার পরদিন সকালে শশীর বর এল, কাজে যাবার সময়, 'যাও নি কেন? যেও,

ওরা ভাত নিয়ে অনেক রাত অবধি বসে ছিল।'

ফেলা সহজভাবে বললে, 'সময় পাই নি। যাব'খন।'

তার শান্ত মনের তলায় অনড় অচল হয়ে মনোরমার কথা গঙ্গায় ভাসা বয়ার মত জেগে ছিল; ডুবে যায় নি, নড়ে নি, সরে নি, ওর অস্তিত্বের সঙ্গে দৃঢ় শৃঙ্খলে বাঁধা সেটা। ও আর ভাবে নি, ভাবছিল না; কিন্তু সেটা ছিলই।

রাত্রে শশীর বর খেতে ডাকতে এল। ও সহজভাবে খেতে গেল। হাতের খুচরো পয়সা শশীর মাকে দিয়ে এল।

৪

ক'দিন গেল। ফেলা কালার মত আসে, বোবার মত বসে নীরবে খেয়ে চলে যায়।

শশীর মা'র অস্বস্তি বাড়ে। অনেক কথা কয়। একদিন হঠাৎ বললে, 'আহা, বামুন মেয়েটি এখনও জ্বরে ভুগছে!'

ফেলা কালার মতই চুপ করে খেয়ে চলে গেল।

ঘরের মধ্যে মনোরমা ব্যাকুল হয়ে উঠল। 'ও দিদি, আর বলো না, তোমার পায়ে পড়ি। আমি একটু সারলেই এখান থেকে চলে যাব, দিদির কাছে দিয়ে এস। নয়তো কোনখানে কাজ দেখে দিও, করব। আর আমার নাম করো না।'

শশীর মা আশ্চর্য হয়ে যায়। অবাক হয়ে থেকে তারপর বলে, 'কেন, বললে হয়েছে কি আর? তুইও যেমন! রোগ না দেখালে যে মরে যাবি! কেন বলব না? হাজার হোক মা তো!'

বস্তিবাসিনীর আবেষ্টন-অভ্যস্ত অনুভূতিতে মনোরমার মনের সীমাহীন লজ্জার স্পর্শ ধরা পড়ে না।

মনোরমা শ্রান্তভাবে চুপ করে যায়। আবাব চোখ বুজে শুয়ে থাকে। জিব নড়ে কি না নড়ে, সে আস্তে আস্তে আপন মনে প্রলাপের মত বিড়বিড় করে নিজের কাছেই যেন বলে, 'না না, আমার লজ্জার শেষ নেই, সীমা নেই, হে ঠাকুর, এ কি করলে?'

মনের সীমাহীন সাগরে তরঙ্গের পর তরঙ্গ ওঠে; পুরাতন কাহিনীর খণ্ডচিত্র তাতে ফুটে উঠে নতুনে মিশিয়ে যায়। পুরাতন গৃহিণীর মৃত্যু, তার অসুস্থতা, বাড়ির নূতনত্ব তাকে এই বিষম আবর্তের মধ্যে এনে ফেলেছে। তার চোখ থেকে জল পড়তে থাকে। নিজের মার কথা মনে পড়ে। তিনি কত কষ্টের মধ্যে তাদের লালন করেছেন। সে? সে কি করেছে তাঁর মতন? মা? মা'র মতন সে কি করেছে? অনেক জননীর চিত্র, এমন কি শশীর মা'র কথাও তার মনের চোখের সামনে ভাসে।

তাদের সন্তানদের সঙ্গে সম্বন্ধ—তার আকর্ষণ, তার মধুরতা মনে পড়ে। ও বাড়ির গৃহিণীর কথা মনে হয়, তাঁর ছেলেমেয়েদের যত্নের কথাও মনে হয়, সঙ্গে সঙ্গে সেই বাড়িরই আরও অনেক কথা, নিজের কথা, দুর্ভাগ্যের লজ্জার কথা, তিক্ত লজ্জায় ঘৃণায় দুঃখে মনে হয়।

বিহ্বলভাবে তার মনে হয়, আর নয়, এবারে হয় মৃত্যু—নয় কোনখানে, একেবারে অজানা কোন জায়গায় পালিয়ে যাবে। মৃত্যু বোধহয় হল না, সে পালাবেই একদিন। চুপিচুপি চলে যাবে।

যার সঙ্গে কোন সম্পর্কই ছিল না, যে সম্বন্ধের দাবি সে কোনদিন স্বীকার করে নি, আজ তাকে—অজানা নিরপরাধ সেই বালককে এই আবর্তের মধ্যে টেনে আনবার কোন তো দরকার ছিল না; সে একদিন বিনা পরিচয়ে নিঃশব্দে চলে যেতে পারত। যাকে কিছুই দেয় নি—মর্যাদা স্নেহ পরিচয় যত্ন, তাকে এই কষ্টের মধ্যেও রাখবে না আর। মুক্তি দেবেই। পৃথিবীর এক কোণে কি আর লুকিয়ে থাকবার জায়গা মিলবে না?—মনোরমা ভাবে।

সুযোগ এল দিনকতক পরে। মনোরমা তখনও তেমনি অসুস্থ। শশীর মা, শশী, তার বর, সকলে একটা বিয়ে-বাড়ির ফুলশয্যায় তত্ত্ব নিয়ে গেছে। অন্ধকার পৃথিবী। বস্তির নিরালোক জগৎকে যেন কোন্ অন্ধকারতম প্রদেশের একটা অংশ মনে হচ্ছে। মনোরমা ঘর থেকে বেরিয়ে তার মাঝে আস্তে আস্তে আঙিনা পার হয়ে দরজার বাইরে এসে দাঁড়াল।

গলির শেষ প্রান্তে একটা মাঝারি রাস্তায় গ্যাসের আলো দেখা যায় মাত্র। কল্পনার চেয়ে পৃথিবী অনেক বড়। বিমূঢ়ভাবে মনোরমা চাইলে। তার তখনও জ্বর সারে নি, শরীর দুর্বলই, তার সমুখে পৃথিবীজোড়া অন্ধকার, অপরিচয়। বিরাট পৃথিবী যেন একসঙ্গে ওর দিকে ঘোমটা দেওয়া রহস্যময় বিভীষিকার মত ইঙ্গিতময়ভাবে চেয়ে রইল। মনোরমা মূঢ়ভাবে থমকে রইল, শশীর মা'র বস্তির ঘর তার কাছে পরম আশ্রয় মনে হতে লাগল। গলিতে ওদিকে পায়ের শব্দ হল। মনোরমার পা কাঁপতে লাগল, সে চুপ করে চৌকাঠ ধরে দাঁড়াল, তারপর বসে পড়ল। শশীর মা'র কথার চেয়ে পৃথিবীকে আরও বিভীষিকাময় মনে হল।

ফেলা বাড়ি ফিরছিল। মানুষ দেখে থমকে জিজ্ঞাসা করলে, 'কে?'

মনোরমা ভয়ে লজ্জায় অভিভূত হয়ে বসে রইল। জবাব দিতে পারলে না।

ফেলা আবার বললে, 'কে?'

কম্পিতস্বরে এবার মনোরমা বললে, 'আমি'। উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করলে। ফেলা আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়াল। বুঝতে পারলে কে। তার মন অকারণে নিষ্ঠুর তিক্ত-

বিরক্তিতে ভরে উঠল। একটু থেমে নিষ্ঠুর শুষ্ক স্বরে বললে, 'এখানে কেন ?'

মনোরমা অপ্রস্তুতভাবে ঘরে ফিরে যাবার চেষ্টা করলে। উঠান পার হয়ে সে রোয়াকে উঠল, ঘরের আলোতে তার কঙ্কালসার দেহকে দেখাচ্ছিল প্রেতের ছায়া। পৃথিবীর অধিবাসিনী বলে মনে হয় না। মনোরমা ঘরে ঢুকল।

ফেলা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে তারপর একবার শশীর ঘরের দিকে, একবার শশীর মা'র ঘরের মধ্যে উঁকি দিয়ে দেখলে। তারা কেউ নেই।

মনোরমা চুপ করে চোখ বুজে শুয়ে ছিল। তার চোখ দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা করে জল পড়ছিল। উচ্ছ্বসিত কান্না নয়, অভিমানের ক্ষোভের আপনার প্রতি কারুণ্যের অশ্রু নয়।

ফেলা দোকানে ফিরে গেল। দোকানে তখনও লোক আছে। গল্প চলছে।

সে চায়ের বাটি, শরবতের গ্লাস ধুয়ে রাখলে। তারপর চুপ করে দাঁড়াল বারান্দায়, অন্য আদেশের অপেক্ষায়। কিন্তু বাড়ির তারা গেল কোথায় ? মনোরমাই বা কোথায় যাচ্ছিল ? হঠাৎ ফেলার বিষম ভয় হল, শশীর মা তার ঘাড়ে ফেলে চলে যাবে না তো ? যায় যদি ? তারপরেই মনে হল, শশীদিদি তার বরসুদ্ধ যাবে কোথায ? আর যায়ই যদি, সেও পালাবে ফেলে। আকাশ-পাতাল ভাবতে ভাবতে হঠাৎ ডাক এল, 'ফেলা, চারটে কমলালেবু নিয়ে এস তো।' শোনা গেল আদেশকর্তা কাকে বলছেন, 'হ্যাঁ, মা'র জ্বর ক'দিন।' তারপর আবার ফেলাকে বললেন, 'এই নাও পয়সা।' পয়সা দিলেন ফেলাকে।

ফেলা পয়সা নিয়ে রাস্তায় নেমে গেল।

লেবু কিনে ফেরবার মুখে কি মনে হল, সে ফিরল। ফিরে আরও দুটো লেবু কিনে নিলে।

৫

রাত্রি অনেক হয়েছে। ফেলা লেবু দুটো নিয়ে বাড়ির দিকে গেল। এতক্ষণে হয়তো শশীরা ফিরেছে, লেবু দুটো মাসীকে দিলেই হবে, সে দেবে'খন ওকে।

আঙিনা যেমন তেমনই অন্ধকার। ওদের ঘরের দিকেও আলো নেই। শশীর ঘর এখনও তালাবন্ধ। দরজার কাছে গিয়ে ফেলা দাঁড়াল। ঘরের কোণে কেরোসিনের ডিবেটা অনেকক্ষণ ধরে জ্বলে অনেকখানি কালো ভুসোয় মোটা হয়ে সামান্য একটু-খানি আগুনের মত রয়েছে। শিখাটা নিবে গেছে মনে হচ্ছে। তবু কেমন করে যেন ঘরে একটুখানি আলো রয়েছে। ফেলা উঁকি মারলে। কঙ্কাল তেমনই শুয়ে আছে, মনে হল ঘুমচ্ছে। এগিয়ে এসে সে আলোটা আস্তে আস্তে উস্কে দিলে। সেটা

যেন মিটমিট করে ওর দিকে চেয়ে দেখলে। ঘরখানা আশ্চর্য নিস্তব্ধ।

ফেলা একটু চুপ করে দাঁড়াল। বড্ড ঘুমচ্ছে, বুকের ওপর একটি হাত, আর একটি হাত পাশে আধকাত হয়ে পড়ে। ও চুপ করে দেখলে আজ, হ্যাঁ খুব বিশ্রী, মৃতের মত দেখাচ্ছে।

সামান্য অল্প একটু দয়ার মত ভাব তার মনে জাগল। লেবুটা দেবে? না, ঘুম থেকে উঠে আপনি খাবে।

আনন্দ দেবার আত্মপ্রসাদের ইচ্ছা মনের কোণ থেকে উঁকি মারে, জাগিয়েই দিক না, খায় তো এখনি খাবে'খন।

ফেলা এগিয়ে আসে। মুখের আধখানা দেখা যাচ্ছে।

দেখতে যেন ভাল লাগছে না। কিন্তু কি করে ডাকবে? 'শোন, এই লেবু—কমলালেবু খাবে একটা?' একটু থেমে আরও নীচু হয়ে, একটু জোরে বললে, 'ওঠ, একটা খেলে ভাল লাগবে।' না, বড্ড ঘুমচ্ছে, পরেই খাবে।

সে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। ঘর নিস্তব্ধ। ঘটি, বাটি, বাসন, চৌকি, প্রদীপ-পিলসুজ, বাক্স-পেটরা আবছা অন্ধকারে যেন কি রকম দেখাচ্ছে।

ফেলা ফিরে এল। কি মনে করে কেরোসিনের ডিবেটি হাতে নিয়ে মনোরমার মাথার কাছে নীচু হল। কি বিশ্রী গভীর ঘুম! এত গভীর!

আরও একটু নীচু হল, আলোটা মাথার কাছে রেখে হাতটা মাথায় রাখবার জন্যে এগিয়ে এনে মাথায় না রেখে নাকের কাছে নিয়ে গেল। নিঃশ্বাস কই?

এবারে ফেলা কপালে হাত রাখলে। কপাল হিম, স্যাঁতসেঁতে ঘরের মত কঠিন, ঠাণ্ডা, চটচটে একটু।

কতটুক সময়, হয়ত মিনিটখানেক পরে ফেলা উঠে দাঁড়াল। মনের ভেতর আর সমস্ত কথা কেমন মিলিয়ে গিয়ে শুধু নির্লিপ্তভাবে জাগছিল, হ্যাঁ, মারা গেছে, মৃত্যু হয়েছে। চুপ ক'রে একটুখানি কঙ্কালের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থেকে হঠাৎ কি মনে করে ফেলা চোখ ফিরিয়ে নিল। তার মনে হল, এই খানিকক্ষণ আগেই—হয়ত যে সময়ে তার মৃত্যু হয়েছে, ঠিক সেই সময়েই সে ভাবছিল, যদি শশীর মা তাকে ফেলে কোথাও চলে যায়! মনে হচ্ছে, সেই সময়েই মারা গেছে! ফেলা নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

মাথার কাছে কমলালেবু দুটো নিয়ে প্রদীপটা মনোরমার শবদেহ আগলে চেয়ে জেগে রইল।

বঙ্গশ্রী—আশ্বিন, ১৩৪১

সন্ন্যাসী

দাউজীর (গোপাল-বলরামের) মন্দিরের প্রকাণ্ড চাতাল। যমুনার তীর থেকে বেশি দূর নয়। স্নানান্তে সকলেই উঠে আসে, প্রণাম করে শিবের মাথায় জল দিয়ে ফল ফুল পয়সা বাতাসা রেখে চলে যায়।

সেদিন মন্দিরের চাতালে একটি সাধু এসে বসলেন। .পরিধানে গৈরিক, মাথাটি মুণ্ডিত, বয়স বোঝা যায় না, স্নিগ্ধ সহাস্য মুখ, মধুর মিষ্টি কথা।

গিরি, নদী, বন, অরণ্যের সম্পর্কীয় কেউ কিনা কিছু জানতে পারে না, কিন্তু অরণ্য প্রান্তর সাগর ঘুরেছেন খুব—বোঝা যাচ্ছিল কথার ভাবে। মন্দিরের কর্মচারী চাকরের সঙ্গে কথা বলছিলেন।

মন্দিরের এক পাশের দিকে বসে তিনি মৃদুস্বরে ভজন করছিলেন।

আস্তে আস্তে দুটি একটি করে মেয়েরা এসে দাঁড়াল, বর্ষীয়সীরা সস্নেহে 'বাবা' বলে তাঁর সঙ্গে কথা কইতে লাগলেন।

একে একে পাঁচ-সাতজন নানা বয়সের মেয়েরা এসে দাঁড়াল। সবাই প্রণাম করে পয়সা রেখে ফল রেখে চলে গেল।

ভিড় হয় নারীরই বেশি। সকালে যারা আসে স্নান করতে, সন্ধ্যায় যারা আসে আরতি দেখতে, তারা সাধু মহাত্মা দেখলেই এসে দাঁড়ায়। কারুর ছেলে-মেয়ের অসুখ, কারুর ছেলের কাজ, কারুর বউ-মেয়ের বন্ধ্যাতা, নানাবিধ দুর্ভাগ্যকে কোন মন্ত্রশক্তিতে সৌভাগ্য করা যায় কি না তারই আবেদন-নিবেদন আসে।

শূল-বেদনার কবচ, বন্ধ্যাতার মাদুলি, চাকরির জন্য জপ ইত্যাদির আবেদন-নিবেদনে সাধুর ভজন-পূজা সংক্ষেপ হয়ে এল।

ভিড়ের শেষ থাকে না, ক্রমে পুরুষেরাও এসে দাঁড়াতে লাগল। কেউ বা 'ভভূত' বিভূতি, কেউ বা পায়ের ধুলো নিয়ে যায়। গুজরাটী, পাঞ্জাবী, শিখ, বেনিয়া, ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, পর্দানশীন সব জাতীয় মেয়ে এসে করযোড়ে মহাৎমাকে দর্শন করে কথা শোনে। সাধু মহাৎমার কাছে পর্দা নেই।

দুটি পাঞ্জাবী মেয়ে এল। একটি বর্ষীয়সী, অপরা তার মেয়ে—অল্প বয়স, অতি ক্ষীণাঙ্গী সুন্দরী—যেন অপরূপ শ্রী-লেখা।

মা বললে, 'বাবা, এর জ্বর কাশি, ছাতিমে দরদ, এই ছ'মাস হয়েছে সারে না, আপনি একে ওষুধ দিন, যদি সারে। অনেক ইলাজ—চিকিৎসা করিয়েছি, কিন্তু সারে না, আপনার কৃপা হলেই আরাম হবে।'

মেয়েটির ক্ষীণ শীর্ণ স্বচ্ছ সৌন্দর্যে বেশ বোঝা যাচ্ছিল, তার কি অসুখ। মহাত্মা শুধু তার দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর যা বললেন, তার মর্ম এই, ওর অসুখ ভাল হবে না।

ব্যাকুল জননী তবু হাতজোড় করে পায়ের ওপর মাথা রাখে, মহারাজের কৃপায় কি না হয়, কি না হতে পারে! সে শুনবে না, তাকে ওষুধ কবচ যা হয় কিছু দিতেই হবে, একটি মাত্র মেয়ে তার, একটি ছেলে নিয়ে বিধবা হয়েছে, সে না বাঁচলে ও পাগল হয়ে যাবে ইত্যাদি—চোখের জল কথার সুর দুইই সন্ন্যাসীর চরণ আর মনকে অভিষিক্ত করে তুলছিল।

মেয়েটি চুপ করে মন্দিরের থামে ঠেস দিয়ে বসেছিল চোখ বুজে, হয়ত তার জ্বরে চোখ জ্বালা করছিল, নয়ত ক্লান্তিতে।

সন্ন্যাসী বললেন, 'আচ্ছা মা, ওষুধ দেখব।'

মা মেয়ে চ'লে গেল।

সকাল সন্ধ্যা বিকাল রাত্রি সব সময়েই ভিড়ের শেষ নেই। সবাই আসে—পুরুষেরা আসে, মেয়েরা আসে। কারুর হাতে খাবারের থালা, কারুর হাতে ফুলের মালা, কারুর হাতে বা আতর-চন্দন, কেউ নববস্ত্র টাকা পয়সা, প্রণামী তো আছেই।

ভক্তেরা ক্রমশ মালা এনে পরিয়ে দেয়, আগে শুধু পায়ে ঠেকাত। চন্দন-সুগন্ধে মাথা কপাল চর্চিত করে দেয়।

সন্ন্যাসী যমুনার তীরে একটি পড়ো ধর্মশালায় আশ্রয় নিলেন। ওখানে ভিড বেশি।

পীড়িত মেয়েটি এসে বিভূতির স্পর্শ নিয়ে যায়, আশীর্বাদ নিয়ে যায়। তার মা'র বিশ্বাস ওতেই ভাল হবে।

এসে আর ফিরে যেতে তখনই পারে না। চুপ করে ভিড় থেকে দূরে একপাশে বসে থাকে। প্রকাণ্ড অশ্বত্থতলায় বাঁধানো বেদীর ওপর বসে সে জীবন-মৃত্যুর সেতুর ওপরের স্বপ্ন দেখে। হয়ত যাবে, নয়ত ভাল হবে।

চোখে পড়ে সন্ন্যাসীর ঘরখানি, জনে জনে প্রণাম করে প্রণামী রেখে ফিরে যাচ্ছে।

বোধ হয় এও চোখে পড়ে, সেবা কখন যত্নের আত্মীয়তার রূপ ধরে এসে দাঁড়িয়েছে।

কোন মেয়ে বলে, 'বাবা, পায়ের থোড়া দবা দে?'

কেউ বলে, 'বাবা, ভোজন কর?'

কেউ বলে, 'আপকো শয্যা বনা দে?'

নারীর স্নেহ-সেবা সন্ন্যাসীকে সব দিক দিয়ে শত বন্ধনে বাঁধে। কোন দিন হয়ত সে বন্ধন ছিল, যাকে মনে পড়ে, নয়ত পড়ে না। আজ সব দিক দিয়ে সেই বাঁধনই তাঁকে নাগপাশের মতন বেঁধে নিচ্ছে যেন। সন্ন্যাসী হয়ত ভাবেন, সে অন্ত,

এ অন্য। নারীরা ভাবে, আহা, কেউ নেই যত্ন করবার!

রাত্রি হয়। সে ওঠে, এসে দাঁড়ায়, বলে, 'বাবা, অব যা রহেঁ।'

'আচ্ছা বেটী, যাও।'—সন্ন্যাসী কোমল স্নেহে তার পানে চান। উপেক্ষাভরে চলে যায়।

উদ্ধত, পীড়িত, তীক্ষ্ণ নারীকে তাঁর ভালও লাগে, ভয়ও করে। সমস্ত লোকের মাঝ থেকে ওকে যেন তাঁর বেশি মনে জাগে।

কিন্তু পীড়িত অবস্থাতেও সে না এসে থাকতে পারে না, রোজই আসে। যেন একটা অন্যমুখীনতা, অন্যমনস্কতা। যে প্রাণ ক্রমশ নির্জীব হয়ে আসছে, সে যেন ওই জনতার মাঝে আপনার নির্জীবতাকে সজীব করে তোলে অথবা জীবনের বৈচিত্র্য দেখে।

সেদিন ভিড় কম। সন্ন্যাসী বললেন, 'বেটী, সবাই আসে, বসে, কত সেবা করে, তুমি কেন অত নির্লিপ্তভাবে থাক?'

সে চুপ করে রইল। তারপর একটু হাসলে, বললে, 'আপনাকে তো অনেকে সেবা করে, ত্রুটি তো হয় না।'

সন্ন্যাসী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে চাইলেন—কি ভাবে কথাটি বললে, হয়ত জানবার জন্যে।

'সে কথা আমি বলছি না, আমি বলছি, তোমার তো সেবা করবার ইচ্ছে হতে পারে।'

সন্ন্যাসীর কথার উত্তর দেবার আগেই কয়েকজন নরনারী এসে দাঁড়াল।

সেবার আয়োজন পড়ে গেল, কেউ করে শয্যা, কেউ করে বাতাস, কেউ বা ফুলের মালা গুছিয়ে রাখে, কেউ বা আহারের আয়োজন করে।

সব কাজ সারা হলে যারা গেল, তারা গেল। যারা থাকে, তারা পায়ে হাত বুলয়, বাতাস করে।

স্বামী স্ত্রী, মা মেয়ে, ভাই বোন কত সম্পর্কের কত জন আসে। সবাই সবচেয়ে আপন জন হয়ে সেবা করতে চায়।

প্রথম প্রথম সাধু ব্যাকুল হয়ে উঠতেন, 'পায়ে হাত দেবেন না, সেবা করবেন না,' ইত্যাদি।

মেয়েরা শোনে না, পুরুষরাও সব সময় শোনে না।

অনভ্যস্ত পরিচর্যায় ঘুম আসে না, অস্বাচ্ছন্দ্য আসে বোধ হয়। সন্ন্যাসীর ঘুম আসে না, চুপ করে শুয়ে থাকেন। মধ্যাহ্ন-রৌদ্রে আকাশ ঝাঁ ঝাঁ করতে থাকে; মনোহর পৃথিবী ঘুমিয়ে পড়েছে, শুধু বুঝি ঐ ঘরের প্রাণী ক'টি ছাড়া আর কেউ জেগে

নেই। শুধু মাঠের গরম হাওয়া উড়ে আসে থেকে থেকে পাতার মর্মর স্বর তুলে, কোথাকার কোন্ ঘুমের লোকের ওপারের—মনের ওপারের বার্তা বয়ে। কিন্তু পরিতৃপ্তি আসে না, কি যেন অবসাদ-বেদনা-শ্রান্তিতে অন্তর ভরে ওঠে।

সেবার কিন্তু ফাঁক পড়ে না, জনের পর জন কেউ না কেউ করেই।

সন্ন্যাসী বিনিদ্র অবস্থাতেই থেকে অবশেষে উঠে পড়েন।

মেয়েরা বলে, 'অওর নেহি লেটেঙ্গে বাবা?'

সন্ন্যাসী বলেন, 'নেহি বেটী, নিদ নেহি আয়া।'

রাত্রেও আসে জনে জনে। নিঃসন্তান স্বামী-স্ত্রী দুজন এসে কতক্ষণ বসে থাকে।

সবাই ফিরে যায়, ওরা আর ওঠে না।

পীড়িত মেয়েটিও বসে থাকে।

তারা পায়ে হাত বুলতে বসে।

নিয়মিত সেবা যেন সংস্কারকে সহজেই অতিক্রম করে সন্ন্যাসীকে বেষ্টন করেছে। সেবার ঠাস বুনুনি—পার হয়ে যাবার কোনও উপায় বা পথ পাওয়া যায় না যেন।

সন্ধ্যার আকাশে মেঘ গুমট হয়ে ছিল, যমুনায় সঙ্কীর্ণ প্রবাহিণীর জল স্থির কাজল-চোখে আকাশকে দেখছিল, আকাশের মেঘের ছায়া জলের বুকে স্থির হয়ে পড়ে ছিল।

অনেকেই চলে গেছে, শুধু সেই পীড়িত মেয়েটি, তার মা আর দু-একজন আছে।

সেবার সমারোহ সাধুকে প্রসন্ন করে, কি ব্যাকুল করে কে জানে; কিন্তু পীড়িত মেয়েটির মুখখানি বাইরের রকে যেন মৃদু হাসিতে ভরে ওঠে।

অবশেষে সেবিকার স্বামী বাতাস করছিল, সে পায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল। তার বিধবা বোনও সাধুর পায়ের কাছে বসে ছিল।

তার ইচ্ছে দুজনেই সেবা করে, অপরের ইচ্ছে সে একলাই করে। দুজনে কি কথা হয়, একজন উঠে যায়।

সাধু অপরকে বললেন, 'রাত হয়েছে, তুমিও যাও।'

যেন একের ক্ষুণ্নতা তাঁকে অপ্রস্তুত করছিল, শেষ সেবিকাও উঠে গেল।

সেবা-অভ্যস্ততা ক'দিনের মাত্র, কিন্তু সন্ন্যাসী যেন পুরাতন কাজের গতি ভুলে গেছেন, চুপ করে জেগে শুয়ে রইলেন। রুগ্ন মেয়েটি রকে শুয়ে ছিল।

সে উঠে এল, বললে, 'মহারাজ, একটু বসি?' অনুমতির অপেক্ষা না করেই মাথার কাছে বসল।

সাধু অবাক হয়ে বললেন, 'বস। কি, বলছ কিছু?'

সে চুপ করে রইল। তারপর বললে, 'আপনার মাথায় হাত বুলিয়ে দিই?'

সাধু আরও অবাক হয়ে বললেন, 'দাও। কিন্তু আজ কেন?'

মেয়েটি এবার অপ্রস্তুত হয়ে গেল। কিন্তু বললে, 'মহারাজ, আপনি এখানে কতদিন থাকবেন?'

'কেন?'—সবিস্ময়ে মহারাজ তার দিকে চাইলেন।

অপ্রস্তুত হয়েই সে বললে, 'আপনি দেখতে পান না, পেলেন না, ওরা সবাই কত ঝগড়া করে আপনার সেবা নিয়ে। আপনি সংসার ত্যাগ করেছিলেন কি সংসারে থাকবেন বলে? ওরা সবাই আপনাকে আপনার করতে চায়। সে থেমে গেল।

সাধু চুপ করে রইলেন। আপনার কাছে লুকনো মায়া, মোহ, আকর্ষণ, বেদনা, অভিমান, তৃপ্তি সবগুলো স্পষ্ট হয়ে চোখের সামনে এসে দাঁড়াল, রাগ বিরাগ আশার সঙ্গে সম্পর্ক তো অনেক দিন ফুরিয়েছে।

মেয়েটি বললে, 'আপনাদের শুনেছি তিন রাত্রির বেশি কোথাও আশ্রয় নিতে নেই।'

সাধু উঠে বললেন, 'তোমার কথা ঠিক, তুমি আজ আমায় মায়ের মত শিক্ষা দিলে।'

সে কি বলতে গেল, 'নেহি মহারাজ',—কিন্তু বলতে পারলে না। শুধু চুপ করে কোন্ অনাদি জননীর মতন সাধুর মাথায় হাত বুলতে লাগল।

রাত্রি গভীর হতে লাগল। ওর মা এসে ডাকলে, 'কেশর!'

সে উঠে প্রণাম করে বললে, 'আমার অপরাধ নেবেন না।'

সারারাত্রি ধরে বিনিদ্র সন্ন্যাসীর বেদনার ভাবনার অবধি রইল না। তন্দ্রার মাঝে যমুনা, সরযূ, স্থনর, গোদাবরী—সবচেয়ে বেশি মনে পড়ে কেশরকে, ঐ পীড়িতা মেয়েটিকে। ঘুম ভেঙে যায়, মোহ চোখের জলের আকারে চোখ বেয়ে গড়িয়ে আসে।

সকালে সবাই জানলে, সন্ন্যাসী তীর্থভ্রমণে যাচ্ছেন, হেঁটে হরিদ্বার যাবেন। তারপর? কিছু ঠিক নেই।

একে একে সকলে প্রণাম করে চলে গেল, দুঃখ করে ব্যথিত হয়ে। কেশরও প্রণাম করে চলে গেল।

উষর বন্ধুর উগ্র সৌন্দর্যে ভরা পথে সন্ন্যাসী নত মাথায় ভজন গাইতে গাইতে চলে যান। পথিক পথে যারা যায় প্রণাম করে, আহার্য দেয়, থাকতে বলে গ্রামে। সন্ন্যাসী উদাসভাবে রাত্রের কয়েক দণ্ডের জন্য অতিথি হন। আগে সুখদুঃখে সমান উদাস ছিলেন, এখন যেন গভীর ভাবনায় উদাসীন থাকেন। মনে জাগে শীর্ণ ক্ষীণাঙ্গী তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালিনী ঐ মেয়েটির কথা। জীবনের কতখানি সহজে অতিক্রম করে এসেছেন, নিজের দিকে

বিশেষ না ভেবে সব গ্রহণ করেছেন সোজাভাবে ; হঠাৎ একি জাগরণ ! এই প্রতিগ্রহ মায়া, মোহ, মমতা, তৃষ্ণা, ঈর্ষা, বেদনা কত কি সৃষ্টি করেছে। সঙ্গে সঙ্গে অন্তরের অতলস্পর্শ সাগরে জাগে একখানি ক্ষীণ তনুর ছায়া, উজ্জ্বল দুটি কালো চোখ, জ্বররক্ত গৌর মুখখানি, শীর্ণ ললিত তনুশ্রী।

পার্বতী, গঙ্গা, ভাগীরথী, যমুনা—সবাই, কতজন এসেছে, কত সেবা করেছে, পুরুষরা কতজন এসেছে, ভক্তি করেছে, সেবা করেছে , কিন্তু কেশর কিছুই তো করে নি, তবু—

মাঠের মাঝের ছত্রিতে (সমাধি মন্দির) বিশ্রামেব জন্যে বসে সন্ন্যাসী স্তব্ধ হয়ে রৌদ্রময়ী পৃথিবীর পানে চেয়ে থাকেন, ভাবেন, উদ্দেশ্য কি ? উদ্দেশ্য কোথায় তাঁর ? ছায়া পড়লে আবার উঠবেন। পথ শুধু, সুদূর দিগন্তসীমা ছাড়িযেও বুঝি শুধু যাত্রা, মহাযাত্রা চিরন্তনী, তার শেষ নেই , উনি যাত্রী, তাতে একলা, সাথীহীন, সঙ্গীহীন।

আবার মনে হয়, উদ্দেশ্য ? মনে পড়ল একটা ওঁদেরই উপমা, পেঁয়াজের খোসা ছাড়িয়ে কি থাকে ? হাসতে গিয়ে চোখের পাশ থেকে জল গড়িয়ে আসে। চোখ খুলে দেখেন, মধ্যাহ্ন-রৌদ্রে চাওয়া যায় না, চোখ বুজে শুয়ে থাকেন ; বহুদিনশ্রুত কবেকার গান মনের মাঝে গুঞ্জন করে—

'বৈরাগ যোগ অতি কঠিন উধো হাম না সাধব হো'

(বৈরাগ্য যোগ অতি কঠিন, হে উদ্ধব, আমি তার সাধনা করব না) সুরের গুঞ্জনে কেবল ঐ লাইনটিই জাগে মনে।

ব্যাকুল বেদনায় হঠাৎ চমকে চোখ খুলে চান, বেলা আর নেই। ঊষর প্রান্তরের সীমান্তে রাঙা সূর্য অস্ত যাচ্ছে। আপনার দুর্বলতায় বিরক্ত হয়ে সন্ন্যাসী তেমনই রক্তচোখে ঊষর জীবনের মনের প্রান্তরে চাইবার চেষ্টা করেন।

মাতা নয়, ভগিনী নয়, সম্পর্কীয়া কেউই নয়, তবু তাদের সেবাযত্নের মমতার মায়ার ছাপ মনে যা পড়েছে, কেশর যা ভাবতে শিখিয়েছে, সে আর মোছে না। অবাধ্য মনের কোণে জাগে, নিবিড় করে একান্ত করে স্বজন করে তিনি কারুকে পান নি। না, তিনি নেন নি, সমস্ত ভুবনকে অবজ্ঞা করে ফিরিয়ে দিয়েছেন। মনে হয় ঠিক করেছেন, না ভুল করেছেন ?

আবার চকিত ত্রস্ত হয়ে ওঠেন, নিষিদ্ধ পরিত্যক্ত অতীতের ভাবনা আবার ? বিরক্ত সন্ন্যাসী দ্রুত পায়ে আবার চলতে আরম্ভ করেন। যেন শিগগির চললেই পৃথিবীর সমস্ত পথ, আপনার অয়নচক্র, বর্ষ মাস ঋতুর সীমা অতিক্রম করে, অরণ্য প্রান্তর নগর সিন্ধু সাগর সব পার হয়ে যেতে পারবেন।

সি ব্লকের তেরো নম্বর ফ্ল্যাট

মা বললেন, 'কেমন বাড়ি? ক'টি ঘর?'

পিসিমা বললেন, 'কলজলের ব্যবস্থা কেমন?'

বড়দা বললেন, 'আলো বাতাস আছে তো? ভাড়া কত?'

আর খুকী মিনু বীণা রেণু সবাই ঘিরে তারাও যেন জিজ্ঞাসুভাবে দাঁড়িয়েছিল তাদের ছোড়দাকে আর ছোটকাকে ওরফে সুধীরকে!

বিকেলবেলায় রোদ্দুর ভাদ্রমাসের শেষের।

নানাবিধ প্রশ্ন আর অতগুলি জিজ্ঞাসার চিহ্নসূচক দৃষ্টিতে—অন্য লোক হলে রেগে যেত। সুধীর এক মাস ধরে বাড়ি খুঁজে অন্ততঃ এটুকু শিখেছে যে, মেজাজ অল্প ভাড়া দিলে দেখানো যায় না এবং নিজের সেই ধৈর্যটা ওর কাছে এখন বেশ উপভোগ্যই মনে হয়। তাই এদের ওপরও রাগ না দেখিয়ে ঘরের পাখাটা খুলে দিয়ে বোনকে এক গ্লাস জল আনতে বলে শুধু বললে, 'উঃ কি গরম!'

হঠাৎ মা ও পিসিমার মনে পড়ল ও সারাদিন অর্থাৎ বারোটা থেকে বাড়ি ছাড়া, বোধ হয় বাড়িই খুঁজছে!

অপ্রস্তুত মুখে পিসিমা বললেন, 'আহা ঘেমে ভিজে গেছিস্।'

মা বললেন, 'জলটা একটু জিরিয়ে খা।'

সুধীর এবারে বিনা ভূমিকায় বললে, 'বাড়ি ভাল, ঘর চারটে, রান্নাঘর একটা, বাথরুম একটা, কল তিনটে, সমস্তক্ষণ জল, আর (ভাইয়ের দিকে চেয়ে) ভাড়া পঁয়তাল্লিশ এবং ফ্ল্যাট।'

'কলকাতায় সমস্তক্ষণ জল? সে কিরে!' পিসিমা অত্যন্ত খুশিমুখে অবাক হয়ে গেলেন।

বড় ভাইপো সংক্ষেপে বললেন, 'জল ট্যাঙ্কে থাকে। টিউবওয়েল থেকে তোলে।'

সুধীর বললে, পরশু টাকা জমা দিয়ে আসতে হবে, এক মাসের ডিপোজিট। যেদিন ইচ্ছে যেতে পার। তবে এ বাড়ি তো আসছে হপ্তায় ছাড়তে হচ্ছে, আশ্বিনের প্রথমদিকেই চল।'

ঘরের ভিড় আসতে আসতে ছড়িয়ে পড়ল।

চারখানা ঘরওয়ালা, তিনটে কলযুক্ত চারতলার ওপর বাড়ি। যেন একটি গা-আলমারীর দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে পড়া। তারপর সব নিজেদের।

এক মিনিট নিরিবিলি নেই, এতটুকু জায়গা নিষ্প্রয়োজনীয় নেই। সব কাজের

দরকারী, সব ওজন করা। ঘরের ওদিকে বারান্দা কাপড় শুকবে—হাওয়া আসবে, মাঝের ফালি জমি সার্বকর্মিক।

যাই হোক দাদা আফিসে যান, সুধীর কলেজে যায়, মা রান্নাঘরে থাকেন, পিসিমাও থাকেন কাজে, মেয়েরা স্কুল কলেজে যায়। বৌদি ছোট ছেলে নিয়ে ব্যস্ত থাকে। বাড়ি থাকলে সমস্তক্ষণ সকলে সকলের অঙ্গাঙ্গি হয়েই থাকে যেন।

সকালবেলা সমস্তক্ষণই কড়া নড়ে।

'কে?'

'গোয়ালা, বাবু। দুধ লাগবে?'

'না, আমার দুধওয়ালা আছে।'

আবার কড়া নড়ে।

'কে?'

'ডিম নেবেন?'

'না।'

'কে?'

'জমাদার।' পিসিমার উৎকর্ণে সবই পৌছয়।

'জমাদার কড়া নেড়ে গেল! ওমা! কি বাড়ির ছিরি! ওরে দরজায় গোবর জল দে ও মন্নুর মা।' মন্নুর মা বাসন মাজা ছেড়ে বালতি করে জল নেয়।

এরপর কিছুক্ষণ দরজা খোলা থাকে, কে আসে না আসে, জানা যায় না।

একে একে সব স্কুল কলেজ অফিস যায়। দরজা ভেজানো থাকে। আবার কড়া নড়ে, 'গুড় নেবেন মা, গুড়?'

'না'—পিসিমা জবাব দেন।

আবার খানিক পরে, 'ঘি নেবেন মা, ঘি?'

'না'—খেতে খেতে পিসিমা বললেন।

ঘিওয়ালা বলে, 'দেখাব মা?' কানে কম শোনে বোধহয়।

বাড়িতে কেউ নেই। খেতে বসে ওঠাও যায় না—ব্রাহ্মণের বিধবা।

এবারে রেগে বললেন, 'না, না, না।' অপ্রস্তুত ঘিওয়ালা চলে গেল।

পিসিমার খাওয়া প্রায় শেষ, মা'র হয়েছে। আবার কড়া নড়ল।

'কে রে, কে?'

মা বললেন, 'আমি উঠছি, দেখি।'

ওদিক থেকে জবাব এল, 'চারটি চাল দেবেন মা?'

মা অপ্রস্তুত মুখে বললেন, 'খাওয়া দাওয়া হয়ে গেল যে।'

ঘর থেকে পিসিমা বললেন, 'দুপুরবেলা কড়া নেড়ে ভিক্ষে চায়? এমন কথাও শুনি নি। সকাল করে আসতে হয়, খাওয়ার পর ভিক্ষে দেয় লোকে?'

মা বললেন, 'কাল আসিস।'

একটি পয়সা দাও না মা। চাল নাই বা দিলে'—নাছোড়বান্দা ভিখারী বালিকা বললে।

নতুন বাড়িতে এসে এটা সেটা কাজ লেগেই আছে। ঝাড়া মোছা গোছান।

বিকেলের দিকে ছোট ছেলেমেয়েরা স্কুল-কলেজের ফেরত এল, একজন খাবার দিতে গেলেন, একজন রান্নাঘরের যোগাড়ের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন, মিনুরা খাচ্ছে।

এবার আর কড়া নড়ল না। শুধু মনে হল কেউ যেন বাড়িতে এসেছে। পিছন ফিরে পিসিমা দেখলেন, একটি ভদ্রমহিলা ও একটি ছোট মেয়ে বছর তিনেকের। চোখাচোখি হতে তিনি একটু হাসলেন, বললেন, 'আলাপ করতে এলুম।'

পিসিমা ডাকলেন, 'ও বৌমা, একটা মাদুর পেতে ওঁকে বারান্দায় বসাও। চলুন, আমি এদের খাবার দিয়ে যাই।'

বৌমা এসে দাঁড়াল। তিনি অমায়িক ভাবে হেসে বললেন, 'মাদুর কি হবে, এমনই এইখানে বসি।'

খাবার ঘরের চৌকাঠের ওপর তিনি বসলেন। পিসিমা বিরক্ত ও হতবুদ্ধি ভাবে এদিক ওদিক কাজ করতে লাগলেন। ছেলেমেয়েরা খাবার কোন রকমে গলাধঃকরণ প্রক্রিয়ায় সমাপ্ত করল। পিসিমা বললেন, 'আর নিবি নি? ওকি খেলি'—বলতে বলতেই শেষ করে উঠে পড়ল।

অভ্যাগতা তখন পাশে দাঁড়ান বৌমার সঙ্গে গল্প করছেন।

এবারে পিসিমার দিকে মনোযোগ দিয়ে হাসলেন, বললেন, 'আপনার কাজ সারা হল?'

হাসির উত্তরে হাসা উচিত, নইলে অসৌজন্য হয়। কিন্তু পিসিমা হাসলেন না, ওঁর ছেলেদের খাওয়া না হওয়াতে খুব রাগ হয়েছিল। বললেন, 'চলুন বারান্দায় বসি।'

পরিচয় শুরু হল। ওরা থাকেন পাঁচ নম্বর ঘরে। ছেলে মেয়ে, বিয়ে, পড়া, বাড়ি, দেশ, জাতি পরস্পরের প্রশ্নোত্তর পালা শেষ হল। তারপর এল ওপক্ষের আত্মপরিচয় অর্থাৎ আত্মগরিমার পালা। এতক্ষণে পিসিমার পাশে মা এসে বসেছিলেন। এঁরা শ্রোত্রী, খুব ভাল বক্তা মোটেই নন।

বিকেল শেষ সন্ধ্যে হয়ে এল। পিসিমার কাপড় কাচা সন্ধ্যাহ্নিক অন্যান্য কাজ সব বাকি। আর মেয়েদের চুল বাঁধা, ঘর পরিষ্কার, ছেলেদের অফিসের ফেরত চা খাবার দেওয়া সব বাকি। প্রতিবেশীর অবসরও একান্ত ভাবেই নিরেট।

পিসিমা ইঙ্গিত করলেন, 'ছেলেরা রাত্রে কি খায়, কে করবে?'—সে চাকর করবে। আমায় কিছু করতে হয় না, অসুখ কিনা। হার্টের অসুখ। আপনাদের কে করবে?'

—'আমরাই করব, এই কাপড় কাচি।'

পিসিমার আভাস ইঙ্গিত ব্যর্থ হল।

তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, কি বলছিলাম যে! আমার ছেলে কি করে? সে এই বি. এস-সি পড়ছে। ঐ যে খুব ভাল হকি খেলে মেঘু দত্ত নাম শোনেন নি? প্রায়ই তো কাগজে বেরয়।

মেঘু দত্ত হকি খেলে। কি খেলা! কি খেলা! পিসিমা চুপ করে রইলেন। আলমারির মত বাড়ি, ছোট ছোট ইঁদুরেরা এ তাক ও তাক ঘুরে বেড়ানর মত ছোট ছোট মেয়েছেলেরা ঐ চারটি ঘরে ঘুরছে আর সবই শুনতে দেখতে পাচ্ছে। মিনুর কানে গেল, সে উঁকি মেরে পিসিমার মুখটি দেখে নিল।

হ্যাঁ আমরা ওকে 'মেঘা' 'মেঘু' বলেই ডাকি। আমার ভাসুর বলেন মেঘলা। তিনিই নাম রেখেছিলেন কিনা। ও যখন হয়েছিল এই পাঁচই ভাদ্র ওর জন্মদিন গেল—সেদিন সে কি বাদল বিষ্টি কি আর বলব। শাশুড়ী ওর নাম বাদল রাখতে চাইলেন। ভাসুর বললেন, 'না, ও একঘেয়ে নামে কাজ নেই। ওর নাম হোক মেঘরাজ।'

ওর খেলার কথা শোনেন নি? ও যে সাহেবদের সঙ্গে সমানে খেলে। ওকে যে কি ভালবাসে সাহেবরা সে দেখলে লোকের হিংসে হবে। কিন্তু ওকে সবাই ভালবাসে। নিজের ছেলে বলে বলছি না, ওকে হিংসে করা যায় না এত ওর গুণ। শুধু তো খেলায় নয়, পড়ায় লেখায় লোকের সঙ্গে গল্পে আমোদে, গান বাজনায়, দয়ামায়ায়, গরিব ভিখিরী পথে দেখলে শীতের দিনে গায়ের কাপড় তাকে দিয়ে আসবে; ঝি চাকরদের খাবার দেখে সে খাবে—এমন ছেলে! সব বিষয়েই সে এমন! নিজের ছেলে বলে বলছি না, আমাদের আগের পাড়ায় সতীপতি সিংগী থাকতেন, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। সেই রায়বাহাদুর সতীপতি সিংগী ওকে নিজের ছেলেদের চেয়ে ভালবাসতেন বেশী। তাঁর ছেলেরা একেবারে কিছু নয়, ভোঁতা। লেখাপড়ায় নয়, খেলায় নয়, দেখতে ছাই। আর মেঘা তাদের কাছে রাজপুত্তুর।'

সুধীর এসে পাশের ঘরে বসেছিল; চা পায় নি, খাবার খায় নি, স্নান করতে যেতে পারে নি। সামনের ঘরের বারন্দার সুমুখে উনি বসে। শুনতে শুনতে তার মনে হল পিসিমা নিটশের অলরাউণ্ড ম্যানের কথা শোনেন নি, তাহলে বুঝতেন ছেলেটির কৃতিত্ব।

পিসিমা ক্লান্ত ভাবে একবার রাস্তার দিকে একবার রান্নাঘরের দিকে চেয়ে হাই তুললেন, তারপর হঠাৎ সোজা হয়ে বসলেন যেমন করে মেরুদণ্ড সোজা করে পূজা

করার সময় বসেন।

ঠুং করে আধঘণ্টা বাজল ঘরের ঘড়িতে। অকস্মাৎ চকিত হয়ে মেঘ দত্ত জননী উঠে দাঁড়ালেন এই সময় হল। 'আমার আবার হার্টের অসুখ কিনা তাই সিঁড়ি ওঠা বারণ। আমি বাবু পারি না, লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াই-টেড়াই, জানতে পারলে যা বকা বকবেন বাপ-ছেলেতে।' পরম পরিতুষ্ট হাস্যে তিনি অগ্রসর হলেন ঘরের দিকে। তারপর বললেন, 'কাল আবার আসব। আমি খুব সব বাড়িতে বেড়াই।'

পিসিমা হতাশ ভাবে বসেছিলেন, উঠে দাঁড়ালেন। কাল আসবার আশ্বাসে ভদ্রতা করে খুশি মুখ দেখাতে পারলেন না। শুধু সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে এলেন। হয়ত ভেবেছিলেন এগারো নম্বরের কেউ বা এসে পড়েন।

ইতিমধ্যে নিজের বাড়িতে উনুন না জ্বললেও রান্নাঘর ভাঁড়ার ঘর ধূম্রলোক হয়ে রয়েছে অন্য বাড়ির উনুনের কৃপায়।

পিসিমা শুধু বললেন, 'ভাগ্যিস কলে জল থাকে নইলে একটি কাজ করা হয় নি, খাবার জল অবধি আমার তোলা নেই। কাপড় কাচা হয় নি। আগুন দেওয়া হয়েছে নাকি?'

মা বললেন, 'না তো, এইবার দেব!'

'তবে এত ধোঁয়া?'

মা বললেন, 'অন্যদের বাড়ির মনে হচ্ছে।'

প্রায় আটটা।

ইতিমধ্যে নীচের ফ্ল্যাটে রেডিওতে সান্ধ্যসঙ্গীত শুরু হয়ে গেছে আর ওপরের তলায় একটা ঘরে গ্রামোফোনে জন্মাষ্টমীর পালা শুরু হল।

মিনুর অঙ্ক অনার্স, সুধীরের ফিজিক্স অনার্স ফোর্থ ইয়ার এবার। মিনুর তবু থার্ড ইয়ার। ছোট-ছোটরা পরম আনন্দে রেডিওর দিকে মন দিলে, দাদা পড়তে বললেন।

তারা বললে, 'ভুল হয়ে যাচ্ছে যে, কি করে পড়ব।'

পিসিমা সন্ধ্যাহ্নিক করতে সন্তুষ্ট মনে কৃষ্ণকথা শুনছিলেন। একবার বললেন, 'বৌ শুনলে? বেশ গানটি দিয়েছে।'

মিনু বিরক্ত গম্ভীর মুখে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল। বই মুখে নিয়ে মনের উপর এই অত্যাচার সহ্য করা যায় না। তার চেয়ে লোকজন গাড়ি বাড়ি দেখা ভাল।

অকস্মাৎ সুধীরও তরতর করে নেমে গেল। কোণের ঘরে মিনুর দাদা আর বৌদিরই কোন অসুবিধা হয় নি বোধ হয়। তারা এদিকে মনোযোগ দেবার হয়ত অবসরও পায় নি। রাত্রি ন'টার পর কোন রকমে মা'র শোবার ঘরে গোল হয়ে বসে সংক্ষিপ্ত জায়গায় খাওয়া পর্বটা সেরে নিলে ছেলেমেয়েরা। রান্নাঘরের মধ্যে ছোট

ছোট ছুখানি পিঁড়ি নিয়ে বসে মা আর পিসিমাও কি খেলেন যেন।

রেডিওর সময় নির্ধারিত আছে—সে থামল; কিন্তু গ্রামোফোন ও কণ্ঠসঙ্গীত? তার তো সময় বাঁধা নেই, যদি কেউ বধির না হন তাহলে শুনতে হবে। পিসিমা মা মিনু সুধীর রেণু ইত্যাদি সবাই শুনতে লাগলেন। কেউ পড়তে পড়তে, কেউ ঘুমবার জন্য শুয়ে থেকে, কেউ ঘুমিয়ে পুনশ্চ ঘুম ভেঙে সহিষ্ণুভাবে শুনতে বাধ্য হলেন। একতলায় চায়ের দোকানের পাশে তখন 'কলাবতী' সঙ্গীত আরম্ভ হয়েছে।

ছু-একদিন গেল। মেঘা দত্তর মা আর আসবার সময় পান নি বোধ হয়। ইতি-মধ্যে শুক্রবারে বিনাব্যয়ে রেডিওতে থিয়েটার পার্টির অভিনয় শোনা হল। সুবিধা ও অসুবিধা ক্রমে গা-সওয়া হয়ে এল। সন্ধ্যাবেলার রান্নাঘরও বেশ গল্পে জমে উঠতে লাগল পুরান বাড়ির মত। গান আর কানে ফোটে না, রেডিও যে খোলা আছে মনেও থাকে না।

পিসিমা তরকারী কুটছেন, মা রান্না চড়িয়েছেন, বৌ ময়দা মাখছে, ছোট ও বড় ছেলেমেয়েরা পড়ছে, সঙ্গীতে শব্দে গোলমালে সকলেরই কান অভ্যস্ত হয়ে গেছে কলকারখানার মজুরদের মত। দরজা খোলা। হঠাৎ তিনটি মহিলা চার-পাঁচটি ছোট ছোট ছেলে নিয়ে এসে দাঁড়ালেন মিনুর পড়বার ঘরের সামনে।

শশব্যস্তে মিনু ডাকল, 'মা কারা সব এসেছেন, বাইরে এস।'

রান্নাঘর থেকে সে ঘর 'বাহির' বলার মত নয়। ছু'পা এলেই মিনুদের শোবার, পড়বার, আর খাবারও ঘর।

মা এলেন, বৌ এল, পিসিমা এলেন। 'আসুন, আসুন' ইত্যাদি অভ্যর্থনার পর পরিচয় পাওয়া গেল, এগারো ও বারো নম্বরের অধিবাসিনীরা পরিচিতা হতে এসেছেন।

অভ্যাগতাদের একজন বললেন, 'আগে যাঁরা ছিলেন তাঁদের সঙ্গে খুব ভাব ছিল আমাদের। সমস্তক্ষণই আমাদের আসা যাওয়া গল্প চলত।'

পিসিমা বললেন, 'ও।' মা হাসলেন।

'তাই ভাবলাম আপনাদের কাছেও আসি, দেখে যাই। নতুন এসেছেন। বেশ করেছেন। সেদিন আর একজন এসেছিলেন।'

পিসিমা বললেন, 'কে?'

'ঐ পাঁচ নম্বরের একজন। নাম তো জানি না। কে মেঘরাজ দত্তর বুড়ি মা।'

নবাগতাদের চোখে চোখে ইঙ্গিতের বিদ্যুৎ খেলে গেল।

পিসিমা জিজ্ঞাসা করলেন, 'চেনেন নাকি?'

'হ্যাঁ চিনি বইকি। বড় বকেন, সময় নষ্ট করেন।'

এবার এঁরা হাসলেন, 'রোজই বেড়াতে আসেন যে!'

পিসিমা চুপ করে রইলেন।

মা বললেন, 'আগে কে ছিলেন এ বাড়িতে?'

'তাঁরা এক ঘর কায়স্থ ছিলেন। বেশ ভাল লোক ছিলেন, আহা, তাঁদের কর্তাটি রোগে পড়লেন তাই চলে গেলেন।'

পিসিমা বললেন, 'কি হয়েছিল?'

এবার সকলেই চুপ করে রইলেন।

একজন একটু পরে বললেন, 'বুকের কি অসুখ।'

আর একজন বললেন, 'থাইসিস, না দিদি?'

প্রথমা বললেন, 'না না, অন্য কি অসুখ।'

তৃতীয়া বললেন, 'অনেক দিন ভুগলেন কিন্তু, না?'

পিসিমা বললেন, 'এখন কোথায় তাঁরা—সেরেছেন কর্তা? কত বয়স? বুড়ো মানুষ?'

'না, বুড়ো কেন, এই পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ হবে।' সেরেছেন কিনা জানি না তো। কোন দেশে গেছেন, না আছেন কলকাতাতে কি শুনেছিলাম যেন।'

তাঁর সঙ্গিনীরা হাসলেন, 'কি শুনেছিলে মনেও নেই তোমার, তা বলছ কেন?'

এবার ছোট ছোট দুটি ছেলে ওদের সঙ্গের কান্না ও আব্দার শুরু করে দিলে। ওরা উঠলেন ও বললেন, 'সে বৌটি এত ভাল ছিল। কত যে কাজ করে দিত আমাদের। এই সেলাই-টেলাই। আপনাদের বৌমা সেলাই জানেন?'

পিসিমা সগর্বে বললেন, 'হ্যাঁ কত রকমের জানে।'

'তা আজ আমরা আসি, আবার আসব।'

মিনু বললে, 'পিসিমা, তুমি যেন কি। দেখ না, সেলাই জানে সে কি বলতে হয়?'

'তাতে কি দোষ, ভালই তো।'

'তোমাদের ঘাড়ে সেলাই চাপিয়ে যাবে, দেখো'খন।'

পিসিমা হাসতে লাগলেন।

মা বললেন, 'ঠাকুরঝি, অসুখের কথা শুনেছ আগের ভাড়াটেদের, একবার বাড়ি-ওয়ালাদের জিজ্ঞাসা করলে হয়?'

সুধীর এসেছিল, সে বললে, 'বাজে কথা, ওসবে কান দিও না।'

মা বললেন, 'তবু জেনে নেওয়া ভাল।'

পরদিন দুপুর বেলা।

মা ওয়াড় সেলাই করছেন। বৌ সেমিজ, টেবিলক্লথ কি সেলাই করছে। পিসিমা দ্বিপ্রাহরিক তন্দ্রা উপভোগ করছেন।

কড়া নড়ল।

'কে?' যাহোক মা উঠে দরজা খুললেন।

'ক'দিন আসতে পারি নি,'—সহাস্যে পাঁচ নম্বর ঘরের মেঘদত্ত-জননী প্রবেশ করলে।

'আসুন', শুষ্ক মুখে হাসি এনে মা বললেন।

'আপনাদের এই বারান্দাটি বেশ। বেশ আলো বাতাস, রোদ্দুর পায় ঘরগুলো। আগের ভাড়াটেদের কাছেও আমি আসতাম রোজই প্রায়।'

পিসিমার ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল, উঠে এসে বসলেন।

'তারা কদিন গেছে?'

'এই মাস দেড়েক হবে।'

'কেন গেল তারা?'

'তাদের বাড়ির কর্তারই হঠাৎ অসুখ করল, আমার মত হার্টের দোষই হল। তা ওরা এখন একতলা খোলা জায়গায় কোথায় বাড়ি নিয়েছে। সিঁড়ি ওঠার পরিশ্রম সহ্য হয় না তো, এই আমারই দেখুন না।—'

পিছন দিকে এসে দাঁড়ালেন, কয়েকটি জামা ও টুকরা কাপড় নিয়ে—গত কালকার প্রতিবেশীনী। বললেন, 'ও তাদের কর্তার তো আপনার চেয়ে ঢের বেশী অসুখ। শুইয়ে রেখেছিল ডাক্তাররা।'

বিরক্ত ভাবে পাঁচ নম্বর বললেন, 'হার্টের অসুখের কথা আর কে ঠিক করে বলতে পেরেছে। আমারও তো একেবারে চলাফেরা বারণ।'

এগারো নম্বর এসে বসলেন মা'র মাদুরের পাশে।

'বেশ সেলাই করেন তো আপনি। আমিও একা বসে থাকতে পারি না, এই এখানে এলুম হাতাহাতি করে আপনার কাছে বসে হয়ে যাবে'খন।'

আমার আবার কল নেই কিনা।

পাঁচ নম্বর বললেন, 'তোমার কলটা কি হল?'

'সে তো আমার নয়, বারো নম্বরের, ও দেয় না, ওর অনেক সেলাই আছে নাকি। তা ভাই মানুষের কি রোজই সেলাই থাকে? মাঝে মাঝেও বাদ যায় না!'

মা ও পিসিমা নির্বাক হয়ে রইলেন।

পাঁচ নম্বর বললেন, 'তা ওর ঘরে নিয়ে করলেই তো পার।'

'ওর ঘর-করণাতে যা অগোছ কে যাবে?'

'বাপ। সে তোমায়ও বলি, কি দুরন্ত ছেলেমেয়ে তোমার! আর কি অপবিষ্কার তোমার ঝি!'

বারো নম্বর এবারে রেগে গেলেন, 'ছোট ছেলেমেয়েরা আর কার দুরন্ত না হয়?'

বলুন তো দিদি? (পিসীমার দিকে চেয়ে) আর আপনার চাকরটিই কি কম অপরিষ্কার!'

পাঁচ নম্বর বললেন, 'সে বাপু জানি নে, তর্ক ঝগড়া করতে পারব না। তবে তোমার ছেলেমেয়েদের দুরন্তপনা ফ্ল্যাটের সবাই জানে।'—বলে তিনি উঠলেন, বললেন, 'আজ আসি, আবার আসব'খন।'

এগারো নম্বর বিরক্ত রাগে বললেন, 'দেখলেন কি মানুষ, গায়ে পড়ে কথা শুনিয়ে গেল। আগেও এই করতেন।'

হতবুদ্ধি মা ও পিসীমা চুপ করে রইলেন।

সুধীর এসে সব গল্প শুনে বলল, 'দরজা বন্ধ করে ঘুমতে পার না? খোল কেন? কেন যে তোমাদের পাড়া বেড়াতে ইচ্ছে করে?'

এবারে মা ও পিসীমা রেগে বললেন, 'হ্যাঁ, ইচ্ছে করে!'

মা জিজ্ঞাসা করলেন, 'জিজ্ঞাসা করেছিলি কি অসুখ ভদ্রলোকের হয়েছিল?'

'হ্যাঁ, তাঁর ব্লাড প্রেসার আছে। ওরা দিনকে রাত, তিলকে তাল বানাতে পারে।' ছেলেমেয়েরা সবাই অবাক হয়ে দুপুরবেলার কাহিনী শুনছিল। এবারে হাসলে।

মা পিসিমাও হাসলেন।

এবারে দরজা সব সময়ে বন্ধ। বেড়ালের ভয়ে সন্ত্রস্ত ইঁদুরের মত ওঁরা সারা দুপুর নিঃশব্দে কাজ করেন। জোরে সেলাইয়ের কলটাও চালান না। কেউ ডাকলে ঘুমের ভান করে পড়ে থাকেন।

কড়া নড়লে ভয়ে ভয়ে সাড়া দেন।

ক'দিন গেছে। একটা দুটো বেলা হবে। কড়া নাড়ল।

'কে?' পিসিমা জিজ্ঞাসা করলেন।

জবাব নেই।

দেরি করে দরজা খুললেন, কেউ নেই।

পিসীমা ঘুমলেন।

বিকালে সুধীর এল। 'মা, আমার এক বন্ধু তার চাকর দিয়ে আমাকে কতকগুলো দরকারী বই পাঠিয়ে দিয়েছিল, সব ফেরত দিয়ে দিয়েছ! তোমরা যে কি কর!'

'কখন এসেছিল? ফেরত দেব কেন?' যুগপৎ মা ও পিসিমা বিস্মিত হলেন।

'এসেছিল, তোমরা দরজা খোল নি, অনেক ধাক্কা দিয়েছিল।'

এবারে পিসিমা বললেন, 'হ্যাঁ ঠুকঠুক্ করে কড়ার শব্দ হল, আমি ভাবলাম পাঁচ নম্বরী এসেছে। তবু তারপর গেলাম, দরজা খুলে কারুকেই দেখতে পেলাম না তো। ভাবলাম সে-ই ফিরে গেছে।'

সুধীর রাগ করে বললে, 'আগে খুলে একবার দেখলে না কেন ?'

পিসিমাও রাগ করে বলেন, 'খুলে দিলেই সব এসে বসবে ! আগে দেখব কে এসেছে সেই জানলাই কি ছাই একটা আছে !'

মা বললেন, 'ক'দিন মাসের গেলে চল অন্য জায়গায় ।'

সুধীর বললে, 'সে এখন দেরি আছে। ছয় মাসের চুক্তি লেখাপড়া করা হয়েছে।'

হতাশ ভাবে সকলে পরস্পরের দিকে চেয়ে সবাই হেসে ফেললেন।

যুগান্তর—শারদীয়া, ১৩৪৬

সুমেরু রায়

সবে ভোর হয়েছে। শাশুড়ী মাটির ঘরের দাওয়ায় বসেছিল। বধূ উঠে গোয়ালের দিকে গেল গোয়াল পরিষ্কার করবার জন্য। আগলের কাছে দাঁড়িয়ে একটু আশ্চর্য হয়ে বললে, 'মা, তুমি কাল রাত্রে গোয়ালঘরের দরজা বন্ধ করতে ভুলে গিয়েছিলে ?'

শাশুড়ী উত্তর দেবার আগেই সে ঘরে ঢুকে চেঁচিয়ে উঠল, 'আরে ঘরের মধ্যে কে শুয়ে আছে !'

এবার শাশুড়ী বিরক্ত হয়ে উঠল। বললে, 'কি সকালে উঠে 'শোর' (গোলমাল) করছিস্। একবার বললি আগল বন্ধ করি নি, আবার বলছিস্ ঘরে কে, ক্ষেপে গেছিস্ ?

ততক্ষণে বধূর স্বামী আর দেবর উঠে এসেছে রকের উপর। বধূ বেরিয়ে এসেছিল ভীতভাবে, এখন স্বামীকে দেখে ওড়নার অবগুণ্ঠন দীর্ঘ করে উচ্চস্বরেই বললে, 'দেখ না কেন ঘরে এসে ?'

এবারে দেবর, স্বামী, শাশুড়ী সব একে একে ঘরে ঢুকল—পিছনে পিছনে দুই বৌও ঢুকল।

সকলের সঙ্গে ঘরে আসায় এখন নির্ভয় কৌতূহলী বধূ এগিয়ে গিয়ে কোণ থেকে একটু উঁকি মেরে দেখে নিয়ে আশ্চর্য হয়ে বলে উঠল, 'আরে, এ যে উম্‌দাবাঈ !' উম্‌দা মানুষ হিসেবে মানে চমৎকারিণী, জিনিস হিসাবে ভাল।

গোয়ালের অন্য দিকে প্রকাণ্ড আটা-পেষা এক যাঁতায় ঘেরা জায়গার একদিকে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে শুয়ে আছে একটি তরুণী। মাথায় নীল ওড়নার অবগুণ্ঠন তাকে ঘিরে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে আছে। লাল সুতা ও জরি জড়ান দীর্ঘ বেণী যাঁতার তলায় রয়েছে। গায়ে লাল রংয়ের আঙ্‌রাখা (অঙ্গরক্ষা অর্থাৎ জামা), আধময়লা

পীত ঘাঘরা পা'দুখানি ঘিরে পড়েছে। গলায় রূপার হাঁসুলি, মাথায় রূপার সিঁথি, কানে সারি গাঁথা ছোট ছোট সোনার মাকড়ি, পায়ে রূপার মোটা মল, বেড়ার ফাঁকে আসা রৌদ্রে ঝকমক করছে। সেকালের কবি হলে তার রূপবর্ণনা করতে পারতেন হয়ত—'বান্ধুলী পুষ্পের' মত অধর, 'তিলফুল জিনি নাসা' 'দশন মুক্তার পাঁতি' 'হরিণ নয়ন' ইত্যাদি বলে। কিন্তু দেখবার রূপের সম্বন্ধ চোখের সঙ্গে, লেখবার রূপ দেখার বাইরে। সত্যিকারের রূপ লেখায় বোঝান যায় না বোধ হয়।

যাই হোক, বধূর কথায় কিম্বা সমবেত দলের উপস্থিতির জন্য তার ঘুমটা কেমন হঠাৎ ভেঙ্গে গেল। সে উঠে পড়ল। তারপর অবাক হয়ে চেয়ে রইল। যেন তার মনে হচ্ছে না ঠিক—এটা জাগা না স্বপ্ন, অথবা কি! কি আর কোন জায়গা এটা!

এইবার তার বড়ভাই জিজ্ঞাসা করলে কঠোরভাবে, 'তুই কোত্থেকে এলি? কেন এলি?'

ততক্ষণে সে ভাল করে জেগেছে, সব মনেও পড়েছে। সে কিছু উত্তর দেবার আগেই তার মা জিজ্ঞাসা করলে, 'কার সঙ্গে এলি? কেন এলি?'

এতক্ষণে সে সোজা হয়ে বসে মাথায় ওড়না তুলে দিয়েছিল। এবারে দুষ্ট ঘোড়ার মত কারুর পানে না চেয়ে অন্য একদিকে তাকিয়ে মা'র কথার জবাব দিলে, 'একলা এসেছি।'

মা ভাইরা একসঙ্গে বলে উঠল, 'এই রাত্রে একলা এসেছিস?'

সে নির্বিকারভাবে গরুগুলোর দিকে চেয়ে রইল। অসহ্য রাগে বড়ভাই কটু একটা গালি দিয়ে বলে উঠল, 'তুই কি পাগল হয়ে গেছিস? লোকে আমাদের কি বলবে তা জানিস না? তোকে আজ আমি মেরে খুন করে ফেলব।'

সে চুপ করে একগুঁয়ের মত সেই দিকেই তাকিয়ে রইল। এবার ছোটভাই বললে, 'আচ্ছা, ওকে এই গোয়ালেই দরজা বন্ধ করে রেখে দাও, খেতে দিও না। যতদিন না ওর শ্বশুরবাড়ির লোকেরা এসে আবার নিয়ে যায়।'

এইবার সে মুখ তুললে, তারপর স্থিরভাবে বললে, 'আমি না খেয়ে মরে গেলেও সেখানে যাব না। সেখানে তারা মারে, গালাগাল দেয়। রাতদিন কাজ করায়, খেতে দেয় না ভাল করে! কক্ষনও যাব না। দাদা মেরেই ফেলুক।'

ওড়নার পাশ থেকে তার বাহুর ওপর মুচ্ড়ে যাওয়া কালশিরে কালো কালো দাগ দেখা যাচ্ছিল। চোখে তার জল ছিল না, মিনতি বা বিনীত করুণা যাজ্ঞার ভাবও মুখে নেই। গৌরসুন্দর কিশোর তনু, আরও উজ্জ্বল চোখ, সুন্দর নিখুঁত মুখ ভোরের বেলায় অনুজ্জ্বল স্নিগ্ধ আলোয় যেন গৌরীর মূর্তির মত দেখাচ্ছিল। সহসা বাইরে কে ডাকল, ভাইরা বেরিয়ে গেল। জননীও এগিয়ে গেল দরজার দিকেই।

বধূ ননদের কঠিন স্থির মুখের দিকে চেয়ে ভীতভাবে কিছু না বলে গরুর দিক পরিষ্কার করতে লাগল। উম্‌দা এবারে ক্লান্তভাবে শুয়ে পড়ল। দু'রাত্রি সে হেঁটেছে। খেতে পায় নি। দিনে হাঁটতে সাহস করে নি, পাছে কেউ দেখতে পেয়ে ফিরিয়ে নিয়ে যায়। গোয়ালের দুটি গরু দুটি বাছুর চুপ করে চেয়েছিল শান্তভাবে উম্‌দার দিকে। যেন তারাও বুঝতে পারছিল—কি একটা হয়েছে, আর উম্‌দাকে চিনতে পেরেছিল।

২

ভাইরা বাইরে এল।

হাতে মোটা একটা লাঠি, মাথায় সাদা আধময়লা পাগড়ি, গায়ে রেজীর (খদ্দর) মেরজাই, মোটা ধুতি, পায়ে রূপার কড়া (মল) পরা এক দীর্ঘকায় মস্ত গোঁফওয়ালা জাঠ চাষা দাঁড়িয়েছিল।

ভাইরা তটস্থ হয়ে বললে, 'এস এস যমুনালালজী, খবর সব ভালো? এত সকালে?'

যমুনা সিং বললে, 'হ্যাঁ সব ভালো। কিন্তু বৌকে কাল থেকে দেখতে পাচ্ছি না, এখানে এসেছে?'

বড়ভাই বললে, 'হ্যাঁ, এসেছে তো।'

আশ্চর্য হয়ে যমুনা সিং বললে, 'এসেছে! একলা চলে এসেছে পরশু রাত্রে। তা থাক ও এখানেই। আর ওকে নিয়ে যাব না। আমরা ভাইয়ের আবার বিয়ে দেব।'

যমুনা সিং উঠে দাঁড়াল।

এবার ছোট ভাই বললে, 'না না, বসুন। আপনি রাগ করবেন না। ও বড়ই ছেলেমানুষ। আমার পিতামহ ওকে আদর দিয়ে 'উম্‌দা পরী' (সুন্দরী পরী) বলে ওর মাথা খারাপ করে দিয়েছেন। আমরা ওকে বুঝিয়ে আবার পাঠিয়ে দেব।'

মা'ও এসে দাঁড়িয়েছিল, সে বললে, 'বেটা, আমিও ওকে নিয়ে বড়ই মুস্কিলে পড়েছি। মেয়েমানুষ, ওর সাহসও তো কম নয়! এই রাত্রে একলা পথ চলেছে! ওকে তোমাদেরই হাতে দিচ্ছি, তোমরাই মেরে বকে শাসন কর।'

যমুনা সিং বললে, 'ওকে শাসন করে আমরা কিছুই করতে পারি না। ও ভারী জেদী। তাছাড়া ও কারুকে মানে না। সুন্দর বলে ভাইয়ের বিয়ে দিলাম। ঐ সুন্দর বলেই মুস্কিল হয়েছে। যত গাঁয়ের মেয়ে আর ছেলেদের সঙ্গে ও কথা কয় লুকিয়ে লুকিয়ে। আমাদের চাষার ঘরে ও মেয়ে চলবে না। সবাই নিন্দে করে, হাসে।'

ব্যাকুল হয়ে জননী বললে, 'তা হোক, ওকে তোমরা শাসন কর।'

ছোট ভাই তামাক সাজতে বসলে কুটুম্বের জন্য। তারপর উম্‌দার বড় ভাই আর ভাসুর নীরবে বসে তামাক খেতে লাগল। মা ভেতরে গেল কুটুম্বের অভ্যর্থনার যোগাড়ের জন্য।

অনেকক্ষণ পরে উম্‌দার ভাসুর বললে, 'এক কাজ করা যায় ওকে শাসন করবার জন্য। আমাকে আমাদের গাঁয়ের একজন বলছিল।'

বড ভাই বললে, 'কি কাজ ?'

যমুনা সিং বললে, 'সে বললে, আগে আগে অনেক সময় দুরন্ত বৌ-মেয়েকে লোকে রাজবাড়িতে পাঠিয়ে ঝি করে রেখে দিত। একেবারে বন্দী হয়ে থাকত। তাতে বাইরে বেরুন, কারুর সঙ্গে কথা কওয়া, বাজে গল্প—সব বন্ধ হয়ে যেত। তারপর সিধে হয়ে গেলে দু-তিন বছর পরে নিয়ে আস্‌ত।'

মা ফিরে এসেছিল। ভাইরা, মা, চুপ করে রইল। ছোট ভাই বললে, 'তারা কি সকলের মেয়ে নেয় ?'

যমুনা সিং বললে, 'তা নেয় না। জানাশোনা লোক দিয়ে ঠিক করতে হয়।'

মা বললে, 'কতদিন রাখতে হবে ?'

'তা জিজ্ঞাসা করে বলা কওয়া করে নেওয়া যাবে।'

বড় ভাই তেজ সিং বললে, 'তা গঙ্গা কি বলে ?'

গঙ্গা সিং উম্‌দার বর।

যমুনা সিং আশ্চর্য হয়ে বললে, 'বাবা রয়েছেন, মা রয়েছেন, তাদের মত আছে, আমি বড় ভাই মত দিচ্ছি। ওর আবার মত কি ?'

অতিশয় অপ্রস্তুত হয়ে তেজ সিং আর মা বলে উঠল, 'নিশ্চয়। তা তো বটেই।'

গোয়াল, গরু, গোবর ও যাঁতার ধুলোর পাশে নিদ্রিত ক্লান্ত উম্‌দা বাঈয়ের ভাগ্যলিপিকায়, তার জীবনের বিধাতাদের সর্বসম্মতি ক্রমে নতুন এক রেখাপাত হয়ে গেল।

৩

উম্‌দার ঘুম ভাঙল অনেক বেলায়। সে আশ্চর্য হয়ে দেখলে, গোয়ালের দরজা খোলা, কেউ বন্ধ করে রাখে নি। সে বেরিয়ে এল বাইরে। মা রান্নাঘরে রুটি করছে। মা'ও কিছু বললে না। সে একটু ভয়ে ভয়ে মা'র কাছে খাবার চাইল। মা দিল। খাওয়ার সময় মা বললে, 'তোর ভাসুর এসেছে।'

চকিত হয়ে নিমেষে সে উঠে দাঁড়াল, বললে, 'আমি সেখানে যাব না। আমি পালিয়ে যাব।'

মা একটু চুপ করে রইল, তারপর বললে, 'আচ্ছা যাস নি।'

বিচলিত চঞ্চল উম্‌দা বিকালের দিকে ভাজের কাছে শুনল, তাকে নিয়ে ওরা সব শহরে যাবে, রাজার বাড়িতে সে থাকবে এখন থেকে, সেখানে কাজ করবে। ভাসুর আর ভাইরা এই বলেছে। উম্‌দা অবাক হয়ে গেল।

রাজার বাড়ি? রাজপ্রাসাদ! রানীরা? মহারাজা? সেখানে চাকরি করবে বা কি কাজ করবে, সেকথা উম্‌দার মনে এল না। অবাক হয়ে সে শুধু ভাবতে লাগল, রাজার বাড়ির কথা, রানীদের কথা, তাদের ঐশ্বর্যের কথা। যে ঐশ্বর্য সে দেখে নি সেকথা তার কল্পনায় এল না। সে স্বপ্ন, তার জানা ঐশ্বর্যের স্বপ্নের চাক্কি, চুলা (যাঁতা, উনান), পাকা বাড়ি, গহনা, কাপড অতিক্রম করে যেতে পারে না। তবু সে ভাবতে থাকে, মুগ্ধ ভাবে ঘুরে ফিরে গহনা-কাপড় পরা অজ্ঞানা রানীদের কথা, তার জানা দেখা বড বাড়ির কথা।

তাবপর একদিন যাত্রার দিন এসে পড়ল। উম্‌দাব রুক্ষ চুলে ঘি মাখিযে আঁচড়ে, মোম মাখিয়ে পেটি পেড়ে উঁচু খোঁপা রুক্ষ তালুর পিছনে বেঁধে, যথাসম্ভব গহনা পরিয়ে, পরিষ্কার ঘাগরা লুগড়ি কাঁচুলি ও জামা পরিয়ে মাথায় দীর্ঘ অবগুণ্ঠন টেনে দিয়ে—তাকে রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হওয়ার তাদের মতে উপযুক্ত সাজে সাজিয়ে তার ভাই, ভাসুর আর মা তাকে নিয়ে শহরের দিকে রওনা হল। আজ রাজপ্রাসাদের স্বপ্নমুগ্ধ কিশোরী উম্‌দা এই যাত্রায় কোন বাধাও দিল না, প্রতিবাদও করল না।

নানা তদ্বিব, নানা মানুষ, বহু দেখাসাক্ষাৎ করার পর একদিন সন্ধ্যায় তারা অন্তঃপুরে প্রবেশের অনুমতি পেল।

গ্রাম্য জাঠ চাষা উম্‌দার ভাই আর ভাসুর ধূলিমলিন জামা-কাপড়-পাগড়ি ধুযে পরিধান করে, মোটা লাঠিটি হাতে নিয়ে সপ্ত-তোরণ প্রাসাদের প্রথম তোরণে 'বিনীত ভাবে ওদের পাঠিয়ে দিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল এবং মা আর মেয়ে অবগুণ্ঠনে মুখ ঢেকে একজন খোজার সঙ্গে কোন এক রানীর প্রধানা সখীর দরবারে গিয়ে পৌছল। উম্‌দার ধূলি-ধূসর মেহেদী-পরা দুখানি গাঢ় রক্তবর্ণ চরণকমল উঁচু ধরনের গ্রাম্য ঘাগরার তলা থেকে দেখা যাচ্ছিল। মেহেদী-আঁকা দুখানি করপল্লব জোড় করে উম্‌দা মা'র পাশে দাঁড়িয়েছিল।

প্রধান সখী একটু রূঢ়ভাবে বললে, 'অত ঘোমটা দিয়েছিস কেন? চল্ রানীজীর কাছে নিয়ে যাই, যদি রাখেন। যদি তোর কপালে থাকে।'

তারা রানী ভোমরজীর (তোমর বংশের কন্যা) মহলের দুয়ারের একপাশে

এসে দাঁড়াল।

উম্‌দা-জননী-বর্ণিত উম্‌দার অবাধ্যতা ও চঞ্চলতার সমস্ত কাহিনী রানীর কাছে বর্ণনা করে বড়ারণজী (বড় সখী) তাকে ডেকে নিয়ে বললে, 'এই, মুখ তোল্! এমনি করে কুর্নিশ কর্।'

কুর্নিশ করা দেখবার জন্য মাথার গুণ্ঠন সরিয়ে কুর্নিশ করে উম্‌দা বিনীত ভাবে পিছিয়ে গিয়ে দাঁড়াল। ঝাড়ের মোমবাতির স্নিগ্ধ আলোতে অলিন্দের পাখী, ফুল আঁকা রঞ্জিত দেওয়ালের এবং কক্ষতলে বিছান সুন্দর গালিচার রংয়ের পরিপ্রেক্ষিতে রানী তার দিকে চেয়ে সেই গ্রাম্য কৃষক বালিকার রূপে অবাক হয়ে গেলেন। সখীরা এবং খোজাও আগে দেখে নি, তারাও আশ্চর্য হয়ে চেয়ে রইল তার দিকে।

আর উম্‌দাও তার কল্পলোকের অজানা এই বিরাট প্রাসাদ এবং প্রাসাদবাসিনীদের অপূর্ব বেশভূষা দেখে অবাক হয়ে চেয়ে রইল। তাকে দেখে যে তারাও অবাক হয়ে গেছে, সে কথা সে বুঝতেও পারল না।

৫

কয়েকটা বছর কেটে গেছে।

সহসা একদিন গঙ্গা সিং এসে দাঁড়াল তেজ সিংয়ের বাড়ি। শাশুড়ী আর তেজ সিংকে নিয়ে সে শহর থেকে উম্‌দাকে আনতে চায়। এতদিনে নিশ্চয় সে শান্ত হয়েছে। বড় হয়েছে। স্বামীর ঘর করবার মত তার বুদ্ধিও হয়েছে।

তেজ সিং চুপ করে রইল। তার কানে বোনের 'পদোন্নতি'র খবর, তার ওপর রাজনেত্রের 'নেক নজরে' পড়ার আভাসও একটু যেন পৌঁছেছিল। সেদিন সরল জাঠ কৃষক তাতে গর্বিত হয়েছিল কিনা কে জানে, আজ গঙ্গা সিংয়ের কথায় হঠাৎ সে যেন লজ্জিত আর দুঃখিত হল। তারা তো কিছুদিন পরে বোনকে স্বামীর ঘরে ফিরিয়ে আনবে ঠিক করেই ওখানে গিয়েছিল। কিন্তু আনা তো হয় নি।

তেজসিং বললে, 'তুমি এতদিন আস নি কেন?'

গঙ্গা সিং বললে, 'মা মরে গেল, বাপ মরে গেল, ভাইয়ের অসুখ হল, অজন্মা হল—আমি ভাবলাম সে যদি আবার এসে চলে যায়। তারপর আমি পলটনে চাকরি নিলাম, ছুটি পাই নি। এখন ভাল কাজ করি, তাই এলাম।'

প্রকাণ্ড তলোয়ারখানি কোলে নিয়ে পিঙ্গলবর্ণ দীর্ঘদেহ, মস্ত-গোঁফওয়ালা, মস্ত-পাগড়ি-পরা জোয়ান গঙ্গা সিং স্ত্রীর কথা বলতে বলতে গ্রামের লোকের মত সরল লজ্জিতভাবে একটু হাসলে।

বৃদ্ধা শাশুড়ী গর্বিত স্নেহভরে তার দিকে চেয়েছিল, বললে, 'চল যাই, নিয়ে আসি

তাকে।' এমন সিপাহী জামাতা, অমন সুন্দরী মেয়ে!...ভাবে।

দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ, গুম্ফ সুশোভিত রৌদ্রম্লান মুখ, দুটি জাঠ পুরুষ আর তাদের বৃদ্ধা জননী শহর অভিমুখে আবার যাত্রা করল।

সেবারের মতই তারা প্রাসাদের প্রথম তোরণে অপেক্ষা করতে লাগল, জননীকে অন্দরমহলের দেউড়ীর দিকে পাঠিয়ে।

প্রহরীমণ্ডলীর কাছে বৃদ্ধা দাঁড়াল। তারা জিজ্ঞাসা করে, 'কাকে চায়, কি আবেদন।'

উম্‌দাকে দেখতে চায়, নিয়ে যেতে চায়? কে উম্‌দা? কোনো উম্‌দাকে তারা চেনে না। কোন্ রানীর দাসী?

'তোমরজীর? আচ্ছা খবর দিচ্ছি।'

'বড়ারণজী আর প্রধান খোজার কাছে যা কেউ, এত্তেলা দে।' বহু দর্শনার্থীর দলে বৃদ্ধাও অপেক্ষা করতে লাগল। দেখা হল। ভ্রূকুঞ্চিত করে প্রধানা সখী বড়ারণজী চেয়ে রইল, 'কাকে চাও? কে তুমি?'

প্রধান খোজাও এসে দাঁড়াল। 'উম্‌দা! উম্‌দার মা তুমি? তাকে নিযে যেতে এসেছ? কোন্ উম্‌দা?'

বিনীতা বৃদ্ধা কন্যার পরিচয় জানায়। সহসা কি মনে পড়ে ঈষৎ হাসির একটা রেখা খোজার মুখে ফুটে উঠল।

বড়ারণজীর মুখে হাসি এবার স্পষ্ট ও উচ্চ হযে উঠল।

খোজা বললে, 'ওহো! তোমরা জান না বুঝি? উম্‌দা বাঈ তাঁর নাম নেই আর। তাঁর নাম খেতাব শোন নি? হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমার মেয়ে তিনি জানি। কিন্তু তিনি এখন পর্দায়েত্। তাঁর মস্ত নাম, খেতাব সুমেরু রায়। মহারাজার কাছে পেয়েছেন। কি বললে? দেখা করবে? কি বল্‌ছিস্ তুই? তোর মেয়ে সে, তাকে দেখতে চাস্? কি বলছিস্ তার বর নিতে এসেছে? তুই পাগল হয়ে গেছিস? ওকথা আর মুখেও আনিস নি শহরে দাঁড়িয়ে। তোর মেয়ে তিনি তা জানি। এখন আর তোর মেয়ে নেই, তিনি রানী। বুঝেছিস, রানী! পথেঘাটে তাঁকে 'মেয়ে' 'মেয়ে' করলে তোর 'ফাটক' হয়ে যাবে। বুঝলি? একেবারে গেঁয়ো। যা গাঁয়ে ফিরে যা।'

খোজা আর সখীরা উপহাসের হাসিতে উচ্ছল হয়ে উঠল।

৬

সুমেরু রায়ের কানে এ কাহিনী পৌঁছায় কিনা কে জানে। ঐশ্বর্য বিলাসময় নিরবকাশ দিনের মাঝে কে কার দুঃখময় পূর্ব জীবনের কথা বা দুঃখদাতা স্বজনের কথা মনে রাখে। কার এমন সাহস যে কোন গণ্ডগ্রামের গোঁয়ার চাষাকে আজ বলে, রাজ-প্রেয়সী সুমেরু

রায়ের স্বামী! আর এক স্থবির গ্রাম্য বৃদ্ধাকে বলে তাঁর মা!

হয়ত শুনেছিলেন, নয়ত শোনেন নি। যাক্। কিন্তু তাঁর যৌবন আর রূপ তো সীমাহীন নয়, আর প্রকৃতির মত নিত্য নূতনও হয় না এবং বিপুল পৃথিবীতে সুন্দরী নারীরও অভাব নেই।

অকস্মাৎ শহরেব লোকেরা, ক্রমে গ্রামবাসিনী তার জননী তার ভাইয়েরাও শোনে, সুমেরু রায় বা উম্‌দা বাঈয়ের ওপর গঙ্গাদেবীর আবির্ভাব হয়।

সহসা একদা এক বৈশাখী পূর্ণিমার রাত্রে 'মছলী' ভবনের (স্নানাগারের) শ্বেত মর্মর কুট্টিমে শুভ্র সূক্ষ্ম বসনে প্রস্রবণের ধারাস্নাত তনু এখানো তন্বী রূপসী উম্‌দা বাঈ ওরফে সুমেরু রায় রবি বর্মার গঙ্গাবতরণের ছবির মত গঙ্গাদেবী রূপে রাজগোচরে আবির্ভূত হয়েছেন।

মদিরামুগ্ধ রাজা মূঢ়ভাবে প্রেয়সী নারীর এই অপরূপ নবশোভাময় রূপের দিকে চেয়ে থেকে শুনলেন, গঙ্গাদেবীর আদেশে আজ এখন আর তিনি সুমেরু রায় নন—তাঁর ইষ্টদেবী গঙ্গাদেবীর অবতার।

তারপর কখনও জ্যোৎস্না রাত্রে, কখনও নক্ষত্র-খচিত চমৎকার তিমির রাত্রে দেবীর আবির্ভাব হয় তাঁর উপর।

রাজ্য সংক্রান্ত নানা সমস্যা, নানা কথা, ভবিষ্যৎ বর্তমান অতীতের মীমাংসা হয় সেদিন।

আর সঙ্গে সঙ্গে উম্‌দা বাঈয়ের বা পর্দায়েত সুমেরু বাঈয়েরও রাজার ওপর প্রভাব হ্রাস হয়ে যাবার আতঙ্ক থাকে না। ধর্মের মোহময় ভয় রাজার নানা নারীর মোহ বিলাসকে দেবীর কাছে অপরাধ ভয়াবিষ্ট করে রাখলে।

আর গঙ্গাদেবী আবিষ্ট সুমেরু রায় প্রত্যাদেশ পান এবং রাজাকে আদেশ দেন—কখনও প্রতিদ্বন্দ্বিনী নারীকে 'কোতল' করতে, কখনও অন্য রানীদের অসম্মান করতে, কখনও রাজ্যে কর্মচারী নিয়োগের ব্যবস্থা ওলটপালট করতে। লোকে সভয়ে অনুভব করে, বলাবলি করে, জাহাঙ্গীরের নূরজাহানের মত সুমেরু রায়ই রাজা এখন।

তবু অবতারত্বের ইন্দ্রজালের মহিমা একদিন সহসা মিলিয়ে গেল রাজার মৃত্যুতে।

আর প্রত্যাদেশ পেলেও আদেশ শোনবার জন্য মুগ্ধ হয়ে কেউ বসে নেই এবং আর প্রত্যাদিষ্টও হন না সুমেরু রায়।

মানুষের বিশ্বাস এত টলমলে, কয়েক দিনেই শহরের গ্রামের সকলে বুঝতে পারল, সুমেরু বাঈয়ের ওপর যে 'ভর' হত গঙ্গাদেবীর—সব ছলনা, কিছুই নয়! যারা উৎপীড়িত হয়েছিল, যারা বঞ্চিত হয়েছিল, যারা লাঞ্ছিত হয়েছিল, তাদের সঙ্গে সমস্ত রাজ্যের সকলেই অবিশ্বাসেও যেন এক হয়ে গেল।

রাজার মৃত্যুতে রানীদের রাজ্ঞীত্ব আর থাকে না বটে, পদেরও পরিবর্তন হয়, মর্যাদারও প্রকার ভেদ হয়, কিন্তু তাঁদের মাজীসাহেব বা রাজমাতারূপে সম্মান প্রতাপ কিছু কম হয় না।

কিন্তু রাজ-অন্তঃপুরের প্রমোদ-প্রাসাদবাসিনী অসংখ্য বিলাস-ক্রীড়নক নারীদের সঙ্গে সুমেরু বাঈও এক নিমেষেই মূঢ় মর্যাদাহীন সাধারণ বার-নারীর পর্যায়ে মিশে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সেই মুহূর্তেই ইঙ্গিতে অঙ্গুলি হেলনে রাজ্যের নানা রকম বিপর্যয়, যথেচ্ছাচার ঘটাবার অধিকাবও তার মিলিয়ে গেল।

প্রাসাদের বিরাট নারীশালায়, মহলে মহলে অন্য মেয়েদের মত তারও জীবনযাত্রা চিরকালের মত বন্দী হয়ে গেল।

তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালিনী, তখনও রূপবতী, সুমেরু বাঈয়ের আশেপাশে আর স্তুতিবাদ-কারিণীদের ভিড় জমে না।

৭

এমন সময়ে একদিন এক সখীর মুখে শুনলেন বৃদ্ধা জননীর কথা, তার এখানে আসার কথা, আর ফিরে যাওযার কথা। বিস্মৃত শৈশবের কথা মনে পড়ে গেল। সুমেরু বাঈ ঈষৎ বিমনাভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তাকে তোরা অন্দরে আনলি নি কেন? আমাকে এত্তেলাও (খবর) দিস্ নি তো?'

এখন নির্ভয়ে সখী প্রগল্‌ভ ভাবে হেসে বললে, 'তার যা ময়লা গেঁয়ো কাপড়-চোপড় আর কথাবার্তা শুনে সে যে আপনার মা তাই বিশ্বাস হয় নি।' তারপর একটু মুখ টিপে হেসে বললে, 'সে আবার বলছিল সঙ্গে আছে তার জামাই আর তার ছেলে, আপনাকে তারা দেখতে চায়। দেখা করতেও এসেছে, নিতেও এসেছে।'

সুমেরু রায় ভ্রূকুঞ্চিত করে তার দিকে চেয়েছিলেন, এখন আর ওরা তাঁকে আগের মত সম্ভ্রম করে কথা বলে না। সে যেন সমানে সমানে হাসছে, গল্প করছে।

তাঁর ভ্রূকুটিতে ভ্রূক্ষেপ না করে সে আবার বললে, 'তা খোজা সাহেব আর বড়ারণজী হেসেই খুন। তারা ওদের বললেন, যা পালা এখন, তোর মেয়ে এখন রানী হয়ে গেছে। ওই গাঁওয়ার'টারকে তার স্বামী বলে পরিচয় দিলে, তোদের ফাটক হয়ে যাবে।'

সুমেরু বাঈ চুপ করে রইলেন। মনে হতে লাগল—মা আছে না নেই? ভাইরা বেঁচে আছে নিশ্চয়। আর গ্রামের মুক্ত জীবন! রাজ-অন্তঃপুরের সুখবিলাসহীন ঐশ্বর্যহীন সে জীবন! সহসা আজকে এতদিন পরে বহু আকাঙ্ক্ষিত এই জীবনকে যেন বন্দীশালার জীবন মনে হতে লাগল। রত্ন-অলঙ্কার-ভূষিত দেহের পরিচর্যাকারিণী দাসী-

সখীপরিবেষ্টিত বহু বিলাসময় প্রাসাদের মহিমা গৌরবের মোহ, রাজার মৃত্যুতে তাঁর ক্ষমতা লোপের সঙ্গে সঙ্গে যেন নিঃশেষ হয়ে গেছে।

সখী বলতে থাকে, 'তারপর আবার সেদিনও এসেছিল তারা!' এবারে অপেক্ষা করে প্রশ্নের।

সুমেরু বাঈয়ের পদমর্যাদায় সম্ভ্রমের চেয়ে কৌতূহল বেশী হয়। বললেন, 'কে এসেছিল? মা? কেন?'

সখী হাসে একটু। তারপর বলে, 'আপনার মা ভাই আর তার জামাই আর ছেলে। আছে তারা শহরে।'

সুমেরু বাঈ জিজ্ঞাসা করলেন, 'মা এসেছে? ছেলে কার?'

'ছেলে জামাইয়ের। সেপাইয়ের আর চৌকিদারের চাকরির জন্য এসেছে তারা। বড়ারণজী বলছিলেন। তা এখন তো আর আপনাকে বললে হবে না, এখন মহকুমা খাসের হুকুম লাগবে।'

সুমেরু বাঈ আবার ভ্রূকুঞ্চিত করে চুপ করে রইলেন। স্পর্ধা বেড়েছে ওদের! স্পষ্ট করে বলার এই সাহস হয় নইলে! কিন্তু চুপ করেই রইলেন। যেন কথা বললেই ওদের স্পর্ধা আর প্রগল্‌ভতা বেড়ে যাবে বুঝতে পারলেন।

কিন্তু তিনি না কথা বললেও সে আবার বললে, 'আর ছেলেটা নাকি এমন সুন্দর দেখতে। বারো-তেরো বছরের ছেলে, মস্ত তলোয়ার কোলে নিয়ে চুপ করে তার মামা আর বাপের পাশে বসেছিল। যেন মেওয়ারের গল্পের বীর বাদল। খাঁটি রাজ-পুতের বাচ্চা হাজার হোক।' স্পর্ধিত কৌতূহলে সে জিজ্ঞাসা করে, 'আচ্ছা, ওকি আপনার ছেলে?'

সুমেরু বাঈ গম্ভীরভাবে বললেন, 'যা খসখসের পর্দাগুলো ফেলে দিয়ে তাতে জল দিতে বল। আর পাখা টানতে বল। আমি শোব।'

তবু প্রতিদিনই নির্ভয়ে কোন না কোন গল্পগুজবের অবতারণা করে সখীরা কেউ না কেউ।

ক্রমে সুমেরু রায়ের সয়ে যায়। আর প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করে। গ্রামের কথা মনে হয়, মায়ের কথা মনে হয়, পারিবারিক জীবন যে কেমন তাও মনে হয়। সঙ্গোপনে ভাবেন, তাহলে স্বামী বিবাহ করেছিল? সন্তানও হয়েছে? অমন সুন্দর সন্তান? সপত্নী নিশ্চয়ই রূপবতী।

কেমন কৌতূহল হয়। সব সময় মনে হয় কেবলি, একবার গ্রামে যেতে পারা যায় না? বৃদ্ধা জননী ও ভাইদের কাছে তারপর রূপসী সতীনকে দেখে আসতে পারে। তার চেয়ে কি সুন্দরী সে হবে! আশ্চর্য, সপত্নীর সঙ্গে কিবা সম্বন্ধ, আর কিবা প্রয়োজন, তবু

ঘুরেফিরে কিশোরকুমার তার ছেলের কথা মনে হয়। কেমন দেখতে তারা—দেখতে কৌতূহল হয়। তার কি তাতে? তবু।

আস্তে আস্তে পদগৌরবের নীহারিকা মণ্ডল মিলিয়ে আসে, সুমেরু বাঈ শহরের গল্প শোনেন, গ্রামের গল্প জানতে চান। সখীরা পায়ে হাত বুলতে বুলতে চুল বেঁধে দিতে দিতে সব কথা বলে।

সবশেষে একদিন এক বিশ্বস্ত সখীর কাছে বলে ফেলেন, 'একবার গাঁয়ে যাওয়া যায় না?'

সে অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। গ্রামে—গাঁয়ে? বাঈ সাহেবার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল? মুখে বললে, 'সে হুকুম তো কারুর নেই। কেউই তো কখনও 'হারেম' ছেড়ে বেরুতে পারে না। শুনি নি তো!'

সুমেরু বাঈ নীরব হয়ে যান।

আবার কতদিন যায়। এবারে একদিন বলেন, 'আচ্ছা, চুপি চুপি বাসনমাজার দাসীর সঙ্গে চলে যাই যদি, আবার দু-চার দিন বাদে ফিরে আসব।'

দ্বিধাভরে সখী চুপ করে থাকে। এবারে বলেন, 'যদি সব গহনা টাকা নিয়ে তোকে নিয়ে দুজনেই চলে যাই! এখানে বন্দী থেকে আর কি সুখ?'

সুমেরুর সিন্দুকভরা ধনরত্ন, অলঙ্কার গহনা সে দেখেছে। লুব্ধভাবে সে চুপ করে থাকে, প্রতিবাদ করে না।

প্রতিদিন আলোচনা করতে করতে ভয় যায় ভেঙে। আশা হয় দুর্বার। অবশেষে ঠিক হল দুজনে যাবেন আগে পরে করে। প্রথমে ধন অলঙ্কার হস্তান্তর করবে আরও দু-একজন দাসীকে দলে নিয়ে, তারপর যেমন করে হোক চলে যাবেই!

মহলের পর মহল, তাতে প্রবেশের জন্য সুড়ঙ্গ পথ, প্রাসাদের মধ্যে মহলের আর বাড়ির সমুদ্র যেন। বিরাট কেল্লার মধ্যে প্রাসাদ, তার তোরণে প্রহরী, তাদের খবরদারী। বিপুল জনতা তার মাঝে আসে যায় কিন্তু যারা কবে একদিন শৈশবে না কৈশোরে ঐ বিরাট অন্তঃপুরে প্রবেশ করেছিল, সেই নারীরা আর তো সেই ব্যূহ কখনও ভেদ করে বাইরে ফিরে আসে নি। তাদের পায়ে নেই সহজ গতি, মনে নেই সাহস, চোখের সামনে নেই চেনা কোনও সহজ পথ।

এক মুহূর্তে সুমেরু বাঈ সখী ও সবসুদ্ধ আবার প্রাসাদে ফিরে এলেন। এবারে প্রহরী খোজার সঙ্গে।

এবারে মহলে বন্দীশালা আরও দৃঢ় হল। আর ধনরত্ন সব মহারানীর হুকুমে তাঁর কোষে বাজেয়াপ্ত হয়ে গেল।

সুমেরু বাঈ শুনতে পান, তাঁর ধন ঐশ্বর্য নিয়ে এক প্রকাণ্ড মন্দির গঠিত হচ্ছে,

মহারানী করাচ্ছেন স্বামীর নামে।

অহঙ্কৃতভাবে ভাবেন তিনি, তাঁরও নাম থাকবে সেখানে, তাঁরই তো ঐশ্বর্য! তৈরী হলে দেখতে যাবেন—আগের মত সমারোহে পাল্কি-বন্ধ গাড়ি খোজা ও দাসী সমভিব্যাহারে।

মন্দির শেষ হয়ে যায়, দেবদর্শনে রানীরা যান, বাঁদীরা যায়, সাধারণ মেয়েরা যায়। কিন্তু সুমেরু বাঈয়ের কোন হুকুম পাওয়া যায় না।

প্রাসাদের ভিতরে সুরক্ষিত সুন্দর মহলে একদা প্রতাপান্বিতা রাজপ্রেয়সী গঙ্গাদেবীর অবতার সুন্দরী উম্‌দা বাঈ, পরে সুমেরু বাঈ, স্থবিরের মত বসে থাকেন, কিছুই ভাবতে পারেন না আর। শুধু অবশিষ্ট সামান্য সম্পদ আর মাসোহারা নিয়ে। আর তোশামোদ করে এবং পুরাতন প্রভাব দিয়ে সংগ্রহ করেন মদির পানীয়।

আচ্ছন্নমনে খাপছাড়াভাবে ভাবেন ভুলে যাওয়া গ্রাম্য জীবনের কথা, আর মাঝে মাঝে বৃদ্ধা জননীর কথা এবং না-দেখা কোন্ সুন্দর তনয়শালিনী অজানা এক সপত্নীর কথা।

ভারতবর্ষ—১৩৫৪

অবশেষে বহু আশা নিরাশার দ্বন্দ্বের পর শেঠানীজী রাজঅন্তঃপুরে তৃতীয়া রানী চন্দাবৎজীর (চন্দাবৎবংশীয়া) মহলে কোন বড় জলসায় একটা নিমন্ত্রণ পেলেন। কবে একদিন কি এক সামান্য কারণে তাঁর পিতামহীর আমলে ঐ নিমন্ত্রণ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল তা তাঁরা জানেন না। কিন্তু চার বছরের মেয়ে তিনি সেই শেষ জলসায় গিয়েছিলেন! তারপর বহুদিন ধরে তার বিবরণ শুনে শুনে তাঁর মনে এমনি এঁকে গিয়েছিল সেই কাহিনী যে, তাঁর মনে হত তাঁর সবই মনে আছে, ভোলেন নি, শোনা কথা নয়, মনে থাকা ঘটনা।

সেই শোনা কথা-কাহিনীর মোহ তাঁকে একেবারে অধীর করে তুলেছিল, আবার কোনদিন ঐ আমন্ত্রণ পাবার আকাঙ্ক্ষায়। যে ভাবেই হোক যেমন করেই হোক রাজঅন্তঃপুর আর প্রাসাদ-বাসিনীদের দেখা তাঁর পাওয়া চাই-ই।

এবং যদি রাজার দৃষ্টিপথে পড়েন!

যে মোহ যে স্বপ্ন অকারণে তাঁকে ওড়নায় ঘাঘরায় কাঁচুলিতে বর্ণবিন্যাস করিয়েছে,—শ্রাবণে ঘন নীল মেঘের ছায়ায় পীত উত্তরী সবুজ কাঁচুলি পরিয়েছে, চোখে কাজল

মাথায় মুক্তার সিঁথি 'বোরলায়' শোভিত করেছে। বসন্তে হালকা মতিয়া রংয়ের ওড়না নয়ত আসমানী রংয়ের উত্তরীতে পীত কঞ্চুলিকায় সেজে অন্তঃপুরের উপবনে নয়ত ছাতে বেরিয়েছেন। প্রতিদিনই সৌখীন প্রসাধনের তাঁর শেষ ছিল না। যেন কি এক প্রতীক্ষা উৎকণ্ঠায় তাঁর দিন মাস ঋতু কেটে যেত।

তাই বলে যে তিনি কুমারী বা অবিবাহিতা ছিলেন তা নয়। স্বামী শ্যামনাথ শেঠ ছিলেন প্রচুর সম্পত্তিশালী ও প্রতিষ্ঠাবান—এক শেঠের একমাত্র বংশধর। কিন্তু তাঁর শ্রেষ্ঠীজন অনুচিত কুদর্শন খর্ব শীর্ণ ক্ষীণ দেহ আর অতিশয় নিরীহ অপ্রতিভ ব্যক্তিত্বে নিতান্ত সাধারণেরও মনে হত যেন তিনি একজন পরিপূর্ণ মানুষ নন।

এক কথায়, স্ত্রী পুত্র কন্যা সত্ত্বেও তাঁকে ক্লীব বা অনতিপরিণত আধখানা মানুষ মনে হত।

২

জলসাটি ছিল তৃতীয়া রানীর মহলে। নাই বা হল মহারানীর প্রাসাদে। দেখতে তো সকলেই পাবেন ; মহারানীও সৌজন্য রেখে আসবেন।

আনন্দিত শেঠানীজী সিন্দুকে আবদ্ধ পুরুষানুক্রমিক সঞ্চিত পূর্ব শ্বশ্রূমাতাদের আহরিত ভারী ভারী হীরা-মুক্তা-সোনা-জড়োয়ার নানা দেশের গহনা ছড়িয়ে নিয়ে বসলেন। মাথার মুকুট, সিঁথি, বোরলা, ঝাপটা,—কানের ঝুমকো, দুল, ফুল, জড়োয়া কান, মুক্তার পিপল পাতা,—গলার সাতনরী, পাঁচনরী, কণ্ঠশ্রী, সরস্বতী হার, হাঁসুলী, সোনার হার মোতির মালা—বাহুর তাবিজ, জসম, বাজু, বাঁক,—হাতের নানা আকারের কঙ্কন চুড়, পৈঁছি, মানতাসা,—কটির নানা গড়নের মেখলা,—পায়ের চরণপদ্ম, পাঁয়জোর, মল মুরাঠা—সব রূপার থালায় করে সাজিয়ে ছড়িয়ে শেঠানীজী দেখতে লাগলেন।

চকচকে রূপার থালায় মুখের প্রতিবিম্ব পড়ল। শেঠানীজী সেটা হাতে তুলে নিয়ে অন্যমনস্ক ভাবে তার দিকে চাইলেন।

সুন্দরী তিনি। নিজের ছায়ার দিকে চেয়ে তিনি ভাবেন।

কিন্তু রাজপ্রাসাদের সকলের চেয়ে তো সুন্দরী তিনি নন! সেখানে সংগ্রহ করে আনা, চেয়ে আনা, ইচ্ছা করে আসা, ইচ্ছা করেই রাজঅন্তঃপুরের জন্য দেওয়া মেয়েদের পাশে তিনি কি সুন্দরী বলে গণ্য হবেন! কারুর নজরে কি পড়বেন? রাজা কি দেখতে পাবেন? কয়েক বছর আগেও তিনি আরও ভালো ছিলেন দেখতে।

চোখের পাশে ও কি? রেখা পড়েছে? মাথার চুলও আগের চেয়ে পাতলা

হয়ে গেছে কি? মুখের দিকে আবার দেখেন ভালো করে। নাঃ, তেমন কিছু মনে হয় না,—ভালোই দেখতে আছেন।

মন কিন্তু তবু বিমনা হয়ে যায়। আরও কয়েক বছর আগে এই নিমন্ত্রণ কেন এল না? দীপ্ত কালো চোখ, মসৃণ ত্বক, ঘন নিবিড় কুন্তলা তখনকার তরুণী শেঠানীজীর কাছে।

দেরী হয়ে গেছে। হঠাৎ মনে পড়ে যায়—, আরশি নয়, থালা ওটা। থালাখানি নামিয়ে রাখেন। আবার খানিক পরে নিয়ে দেখতে ইচ্ছা হয়। জানলা দিয়ে এসে পড়া দীপ্ত রৌদ্রে মুখ জলজ্বল করে ওঠে এবার। মনে হয়—না, দেরি হয় নি। সেদিনের তন্বী তরুণী শেঠানী নেই বটে, আজকের শেঠানীজীর মুখের দীপ্তিও কম নেই।

সঙ্কুচিত অপ্রতিভ হাসি মুখে নিয়ে শেঠজী এসে দাঁড়ালেন। রূপবতী ও বুদ্ধিমতী স্ত্রীর বুদ্ধির উপর তাঁর ভরসা আর শ্রদ্ধার সীমা ছিল না।

জিজ্ঞাসা করলেন, 'গহনা দেখছ? আরও কিছু এখনকার জিনিস আনাব কি?'

শেঠানীজী হাতের থালার আরশি স্বামীকে দেখে নামিয়ে রাখলেন; বললেন, 'গহনা? দেখলাম। না, এই থেকেই বেছে পরব। তবে যদি এমন হত কোনও গহনা, যা রানীদের চোখেও সহজে পড়ে না!'

স্বামী বসলেন। কিশোর ছেলে আর তরুণী মেয়েও এসে দাঁড়িয়েছিল, বসল।

স্বামী বললেন, 'আমি সিন্দুকের সব গহনা দেখি নি। তবে দু'একটি গহনা নাকি আছে তেমন। আমার মা আমার বাবার কাছে শুনেছিলেন এক মুক্তার মালার কথা, আর তেমনি হাতের নীলার পৈঁছির কথা। আমার পিতামহী তাঁর বাপের কাছে যৌতুক পেয়েছিলেন। তিনি কাথিয়াওয়াড়ের এক বড় শেঠ ছিলেন। সেরকম গহনা নাকি এদিকে আর কোন শেঠের ঘরে নেই। খুঁজে দেখ না সেটা। সেইটে পরে দাদাজী কবে এক সময়ে রাজপ্রাসাদেও গেছেন।'

ছেলেমেয়েরা বললে, 'তবে তো সেও পুরোন দেখা জিনিসই।'

শেঠজী আর শেঠানী একটার পর একটা মখমলের, হাতির দাঁতের, মীনার কাজ করা, সাদা পাথরের, ছোটবড় গহনা রাখা বাক্সগুলি খুঁজছিলেন। পুরোন শুনে শেঠানীজী একটু হাসলেন, তারপর বললেন, 'হ্যাঁ, পুরোন আর দেখা জিনিস বটে, কিন্তু যারা দেখেছিল তারা তো আর নেই, এখন আবার নতুন লোকে দেখবে।'

'এই যে, এইটে কি?'

একটি শ্বেত পাথরের বাক্স থেকে একটি চমৎকার মুক্তার মালা বেরিয়ে এল। স্বামী মুগ্ধ চোখে হাতে নিলেন, দেখে বললেন, এটাই বোধ হয়। আমাদের কাছে তো অনেক রকম আসে কিন্তু এরকম জিনিস আমিও দেখি নি।'

ছেলেমেয়েও দেখল।

শেঠানী গলার সেই মালা, চিক, কণ্ঠশ্রী, হাতের নীলার পৈঁছি, নির্মল উজ্জ্বল মুক্তার কঙ্কন, মাথার জড়োয়া সিঁথি, আরও কয়েকটি হাতের পায়ের ও কটির কি কি বেছে বেছে দেখতে লাগলেন।

রাত্রি দ্বিপ্রহরে জলসা বসবে। মনে তাঁর উদ্বেগের সীমা নেই। না জানি সে কি রকম উৎসব! না জানি কত অপূর্ব রূপবতী সুন্দরীর সমাগম হবে সেখানে! রানীরাই বা কেমন সুন্দরী হবেন? দেখা যাবে কি সকলকে? শোনা যায়—ওখানে দীর্ঘ অবগুণ্ঠনে মুখ ঢেকে রাখাই নিয়ম। শুধু মহারানীরই মুখ দেখতে পাওয়া যায়।

তাঁকেও কি অতখানি ঘোমটা দিতে হবে?

তা হলে কিছুই দেখতে পাবে না। কিন্তু সখীরা 'পাত্রীরা' তো ঘোমটা দেয় না। উন্মনা উৎসুক শেঠানীজী প্রাসাদবাসিনীদের রূপ, তাদের জীবন, তাদের ঐশ্বর্যসুখ, তাদের বিলাস সাজ-সজ্জার কথা ভাবতে থাকেন।

৩

দ্বিতীয় প্রহর রাত্রে লাল কাপড়ের ঘেরাটোপ পরা রঞ্জিত তুঙ্গ-শৃঙ্গ, শুভ্র বলীবর্দবাহিত রাজ-রথ এল আমন্ত্রিতার জন্য। শেঠানীজীর উৎসুক উৎসব-সজ্জা সন্ধ্যা থেকেই শুরু হয়েছিল। তিনি সঙ্গিনী ও পরিচারিণীদের সঙ্গে রাজ-রথে উঠলেন।

কানাত-ঘেরা অন্তঃপুর তোরণের সামনে রথ থামল। দীর্ঘ অবগুণ্ঠনে মুখ আবৃত করে তিনি খোজা ও অন্যান্য অভ্যাগতদের সঙ্গে প্রাসাদের অন্তঃপুরের প্রাঙ্গণ, তারপর দীর্ঘ সুড়ঙ্গ পথ ও মহলের পর মহল অতিক্রম করে গন্তব্য প্রাসাদে পৌছলেন। তাঁদের নির্দিষ্ট পদানুসারে বসবার জায়গায় খোজা আর দাসীরা বসিয়ে দিল।

নিঃস্তব্ধ সভা। মাঝে মাঝে মহারানী রাজা ছাড়া আর কেউ কোন কথাই কইছে না। রানীদের সখীরা দলে দলে এক এক দিকে বসে আছে। কোন দলের নীল ওড়না, কোন দলের গোলাপী, কারও বা বেগুনী, অথবা ফিকে সবুজ ওড়না। এক এক রানীর সখীর দলের এক এক বিশেষ রং এক এক উৎসবের দিনে।

ঘোমটার আড়াল থেকে আঙুলের ফাঁক দিয়ে দিয়ে শেঠানী গল্পের স্বপ্নের মত সব দেখতে লাগলেন।

তারপর নজর ও পরিচয় আরম্ভ হল। পদ অনুসারে প্রধান খোজার সঙ্গে এক এক জন এগিয়ে যায়। তিনবার নিচু হয়ে কুর্নিশ করে, রাজার সামনে গিয়ে নজরানা ভেট করে পিছিয়ে ফিরে যায় নিজের আসনে।

হাসির রেখা ফুটে উঠে মিলিয়ে যায়। আস্তে আস্তে প্রাসাদ-সমুদ্রে কথার তরঙ্গ ওঠে আর ভেঙ্গে পড়ে। ছোট ছোট কথা হাসির বুদ্‌বুদ ওঠে মহলে মহলে।

তারপর রাজার কাছে একদিন লজ্জিত আহত শেঠানীজীর দু ফোঁটা চোখের জল পড়ল। আর সে চোখের জল বৃথা পড়ল না। তুচ্ছ কারণে তৃতীয়া মহিষীর পানখাবার জায়গীর বাজেয়াপ্ত হয়ে গেল রাজ সরকারে। এবং অপমানিতা রাজকন্যা ও রাজমহিষী নিঃশব্দে স্বামীর দেওয়া অন্য অন্য জায়গীরের আয়ও ছেড়ে দিলেন।

অভিমানিনী তেজস্বিনী রানী অবশেষে পীড়িত হয়ে শয্যা গ্রহণ করলেন। মহারানী ও অন্যান্য সপত্নীরাও দেখতে এলেন। রাজার কানেও খবর পৌছল।

রাজা সমারোহে চিকিৎসা-পথ্যের ব্যবস্থা করে দিলেন। প্রথামাফিক জিজ্ঞাসা করে পাঠালেন খোজা পাঠিয়ে কিছু 'ফরমাশ' আছে কি না?

দৃপ্তা রাজবংশের দুহিতা খোজাকে বললেন, 'হুজুর সাহেবের অনেক মেহেরবানি। কিছুই দরকার নেই আমার। শুধু তাঁকে বলো তিনি 'বাঁদীদের বান্দা' হয়ে থাকুন।'

কিছুদিন পরে যথারীতি সমারোহে রানীর মৃত্যু হল। এবং তারও চেয়ে সমারোহে শোকযাত্রা ও শ্রাদ্ধ হয়ে গেল।

রাজার স্ত্রীর বা স্ত্রীলোকের কোনও অভাবই নেই। কাজেই বিয়োগ বিরহের কথা ওঠেই না।

কিন্তু বাঁদীর বান্দা হওয়ার তিক্ত শ্লেষ তাঁর মনে ছিল। আর শেঠানীর চুল বাঁধার কাহিনীও তাঁর কানে পৌছেছিল।

এবারে রাজা মাঝে মাঝে চেয়ে দেখেন শেঠানীর পানে। বহুনারী-বিলাসীর মোহ যেন কেটে আসছিল।

সহসা একদিন জিজ্ঞাসা করলেন শেঠানীজীকে, 'তোমার তো ছেলেমেয়ে আছে না? কত বড় তারা? মেয়েকে দেখতে কেমন? একদিন তাকে এনো।'

শেঠানী চকিত হয়ে উঠলেন। নিমেষের মধ্যে চটুল লঘু প্রকৃতি নারীত্বের আড়াল থেকে যেন কোন চিরকালের জননী জেগে উঠল। মেয়েকে এই জায়গায়?

একটু স্তব্ধ হয়ে থেকে বললেন, 'মেয়ে আমার ছোট। আর তার বিয়ে হয়ে গেছে।'

'ছোট! কত ছোট? কত বয়স?' ক্রূরভাবে কৌতূহলী রাজা জিজ্ঞাসা করলেন।

জননী শেঠানী নতমুখে বললেন, 'তা পনের-ষোল বছর হবে।'

'ও! তাহলে চন্দাবৎজীর পাত্রীরা তোমাকে ঠিকই বলেছিল বুড়ী হওয়ার কথা।' ওরই কথাতে চন্দাবৎজীর জায়গীর বাজেয়াপ্ত হয়, মনোমালিন্য হয়। তাই নিয়ে 'ভাজী'

ঝাড়ুদারেরা চিরকালের প্রথামত গান বেঁধে গেয়ে বেড়ায়, শহর রটিয়ে।

কিন্তু বাজেয়াপ্ত জায়গীর তো ফিরিয়ে দেওয়া গেল না তাই বলে। দিলে তিনি নিতেনও না।

আরক্ত লজ্জিতমুখে শেঠানীজী অপমান গলাধঃকরণ করলেন।

রাজা বললেন, 'তোমার মেয়েকে আনতে রথ যাবে।'

সুসজ্জিত রথ গেল কয়েক দিন পরে শেঠানীজীর বাড়ি এবং শুধু জননীকে নিয়েই ফিরে এল।

খোজা গিয়ে জানাল রাজাকে। শেঠানীও করজোড়ে নিবেদন করলেন কন্যাকে তার শ্বশুরবাড়ি থেকে বিকানীরে নিয়ে গেছে। আজ আর তাঁর মুখে লঘু লাস্যলীলাময় মধুর হাসি নেই; অভ্যস্ত সুসজ্জিত বসনভূষণের শোভা ও অবগুণ্ঠনের আড়ালে যেন ভীত বিবর্ণমুখ এক জননী মূর্তির আভাস পাওয়া যাচ্ছে। রাজা সখীদের নৃত্যগীতে নিমগ্নচিত্ত ছিলেন,—তাঁর দিকে চাইলেন না।

শুধু বাড়ি ফেরবার সময় খোজার মুখে হুকুম পেলেন শেঠানীজী, প্রতিদিন সন্ধ্যায় তাকে আসতে হবে। জলসার উৎসবে আমন্ত্রণ নয়। প্রতিদিন উপস্থিতি ও অপেক্ষা তারপর আদেশ হলে ফিরতে পাবেন।

সখীদের মহলের একটা ঘরে দিনের পর দিন হাজিরা দিতে বসে থাকেন শেঠানী। রাজদর্শন কোনদিন মেলে, কোনদিন মেলে না। আর লাস্যসঙ্গিনীও নয়, প্রোষিত-ভর্তৃকাও নয়, বহু-বিলাসীর পরিত্যক্ত বিলাস-ক্রীড়নক যেন। হাসির দীপ্তিহীন মুখে, ম্লান অধরের পাশে, চোখের কোণে বলীরেখা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। চোখে কাজল আর সূক্ষ্ম হয়ে আঁকা হয় না, নিত্য নূতন বসনভূষণের শোভা আর ফোটে না; করপল্লবে, চরণে মেহেদীর নূতন নূতন ফুলকারী কাজ আর আঁকা থাকে না।

সখীরা অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। কি যেন জিজ্ঞাসা করতে গিয়েও জিজ্ঞাসা করতে সাহস করে না, কয়েকদিন আগেও তিনি সম্মানিতা অতিথি ছিলেন। তাদের মনে হয় যেন কতদিন ধরে পীড়িত হয়েছেন তিনি।

অকস্মাৎ কার নিষ্ঠুর ইঙ্গিতে তাঁর ভান-করা যৌবনের দীপ্তি হেমন্তের আকস্মিক সন্ধ্যার মত ম্লান হয়ে গেছে যেন।

নিজেদের মধ্যে অন্তঃপুরবাসিনীরা, প্রাসাদবাসিনীরা বলাবলি করে যে, শেঠানীজী পীড়িত।

রাজাদেশে একদিন খোজা আসে কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা করতে।

শেঠানী মিনতি করে বললেন, 'তাঁকে বাড়িতে গিয়ে কিছুদিন বিশ্রাম করার হুকুম হোক, রাজার কাছে আবেদন জানাতে। তিনি অসুস্থতা বোধ করছেন।'

খোজা চলে যায়। তারপর ফিরে আসে হাতে রূপার থালার ওপরে একটি মদিরা পাত্র নিয়ে। বলে, 'এই ঔষধ আপনার জন্য মহারাজা পাঠালেন। আর বললেন আপনার ইলাজ (চিকিৎসা) ও বিশ্রাম এখন থেকে এখানেই হবে। সেরে উঠে বাড়ি ফিরবেন।'

শেঠানী অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন ; জিজ্ঞাসা করলেন, 'এখানে ?' তারপর বললেন, 'কি ওষুধ ?'

খোজা একটু চুপ করে থেকে তারপর বললে, 'তা তো জানি না।'

সখীদের মহলে একটা মহল শেঠানীজীর আরোগ্যশালা হল। প্রতিদিন সকালে রাজবৈদ্য আসেন, যবনিকার অন্তরাল থেকে নাড়ি দেখে যান। ঔষধের বিধান দিযে যান। আর সন্ধ্যায় আসে খোজার হাতে রূপার থালার উপরে এক গ্লাস ওষুধ। ঔষধ পান করা হলে দাসীরা পাত্র ধুয়ে নিয়ে আসে, তারপর খোজা ফিরে যায়।

দিনের পর দিন গেল। মাসও গেল। ম্লান আচ্ছন্নভাবে শেঠানীজী শুয়ে থাকেন। চলে যাবার কথা জিজ্ঞাসা করতে চান, সাহস হয় না। এখন আর পুরাতন ভরসা নেই। অবশেষে একদিন খোজাকে বললেন, 'আমি কবে যেতে পাব ? এ ওষুধ কতদিন খেতে হবে ? শরীর এতে যেন আরও খারাপ লাগছে। আর খাব না।'

খোজা নীরবে ওঁর মুখের দিকে চেয়ে থাকে, 'ওষুধ তো আপনাকে খেতেই হবে— মহারাজের হুকুম।' তারপর বলে ফেলে, 'চন্দাবৎজীও তো খেযেছিলেন।'

শেঠানীজীর কোটরাবিষ্ট চোখ বিস্ফারিত হয়ে ওঠে। রানী চন্দাবৎজীও খেযে-ছিলেন ?—ভাল তো হন নি ? চকিতে মনে পড়ে যায়—রাজ-অন্তঃপুরের নানাবিধ কাহিনী, নানা জনশ্রুতি···

ভীত অস্ফুটস্বরে কি বলতে যান ; ততক্ষণে খোজা অতর্কিত বলা কথা সামলে নিয়ে ইঙ্গিতে দাসীদের সামনে কথা কইতে নিষেধ করে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

অদ্ভুত ভাবনায়, ভয়ে আচ্ছন্নভাবে শেঠানীজীর রাত্রি কেটে যায়। প্রভাত হয়, যথারীতি রাজবৈদ্য আসেন। দাসী, সখীরা কুশলপ্রশ্ন করে চলে যায়। উৎসুকমুখে উৎকণ্ঠিত শেঠানী কেবলি ভাবেন, কাকে তিনি জিজ্ঞাসা করবেন, এ কি ঔষধ ? কার মুখে তিনি রাজার কাছে বাড়ি যিরে যাবার আবেদন জানাবেন ? কে তাঁর এমন আছে এখানে ? সৌভাগ্যের দিনে তিনি তো কারও প্রিয় ছিলেন না।

দাসীরা আহার্য আনে, পথ্য আনে নানাবিধ পাত্রে প্রকাণ্ড থালায় সাজিয়ে, একটুও মুখে দিতে পারেন না।

নিঃশব্দ প্রাঙ্গণে নিঃস্তব্ধ রৌদ্রোজ্জ্বল দ্বিপ্রহর নেমে আসে। চুপ করে শুয়ে থেকে চোখ জলে ভেসে যায়। কুদর্শন নির্বোধ স্বামীর বিনীত নম্র সোহাগ, সমাদর,

কিশোরকুমার তনয়, তরুণী কন্যা, তাদের হাসি কথা আলাপে মুখরিত নিজের গৃহখানির কথা মনে পড়ে।

হয়ত আর কোনদিন সেখানে ফিরে যাবেন না।

কখন মুদিত চোখের আড়ালে সন্ধ্যা নেমে এল। প্রদীপ জ্বেলে দিয়ে গেল দাসীরা।

আর খোজার হাতে রূপার থালায় করে নিয়মিত ঔষধও এল।

ব্যাকুলভাবে শেঠানীজী উঠে বসলেন, চোখ জলে ভরে গেল। মিনতিভরা চোখে তিনি খোজার পানে চাইলেন, অস্ফুটস্বরে বললেন, 'এ ঔষধে তো ভাল হয় না, আর খাব না।'

সে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে তাঁর হাতে গ্রাসটা দিয়ে বললে, 'ভাল হবেন বৈকি। খেয়ে নিন। মহারাজার হুকুম।'

বিবর্ণ মুখে শেঠানীজী ওষুধ হাতে নিযে মুখে তুললেন। খোজা ফিরে গেল শূন্য পাত্র নিয়ে।

বাল্যকাল থেকে পরম আকাঙ্ক্ষিত প্রাসাদের অন্তঃপুরের কক্ষে হাতির দাঁতের কাজ করা চমৎকার পালঙ্কে সুন্দর শয্যায় দাসী-সখীদের দ্বারা সেবিতা শেঠানীজী আবার শুয়ে পড়েন। ভয় আছে অথবা নেই, ভালো হবেন কিনা, সব অনুভূতিই যেন অসাড় হয়ে গেছে। ভয়ে, ভাবনায় ও ঔষধের গুণে আচ্ছন্ন অভিভূত শেঠানীজীর মনের চোখের সামনে ভেসে আসে—তার পরদিন, তারও পরদিন,—রূপার থালায় ঔষধের গ্রাস রাখা আবর্তিত মালার মত শুধু এ একটি প্রতিদিন…। এর শেষ কবে? আচ্ছন্নতা ও বিস্মৃতির মাঝে শেঠানীজী আর ভাবতে পারেন না।

পরাগ—১৩৫৪

সেপাই পিসিমা

চল্লিশ বছর আগের সেকাল। রাজস্থানের একটি শহর। সকাল বেলা। একটি বাড়ির বাইরের আঙিনায় একটি পাথরের চৌকির ওপর বসে গৃহস্বামী সেকালের মতই 'বারদুয়ারে' বসেই দাঁতন করছেন, একপাশে নাপিত বসে আছে কামানোর সরঞ্জাম নিয়ে। দু-একজন ভৃত্য মুখ ধোবার জল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

সেকালের মতই আবেদন-নিবেদনের পসরা নিয়ে, ব্যক্তিগত প্রয়োজন নিয়ে দু চারজন দাঁড়িয়ে আছে। কারও নিজের চাকরি, কারও পদোন্নতি, কারুর বা কোন বিশেষ বক্তব্য আছে।

কি কেউ এখানে আছ?'

জানলার কাছে স্ত্রী কন্যারা কেউ না কেউ মাঝে মাঝে সকালে বসে সেলাই বা পড়াশোনা করতেন!

কন্যা বললেন, 'আছি বাবা।'

পিতা বললেন, 'আচ্ছা এদের—ওই মেয়েটিকে ভিতরের দিকের আটা পেষার ঘরটার অন্য সব দিক—গরু, ঘোড়ার দানার দিক—খালি করিয়ে দাও। ও আজ থেকে এখানে রইল। আমি চা খেতে গিয়ে সব কথা বলছি।'

সেকালের চা খাওয়া, (টেবিল চেয়ার বয় বাবুর্চির যুগ তখনও চালু হয় নি) দালানে মাটিতে আসন পেতে বসে চায়ের ব্যাপার সমাধা হত। চা পাঁউরুটি, কিম্বা চায়ের সঙ্গে লুচি তরকারী নিমকি মিষ্টি যাই হোক।

কর্তা ভিতরে এলেন।

গৃহিণী একটি পিঁড়ি পেতে বসেছিলেন চায়ের দেশী আসরের সামনে বিধবা কন্যা জলখাবার ও চায়ের কেতলী এনে রাখলেন। গৃহিণী চা পরিবেশন করলেন।

খেতে বসে কর্তা বললেন, 'মেয়েটি ভিতরে এসেছে?'

মেয়ে বললেন, 'হ্যাঁ দানার কোঠ্যারে (ভাঁড়ার) বসতে বলেছি।'

গৃহস্বামী এবারের গৃহিণীর দিকে চেয়ে বললেন, 'একটি আশ্রিত তোমার হেফাজতে এল! কাজকর্ম কিছু কিছু করবে বলেছে। বাসনটা মাজবে না, বাইরে বেরুবে না, বাজার পাঠান চলবে না, এঁটো ছোঁবে না, ছাড়া কাপড়ও কাচবে না…অনেকটা 'দেবী-চৌধুরানী'র গোবরার মা'র মত মনে হচ্ছে।' কর্তা ঈষৎ হেসে স্ত্রী ও কন্যার দিকে চাইলেন।

তার পর কন্যাকে বললেন, 'তবে তোমার ছেলেমেয়েদের দেখবে, রান্না ঘরটাও ধোবে, আর বাড়ির সব আটা পিষবে। দেখ, যেন চাকররা কেউ ওর ঘরের দিকে না মাড়ায়। ওর ননদটি একেবারে সেপাই, কেউটে সাপও বলা যায়—ছোবলাবে তা হলে। তোমার ওপর ভার দিলাম ওর।' গৃহিণীকে বললেন, 'দেখেছ নাকি সেপাইটিকে?'

গৃহিণী বলেন, 'না আমি ওদিকে ছিলাম, রমা বলছিল। তা চাকরি করতে এসে অত পর্দা করলে কি করে চলবে! চাকরবাকর তো সব জায়গায় ঘুরচে।'

কর্তা একটু হাসলেন, বললেন, 'চাকরি ঠিক নয়—গহনা দেখলে না? আর ঘোমটার বহর তো দেখলে, ও নিজের পর্দা রাখবে।' কর্তার চা পান হল, উঠে গেলেন।

গৃহিণী কন্যার দিকে চেয়ে বললেন, 'গয়না তো এদেশে অমনি করেই সবাই পরে।

ঝি চাকরানী মেথরানী সকলেরই গা-ভরা গহনা আছে! তা এত পর্দা নিয়ে কি আর চাকরি করা চলে! রকম দেখ! সব বাড়াবাড়ি।'

কন্যা বললেন, 'আবার সব কাজও করবে না!'

মোট কথা, একটি 'গোবরার মাকে' রাখা তো হল, আবার রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে চাকরদের চোখ থেকে। এটা ভাল লাগছিল না ওঁদের। সেপাই ননদটিও আছে মিলিটারী মেজাজ নিয়ে।

রমা দানার ভাঁড়ারে এসে দেখলেন, মেয়েটি মুখ খুলেছে, সুন্দর দেখতে এবং তার সেপাই ঠাকুরঝির হাত ধরে তার চোখ থেকে জল পড়ছে। ঘরে একটি টিনের বাক্স, এক ঝুড়ি বাসন, একটা চট মোড়া বিছানা খুলে রাখা রয়েছে। ছেলেমেয়েগুলি তাতে বসে রয়েছে, তলোযারখানি একদিকে রেখেছে।

সেপাইয়েরও চোখ শুকনো নেই। সে বলছে, 'তুই ভাবিস নি, বাবুজীর বাড়িতে তোর কোন ভাবনা ভয় নেই। আর আমি তো আসা যাওয়া করবই। এখন যাই, দুশমনদের হাত থেকে আপনাদের জমি, ক্ষেত, কোঠি (কুয়া) বাঁচাই। এখন তো আর তোদের জন্য ভাবনা রইল না।'

সেপাই পিসি গৃহস্বামীর মেয়েকে দেখে হাত জোড় করলে। তারপর ভাইপো ভাইঝিদের একটু আদর করে বললে, 'কাঁদিসনি 'বিন্না' (বাছা), আমি খুব শীগগীরই আসব।'

ভাজ আবার তাব হাত ধরে বললে, 'খুব শীগগীরই এস বাইজী (ঠাকুরঝি)।' ননদকে 'বাইজী' বলা হয় রাজস্থানে।

২

ভাজের চাকরি শুরু হল। কি কি কাজ করতে হবে, কখন কখন করবে—তালিম চলল রমার সঙ্গে। কি কি করবে না—তাও সে বললে। চাকরদের দিয়ে কাজ শেখান চলবে না, গৃহকর্তাব আদেশ আছে। গৃহস্বামীর মেয়েই সব কাজ শেখাবেন ও করাবেন। কাজ করাতে গেলে একটি নাম বলে ডাকা চাই তো। কন্যা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি নাম তোমার?'

গলা অবধি ঘোমটা একটু কমিয়ে কপাল অবধি তুলে সে রমার সঙ্গে ঘুরছিল।

'আমার নাম? আমার নামে কি হবে? আমাকে ধনজী—ধনপাল সিংয়ের মা বলে ডেক।'

'কেন, তোমার নিজের নাম বল না?' কন্যা বললেন, 'ও যে বড্ড বড় নাম হল।'

সাধারণতঃ রাজপুতের মেয়ের নাম ধরে সবাই ডাকতে পারে না। বাপের বাড়িতে

বলবে 'বাইজী' (কন্যা), শ্বশুরবাড়িতে বলবে 'ভাবী', 'ভৌজী', 'বিন্দনী' (বউ), পরে বলবে সন্তানের নাম ধরে তার মা। নিজের নাম সে তো খারাপ মেয়েদের থাকে! নাম ডাক তো তাদের নিজের নামে হয়। ভদ্রগৃহস্থ ঘরে আবার মেয়েমানুষের নাম ধরে ডাকে নাকি ? এতখানি প্রথার খবর জানা ছিল না মেয়ের।

ধনজীর মা একটু চুপ করে থেকে বললে, 'আমার নাম কমলাবাঈ। কিন্তু আমার নাম ধরে ডাকলে তোমাদের সব চাকর দাসী আমার নাম জানতে পারবে। আর তারা নাম ধরে ডাকে যদি সে বড় অপমান আমাদের বংশের। নাম ধরে ভদ্রলোকের মেয়েকে ডাকে না।'

ঝিয়ের নাম আবার বাঈ! কন্যা শুনলেন নতুন কথা। ভাবলেন, তা তো ভালো, তা 'তুমি' 'তোমাদের' বলে কথা কওয়া কেন ? আপনি বলে কথা কওয়া উচিত তো। পিসি তো বেশ আদবকায়দা মত কথা কইল দেখলাম।

'আচ্ছা এস ধনজীর মা, গম ওজন করে নিয়ে যাও। বাড়ির জন্য তিন সের গম দিন পিষবে, তিন সের যবও পিষবে চাকরদের রুটির ও কুকুরের রুটির জন্য। এই রান্নাঘরটা ধোবে, শোবার ঘরগুলো ঝাঁট দেবে, আর মুছবে।' ঘোমটা থেকে এক চোখ বার করে রাজপুতের মেয়েদের মতই সে এঘর ওঘর ঘুরে কাজ দেখতে লাগল। গায়ের গহনা ঝলমল করতে লাগল। যেন রানী। ঠিক যেন পরিদর্শিকা। যেন চাকরি করতে আসে নি, বাড়ীতে বেড়াতে এসেছে।

রমার মনে যেন বিরক্তি জাগে, তেমনি কৌতুক বোধ হয় ওর ধরন-ধারণে। কিন্তু পিতার আদেশ, কাজ ওকে দেখাতে হবে।

ঘরের পরিষ্কারের কাজ শেষ হলে ধনজীর মা দৈনিক পেষবার জন্য গম আর যব নিজের ঘরে নিয়ে এল। ঘরের মস্ত ভারী যাঁতা বা 'চাক্কি'র পাশে সে সব নামাল। তারপর ভ্রূ কুঞ্চিত করে জিজ্ঞাসা করলে, 'আমি কোথায় রুটি করব, কখন করব? আমার ছেলেমেয়েরা কখন খাবে?'

রমা হেসে ফেলল, 'তুমি এইখানে রুটি করতে চাও, করো। না হয় রান্নাঘরের উনুন খালি হলে রুটি করে নিও। ওরা তখন খাবে। পাথর দিয়ে উনুন করে নাও।' আদেশ পালনে, দাসীবৃত্তিতে অনভ্যস্ত রাজপুতের মেয়ের মন যেন দাসীত্বের জীবন মানতে চায় না। হুকুম স্বীকার করতে রাজী নয়। কোঁচকানো ভ্রূর নীচে কালো চোখে আগুন না জল ? ঝকঝক করে ওঠে। জল কি ?

আহা! রমা কোমলভাবে বলে, 'আমি তোমায় তরকারী ডাল দিতে বলে যাচ্ছি। রুটি করো আগেই। আমাদের রান্নাঘরের তরকারী সবাই পায়, তুমিও নিও। রুটি করে নাও, নিয়ে তারপর ওদের খাওয়া হলে আটা পিষো। আমাদের তো রাত্রে

রুটির দরকার। কিন্তু এত গহনা পরে কাজ করবে কি করে, ভারী লাগবে না? ওগুলোর সব মিলিয়ে ওজন তো পাঁচ-সাত সের হবে।'

এবারে গহনার কথায় নারী কোমল ভাবে বলে, 'বাইজি, অনেক গহনা গেছে—স্বামীর অসুখে নানা বিপদে। এখন তো মাত্র এই ক'টাই আছে। কোথায় রাখব, চোরে নেবে তাই ননদ বললে পরেই থাক। আজকে বাক্সতে তুলে রাখব।'

৩

কিন্তু ঝিকে দিয়ে কাজ করানো সোজা, ও যেন ঝি নয় রানী। রানীর মত মেজাজওয়ালা কোনও ঘরের গৃহিণীকে দিয়ে কি কাজ করান চলে!

তার পর্দা চাই—তার ছেলেমেয়ের নিয়মমত রক্ষণাবেক্ষণ চাই, খাদ্য চাই তাদের সুনিয়মে তার বাড়ির কর্ত্রী ভাবের ধরনটা যায় না। কিছু আদেশ করলেই ভ্রূকুঁচকে আদেশকারিণীর দিকে চায়। তাবপর আবার নরম হয়ে যায়। দ্বিধাদ্বন্দ্বের শেষ নেই তার মনেও, বাড়ির লোকের মনেও। বেশ বিবেচনার বিষয় যেন। আর বিপদ আসে কোন না কোন পথে।

একদিন রাত্রে বাড়িতে জল্পনা হল বেশ রাত্রে সকলে ছেলেমেয়েরা মিলে কাছাকাছি এক আত্মীয়ের বাড়ি হেঁটে বেড়াতে যাওয়া হবে পিছনের গেট দিয়ে। কেননা সামনের দিকে গেটে বহু লোকজন, ঘোর পর্দার দেশ, সকলে দেখতে পাবে। হাঁটাচলার প্রথা তখন এখনকার মত চল ছিল না।

কন্যা এলেন, ধনজীর মা'র ঘরে। সে ছেলেমেয়েদের শুইয়ে কাঁথা সেলাই করছে তেলের কুপিটির পাশে বসে। আমাদের দেশের দেশী কাঁথা নয়—ওদের কাঁথা।

কন্যা বললেন, 'ধনজীর মা,—আমরা একটু বেড়াতে যাচ্ছি, আসতে রাত্রি এগারোটা হবে, তুমি একটু আমার ছেলেমেয়েদের ঘরে বসবে? নাহলে কাঁদবে, জাগলে মুস্কিল হবে।'

ধনজীর মা আশ্চর্যভাবে মনিব-দুহিতার মুখের দিকে চেয়ে রইল। সে যাবে রাত্রে তার ঘর ছেড়ে! মনিবের মেয়ের আক্কেলটা কি! এই যেন ভাবটা।

উত্তরের অপেক্ষায় রমা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপরে বললেন, 'তাহলে এস, আমি যাচ্ছি কাপড় বদলাতে।'

সে বললে, 'আর আমার ছেলেমেয়েরা একলা থাকবে এখানে?'

বিব্রত রমা বললে, 'ওরা তো ঘুমিয়েছে, এক-আধবার না হয় দেখে যেও।'

সে বললে, 'তোমার ছেলেমেয়ে যদি একলা থাকতে না পারে, তাহলে আমার ছেলেমেয়েও পারবে না।'

একটি একটি করে সেকেণ্ড ও মিনিট তার হাতের কাঁথায় ছুঁচের ফোঁড় বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে কেটে যেতে লাগল। রমা দাঁড়িয়ে নীরবে চেয়ে আছেন, সেও নিঃশব্দে সেলাই করে চলেছে। বেশ বোঝা গেল সে উঠবে না। সেই মনিব কি বাড়ির লোকেরা মনিব, তার ব্যবহারে বোঝা গেল না।

পরদিন কন্যা পিতার আহারের সময় বললেন ধনজীর মা'র উদ্ধত বাক্য ও স্পর্ধিত মেজাজের কথা।

গৃহিণীও বিরক্ত ভাবে বললেন, 'যদি রাতবিরেতে দরকার পড়লে কোনও কাজে না লাগে, তাহলে ও নবাব-নন্দিনী ঝি রেখে আমাদের কি উপকার! কাজ করতে এসে অত রানীগিরির মেজাজ দেখালে চলে না!'

কর্তার খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল।

তিনি একটু হাসলেন।—'কি বলেছে? তোমার ছেলেমেয়েও যদি একলা থাকতে না পারে তার ছেলেরাও পারবে না? খাঁটি রাজপুতের ঘরের মেয়ে সিংহের বাচ্চা যে। দারোগা নয়—(সঙ্কর) আসল সিংহীর রক্ত শরীরে রয়েছে। সিংহীর বাচ্চার মতই কথা বল্‌ছে তো। তোমরা রাগ করলে হবে কেন? ওকি আর ঝিয়ের মত ভয় পাবে, না কথা শুনবে? এত রাত্রে ওর ছেলেমেয়ে একলা রাখতে তাই চায় নি।'

কর্তার কথায় গৃহিণী ও কন্যা আশ্চর্য হলেন। কিছু রহস্য আছে নাকি ভিতরে? মৃদু হেসে গৃহিণী বললেন, 'এ যে প্রায় পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাসের গল্প দেখছি।'

'তাহলে একটি দ্রৌপদীর আগমন হয়েছে নাকি বাড়িতে?'

কর্তা অট্ট হেসে বললেন, 'প্রায় তাই। কীচকবধ না হলেই ভালো, ভীম নেই বটে, পঞ্চপাণ্ডবও নেই। কিন্তু যে সেপাই ঠাকুরঝি আছে সে সব পারে। ও তোমাদের সব হুকুম না মানলেও কিছু বলো না—। আগে তো কখনও চাকরি করে নি, ব্যাপারটা কি তাই ভাল করে জানে না।'

তবু ঘাত-সংঘাতে দিন আসে যায়।

সেপাই ঠাকুরঝি মাঝে মাঝে আসে ভাজের ভাইপোদের কাছে। ভাইপোটি আর একটি জায়গায় বালক ভৃত্যের কাজ করে।

বাড়ির ভৃত্য দাসদাসীরাও তাঁর নাম দিয়েছে সিপাহী বাঈজী। সকালে গৃহস্বামীর দাঁতনের মুখ ধোবার আসরে সে এসে নিজের মামলা, বৈষয়িক ব্যাপারের কথা বলে যায়, জানিয়ে যায়—

ধনজীর মা'র মেজাজ আর পর্দা দুই একটু কমে গেছে।—বাঙালী বাড়ির জীবনে অভ্যস্ত হয়ে এসেছে। মানসম্ভ্রম যাবার ভয়, পুরুষকে ভয়-আতঙ্ক আর যেন নেই। চাকরিজীবনও কিছুটা আয়ত্ত করে নিয়েছে।

হেনকালে সহসা একদিন সকালবেলা গেটের বাইরে একটি পুরাতন রথ এল। যেমন মহাভারতের রথের ছবি দেখা যায়—ঠিক তেমনি দেখতে, শুধু ঘোড়ায় টানা নয় বলীবর্দ বাহিত জীর্ণ বিবর্ণ ঘেরাটোপ ঢাকা একটি রথ এসে দাঁড়াল। এবং পিসী বা ঠাকুরঝি রথ থেকে নামল।

দ্বারবান ভৃত্যবর্গ আজ সহসা সেপাই ঠাকুরানীকে ঘেরাটোপ পরা পর্দানসীন রথ থেকে নামতে দেখে অবাক হয়ে চেয়ে রইল। এতদিন যাতায়াতে আর তাদের ভয় সমীহ ছিল না। দু-একজন এগিয়ে এল। কৌতুকভরে একজন জিজ্ঞাসা করলে, 'বাঈজী, আজ একি ব্যাপার, পর্দানসীন সেজেছ ?'

সেপাই বাঈজী শুধু হাসলে, কিছু বললে না।

তারপর গৃহস্বামীর মুখ ধোবার প্রাঙ্গণের দিকে এল। আজ আর হাতজোড় করে নমস্কার বা সেলাম 'বন্দেগী' নয়, মাথা মাটিতে ঠেকিযে 'ঢোক' (প্রণাম) জানিয়ে উঠে দাঁড়াল।

কর্তা জিজ্ঞাসু নেত্রে চাইলেন।

সে বললে, 'আপনার কৃপায় আজ আমার পিতৃবংশের সম্পত্তি ও সম্মান উদ্ধার করতে ও রাখতে পেরেছি। ভাইবৌকে আর কার কাছে রাখতাম ? তার ইজ্জত মান. কে রাখত আপনার বাড়ির মত করে !—তাকে নিয়ে ঘুরলে আমার বিষয় উদ্ধারও হত না। আজ আপনার শরণ নিয়ে সব ফিরে পেয়েছে এরা। এখন তাদের নিজের বাড়িতে ফিরিয়ে নিযে যাবার হুকুম নিতে এসেছি। আপনার হুকুম হলে তাদের নিয়ে চলে যাই।'

সেপাই পিসিমার আর পুরুষোচিত সেই দৃঢ় বলিষ্ঠ চেহারা নেইও, রোগা হয়ে গেছে অনেক। চেহারাও কোমল হয়ে গেছে। ফিবে পাওয়া সম্পদ ও সম্মান তার মনকেও নরম করে দিয়েছে যেন। কৃতজ্ঞতায তার চোখ ছলছল করে এল।

গৃহস্বামী খুশি মনে জিজ্ঞাসা করলেন, 'সব ফিরে পেয়েছ ? সম্পত্তি জমিজমা ?'

নারী বললে, 'হ্যা প্রায় সবই পেয়েছি। তবে ক্ষেতখামারে গরু মহিষ চরিয়ে নষ্ট করে দিয়েছে অনেক। ঘাসের গুদামে আগুন লাগিয়ে নষ্ট করেছে। তবু মামলায় তাদেরই হার হয়েছে। আমরা আমাদের 'বাপোতা' (রাজস্থানের পৈতৃক বিষয়ের নাম) বাপের ভিটে ফিরে পেয়েছি !'

নারী ভিতরে এল, গৃহিণীকেও আজ প্রণাম জানাল। বললে, 'মাজী, আপনার বাড়িতে এত পুরুষের মাঝেও আমার ভাইয়ের বৌয়ের জন্য ভয় ছিল না।…অন্য জায়গায় আমি এত নিশ্চিন্ত হতে পারতাম না। আপনার কাছে ওরা সন্তানের মত ছিল। আজ আপনার কাছ থেকে নিয়ে যাবার হুকুম দিন।'

ধনজীর মা উঠান ধোবার ঝাঁটা ফেলে ননদকে জড়িয়ে ধরল। তাদের চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল।

তারপর আবার ঝাঁটা হাতে নিয়ে ঘর ধুয়ে কাজ সেরে নিয়ে স্নান সেরে রঙীন নতুন ঘাগরা, জরি দেওয়া ওড়না, সূক্ষ্ম কাঁচুলির উপর হাতওয়ালা জামা পরে ছেলে-মেয়েদের জরির জামা পাগড়ি পাজামা পরিয়ে সাজিয়ে এনে গৃহিণীকে প্রণাম করল। সে চাকরদের সঙ্গে কথা কইত না, রান্নাঘরের যে ব্রাহ্মণের কাছে ডাল তরকারী নিত, আজ অর্ধাবগুণ্ঠনে সজল চোখে সকলের কাছে বিদায় নিল করজোড়ে। কাপড় চোপড় গহনায় বিনীত নম্রতায় তাকে অভিজন দুহিতা বধূর মতই মনে হচ্ছিল। কুল পরিচয় আজ তার ঔদ্ধত্যের অর্থ বহন করে এনেছে।

অন্তঃপুরের ভৃত্যমহলে সাড়া পড়ে গেল ধনজীর মা'র জমিদারীর কথা, গহনার কথা, জমিদারীর আয়ের কথায়; তার নিজের ঘরের রথ এসেছে তাকে নিয়ে যেতে। সে পর্দানসীন ঠুকুরানী ('ঠাকুরানী' ঠাকুর অর্থে জমিদার) ছিল, বিপদে পড়ে ঝাঁটা ন্যাতা হাতে ধরেছে। চাকরি করে মাহিনা নিয়েছে এক হাতে করে, চোখ মুছেছে অন্য হাতে।

জমিদারী? জমিদারীর আয়? মুখে মুখে প্রশ্নে উত্তরে জমিদারীর আয় সম্পদে সমারোহের কাহিনী শত থেকে সহস্রের অঙ্ক বেড়ে যেতে লাগল।

কেউ বলে ওদের জায়গীরের জমিদারীর আয় দু হাজার। অন্যজন বলে পাঁচ হাজার, কেউ বলে আরও বেশী।—সন্দিগ্ধ সঙ্কীর্ণমনা লোকেরা চুপ করে থাকে, বিশ্বাস হয় না, তাদের ভালোও লাগে না। তারা বলে বাজে কথা, একেবারেই চাষা। জমিদারী না আরও কিছু।

সে যতই হোক, বা যাই হোক, ধনজীর মা ও তার সেপাই ঠাকুরঝি ছেলেমেয়েদের নিয়ে ছেলের হাতে তরোয়ালখানি দিয়ে দীর্ঘ অবগুণ্ঠনে মুখ আবৃত করে বাড়ির বহিঃপ্রাঙ্গণের সীমানার বাইরের পথে গিয়ে পূর্বপুরুষের রথের উপরে উঠে বসল। একদা মনিব! সেই মনিব বাড়িতে রথে ওঠা তাঁদের অসম্মান প্রকাশ করে যদি।

গ্রামে যেতে বেলা অপরাহ্নে ঢলে পড়ল। রথ পিছনে জল্পনাপরায়ণ মানুষ রেখে আনন্দিত বালক শিশু, জননী পিতৃস্বসাকে নিয়ে চলে। ক্রমে শহরের পথ ছেড়ে গ্রামের বালিভরা ধূসর পথ ধরল আর খানিক দূরেই তাদের এলাকা সীমানা পড়ছে। বাতাসে আন্দোলিত লীলায়িত ভুট্টা বাজরা যবের ক্ষেতের আভাস সীমানা যেন চোখের সামনে ভেসে আসছে ঐ দূর দিগন্তের ক্ষেত্র সীমান্তে!

রথের জালির জানলা দিয়ে ধনজীর মা ও পিসিমা পিতৃপুরুষের পদধূলিতে পবিত্র

স্মৃতিপুত গ্রামের ক্ষেতখামার দেখতে দেখতে চলে। নষ্ট করেছে ক্ষেত? ঘাসের গোলায় আগুন দিয়েছিল? ক্ষতি করেছে অনেক?

কিন্তু কই? সে ক্ষতির ক্ষত মনে আর দাগ কাটতে পারছে না। কোথায় ক্ষত? কোথায় ক্ষতি? তাদের চিরকালের মাটি, তাদের মৃণ্ময়ী জননীর কোলে ফিরে এসেছে। যেন মানসচক্ষে দেখতে পাচ্ছে ফণিমনসার বেড়া দেওয়া উঁচু মাটির দেওয়াল বেষ্টিত তাদের মৃণ্ময়ী অট্টালিকাখানি। কত যুগযুগান্তের জন্মমৃত্যু বিবাহ উৎসব শোকের স্মৃতি ভরা আছে যেখানে।

ভারতবর্ষ—১৩৬১

আরাবল্লীর আড়ালে

রাজপুতনার ম্যাপ খুললে কিংবা ঐ লাইনের রেলওয়ের ম্যাপ দেখলে সেলাইয়ের ফুলকাটা কাজের মতন রেখাবলী এঁকেবেঁকে নগর, অরণ্য, নদী, বাঁধ, রেলপথ ঘিরে-ঘিরে চলেছে দেখতে পাওয়া যায়। সেই আরাবল্লীরই ছোট কোলের শিশুর মত একটি গণ্ডশৈলের পাশের এক ক্ষুদ্র গ্রামে ধাপি জন্মেছিল।

বড় বোনের নাম ছিল মোহর, মেজো মেয়ের নাম হয়েছিল কেশর, সেজোর নামও ভালই রেখেছিল মা-বাপ—কস্তুরী; কিন্তু এর বেলায় আর ধৈর্য রইল না তাদের, জন্ম-মুহূর্তেই এর নামকরণ হয়ে গেল—ব্রাহ্মণ সজ্জন ছাড়াই। কে রাখল কে বলল ঠিক বোঝা গেল না, কিন্তু নাম হয়ে গেল—ধাপি। ও-দেশে কোন কিছু সুখ-দুঃখ যথেষ্ট হলে বা পেট ভরে গেলে, গ্রাম্যভাষায় ওরা বলে 'ধাপ গিয়া'। অর্থাৎ যথেষ্ট বা ঢের হয়েছে। এক কথায় 'আর না' থাক্; আমাদের আন্নাকালী থাকমনির মত আর কি।

দূরে দূরে নীল পাহাড়ের শ্রেণীর নীচে বাজরা, যব গম ও ভুট্টার লালায়িত ক্ষেত; ছোট ছোট বালির পাহাড় আর গণ্ডশৈলের পাশে, ধূ-ধূ করা বালির মাঝে গণ্ডগ্রামগুলি; কয়েক ঘর চাষী, কিছু অন্য জ্যাতি—ক্ষত্রিয় রাজপুত নাপিত দারোগা কিছু বা ব্রাহ্মণ-বেনে; মাটির দেওয়াল-দেওয়া খড়ে-ছাওয়া ঘর, বলদে জল-টানা গভীর অতলস্পর্শী কয়েকটি কুয়া, সকাল-সন্ধ্যায় তারই পাশে, জলার্থিনী কলসী-মাথায় নারীর ভিড়, পুরুষের তারই একান্তে তাম্রকূট সেবন আর সুখ-দুঃখের আলোচনা,—এই নিয়ে গ্রাম। ব্রাহ্মণ-বেনের (বৈশ্যের) সাধারণ ঘরের মেয়েদের গোল ভাবের শান্ত মুখ, প্রায় ফরসা রং, ধীর চোখ, কোমল হাসি, অনতিদীর্ঘ দেহ; আর রাজপুত-

ক্ষত্রিয়ানীদের অবনীবাবুর রেখাটানা শক্তিমূর্তির মত লম্বা ধরনের মুখের তীক্ষ্ণ গঠন, কালো দীপ্ত দৃষ্টি, পাতলা বাঁকা ঠোঁট, উজ্জ্বল গৌর এবং দীর্ঘ দেহ।

দারোগা জাতটা এদেরই ঘরের সঙ্কর। রাজপুত-ক্ষত্রিয় ঘরের দাস-দাসীর সন্তান অর্থাৎ ক্ষত্রিয় পিতার দাসীর সন্তান। এদের দারোগা বলে। বহুদিন ধরে ক্রমশঃ এরাই একটা জাত হয়ে গেছে।

ধাপি ছিল এই দারোগা ঘরের মেয়ে। "যৌবনে বহুপরিচর্যারত" ভর্তৃশালিনী কি ভর্তৃহীনা জানা নেই—এক পিতামহী বা মাতামহীর ক্রোড়ে যে ক্ষত্রিয় সন্তান জন্মলাভ করেছিল সে তার পৈতৃক রক্তধারার রূপের বৈশিষ্ট্য পুরো পেয়েছিল। ধাপিরাও তার প্রসাদ থেকে বঞ্চিত হয় নি। কিন্তু সবচেয়ে বেশি প্রসাদ পেয়েছিল ধাপি। কোন পূর্ব-প্রপিতামহীর রূপের আলো তার তনুটিকে যে অপরূপ দীপ্তি দিয়েছিল, পাশাপাশি কাছাকাছি আর কোন গ্রামে বৈশ্য ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় দারোগা-ঘরে তেমন সুন্দরী আর কেউ ছিল না।

জন্ম-মুহূর্তে ধাপি নাম হলেও আদর করে রাঙা আঙ্‌রাখা রঙীন ঘাগরা কপালে টিপ মাথায় লাল সুতো দিয়ে বিনানো চোটি (বেণী), পায়ে মুরাঠি (মেল), কানে পিপ্পল পাতার ঝুমকো, গলায় বলেওড়া (রূপার মোটা হার) হাতে পৈঁছাকঙ্কণে তার সাজের ত্রুটি বাখে নি মা-বাপ-বোনেরা!

কুয়ার পাশে বাঁধানো প্রণালী, তার পাশে খেলী (ছোট চৌবাচ্চা), প্রকাণ্ড চামড়ার চড়শ (থলে) করে জল উঠে আসছে, আর প্রণালী বয়ে খেলীতে পড়ছে, তারপর চাষীর কাটা মাটির আলবাঁধা পথে ক্ষেতে ক্ষেতে চলে যাচ্ছে। মাঝে-মাঝে গ্রামের মেয়েরা বাঁধানো প্রণালী থেকে মাটি বা পিতলের কলসে জল ধরে নিয়ে যাচ্ছে। অনেকে খাবার জল হাতে করেই ডোলে করে টেনে তুলে নিচ্ছে,—এই নিয়ম-বাঁধা দৈনিক কাজ।

কেশররা তিন বোন তিনটি চরি (পিতলের ও-দেশী কলসী) নিয়ে আসে। ছোট্ট একটি চরি-মাথায় ধাপিও তাদের সঙ্গে আসে। গ্রামের বয়স্কা, প্রৌঢ়া, বালিকা, তরুণী কলসী-মাথায় বাসন-হাতে সবাই আসে, শ্রেণী করেই দাঁড়ায় এখনকার 'কিউ'য়ের মতই। তার মাঝে গল্প হাসি কলহ কোলাহল সমান ভাবে চল্‌তে থাকে। যাদের হাতে বাসন থাকে, তারা খেলীর পাশে মাজতে বসে। যারা জল ভরে তারা জল নিয়ে চলে যায়। নানা রকমের হল্‌দে নীল গোলাপী রংয়ের ওড়না, খয়েরী রঙের মোটা রেজী-র (খদ্দরের) ওপর সাদা ফুল ছাপা ঘাগরা, গায়ে নানা টুকরাজোড়া রঙীন কাঁচুলি, মাথায় বোরলা (রূপার পুঁটে, নারীর ভূষণ—কুমারী ও সধবা পরে), সর্বাঙ্গে ভারি ভারি রূপার গহনা, কারও বা সোনারও একটি-আধটি আছে ; মাথার

বিঁড়ের উপরি-উপরি কলসী বসিয়ে, লুগড়ি কোমরে গুঁজে অনায়াসে তারা আবার গল্প করতে করতে চলে যায়।

সহসা একদিন গ্রামের ঢিমে তালের ছন্দ কেটে গেল। জল ভরতে গিয়ে মেয়েরা বেশী করে ঘোমটা টেনে দিয়ে আঙুলের ফাঁক দিয়ে একটি করে চোখ বার করে দেখতে পেলে, কূয়ার ধারের প্রকাণ্ড অশ্বত্থতলায় যেখানে পুরুষেরা তামাক খায়, বিশ্রাম করে, সেখানে লাল রংয়ের আচ্‌কান-পরা কোমরে তকমা আঁটা, হাতে রূপার আশাসোটা, মাথায় শহুরে রঙীন লহরিয়া (ঢেউখেলান) রংয়ের সাফা (পাগ্‌ড়ি) পরা দু'-তিন জন লোক এসে বসে গল্প করছে। দু'জন বর্ষীয়সী নারীও রয়েছে একটু দূরে আর একটা গাছতলায়।

মেয়েদের দেখে মেয়েরা দু'জন এদিকে এগিয়ে এল! তাদের শহুরে সভ্য পচ্ছিচ্ছদ, —মল্‌মলের রঙীন ঘাগরা, হাল্‌কা পাতলা কাপড়ের চওড়া জরিপাড় লুগ্‌ড়ি (ওড়না) গায়ে, কাঁচুলির উপর সদ্‌রি (হাতওলা জরির কাজ করা জামা), সর্বাঙ্গে সোনা-রূপার বিপুল ওজনের গয়না ঝলমল্ করছে।

ঘোমটা যারা দিয়ে রইল তারা ঘোমটাও খুলল না, কথাও বলল না। কিন্তু তাদের আশপাশের বালক-বালিকা-শিশুর দল কয়েক মুহূর্তেই গ্রামে রটান করে দিল—অজস্র গহনা-পরা, লহরিয়া রংয়ের পাগড়ি, লাল রংয়ের আচকান পরা নরনারী কারা এসেছে তাদের গ্রামে। তাদের সঙ্গে আশাসোটা শিঙাধারী চোপদার ও সঙীনধারী সেপাই এসেছে। মাঝে মাঝে তারা শিঙা বাজাচ্ছে। দেখতে দেখতে গ্রামের বর্ষীয়সী অর্ধবয়স্কা মেয়েদের সমাগম হতে লাগল।

ধাপিরাও মাথার চরি হাতে নিয়ে এসে দাঁড়াল। মলিন সবুজ আঙবাখি পরা, হলদে রংয়ের খদ্দরের ওপর সাদা বুটিদার মোটা ঘাগরা পরা ধাপিকে দেখা গেল। গ্রামে জল্পনা-কল্পনার আর শেষ রইল না। মেয়েরা বলাবলি করে,—আগন্তুকদেব ওড়না ঘাগরার বিচিত্র রংয়ের কথা, গহনার গুরুভারের কথা, কাচের চুড়ির বাহারের কথা। গ্রামের বর্ষীয়সীরা সেই নবাগতা বর্ষীয়সীদের কাছে শুনে আসে দূর শহরের অপরূপ কথা; রাজঅন্তঃপুরের ঐশ্বর্যের কথা, সোনা রূপা হীরা মুক্তার ঝলমলে বসন-ভূষণ করা রানীদের কথা, তাদের সখীদের কথা এবং আরও কত কি রহস্যময় জীবন-মৃত্যু-প্রেমের কাহিনী। যার কিছুটা ওরা বুঝতে পারে, অনেকটাই বুঝতে পারে না, শুধু অভিভূত হয়ে শোনে। প্রকাণ্ড প্রাসাদের পর প্রাসাদ, অট্টালিকা সৌধময় জনাকীর্ণ অপরূপ নগরী; যার পথ বাঁধান, পথে শ্রেণীবদ্ধ আলো; গাড়ি-ঘোড়া তাঞ্জাম রথের পালকির শেষ নেই; সেখানকার মেয়েরা চিত্র-বিচিত্র নানাবিধ বসন, অলঙ্কারের, বহুতর সুখের বিলাসের উপকরণে পরিপূর্ণ। সেখানে সব সময়ে সব পাওয়া যায়, দোকানে বাজারে সাজান থাকে সব জিনিস, হাটের দিনের জন্য কারুকে অপেক্ষা করতে হয় না। পুরুষেরা কত

রকমের কাজ করে। শুধু চাষ-বাস? ছিঃ! কত লেখা-পড়ার কাজ, কাছারী, আদালত, মহকুমা আম (মহকুমা)। তাতে কত লোক, কত জাতি! ওরা ধবধবে সাদা রংয়ের সাহেব দেখেছে, ওরা ঘোড়া-গরুহীন হাওয়া গাড়িও দেখেছে, ওরা কতবার রেলগাড়িতে চড়েছে। ওদের দেশে নাটকঘর আছে, সেখানে বিলিতী ছবির ছায়াবাজী দেখা যায়। সবাই দেখে টিকিট কিনে। মেয়েরা? শুধু জল তুলে গম পিষে রুটি গড়ে দিন কাটায় না। আটা কিনতে পাওয়া যায়। জল তোলার লোক আছে। মেয়েরা বড় বড় ঘরে সবাই বসেই থাকে। শুধু বসে থাকে? ইচ্ছা হলে গান গায়, পান খায়, শুয়ে থাকে, কিছু করে না, করতে হয় না। তারা নাটক দেখতে যায়, বেড়াতে যায়।

বিবরণের পর বিবরণ, কাহিনীর উজ্জ্বল বর্ণনা গ্রামটিকে কয়েক দিনের মধ্যেই মন্ত্রমুগ্ধ করে ফেলল। শ্রোত্রীদলের বর্ষীয়সীরা বাড়ি এসে গল্প শেষ করে প্রতিদিনই নিঃশ্বাস ফেলে, বলে, তা আর কি আমাদের কখনও ও-সব দেখা হবে! এবং বালিকা কিশোরী তরুণী সব বয়সের মেয়ে সকলেই সে কাহিনী আরব্য উপন্যাসের মত বার বার শুনতে চায়। তাদের কৌতুহলের সীমা থাকে না সব কথা শোনবার জন্য। আর! আর যদি কোন দিন কেউ নিয়ে যায় সেই স্বপ্নের মত অপরূপ দেশে!

বড়রা বর্ষীয়সীরা গ্রাম্যবৃদ্ধরা অনুপস্থিত থাকলে, এরা বলে তাদের কাছে রাজ-অন্তঃপুরের কাহিনী, কত সখী, কত অপরূপ সুন্দরীর কথা—যারা কোন দিন হয়ত রানীদের অতিক্রম করে রাজার সুনজরে পড়বে! তার পর? রহস্যময় ভাবে চোখ টিপে বলে—রানীরাও তাদের ভয় করেন! তারা রাজার প্রিয়পাত্রী পরম আদৃতা, তারা খোজাদেরও শাসন করে—কখনও কখনও তাদের গায়ে রানীদের মতই গহনা, পায়ে সোনার মল, মুরাঠা পাঁয়জোড়।

অবাক্-বিস্ময়ে শ্রোত্রীদের বাক্যস্ফূর্তি হয় না। সোনার মল, পাঁয়জোড়? সোনার জিনিস তো পায়ে পরে না কেউ। স্যাকরাদের মেয়ে মনফুলী বিজ্ঞভাবে বলে, 'কই, সোনা তো এখানে 'পাটেল'জীর বাড়ির মেয়েরাও পায়ে পরে না, তারা তো খুব বড়লোক! সোনা পায়ে পরতে নেই!'

শহরবাসিনীরা হেসে উঠে বিদ্রূপ করে বলে—'বড়লোক! পরতে নেই! পাটেলজী! চল না তোরা আমার সঙ্গে, আমি তোদেরই একদিন সোনার মল পরাব। তাজিমী দিয়ে রাজা নিজের হাতে সোনা পরিয়ে দেন তাদের পায়ে। কত সুন্দর মেয়ে আমরা নিয়ে গেছি। ঐ তো সরবতী বাঈ—সে পাত্রী থেকে পর্দায়েত হল আমাদেরই সামনে। এখন সোনার মল পায় নি? মহারাজা তাকে দেখে উঠে দাঁড়ান, রানীদেরও দাঁড়াতে হয়, দু'জন লালজী সাহেবের মা সে! তার কত সম্মান, তাজিমী পেয়েছে,

তার আলাদা রাওলা (মহল) গাড়ি পালকি রথ। ছিল তো তোদেরই মত গেঁয়ো মেয়ে। কপাল ফিরে গেল না তার ? শহরের জানত কি ?'

মনফুলী, ঘিসি, ধাপি, কেশর, কাবেরী সব অবাক হয়ে মুগ্ধ হয়ে চেয়ে থাকে। মৃদু হেসে একজন শহরবাসিনী বলে, 'তোরা যদি যাস তো আমি নিয়ে যাব।'

আশা-আকাঙ্ক্ষা কৌতূহলে বালিকারা মূক মূঢ় হয়ে যায় ! যদি ? যদি যেতে দেয় মা-বাপ ; উৎকণ্ঠিত বালিকারা জিজ্ঞাসা করে, 'কবে ফিরে আসতে পাবে যদি যেতে পায় ?'

শহরবাসিনীরা অট্টহেসে ওঠে—'ফিরে ? ফিরে এসে কি হবে ? তখন রানীদের মত নিজের মহলে থাকবি, তোদের তালুক-মুলুক হবে, হুজুর সাহেব তোদের রাওলায় এসে বসবেন কত দিন, তোদের ছেলেমেয়ে হবে, ছেলে লালজী হবে, মেয়ে বাঈজী লাল হবে। ফিরবি কি জন্য এই ধূ-ধূ করা বালি ভরা পাহাড়ে মরুভূমির দেশে ?'

কেশর কাবেরী নতমুখে বসে থাকে। তারা বড় হয়েছে। কিছু যেন বুঝতে পারে ভিতরের কথা।

কিন্তু শহরবাসিনীরা ওদের দিকে চেয়ে বলে, 'ওদের নেব না। ওদের বিয়ে হয়ে গেছে যে। আমরা সুন্দরী কুমারী মেয়ে খুঁজছি।' তারা ধাপি, মনফুলী' ঘিসিদের দিকে চায়। 'আমরা বিয়ে হওয়া মেয়ে নিই না,' আবার বলে।

আশা-উৎকণ্ঠায় ধাপি মনফুলী চঞ্চল উদ্বেল হয়ে ওঠে ! ওরা কুমারী, এখনও বিয়ে হয় নি সৌভাগ্যক্রমে।

আর কাবেরী কেশরও যেন মনে মনে একটু নিরাশ হয়ে যায়, কি আকাঙ্ক্ষা যেন কিসে প্রতিহত হয়ে গেল। সোনার মল ? গহনা অথবা অপরূপ না-দেখা শহরের জন্য ? কিম্বা নাটকঘর, হাওয়া-গাড়ি ?

সহসা এক দিন গ্রামের লোকেরা শুনলে, যারা এসেছিল তাদের সঙ্গে গতরাত্রের শেষ প্রহরে যখন গ্রামের সকলে ঘুমচ্ছিল তখন মনফুলী ধাপি আর মনফুলী ধাপির বাপ শহরে চলে গেছে !

ধাপির মা-বোনেরা কিছুই জানে না, মনফুলীর বাড়ির কেউ জানে না।

সমস্ত গ্রাম যেন মূঢ় স্তব্ধ হয়ে গেল।

ধাপির মা হতবুদ্ধির মত কোলের ছেলেটিকে স্তন্যপান করায়, তার ওপরের মেয়েটিকে নিয়ে বসে থাকে। মেয়েরা,—কেশর মোহর রুটি গড়ে, ভাই-বোন মাকে খেতে দেয়। মা অন্যমনে একটু মুখে দেয় আর উন্মনা ভাবে চারদিকে তাকায়, কি ভাবে মুখে কিছুই বলে না। কয়েক দিন পরে ধাপির ও মনফুলীর বাবা শহর থেকে ফিরে এল। শহর দেখার গর্বে উৎফুল্ল এবং কন্যাদের ভাবী কালের সৌভাগ্য আশায়

গর্বিত তাদের মুখে দরিদ্র গ্রামের কৌতূহলী সকলে ঈর্ষাকাতর হয়ে, বিতৃষ্ণাভরে উদাসীন ভাবে শুনল, যারা এসেছিল তারা ধাপিকে রাজ-অন্তঃপুরের জন্য নিয়েছে, শুকে দু'শো টাকা দিয়েছে। আর মনফুলীর জন্য একশো টাকা দিয়েছে।

ভিড়ের মধ্যে থেকে কে বললে, 'তুমি বেচে দিলে তোমার মেয়ে?'

ক'দিন শহরে থেকে, গতরাত্রে 'কলালে'র দোকানে পান আহার করে তাদের আমিরী মেজাজ তিক্ত হয়ে উঠল এ কথায়। মনফুলীর বাবা বললে, 'বেচব কেন? এত দিন মানুষ করি নি? তার তো খরচ লেগেছে! হুজুর সাহেব অমনি অমনি নেবেন কেন?'

কন্যা-গর্বে গর্বিত ধাপির বাপ বললে, 'গাঁয়ে তো মেয়ে রয়েছে তা আর কারুকেই নিল না কেন?'

ঐশ্বর্য বিলাসহীন নিতান্ত দরিদ্র গ্রামের অধিবাসীরা ক্রমে ক্রমে ফিরে গেল, আর বিশেষ কিছুই বললে না।

ছোট্ট পাহাড়ের পিছন দিকে সূর্য অস্ত গেল, সঙ্গে সঙ্গে শহরের দিকের রেলগাড়ি-খানা দূরের বড় গ্রামের স্টেশন পার হয়ে চলে যাবার ঝিক্‌ঝিক্ শব্দ মিলিয়ে গেল। গ্রামবিচ্ছিন্নাদের অনাগত ভাবী কালের ঐশ্বর্যময় বিলাসব্যসনময় দিনের আশার স্বপ্ন যেন ঐ শব্দে নিস্তব্ধ গ্রামের অন্তর মথিত করে তুলতে লাগল। যেন তা সুখ নয়, যেন তা দুঃখও নয়, তারও চেয়ে গভীর কিছু। যেন চিরন্তন মূঢ় শূন্যতাময় অন্ধ বিরহ-বেদনা। আর মাটির দেওয়ালে খড়ের চাল দেওয়া ছোট্ট ঘর দু'খানিতে মা-বাপের কাছে ভাইবোনের মাঝে শুধু দুটি ছোট জায়গা চিরদিনের মত নিশ্চিহ্ন ভাবে খালি হয়ে গেল; তাদের মূঢ় মূক জননীরা তাদের খাবার থালা পেড়ে নিয়ে আবার তুলে রাখে, শোবার জায়গা বাড়তি হয় সেদিকে উন্মনা হয়ে চেয়ে থাকে। স্ত্রীর দিকে চেয়ে ধাপির বাবা বলে তামাক খেতে খেতে,—'এখন তো পাত্রী হবে'; ব্যাখ্যা করল—'এই ছোট মেয়ে নাচ গান শিখলে তাদের পাত্রী বলে। তার পর চাই কি হুজুর সাহেবের নেকনজরে পড়লে পর্দায়েত হয়ে যাবে। তার পর জোরকপাল হলে মেয়ে আমাদের পাশোয়ান হবে। পর্দায়েত হল পাশোয়ানের চেয়ে একটু নীচে, পাশোয়ান রানীর পরেই। সরবতী বাঈ এখন 'প্রেম-রায়' খেতাব পেয়েছে—পাশোয়ান হয়ে গেছে।'

ধাপির মা'র চোখ দিয়ে দু'ফোঁটা জল গড়িয়ে আসে, সে কিছুই বলতে পারে না। ঐশ্বর্য-বিলাস-আকীর্ণ ওর একান্ত অজানা সেই সুখ-ব্যসনের কোন কল্পনা তার মনে জাগে না, শুধু ধাপির মুখ, হাসি আর কথা তার মনে পড়ে।

বহু বৎসর কেটে গেছে—প্রায় দশ বছর। ছোট লাল কুর্তা আর লাল চুড়িদার

পাজামার ওপর ওড়না পাত্রীদের নির্দিষ্ট পোশাক-পরা ধাপির বালিকা-তনুদেহ ক্রমে ক্রমে অপরূপ হয়ে বিকশিত হয়ে উঠেছে। মেয়েরা সখীরা দেখে মুগ্ধ হয়। সর্দার খোজা 'খুশ্ নজরজী'র মনে একটা অপূর্ব স্নেহ আর অদ্ভুত ভয়ভাবনা জাগে তার জন্য। এত রূপ! রানীদের পাশোয়ানদের ঈর্ষাতিক্ত দৃষ্টি অতিক্রম করে যায় নি। সকলের চোখ পড়েছে সেদিকে, কেউ বা মুগ্ধ হয়ে দেখেছে, কত জন বা তিক্ত, কত জন ভীত-শঙ্কিত চোখে দেখে তাকে—পাছে রাজার মুগ্ধ দৃষ্টিও তার ওপর পড়ে কোনও দিন, আর তারা তাদের বহু-মানসমাদৃত স্থানভ্রষ্ট হয়।

বিরাট অন্তঃপুর। জনাকীর্ণ। শুধু মেয়ে কিন্তু। দাসী, সখী, সেবিকা, সহচারিণী, প্রতিহারিণী, সব মেয়ে—যেন অসংখ্য। তিন রানী—তাঁদের এক একজনের এক এক প্রাসাদ। তাঁদের পিত্রালয়ের সখী দাসী; রানীত্ব লাভের পর পতিগৃহের সখী সেবিকাতে নিজ নিজ অন্তঃপুব পরিপূর্ণ। এ ছাড়া পাশোয়ান পর্দায়েতদের রাওলা (মহল) ভরা দাসী সহচারিণী।

পুরুষ শুধু রাজা! এবং লালজী সাহেব দু'জন,—প্রেমরায়ের ছেলে। অবশ্য তাদের শুধু খুশ্নজরজীর অনুমতি নিয়ে অন্তঃপুরে প্রবেশের যাতায়াতের অধিকার আছে মাত্র।

মাঝে মাঝে জলসা হয়। উৎসব-প্রাঙ্গণে নাচ-গান-অভিনয় হয়। রাজার স্বর্ণ-খচিত আসন পড়ে,—তারপর পদানুসারে মহারানীর পর অন্য রানী, পাশোয়ান, পর্দায়েতদের আসন পড়ে। তারপর নিমন্ত্রিত অভ্যাগতদের, সমাগতদের আসন থাকে। একের পর এক নাচের দল, গান গেয়ে নেচে চলে যায়।

রাজার সামনে থাকে রূপার থালায় মধুর মদির পানীয়, তার জন্য ছোট ছোট কাচের গেলাস, সোনার তবকে মোড়া পান, লবঙ্গ, এলাচ।

কোন্ পুরাকালের প্রথামত মহারানী পানীয় প্রথমে ঢেলে দেন মহারাজার গ্লাসে, তারপর সেটা রাজার ওষ্ঠ-পৃষ্ঠ হয়ে রানীর অধর-স্পর্শ লাভ করে। তারপর একে একে অন্য রানী, পাশোয়ান পর্দায়েতদের এবং লালজীদের মধ্যে ঘুরে আসে।

নাচের গানের—বারবার পুনরাবৃত্তি ও পানীয় পাত্রের একইভাবে মুখে মুখে আবর্তনে রাত্রির প্রহরের পর প্রহর কেটে যায়।

সেদিন জলসা প্রেমরায়ের মহলে। প্রেমরায়ের পাত্রীর দলের মধ্যে সহসা দেখা যায় ধাপিকে। মদিরামুগ্ধ রাজা সখীদের দিকে চেয়েছিলেন। সহসা প্রেমরায় মহারানীর আসনের কাছে এসে নত হয়ে কুর্নিশ করে—কিছুক্ষণের জন্য অন্যত্র যাবার আবেদন জানালেন। নিয়মিত সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সখীর দলও চকিত হয়ে উঠে দাঁড়াল তাঁর অনুসরণ করার জন্য।

খুশ্‌নজরজী এসে দাঁড়ালেন প্রথানুসারে প্রত্যুদ্গমনের জন্য, তারপর মুহূর্তের জন্য তার মাঝে চকিতের মত ধাপিকে দাঁড়ানো দেখা গেল। চাঁপাফুলের মত উজ্জ্বল রং, কালো চুলে ঘেরা অপূর্ব সুন্দর মসৃণ পরিচ্ছন্ন কপাল, কালো সফরীনেত্র, চমৎকার টুকটুকে দুখানি ওষ্ঠাধর সহসা যেন ঝকমক করে উঠল ঝাড়-লণ্ঠনের আলোয় এবং নিমেষের মধ্যেই আর তাকে দেখা না। সকলের আড়ালে মিলিয়ে গেল। প্রেমরায়ও দেখতে পেলেন তাকে ঐ এক মুহূর্তেই।

মহলে এসে প্রেমরায় ডাকলেন, 'গোদাবরী বাঈ!'

ধাপি এসে কুর্নিশ করে সামনে দাঁড়াল। রাজ-অন্তঃপুরে এসে ধাপির নাম হয়েছিল, গোদাবরী। ধাপি নামটা গ্রাম্য।

'তোমাকে বারবার বলেছি না, তুমি হুজুর সাহেবের জলসায় যাবে না?' প্রেমরায় গম্ভীর মুখে প্রশ্ন করলেন। ফর্সা রং আসব ও ক্রোধের উত্তেজনায় লাল হয়ে গেছে—মুখের ভাব তিক্ত বিরাগে হিংস্র ঘৃণায় ভরা!

'আমি চাই না, তোমাকে হুজুর সাহেব দেখতে পান।' তারপর খানিকক্ষণ কি ভেবে বললেন, 'আচ্ছা আর তোমাকে দেখতে কখনও কেউ পাবে না।' প্রধান সখী বাড়ারণজীর দিকে চেয়ে বললেন, 'ওকে বাঁদী কুইয়ের একটা ঘরে রাখগে।'

এক মুহূর্তের মধ্যে সব ঘরখানা আড়ষ্ট হয়ে গেল। দীর্ঘকালের মধ্যে কোন বাঁদীর এমন শাস্তি ওরা দেখে নি। সহসা দ্বারের কাছে বৃদ্ধ খুশ্‌নজরজীকে দেখা গেল, তিনি অতর্কিতে নিয়মবিরুদ্ধভাবে 'কাকে?' জিজ্ঞাসা করেই কৌতূহল সম্বরণ করে জানালেন, 'হুজুর সাহেব সেলাম দিয়েছেন।'

প্রেমরায়ের কঠিন মুখ কঠিনই রইল। শুধু শান্তভাবে 'যো হুকুম' বলে তিনি খুশ্‌নজরজীর অনুগমন করলেন।

দুর্গ-পরিখার নাম 'তালকটোরা'। অর্থাৎ যে তটিনীর আকার বাটির মত। বহু কালের জমা জলে স্রোতহীন গভীর হ্রদ—নদী নয়। বর্ষায় কূলে কূলে পূর্ণ হয়ে ওঠে, গরমে শুকিয়ে কোথায় নেবে যায়, শীতে স্থির শীতল মুখে আকাশের দিকে চেয়ে থাকে প্রাসাদের ছায়া বুকে নিয়ে। অসংখ্য কুমিরে সমাকুল। তারাও বর্ষায় ভেসে বেড়ায়, কখন গরমে কাদার মধ্যে লুকিয়ে থাকে, শীতে পরিখা-কিনারে স্থিরভাবে রৌদ্রে শুয়ে থাকে।

দুর্গতল বর্ষায় পরিখার সঙ্গে প্রায় সমান সমতল হয়ে যায়। সেদিন প্রাসাদের নীচের ঘরগুলিতে জল ভরে যায়। বহু গ্রীষ্মের বিলাস-শয়নাগার, দাসী-বাঁদীর গ্রীষ্মের শোবার ঘর, থাকার ঘরও ঐ গৃহশ্রেণীর মধ্যে পড়ে।

তারি মাঝে আছে বন্দিশালা। নিরপরাধ, নিরীহ অপরাধিনীদের নির্বিচার

কারাগৃহ। প্রধান অপরাধ—যাদের রূপের প্রতিদ্বন্দ্বিতা অথবা কণ্ঠের স্বরের শ্রেষ্ঠতা; অথবা অকারণ বিঘ্নকারিতার অপরাধ তো আছেই। সলিটারি সেলের মত যেন!

এখনও লাল চুড়িদার কুর্তা ওড়না-পরা স্বল্পপরিণত কিশোর তনুশালিনী সামান্য পাত্রী মাত্র—সখীও নয়, বহু আকাঙ্ক্ষিত পর্দায়েত তো নয়ই,—ধাপি ওরফে গোদাবরী বাঈ প্রধানা সখীর হাত ধরে গ্রাম থেকে অজানা-পথে প্রাসাদে আসার পর আজ আবার নতুন করে আর এক না-জানা পথে ধীরে ধীরে নেমে গেল। সব সঙ্গিনী দাসীরা এক মুহূর্তেই ওদের দেখে সরে গেল। সমবেদনার সাহস তাদেব নেই, কথা বলার ভরসা নেই, আতঙ্কে সকলে যেন ভোজবাজীর মত মিলিয়ে যেতে লাগল।

নির্জন অজানা গলি সুড়ঙ্গ পথ অতিক্রম করে যন্ত্রচালিতের মত কত সিঁড়ি কত নীচু গড়ানে পথ বেয়ে ধাপি নেমে এল।

সারি সারি ঘর! দিনেও অন্ধকার যেন। উপরে অনেক উঁচুতে ছোট ছোট জানালাব মত আছে। বর্ষায় সেখানে জল পৌঁছায না।

ঠাণ্ডা ঘরের মেজেতে দু'খানা চট এবং একটা কম্বল পড়ে আছে। ধাপিকে সেখানে হাত ধরে বসিয়ে দিয়ে বডারণজী বললে, 'সন্ধ্যেবেলা আলো দিয়ে যাবে আর খাবাবও পাবি ঠিক সময়ে।'

ফ্যালফেলে হতবুদ্ধি হরিণের মত কালো চোখ দুটি মেলে সে চেয়ে রইল তার মুখপানে, কিছুই কথা বলতে পারল না। হয়ত বড়ারণের করুণা হল, তার মুখ দেখে বললে, 'ভয় নেই, আমি আসব আবার।'

সিঁড়ি দিয়ে সে ওপারে উঠে গেল। দরজা বন্ধ হয়ে গেল। অভিভূত ধাপি অশ্রুহীন চোখে শুয়ে থাকে। সহসা কিসের শব্দে ঘুম ভেঙে যায় তার। দেখে—সামনে দু'খানা রুটি, এক ঘড়া জল আর একটি প্রদীপ রেখে গেল একজন দাসী। চেয়ে দেখলে ওপরের আলোও আর নেই। অকস্মাৎ তার মনে পড়ে যায়, সে একেবারে একা। এই গৃহ-শ্রেণীর মাঝে কোথাও কেউ নেই। এবং বহু কাহিনী আশেপাশে থমথম করছে। একদা যারা এখানে ছিল আর কোনখানে যেতে পায় নি, তাদের কথা মনে করে তার সর্বাঙ্গে যেন কাঁটা দেয়। নিস্তব্ধ ঘরের আশেপাশে কোনখানে মানুষের সাড়া নেই, জীবিত জীবের সংস্পর্শ নেই।

ধাপি রুটি খেতে পারে না, গলা কাঠ হয়ে গেছে, জল খায় শুধু। তারপর প্রদীপটা বাড়িয়ে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসে থাকে। পিঠে দেওয়াল থাকে আর আশপাশে সামনে বারবার চায়। তার চীৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছে হয় কিন্তু কণ্ঠস্বর তার একেবারে বসে গেছে যেন।

সারারাত সে জেগে বসে থাকে। মাঝে মাঝে ঘরের পাশে পরিখায় জলের শব্দ হয় ছলাৎ ছলাৎ করে, তার মনে হয় যেন তালকটোরার জলটা তার জীবিত সঙ্গী।

সকালবেলা রুটি নিয়ে বড়ারণ এল। ভয়ে অনাহারে অনিদ্রায় প্রেতের মত ধাপিকে দেখে সে হতবুদ্ধি হয়ে গেল, বললে, 'তুই খাস নি কেন?' আজ এই সামান্য কথাই সহসা যেন ধাপিকে সাহস দিল। সে বড়ারণের পায়ে লুটিয়ে পড়ল। কাঙ্গালের মত বললে, 'আমাকে আমার মা'র কাছে পাঠিয়ে দাও বড়ারণজী। আমি আর কখনও এখানে আসব না, হুজুর সাহেবের সামনে বেরুব না।'

বড়ারণ বললে, 'তোকে পাঠালে যে আমার গর্দান যাবে, নইলে আমি কি মানুষ নই, তোর মত বাচ্চাকে এই কয়েদঘরে রাখি! আচ্ছা তুই খা তো, দেখি তোর মাপ হয় কিনা।'

ধাপি আকুল হয়ে কাঁদে শুধু। খাবারের দিকে ফিরে চায় না। যার কোন সভ্য সমৃদ্ধ শোভা নেই, অলঙ্কার নেই, সেই ছোট গ্রাম আর জননীর শান্ত মুখ তার মনে পড়ে।

রাত্রির পর দিন আসে। কত দিন কত রাত্রি গেল, ধাপি জানে না। দিন দিন সে শীর্ণ হতে শীর্ণতর হয়ে যায়—দিনের বেলায়ও সে কোন দিকে চায় না, ভয় করে। কোন দিন এক টুকরো রুটি খায়, কোন দিন খায় না।

সহসা একদিন সকালে এলেন খুশ্‌নজরজী বড়ারণের সঙ্গে, ধাপিকে দেখে হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন। সে ঘুমোচ্ছিল—পাণ্ডাশ মুখ যেন মৃতের মত।

করুণাভরে ডাকলেন, 'বাঈ, গোদাবরী বাঈ!'

রাত্রির বিনিদ্র-ক্লান্ত আরক্ত চোখ মেলে সে বললে, 'জী।'

খুশ্‌নজর বললেন, 'আমার কাছে যাবে? আমি নিয়ে যেতে পারি, হুকুম পেয়েছি।'

সে চোখ বুজেছিল আবার, একটু হেসে চোখ বুজেই বললে, 'জী', অর্থাৎ আচ্ছা। বড়ারণ তাকে বললে, 'ওঠ্‌ সেলাম কর।' সে কথা কইলে না। খুশ্‌নজর ওপরে উঠে গেলেন, বললেন, 'কাল ওকে নিয়ে যাব।'

সকাল হল। সিঁড়ির মাথার লোহার দরজা খুলে গেল।

বহু মিনতি করে আজ মনফুলী ওদের সঙ্গে এসেছে। তিন জনে নেমে এল। ধাপির ঘরে কাল আর প্রদীপ জ্বলেনি, যেমন তেমনি তেলে ভরা রয়েছে। রুটি পড়ে আছে, শুধু জলের ঘটিটা গড়িয়ে গেছে ঘরের এক দিকে।

ধাপির আজ আর ঘুম ভাঙল না।

বসুমতী—১৩৫২

বেটী কা বাপ্

বিশাল এক অশ্বত্থ গাছের তলায় এক প্রকাণ্ড কূয়ো। কূয়োর মুখের বেড়টাই প্রায় সাত-আট হাত। আর গভীরতা প্রায় একশো হাত বা আরও বেশী।

রাজস্থানের সব কূয়োর মতই সে কূয়োর জলও বলদে টেনে তোলে। একটা চামড়ার থলে করে প্রকাণ্ড কাছি দিয়ে বেঁধে। গরু বা বলদ সেই দড়ি বাঁধা গলায় নিচু একটা ঢালু জমিতে নেমে যায় আর কূয়ো থেকে চামড়ার চড়স বা থলে ভর্তি জল উঠে এসে নালা প্রণালী বেয়ে ছোট চৌবাচ্চা ও ক্ষেতে ক্ষেতে চলে যায়। কূয়োর চারিদিকে লোকের ভিড়। জলের প্রয়োজন সকলেরই। মাথার উপর পিতল, তামা, মাটির কলসী নিয়ে গ্রামের মেয়েরা এসেছে। পুরুষরা আল বেঁধে জল নিচ্ছে।

সারা গ্রামের সব অধিবাসীরই জন্য হল এই কূয়োতলা। কোন গ্রামে দুটি-তিনটি কূয়ো কোথাও আরও বেশী, যদি ধনীসম্প্রদায় থাকে ওসব জায়গায়।

ভোর থেকে কূয়ো থেকে জল তোলার গান শুরু হয়। 'আরে কীলো চলিও পানি ভরিও।' 'কূয়া চলিও' বলেও কেউ কেউ গান গায়। আরও গ্রাম্যসঙ্গীত লোকসঙ্গীত গায় মেয়েরা-পুরুষরা। তবে গরু খেদিয়ে চড়স ভরার গান প্রায় দু'লাইনেই সারা, দুটি মানুষ গায়।

আর অশ্বত্থতলায় অন্যদিকে গল্প গান বচসা বাক্‌বিতণ্ডা নিয়ে বসে থাকে, জল ভরে নেওয়া নানা বয়সের মেয়ে।

জলের দরকারে সমস্ত সকাল আর বিকাল যেন সারা গ্রামটি জড় হয় ঐ কূয়োতলায়। চাষী কৃষক পুরুষও থাকে আশেপাশে। তাঁদের কাজের অবসরে তামাক খাওয়া দু-চারটে কথা বলার চেষ্টা—অবসর নেই অবশ্য।

সেদিনও কোন মেয়ে বাসন মেজে নিচ্ছে 'শুকমঞ্জন' (শুষ্ক মার্জনা) করে। জল পড়লেই অশুচি হয়ে যায় সে দেশে। জলে শুদ্ধ হয় না। শুকনো বালিতেই শুদ্ধ। কোনো মেয়ের দল জল ভরে তিনটে কলসী উপরি উপরি মাথায় নিয়ে বাড়ি ফিরছে।

সহসা দেখা গেল একটা দীর্ঘাঙ্গী প্রৌঢ়া নারী তিনটি বালিকার সঙ্গে আসছে!

কূয়োতলায় কর্ম ও গল্পব্যস্ত সকলেরই সেদিকে চোখ পড়ল। তারা অবাক হয়ে চাইল।

শোনা গেল ঐ বৃদ্ধা রোজ কূয়োর পাড়ে আসে না। কূয়োর ধারে দু-একজন তার সমবয়সী নারী ছিল! নিজেদের মধ্যে তারা কি যেন বললে। একজনের মুখে যেন কুটিল দুষ্ট হাসির আভাস খেলে গেল।

তারপর সে এগিয়ে এসে তাকে বললে, 'কি ভাই নাতি হয়েছে ?'

প্রৌঢ়া ভ্রূকুঞ্চিত করে তার দিকে চাইল। তারপর বেশ বিরক্ত ভাবে বললে, 'কেন ? কি হয়েছে তা তো তুমি দেখেই এলে সকালে। আবার জিজ্ঞেস করছ কেন ? তামাসা করছ ?'

সে বললে, 'ওমা, আমি আবার কখন দেখলাম !'

প্রৌঢা বললে, 'কেন সবার সঙ্গে দাঁড়িয়ে গল্প করছিলে হাসছিলে। বলছিলে— এবারও মেয়ে হয়েছে। ছটা মেয়ে হযেছে। মজা বুঝবে। সবই আমার ছোট ছেলে শুনেছে। আমি 'জাপায়' (আঁতুড়ঘর) ছিলাম। পরে শুনলাম। এখন নাইতে এলাম।'

অন্য বুড়ী গালে হাত দিল। গলার স্বর উঁচু করল। উঠে দাঁড়িয়ে চারিদিকে চেয়ে বললে, 'দেখ একবার ! গাযে পড়ে ঝগড়া করার বকম দেখ কুশল সিংয়ের মা'র ! কি কাণ্ড ! আমি তো বাড়ি থেকে সোজা কুয়োতেই আসছি। তা তোমার বাড়ি পথে পড়ে, এক পলক মাত্র দাঁড়িয়েছিলাম। তার মাঝে অত কথা কখন বা বললাম, কাব কাছেই বা বললাম ? তোমার ছোট ছেলে সন্ত সিং তো দেখি খুব খারাপ লোক ! আর ছেলে হয়েছে কি মেয়ে হয়েছে বললে দোষটাই বা কি ?'

চারিদিকের মেয়েদের ততক্ষণে কুয়োর জল তোলা বন্ধ হয়ে গেছে। বেশি ঘোমটা দিয়ে কম ঘোমটা দিয়ে সবাই তুই বুড়ীকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে।

সন্ত সিংয়ের মা রাগে আগুন হয়ে গেছে। তার মুখে কথা বেরুচ্ছে না।

অন্য বুড়ীটি বিনিয়ে বিনিয়ে নানারকম কথা বলে চলেছে। যার প্রতিপাদ্য বিষয় হল, মেয়ে হয়েছে কি ছেলে হয়েছে লোকে দেখতেও যায়, মুখেও বলে থাকে। তাতে তো কেউই কখনও রাগ করে না। তুই বুড়ী বাতাসে দড়ি বেঁধে ঝগড়া করছিস কেন ? কি ঝগড়াটে গো ! বেশ হয়েছে মেয়ে হয়েছে ! রাজপুতের ঘরে গণ্ডা গণ্ডা হওয়ার ফল ভোগ কর্ সবাই ! মনে নেই সেবার তোর মা আমার পিসিকে কি বলেছিল···চার মেয়ের মা হয়েছে বলে !

সন্ত সিংয়ের মা অবাক ! 'মা কবে বলেছে তোর পিসিকে ওকথা ? আমিই বা তাকে কবে দেখলাম ? তুই তো কম মিথ্যাবাদী নস !'

তুমুল বচসার মাঝে শোনা গেল—অন্য বুড়ীকে পাড়ার মোতিবাঈ সে কথা বলেছে। রাজপুতের ঘরে মেয়ে বেশী হবার খোঁটা আর টিটকারি বুঝি ওরাই কে কবে দিয়েছিল সন্ত সিংয়ের বাড়ি থেকে। ওর পিসির নাম করে নি বটে কিন্তু তাকে দেখেই বলেছিল, এবং সে কথা তো এ বুড়ী ভোলে নি—আজ পালটা টিটকিরি দিয়েছে তাই। মেয়ে হয়েছে জেনেও ছেলে হয়েছে বলে ন্যাকা সেজে আনন্দ জানিয়েছে 'বেশ বেশ' বলে !

কুয়োর পাড়ের পুরুষেরা বিব্রত বিরক্ত হয়ে উঠল পাড়ার ঝগড়ায়। কিন্তু কেউই মেয়েলী ব্যক্তিগত ঝগড়ার মাঝে কথা কইতে চাইল না। তাতে আবার অন্য বুড়ো ভীম সিংয়ের মা প্রসিদ্ধ মুখরা। কিন্তু ঝগড়া, জলতোলা, জলভরা কিছুই থামল না। এবং ক্রমেই রোদ উঠল, বালি তাতল, বেলাও হল। বুড়ীর বাড়িতে আঁতুড় ঘরে কাজও আছে। তিনটি শিশু নাতনীও সঙ্গে, সুতরাং সন্ত সিংয়ের মা বাড়ি ফিরল রাগের আগুনে জ্বলতে জ্বলতেই।

২

বুড়ীর বড় ছেলে কুশল সিং সেপাইতে কাজ করে। তার দুই মেয়ে এক ছেলে। ছেলে গ্রামের ক্ষেতখামার দেখে। শহর হাটবাজার যাওয়া আছে। তাও করে, আবার মামলাবাজিও মাঝে মাঝে করে।

বুড়ীই বাড়ির গিন্নী। দু' বৌ আর নাতি-নাতনী নিয়ে। তা বড়ছেলের বৌ-এর দুটো মেয়ে হলেও একটা ছেলে আছে। রাজপুতের ঘরের বংশধর। মুখ রেখেছে। ছোট বৌটির এবারে নিয়ে চারটে মেয়ে হল। সবাই ভেবেছিল এবার একটি ছেলেই হবে। তাই হিংসুটে জ্ঞাতিগোত্রের গ্রামের লোকের আনন্দের সীমা নেই।

সন্ত সিংয়ের মা ভূরি বাঈয়ের বড় ছেলে সেপাইতে 'অপ্‌সর'—সামান্য উঁচু পদের (অফিসার)। ছোট ছেলে গাঁয়ের মোড়ল। সকলেরই বেজায় মেজাজ। আবার কুটুম্বরাও পাশের গ্রামের সম্পন্ন গৃহস্থ। ছোটখাটো জমিদার বিশেষ।

জ্ঞাতিদের আর কত সয়। কুয়োপাড়ের অন্য বুড়ী গণেশীবাঈ ভূরিবাঈয়ের জ্ঞাতি ননদ।

মনে মনে রাগ আর নানারকমের কল্পনাভাবনা নিয়ে বুড়ী ভূরিবাঈ বাড়ি এসে আঁতুড়ের চালায় উঁকি মারল।

পোয়াতি ঘুমচ্ছে। আর তার পাশে এক রাশ ফুলের মতন নতুন শিশুটিও ঘুমচ্ছে।

হ্যাঁ, খুব সুন্দর হয়েছে। পাশ থেকে নাতনীরাও বলছে, 'দেখ দাদী, কি সুন্দর মেয়ে হয়েছে মা'র!'

বুড়ীর মুখে হাসি ফুটেছে। বুড়ী বললে, 'হ্যাঁ।'

তার এ নাতনীরাও সুন্দরী। আর সেই জন্যেই তো—কি সেইজন্যে? বুড়ী মনে মনে যেন কি বলল।

তারপর বড়বৌকে ডেকে বললে, 'ছোটি বিন্দনীকে চা পানি ঝাল গুঁড়ো সব দিয়েছিস? দাই এসেছিল, আবার কখন আসবে? সেঁক তাপ করবে তো?'

বড়বৌ আধঘোমটা টেনে শাশুড়ীর কথার উত্তর দিলে। পাঁচ নাতনী এক নাতি নিয়ে শাশুড়ী বসলে দাওয়ায়। বৌ রুটি করছে রান্নাঘরে। ছেলেরা দুজনেই বাড়ী নেই, কাজে বেরিয়েছে। বুড়ীর মনের মধ্যে কূয়োর পাড়ের রাগ ঝগড়া সত্ত্বেও বাইরে পাশে ফুটফুটে পাঁচটি রাজপুত কন্যা আর একটি সুন্দর কিশোর পৌত্র মনকে বারে বারে কোমল করে দিচ্ছে।

কিন্তু রাজপুতের ঘরে এত মেয়ে! গালাগালির মত ব্যাপার। একে তো তারা কথায় কথায় 'বেটী কা বাপ্' বলে শ্লেষ করে কথা বলে। ভূরিবাঈ নাতনীদের চুল বেঁধে দিতে বসে বহু পুরানো বংশের খানদানী ঘরের অনেক কাহিনী মনে করতে লাগল।

সবই তো তার জানা আছে। লোকে বলে কাল বদলেছে, কই আর বদলেছে? তাহলে কি আর গণেশী মাগী গায়ে পড়ে কথা শুনিয়ে ঝগড়া বাধাতে পারে!

হোক সুন্দর মেয়ে ··।

আজ ছেলেদের বলবে ঝগড়ার কথা—একটা বিহিত করতেই হবে!

বিকেলে বড়ছেলে বলে, 'কি বিহিত ?'

মা বললে, 'সে যা-হয় করব কিছু তখন বলব। দাঁড়া, আগে কূয়ো পূজোটা হয়ে যাক—আঁতুড় থেকে বৌ বেরিয়ে আসুক।'

৬

'কূয়ো পূজো' ব্যাপারটা যেন অনেকটা আমাদের ষষ্ঠীপূজোর মত শুচিশুদ্ধ হওয়া। পাঁচ-সাত জন সধবা মেয়ে পোয়াতিকে ধরে উঠিয়ে কূয়োর ধারে আকণ্ঠ ঘোমটা টেনে আনে, তারপর শুভজন্মমঙ্গল সঙ্গীত গাইতে গাইতে তার ঘরে যায়! একজনের কোলে থাকে শিশুটি।

মা ও শিশুর সর্বাঙ্গ ঢাকা, কেউ যেন দেখতে না পায়। 'নজর' লাগবে 'সোঁদা' নতুন শরীরে। আর এই কূয়ো পূজোটি করতে হয় শিশুজন্মের ছ'দিনের দিন। অনেকটা 'ষেটেরা পূজা'র মত।

নবজাতকের জননী টলতে টলতে যাবে। গায়ে জোর নেই বটেও। আর সেটি দেখাতেও হবে। না হলেই পাড়াপড়শীতে 'ডাইনী' তো থাকতে পারে কেউ—সে ঠিক 'নজর' দিয়ে শিশুর রক্ত অদৃশ্য উপায়ে শোষণ করে নেবে। পোয়াতির ক্ষতি করে,দেবে কোন কিছু।

কূয়ো পূজোও হয়ে গেল নিয়ম মত।

নতুন শিশু শুয়ে থাকে ঘরের সামনের দাওয়াতে ছোট্ট খাটিয়ায়। আর রাজ্যের শিশু বালক বালিকা এসে তাকে ঘিরে বসে। কেউ বলে কি সুন্দর, কেউ বলে কোলে নেবে। কেউ একটি লাল ফুল নিয়ে আসে, ভাবে নবজাতক দেখবে। কেউ আবার বাতাসা মিষ্টিও আনে খাওয়াবে বলে।

বুড়ী ঠাকুমা ভুরিবাঈয়ের আর নড়বার উপায় নেই। পাছে সত্যিই ওরা মেয়ের মুখে বাতাসা পুরে দেয়। চোখে ফুল বুলিয়ে খোঁচা দেয়।

যদিও কিছুই মায়াদয়া নেই তার মেয়েটার ওপর। চার-পাঁচটা মেয়ের ওপর মেয়ে! দুই ভাইয়ের ঘরে ছ' মেয়ে। রাজপুতের ঘরে মেয়ের ব্যাপার তো সবাই জানে। আজই না হয় ওরা গেরস্থ। নইলে ওদের বংশ তো খুব বড়। বড়ঘরও বটে। তেমনি ঘরের সঙ্গেই তো কুটুম্বিতা করতে হবে। ছেলেদের অত ধন কোথায়? আর মনেও তো খাটো হয় মেয়ের বাপ।

কুশল সিং এসে দাঁড়াল প্রাঙ্গণে।

খাটের ওপর এক মাসের মেয়ে ঘুমচ্ছে।

ঘুমন্ত মেয়ের দিকে চেয়ে রইল জ্যেঠা। তার চোখ যেন ফেরে না। মাকে বললে, 'এই মেয়েটা সকলের চেয়ে সুন্দর হয়েছে। যেন পদ্মফুল। এর নাম রাখ পদ্মিনী।'

একটু দূরে বসে মা চরকা কাটছিল।

একটু বিরসভাবে ছেলেকে বললে, 'তুই তো সবগুলোকেই সবচেয়ে সুন্দর হয়েছে বলেছিস ছোটবেলায়। আর সবাইকেই 'পদ্মিনী' বলতিস্। ছটা পদ্মিনীর জন্যে ছটা ভীম সিংয়ের যোগাড় তো করতে হবে। মাথা আর মান তাতে তো বিকিয়ে যাবে তোদের।'

ছোটছেলে এসে দাঁড়িয়েছিল। সেও হেসে বললে, 'আর আলাউদ্দিনের ভয়ও আছে পদ্মিনীদের জন্যে।'

মেয়ে জেগে উঠেছিল। জ্যেঠা কোলে তুলে নিয়ে বললে, 'একালে আর আলাউদ্দিন নেই। তার ভয়ও নেই। হোক না ছটা মেয়ে। কেন অত বারবার ছটা মেয়ে বলছ!'

মা তিক্ত মুখে বললে, 'এখন আদর করতে ভাল লাগছে। পরে বুঝবি। এখনি তো পাড়ার লোকে হাসি তামাসা করছে। সেদিন কুয়োতলায় ভীমের মা কত কথাই বললে! বলে, আমি বলি ছেলে হয়েছে। তা এবারেও মেয়ে!'

দুই ভাইয়ের মুখই গম্ভীর হয়ে গেল।

কুশল সিং শিশুকে বিছানায় নামিয়ে বললে, 'একালে আর অত ভাবে না লোকে। তুমি কেন কথা বল ওদের সঙ্গে। আমাদের মেয়ে আমরা বুঝব। লোকের 'পচাইয়ের' দরকার এত কিসের!'

জ্যেঠার পদ্মিনী ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে একটু হাসল যেন। আবার ছোট্ট দুখানি টুকটুকে ঠোঁট দুধ খাবার মত চুষল।

মুগ্ধ জ্যেঠা রাগ ভুলে গেল প্রতিবেশীদের ওপর। আবার নীচু হয়ে মৃদু আঙুলে মেয়ের গালে হাত দিয়ে বললে, 'সত্যিই পদ্মিনীবাঈ আমাদের। রানী পদ্মিনীই হবে দেখিস্।'

৪

মেয়েটা দু'মাসের হয়ে গেল। যেমন শান্ত তেমনি সুন্দর আর মোটাসোটা বড় হয়ে উঠেছে।

গ্রামে মোতি-জ্বরা (টাইফয়েড) লেগে গেল—ঘরে ঘরে কারুর অসুখ। আবার হাম বসন্ত দেখা দিল—মাতা, ফুলমাতা, ছোটি মাতা নানা নামে মায়ের দয়া দেবী শীতলা রূপে।

না, ভূরিবাঈদের ঘরের চৌকাঠও কোন অসুখ আর মাতা ফুলমাতা কোন মাতা-দেবীই মাড়ালেন না।

ছ-ছটা মেয়ে কারুর গায়ে একটু আঁচড় লাগে না অসুখ-বিসুখের। যদিও প্রথম চারটে নাতনী ঠাকুমার ভারী আদরের। গোদাবরী গঙ্গা জানকী যমুনা আর গৌরীও। সবাইকেই ভূরিবাঈ ভালবাসে। মায়া পড়ে গেছে। মরে যাক্ সেটা খুব মনে হয় না। তবে এই নতুন ছোট্টটা এটার কোন অসুখ হলে তার দুঃখ ছিল না···বরং সুবিধাই হত···। কি সুবিধা? সে ভূরিবাঈই জানে।

মেয়েটা যত সুন্দর হয়ে ওঠে তত জ্যেঠার আদরের হয়। আদিখ্যেতার হয়। মুখ রং চেহারা যেন নিখুঁত 'গঙ্গোরের' (গণগৌরী দেবীর) মত।

ঠাকুমা নাতনীদের নিয়ে বসে সকলের চোটী বিনুনী বেঁধে দেয়। আঁচড়ে দেয় মাথায় ঘি মাখিয়ে। আর নানারকম রূপকথা বলে। সোনে কি মক্কী (সোনার ভুট্টা), রাজা কি কুমার ঔর জাঠকি ছোরীর (রাজার ছেলে আর চাষার মেয়ে) চমকপ্রদ রূপকথা। আবার ইতিহাসের গল্পও বলে—রাজা হাম্বীর রানী কমলাবলী কর্ণাবতী রাজকুমারী কৃষ্ণকুমারী। যাকে আফিম ফুলের কুসুম্ভ ফুলের বিষ দুধের বাটিতে গুলে খাওয়ানো হল মেরে ফেলার জন্য।

নাতনী গোদাবরী বারো বছরের হয়েছে। আর সকলেও বড় হয়েছে।

তাদের যেন নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যায়। বিষ? কেন দাদী? মরে গেল কৃষ্ণকুমারী? সত্যি বিষ খাইয়ে দিল? কে দিল বাবা, কাকা? কেন দিল?

নির্লিপ্ত মুখে ঠাকুমা বলে, 'আর কেন! রাজপুতের মেয়ে! তারা রাজার মেয়ে হলেও মেয়ের দায় তো! আর করম তো একটা আছে। করমফল আগের জন্মের ছিল তার।'

রাজপুতের ঘরে বেশী বেটী কা বাপ্ হওয়া কি কম অপমানের কথা···। তাতে রাজকন্যা? রাজা বাপকেও ছোট হতে হয় তো মেয়ের জন্যে!

নতুন খুকীর দিকে চোখ পড়ে বুড়ীর। সত্যি যেন কৃষ্ণকুমারী না পদ্মিনীর মতই সুন্দর মেয়েটা। কি সুন্দর যে হচ্ছে দিনে দিনে, ভাল লাগে দেখতে কিন্তু তার মায়া হয় না। তবু দয়া হয় একটু যেন। থাকে থাক বেঁচে। যদি রামজীর তাই ইচ্ছে হয়।

গোদাবরী ভীতভাবে ঠাকুরমার ঐ কথাকাহিনী শোনে। কিন্তু তার মনে হয় এর চেয়ে আরব্য উপন্যাস রামায়ণ মহাভারতের গল্প ভালো! তাতে রমণীদের জহরব্রত কিম্বা বিষ খাওয়ানো, মেরে ফেলা, মরে যাওয়ার তো গল্প নেই। রানীরাও পুড়ে মরতেন? সভয়ে জিজ্ঞাসা করে।

৫

কুশল সিংয়ের শহরে ডাক পড়ছে কুচ্‌কাওয়াজের জন্য, শীতকাল তো। সে এসে বললে, 'জিজি, (মা), আমি কাল ভোরে শহরে যাব। ফিরে আসতে দিন দশ বারো হবে। আরও কোথায় পাঠায় কিনা কে জানে। আবার সম্ভও যাবে একটা মামলা আছে। একটু হাটবাজারও আছে। এখন তো 'রবির' (রবিশস্য) দেরি আছে ততদিন বাইরে ক্ষেতখামারে বেশী কাজ নেই। শুধু ঘর। আর এই তোর নাতি আর ছটা নাতনী। শীতকালে সাবধানে কাটাস।'

স্নেহশীল কুশল সিং মেয়েদের দিকে চাইল হাসিমুখে। আর ঘুমন্ত খুকীটাকে একবার কোলে তুলে নিল।

দুর্ধর্ষ, অপসর (অফিসার), সেপাই জ্যেঠা বললে, 'এই পদ্মিনীটার জন্যেই আমার মন কেমন করবে খুব। আমি ফিরতে ফিরতে এটা আরও বড় হয়ে যাবে। আর সুন্দর হবে আরও। যদি দেরি হয় ফিরতে—।'

তার নিজের মেয়ে অন্য ভাইঝিরা তাকে তখন ঘিরে দাঁড়িয়েছে। শহর থেকে বাবা কি কি আনবে তাদের জন্য। গুড়িয়া, (নেকড়ার তৈরি পুতুল) কাঠের খেলনা, রান্নাবাড়ির সরঞ্জাম 'চাক্কি' 'চুলা' তাওয়া থালা সবসুদ্ধ হওয়া চাই খেলনাগুলি।

ছেলে বীর সিং বললে তার একটা হাওয়াগাড়ী চাই কলের।

৬

বড়ছেলে শহরে গেল। কয়েকদিন বাদে সম্ভ সিংও মামলা করতে গেল।

দেশে রোগ নেই। শীতের হাওয়া নিমের বাতাস গরু মহিষের দুধ ঘি ছাচ (দই ঘোল) আর ঘরের গমের বেজড়ের রুটি (যব, ছোলা, গম মেশানো রুটি) বাজরার খিচুড়ি দলিয়া লৌজি (আচার) দিয়ে সামান্য ডাল তরকারী দিয়ে খেয়েও তাদের স্বাস্থ্য আর রং যেন ফেটে পড়েছে।

পাঁচটা মেয়ে যেন পাঁচটি গণগৌরী প্রতিমা। বৌ দুটিরও রূপ ধরে না শরীরে।

রাজপুত ঘরের মত বুড়ীও সন্ধ্যেবেলা একবাটি আফিম-গোলা জল খায় আর ঝিমোয়। ঝিমোতে ঝিমোতে ওদের কাহিনী শোনায়।

আর ভাবে, না, কোন মেয়েরই গা গরম হয় না শীতের ঠাণ্ডা লেগে।

সর্দি কাশি হয় না। কিছুই হয় না।

তা কারুর না হোক ছোট্ট ঐ সোঁদা নতুনটারও গায়ে ঠাণ্ডা লাগে না?

এদিকে ছেলেরা চলে গেছে। শাশুড়ী হুকুম করলে এখন থেকে বিকালে ছোট বিন্দনী (বধূ) রান্নাঘরের কাজ করবে। ওর কাছে মেয়ে দিয়ে। সকালে বড়বউ রাঁধবে।

বুড়ী যেন কি ভাবছে। কি ভাবছে বুড়ী? বড় বৌ ভাবে শঙ্কিত মনে।

৭

ক'দিন গেল—কুশল সিং আর সম্ভ সিং একসঙ্গেই ফিরল।

ছেলেমেয়েরা সব প্রাঙ্গণে খেলা করছিল। এসে কাছে দাঁড়াল। কাকা ও বাপের হাতে মস্ত ঝোলা-ঝুলি। কিন্তু তারা চেঁচামেচি হৈচৈ কিছু না করে চুপ করেই দাঁড়িয়ে রইল।

পিতা হাসিমুখে ঝোলা থেকে এটা সেটা বার করতে লাগল। খেলনা, পুতুল, খেলার মোটরগাড়ি, একটা লাল ঝুমঝুমিও।

এবারে হঠাৎ চোখে পড়ল দাওয়ার উপর ছোট খাটুলীটা খালি। খুকীটা কই? পদ্মিনী কই তার!

জিজ্ঞাসা করলে, 'কোথায় পদ্মিনী? ভেতরে?'

মা বসেছিল চুপ করে রোয়াকে। কেঁদে উঠল অস্ফুট চেঁচিয়ে মুখটা ঢেকে।

ছোট ছেলেরা খেলনায় হাত দিয়েই দাঁড়িয়েছিল। বড় মেয়েরা চোখ মুছতে লাগল। বৌ দুজন রান্নাঘরের দরজার কাছে ঘোমটা দিয়ে দাঁড়িয়ে গুনগুন করে কাঁদতে লাগল।

কুশল সিং উঠানের একটা খাটিয়ার ওপর বসে পড়ল। সন্ত সিং বিহ্বল ভাবে রোয়াকে মা'র কাছে বসল।

কুশল সিংয়ের হাতে লাল ঝুমঝুমিটা। আর ওদিকে পদ্মিনীর খালি খাট বিছানা। সে অন্যদিকে তাকিয়ে রইল। চোখ দুটো লাল হয়ে গেল। তার সেপাইয়ের চোস্ত দাড়ি গোঁফ বেয়ে টপটপ করে চোখের জল পড়তে লাগল।

তারপর চোখ মুছে সহসা গম্ভীর হয়ে সে জিজ্ঞাসা করলে, 'কব গুজরি বাই? ছোরী কব গুজ্‌রী (কবে মারা গেছে মেয়ে)?'

জননী বললে, 'এই পাঁচ দিন হল—তোরা যাবার চার দিন পরে।'

ছেলে বললে, 'কি অসুখ হয়েছিল?'

'কিছুই না। একদিন একটু গা গরম হয়েছিল।'

ছেলেরা সন্দিগ্ধ ভাবে মা'র দিকে চাইল। 'ওষুধ এনেছিলে?'

'তোরা নেই। আর একটু জ্বর। ওষুধ কিছু আনি নি। কে আনে। হঠাৎই মরে গেল তো।'

হঠাৎ কুশল সিং গম্ভীর হয়ে গেল। যেন কি একটা কথা মনে হল তার কিন্তু কিছু বললে না। ঘরে উঠে গেল।

৮

দিনের কাজ খাওয়াদাওয়া শেষ হল। সন্ধ্যাও শেষ হল। রাত্রি হল। অনেক রাত্রি।

ছেলেমেয়েরা সব শুয়েছে। ছোটবৌ বড়বৌ ঘরে। সন্ত সিংহও শুতে গেছে। কুশল সিং মা'র ঘরে এসে বসল।

সহসা বললে, 'আর ছটি মেয়ের ভাবনা রইল না তোর।'

মা চকিত হয়ে উঠল। কিছু বলতে পারল না—যেন কি রকম হয়ে গেল মুখটা। তারপর বললে, 'তা রামজী দিয়েছিল। সেই আবার কেড়ে নিল।' বলে চোখ দুটো একটু মোছবার মত করলে।

ছেলে কঠিন মুখে মা'র দিকে চেয়েছিল। 'হ্যাঁ, তা নিয়েছে। তুভি থোড়ি ঘনি অমল ঘালি ছি? (তুইও আফিম দিয়েছিস একটু বেশী করে) তাই ঠিক না?'

মা চমকে উঠে অপ্রস্তুত হয়ে গেল। তারপর রেগে উঠল।

'আফিং কি আজ আমি নতুন দিচ্ছি ছেলেমেয়েদের? তোদের সব ছেলেমেয়েই তো আমার কাছেই অমল খেয়ে ঘুমিয়েছে। বারো মাসই তো আমি ঘুম পাড়িয়েছি।'

'হ্যাঁ, তা আমি জানি। তবে এবারে ছটি মেয়ে দেখে একটু বেশী অম্বল দিয়েছিস্। বেশী বেশী ভেবেছিলি কিনা। তাই মাত্রা বেশী হয়ে গেছে।'

কুশল সিং উঠে গেল ঘর থেকে।

মহিলা মহল—১৩৭১

সেই মেয়েটি

জ্বর হয়েছিল। শুয়েছিলাম।

হঠাৎ দরজার কাছে থেকে কে ডাকল, বলল, 'কি করছ বাই (দিদি) ?'

বললাম, 'আয়।'

অনেকদিনের পুরোনো ঝি। শুনেছি আমার ছোট বেলাতেও সে আমাদের ভাই-বোনদের দেখাশোনা করেছে। তখন তার বয়স দশ-এগারো।

নামটা হচ্ছে মাঙ্গী। অর্থাৎ থাকমণি বা বেঁচে থাক। মানে মায়ের আগের কোনও সন্তান বাঁচে নি তাই তাকে 'চাওয়া'—মাগিয়া নেওয়া ভিক্ষা মেগে যাচ্ঞা করে নেওয়া হল বিধাতা বা যমের কাছ থেকে।

দেখতে মন্দ নয়। নাপিতের ঘরের মেয়ে। সে-দেশে তারা নাপিতানীর কাজ করে না। মানে আল্‌তা পরানোর কাজ জানে না। মেহেদী পরার দেশ। তবে অন্য রকম সেবা-যত্ন করে। ঝিয়ের কাজ, ছেলেমেয়েদের তেলমাখানো, মালিস করা সব জানে। মেহেদী-পাতা বেটে হাতে পায়ে ফুলকারী কাজ এঁকে দেয়। সেটা আবার সধবার সৌভাগ্যের চিহ্নও তো বটে। রাজস্থানের রাজপুত ঘরের নিয়মে দাস-দাসীতে পাঁচটি বা আরও বেশী অবশ্য সেবক অঙ্গ-থাকা প্রথা ছিল সেকালে।

দু'জন ব্রাহ্মণ (কর্মচারী ও রান্নার জন্য), দু'জন সেবক ভৃত্য (অব্রাহ্মণ জাতি), দু-একজন রাজপুত (সেপাই প্রহরী দারোয়ান), এক নাপিত (উচ্ছিষ্ট পরিষ্কার করার কাজ)। তাছাড়া মীনা ও বলাই, মালী, (গাড়ি ঘোড়ার সহিস ও চালকের কাজ)। যদি গাড়ি-ঘোড়া থাকে আর বাগান-বাগিচা থাকে।

যেমন ব্রাহ্মণ খাবার জল এনে দেবে প্রভুকে, জল খাওয়া গেলাসটা কিন্তু নেবে 'দারোগা' জাতি বা নাপিত সন্তান। রাজপুত করবে সেপাই দরোয়ানের কাজ কিন্তু চাকরের কাজ কিছু করবে না।

চাকর ঘরের কাজ করবে, কিন্তু নাপিতের কাজ এঁটো উচ্ছিষ্ট ধোয়া-মোছার-কাচার কাজ করবে না।

সূক্ষ্ম চুলচেরা জাতিবর্ণ হিসাবের কর্ম বিভাগ। একটি 'সর্বার্থ সাধক' লোক রাখার প্রথা সেকালে চলত না। সেই হিসাবেই সে ছিল অন্তঃপুরের শিশু টহলনী। মানে শিশুরক্ষিণী 'ছেলেভোলানী'।

সে বসল আমার মাথার কাছে। মাথা টিপে দেবে, নয়ত হাত বুলিয়ে দেবে। খুব গল্পবাগীশ। আধ-অন্ধকার ঘর। গরমের দিনের বিকাল। এটা-সেটা গল্প করে। সম্প্রতি তীর্থ করতে গিয়েছিল। সে গল্পও করল।

জিজ্ঞাসা করি, 'কতদূর—কোথায় কোথায় গেলি ?'

বললে, 'এই দ্বারকাজী মথুরা বিন্দ্রাবনজী (বৃন্দাবন) আর দিল্লী আগ্রা হয়ে এলাম।'

তার হাতটা খুব সুন্দর নরম। আমার মাথায় থামল হঠাৎ। যেন কি ভাবতে ভাবতে থেমে গেছে।

জিজ্ঞাসা করি, 'কিরে চুপ করে গেলি যে ?'

সে আবার মাথায় বিলি কাটে চুলে।

জিজ্ঞাসা করি, 'তীর্থে কি সব দেখলি ? কি আনলি ? তোর ছেলেমেয়েদের কোথায় রেখে গেলি ? তাদের জন্যে কি আনলি ? একটু গল্প বল। শুয়ে শুয়ে ভাল লাগছে না।'

সে চুপ করে যেন কি ভাবছিল।

বললে, 'ছেলেমেয়েদের ছোট দুজনকে তাদের মামার কাছে রেখে গিয়েছিলাম, আনব আর কি—বেশী তো পয়সা ছিল না। এই সব দ্বারকানাথজীর গোবিন্দজীর ছবি আর প্রসাদ আর চন্দন তুলসী এইসব এনেছি। তোমার জন্যেও এনেছি।'

'তা দিস। এখন কি কি দেখলি গল্প বল।—কিছু নতুন আশ্চার্য দেখলি ? কোথাও সাধু মহাত্মা ?'

এবারেও সে একটু চুপ করে রইল। তারপর বললে, 'হ্যাঁ একটা ভারী আশ্চর্য মানুষ দেখলাম বাইজী। সাধুমহাত্মা কিন্তু নয়—একটা আশ্চর্য মেয়ে।'

সাধু-মহাত্মা নয়! মেয়েমানুষ একটা! উঠে বসলাম। কৌতূহল হল একটু।

সে বললে, 'উঠলে কেন ? শোও না। মাথাটা ছেড়েছে ? অনেক বড় গল্প।'

বললাম, 'তোর হাতের গুণেই ছাড়ল। বসি একটু। গল্প বল্। শোব পরে।'

সে বলল, 'তবে আগে আমার বিয়ের গল্প বলি। আমাদের এদেশে নাপিতের ঘরের বিয়েতে বিয়ে হতে ছেলেদের মেয়েদের জন্যে বেশ পণ দিতে লাগে জান তো। বাবা-মা যত টাকা চাইছিল তেমন আর বর পাওয়া যায় না। আমিও বেশ বড়িসারি (বড়সড়) হয়ে উঠলাম। মা ব্যস্ত হয়। আর বাবা বেশী টাকার মতলবের তালে থাকে। এই হতে হতে একটা সম্বন্ধ আমার এল। বরের টাকা আছে অনেক।

বাবাকে পণ ভালো দেবে, সাধারণের চেয়ে বেশী। সেপাইতে কাজ করে টাকা জমিয়েছে। বিয়ে করতে সময় পায় নি। ঘর বাড়ি ক্ষেত আছে। এখন বিয়ে করবে। বেশ বয়স হয়ে গেছে অর্থাৎ প্রায় পঁয়ত্রিশ। আরও একটা গুজব শোনা গেল। কিন্তু···'

মাকে বাবা ধমক দিল, 'ওসব বিয়ে-না-করা পুরুষ মানুষরা অমন হয়ে থাকে··· ।'

বাবার মতে টাকাটা তো কম নয়। মা'র মতে তার কোনও কুলে কেউ নেই। মা বাবা মামা মাসী পিসি কাকা দেখবার জন্যে নিকটাত্মীয় কেউ নেই। সেটাও দেখতে হবে তো!

মা চিন্তিত। 'তবে বিয়ে দেবে কে? দিচ্ছে কে বিয়ে?'

বাবা বললে, 'সে আছে, আছে। ভাই বন্ধু-বেরাদার গুষ্টি গাঁয়ের তো আছে। তারপর একদিন ঘোড়ী-ডোলী (ঘোড়া-পালকি-ডুলি—পশ্চিম উত্তর ভারতের সব বিয়ের বরযাত্রার বিশেষ অঙ্গ অপরিহার্য নিয়ম) বাজনা করে লগ্ন দেখে—আমাদের ছিল দিনে লগ্ন,—বরিয়াত এল। হলদে আর লাল রংয়ের আচ্‌কান ধুতি পাগড়িপরা বরের আধখানা মুখে জরির ঝালর ঢাকা বর এল অনেক বন্ধুবান্ধব নিয়ে। সঙ্গে এল গায়িকা 'ভক্তন্'দল,—কোন এক দূর সম্পর্কের বুড়ো কাকা না মামা এল বরিয়াত নিয়ে। (ভক্তিনী অর্থাৎ নর্তকী কীর্তনী। হরিনাম গায়িকা। (ভক্তের স্ত্রীলিঙ্গে ভক্তিনী)। কিন্তু তারা সেদিন ভক্তি সঙ্গীত গাইবে না, মঙ্গল সঙ্গীত গাইবে সীতা-রামের বিয়ের।

বাবা অনেক টাকা গুনে নিল। কত আমি জানি নে। লোকে বললে পয়সা আছে বরের।

সারাদিন ধরে ভিতরে বাড়ির মেয়েদের মঙ্গল গান, বাইরে ভক্তনদের গান, রাজোয়াড়ার মত (মদিরা পান) পানাহার করে বিয়ে শেষ হল।

তোমাদের দেশের মত শুধু রাত্রেই আমাদের বিয়ে হয় না (সে আমাদের বাংলা দেশের বিয়ে দেখেছে)। তবে মণ্ডপ করে বামুন পুরুত ডেকে কি-সব মন্ত্র বলে আমাদেরও বিয়ে হয়। যখন যেমন শুভলগ্ন পড়ে। তোমাদের মতন খাওয়ানোর ধরনও নয়।

তার পরদিন ভালো লগ্ন দেখে পাড়ার মেয়েরা আর মা মামী পিসির দল প্রথা নিয়মমত সবাই মিলে খুব ঘোমটার ভিতর থেকে চেঁচিয়ে কেঁদে-কেটে (আমাদের দেশে না কাঁদলে নিন্দে করে। খুব কাঁদতে হয়) আমাকে পাঠিয়ে দিলে। শ্বশুর-বাড়ি পাশের গাঁয়ে। খুব কাছেই।

সেখানেও মঙ্গল-গান করলে সে গাঁয়ের মেয়েরা সকলে মিলে।

ছোট একটা ডুঙ্গর (পাহাড়) আছে গাঁয়ে। বালির পাহাড় আর বাবলার জঙ্গল।

একটা ঠাকুর লোগ (জমিদার) কিছু বামুন বেনে আর সব দারোগা মীনা বলাই ভীর (আভীর) গ্রামভরা।

সেদিনও তাদের বাড়িতে সারারাত মঙ্গল-গান, খাওয়া-দাওয়া সব করল। কেউ রইল রাত্রে, কেউ চলে গেল। কিন্তু কে তাদের আপনার কে পর আমি আর কিছুই বুঝতে পারলাম না।

তারপর দিন সকালে দেখলাম, একে একে সবাই চলে যাচ্ছে।

বাড়িতে দু-একজন মাত্র মেয়ে আর দু-একজন কে রইল। তারা সারাদিন খাওয়ানো, কাজ-কর্ম, বাড়ি পরিষ্কার নিয়ে ব্যস্ত রইল।

আমার বরের কে তারা আমি জানি না। সে কারুকে বললে ভূষা (পিসি) কারুকে ভেন (বোন) অন্যান্যদের বললে দাদী নানী।

আমাদের তো কারুর সঙ্গে কথা কওয়ার নিয়ম নয়। কনে বৌদের একেবারে ঘোমটা দিয়ে থাকতে হত সেকালে।

বিকেলের দিকে ঘরের কোণে একটা খাটিয়ায় চুপ করে বসে আছি। বর বাড়ি নেই। অন্য দাদী ভূয়ারা কোথায় আছে না গেছে, তাও জানি না।

হঠাৎ একটা মেযে এল বাড়িতে। পরিষ্কার 'গোটা (জরি)-দার নীল রংয়ের ওড়না গায়ে, জরিরই ঝলমলে হলদে রংয়ের মসলিনের ঘাগরা পরা, কাঁচুলির ওপর 'সদ্‌রি' হাতওয়ালা রেশমের জামা পরা। হাতে সোনার পৈঁছা কঙ্কণ চুড়ি, ওপর হাতে বাজু তাবিজ পরা, গলায় সোনার বলেওড়া (হাঁসুলী) আর কণ্ঠি (কণ্ঠমালা)। আর কোমরে রূপার মেখলা জিঞ্জির দার, পায়ে মল মুরাঠি পাঁয়জোড় পরা। হাতের পায়ের আঙুলে সোনা আর রূপার আংটি ঝিকমিক করছে।

পাতলা সুন্দর চেহারা। হাসিমুখে একমুখ পান। একেবারে 'গঙ্গোরে'র (গণগৌরী দেবী) মত সুন্দর দেখতে যেন।

তখন বাড়িতে বিয়ে বাড়ির ভিড় নেই তো। হঠাৎ তাকে ঢুকতে দেখে বাড়ির ঐ দাদী নানী পিসিরা অবাক হয়ে গেল।

একজন দাদী জিজ্ঞেস করলে, 'কোত্থেকে এসেছ? বোস। চিন্‌তে পারছি না তো? কুলদীপের কেউ হও কি?' নামটা ওরা বললে। তুমি তো ওর নামটা জান।

বরের নাম তো করতে নেই তুমি তো জান। আমি শুনতে পাচ্ছি, ঘোমটা থেকে দেখছিও।

মেয়েটি হাসল। বললে 'না, কেউ হই না আমি তোমাদের। এই বিয়ে বাড়ি দেখে ইচ্ছে হল বৌ দেখতে, তাই এসেছি। বৌ দেখতে লোকে যেমন আসে। বৌ

ভালো হয়েছে, না?'

গিন্নিবান্নিরা একটু অবাক হয়ে চাইল। তারপরে বললে, 'বেশ বেশ বস। তা দেখ। বৌ দেখাচ্ছি।'

আমার মুখ ঘোমটায় ঢাকা। গায়ে রূপার কিছু গয়না। জরির ঘাগরা লুগড়ী পরা। আমাদের ঘরে আর সোনা হীরে মোতির গয়না কোথায় পাবে। তার গায়ের গয়না দেখে সাজ দেখে এই বুড়ীরা অবাক হয়ে গেছে।

একজন চুপি চুপি বললে আমার কানের কাছে, 'ভক্তন ছে মালুম, ঘর কি লুগাই কোনে। ঘোমটা নেই, অত গহনা, অত হাসি।' (কীর্তনী মেয়ে গেরস্থ ঘরের মেয়ে নয় বোধ হচ্ছে)। সে বেপরোয়া ভাবে আমার কাছাকাছি বসল একটি খাটিয়ায়।

ওরা একজন আমার ঘোমটা তুলে মুখ দেখাল। আমি চোখ বুজে রইলাম তোমাদের দেশের মতনই।

সে বললে, 'বেশ বৌ হয়েছে তোমাদের কুলদীপের।'

ওরা বললে, 'তুমি কোথায় থাক?'

একলা মেয়েমানুষ, অত সোনা-রূপার গয়না পরে একলা পথে বেরিয়ে পরের অচেনা বাড়ি বৌ দেখতে এসেছে! তাদের সন্দেহ হচ্ছিল 'ভালো' মেয়ে নয়। একটু গুনগুন্ সুরে গানও করছিল।

'দেখছি গান জান!' এক দাদী বললে, 'বিয়ে বাড়িতে এসেছ তা একটু গান গাও না।'

চমৎকার ঝকঝকে দাঁত, লাল টুকটুকে ঠোঁটে সে হাসল। বললে, 'আমার এমন কোন পরিচয় নেই। এ গাঁয়ে বেড়াতে এসেছিলাম। চল, তোমাদের বাড়ি দেখি। আচ্ছা আগে একটা গান শোনাই। বলছ যখন।'

এ দেশের মেয়েদের মতই সে খাটিয়ায় বসেছিল। আরম্ভ করল। 'হে গোবিন্দ রাখ্ শরণ অবত জীবন হারে।...' রক্ষা কর হে গোবিন্দ শরণাগতকে।...ভক্তের আহ্বানে বৈকুণ্ঠে 'শোর' (গোলমাল) পড়ে গেল ..। (সুরদাসের গান)।

কি গলা আর গান! গানের গলার সুরে আমার ঘোমটা কখন সরে গেছে।

আর দাদী নানীরা অবাক হয়ে যেমন তেমনি বসে আছে। কতক্ষণ ধরে সে ঘুরেফিরে গানটি গাইল জানি না। দেখলাম তার ঠোঁটটি শুকিয়ে গেছে। চোখে জল ভরো-ভরো। কিন্তু পড়ছে না।

গান শেষ হলে ওরা বললে, 'বাঈজী, একটু সরবত পানি খাও। ওঠ (ঠোঁট) শুকিয়ে গেছে। কি গান কি ভজনই শোনালে। আহা, কুলদীপ থাকলে কি তোমায় ছাড়ত এখনি! আরও গান শুনতাম। আবার এস বাঈজী। এখন কিছু খাও।

বিয়ে বাড়ি।' ('বাই' হল কন্যা)। সে শুকনো শুকনো রাঙা ঠোঁটে আবার হাসল। বললে, 'তা নিয়ে এস সামান্য কিছু। শীগ্‌গির দাও কিন্তু। আমি অনেক দূরে যাব। অন্য গাঁয়ে।' যে কয়েকজন ছিল সবাই উঠে গেল রান্নাঘরের দিকে। সিদ্ধি ঠাণ্ডাই আনবে। নয়ত লাড্ডু, কচুরি, পুরি যা আছে আনবে দেখে-শুনে।

আমার মুখটা তখনও খোলা। ঘোমটা দিতে মনে নেই। সবাই চলে গেল, ও তাই চাইছিল যেন। চলে গেলেই সে চট্ করে উঠে দাঁড়াল। আমার কাছে এসে নিজের গলায় 'বলেওড়া'টা (হাঁসুলী) খুলে আমার কোলে ফেলে দিয়ে বললে, 'কারুকে বোল না। এ তোমায় দিলাম। তোমাকে দিতেই এসেছিলাম। আমি এবার চলে যাই।'

অত ভারী গয়না! আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'সে কি? আমি কেন এ নেব? তুমি কে? তোমার কি নাম বল?'

সে বললে, 'পাহুনার আবার নাম কি? এ তুমি নাও। আমি তোমাদের আপনার লোকই ছিলাম।'

দাদীরা এসে পড়ল। একথালা লাড্ডু কচুরি, এক ঘটি সিদ্ধি নিয়ে এল। সে সিদ্ধিটা মাথায় ঠেকাল। আর দু হাতে করে থালাটা ধরল। তারপর একটু হেসে একজনের হাতে থালাটা দিয়ে মাথাটি নীচু করে নমস্কার করে বললে, 'এবার আমি যাই।'

দাদীরা অবাক হয়ে বললে, 'খেলে না কিছু? চলে যাচ্ছ? নামও জানলাম না। কুলদীপকে কি বলব কে এসেছিল?'

সে হাসলে, বললে, 'ঐ তো হাতে করে নিলাম, ওতেই খাওয়া হল মাজী। (ও দেশে ছুঁলেই নেওয়া হয়, সম্মান রাখা হয়)। আর নাম? অচেনা পথের মানুষের আবার নাম কি! কিছু বলবার দরকার নেই কুলদীপজীকে।'

চলে গেলে ওরা বললে, 'ও ভালো ঘরের মেয়ে নয়। দেখলে না জুতোটাও পায়ের গোড়ালি তোলা। ভক্তনদের মত।'

আমি অবাক হয়ে শুনছি। বললাম, 'তারপর? কে সে? না সত্যি কেউ তোদের? তোর বর চিনলে তাকে? গোড়ালি তোলা জুতো আবার কি দোষের হল?'

মাজী বললে, 'না। কেউ হয় না।' আর বললে, 'ভদ্রমেয়েরা জুতোর গোড়ালির দিকটা তো উঁচু রাখে না।'

আমি। সে কিরে? তারপর গয়নাটা ওদের দেখালি? বর দেখল?

'গয়নাটার কথা দাদীদের কারুকে তো বলিই নি। তখন তো ছোট, ভয়ই পেয়েছিলাম। অত ভারী সোনার জিনিস দেখে। দেখাই নি কারুকে।'

তারপর সেদিন তো পাড়ার গিন্নীরা নিজেদের বাড়ি ফিরে গেল বর এলে পরে। মেয়েটার গল্প করলে। গানের কথা বললে। কেমন সুন্দর দেখতে তাও বললে। আর বললে, 'যাই হোক, সে মেয়েটা কিন্তু 'ভালো' মেয়ে নয়। কোন ভক্তিনী (ভক্তন) হবে।'

বর শুনল চুপচাপ। ওদেরও কিছু বললে না। আর আমি তো কনে বৌ, আমাকেও কিছু বললে না।

শুধু ওদের বলল, 'আমি একটু গাঁয়ে ঘুরে-ফিরে আসি। তোরা কেউ থাক্ একটু আরও বিন্দনীর (কনে বৌ) কাছে।'

অনেক রাত্রে সে ঘুরে-ফিরে এল। মনে হল গাঁয়ের কলালের (মদের দোকান) দোকানে ও গিয়েছিল।

কিন্তু আমি গয়নাটার কথা মা-বাবাকেও বলি নি। পাছে বাবা চেয়ে নেয়। আর বরকেও বলতে সাহস হয় নি। যদি বকে। প্রথমেই কেন বলি নি বলে। আমার খুব ভয় হয়েছিল। বয়সে অনেক ছোট ছিলাম তো। বরকে খুব ভয় হত সে অনেক বড় বয়সের। এখানে ওখানে লুকিয়ে রাখি। আমাদের ঘরেতে চাবি দেওয়া বাক্স, আলমারী থাকে না। হাঁড়ি-কুড়িতে পয়সা রাখে গাঁয়ে ঘরে। মাটিতে পুঁতে রাখে হাঁড়িটা॥ বাক্স থাকলেও রাখে না, মন্দ লোকের, চোরের চোখ আগে বাক্স দেখতে পায়।

আমি তো তখন পনেরো-ষোল বছরের মেয়ে। আমার তো গৌনা করার (দ্বিরাগমন) আর দরকার হ'ল না। এই বাড়িতেই আছি। সাবধানে রাখি গয়নাটা।

তারপর আমার বড় ছেলে হল। ছেলে হবার আগে বরকে একদিন হাঁসুলীটা দেখালাম। আর বললাম সেই মেয়েটির কথা। সাহস করে বললাম, সে তোমাদের কেউ হয়? মেয়েটা আমাকে গয়না দিয়ে বলেছিল আপনার লোক হই। বর চুপ করে রইল খানিকক্ষণ। তারপর বললে, 'রেখে দে তোর ছেলে হলে তাকে দেব। আমার তো মনে পড়ছে না কোন আপনার লোক ওরকম আছে।'

একে আমার চেয়ে ও অনেক বড় তাতে গাঁয়ের লোক (মোট্যার) পুরুষ। আমি ভয়ে বেশী কথা জিজ্ঞাসা করতে পারতাম না। যদি বকে, ধমক দেয়। একটু হেসে বললে, 'গাঁয়ের লোক তো থাপ্পড়ও মারে-টারে! জান তো!'

আমিও হাসলাম তার কথাতে।

'তারপর কুড়ি বছর গেল। এবারে আমরা একবার জগদীশ (পুরী জগন্নাথ) যাব ভাবলাম। অনেক লোক যাচ্ছিল। ও দেখল, একজন গেলে ভাড়া কুলিয়ে যায়।

দু'জনে গেলে টাকা কম পড়ে। আমারও যাবার ইচ্ছা। তখন আমি বললাম, 'এবারে দ্বারকাজী আর বৃন্দাবনজী চল।' এখন আমি আর অত ভয় করি না। মেয়েছেলেরা বড় হয়েছে, মেয়ের বিয়ে দিয়েছি।

গেলাম বৃন্দাবনজী। মন্দিরে মন্দিরে নাম শুনি। ভজন শুনি। পুণ্য কুণ্ড দর্শন করি। বনে নিধুবনে যাই। বন পরিক্রমাও করলাম পঞ্চক্রোশী। হঠাৎ একদিন দলের লোকেরা সব বঙ্কবিহারীজীর শয়ন আরতি দেখতে গেল। আমরাও গেলাম।

তখন ঝুলন এসে পড়েছে। দেশ-বিদেশের লোক আসছে দর্শন করতে। ভক্তরা আসছে গান শোনতে, ঠাকুরকে ভজন শোনাতে। লোকে বললে, দেশ-বিদেশের ভক্তনও (গায়িকা ভক্তিনী) আসে, খুব ভাল নাচে আর গায় ঠাকুরের শয়নারতির সময় —দেবদাসীদের মত।

আমরা গিয়ে বসেছি। কিছু ভক্ত গান গেয়ে চলে গেছে। কিছু গাইবে বলে বসে আছে। হঠাৎ কানে এল, 'হে গোবিন্দ রাখ্ শরণ অবত জীবন হারে'…হে গোবিন্দ, হে গোপাল, 'পানি বিনা মীন প্যাসী (পিয়াসী) সিন্ধুকে কিনারে'।—সেই গান! যেন কাঠের পুতুলের মতন হয়ে গেলাম। যেন মনে হচ্ছে আমি নড়লেই বুঝি গান থেমে যাবে। কুড়ি বছর আগের শোনা সেই গলা। প্রায় সেই চেহারা। শুধু আর ঘাগরা লুগড়ী গহনার জৌলুস নেই। খালি হাত পা গলা। বৃন্দাবনী ছাপার শাড়ি কাঁচুলি সদরি জামা পরা। খালি হাতে হাততালিতে তাল দিচ্ছে।

একটি মৃদঙ্গী মৃদঙ্গ বাজাচ্ছে।

অনেকক্ষণ গান হল। নটা বাজল। শয়নের যোগাড় হবে এবারে।

গায়িকা গুন্‌গুন্ করতে করতে মন্দির প্রদক্ষিণ করতে আরম্ভ করল। আরও অনেকের সঙ্গে—

'শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ড গিরি গোবর্ধন।
মধুর মধুর বংশী বাজে ঐ বৃন্দাবন।'

গাইতে গাইতে পরিক্রমা করতে লাগল। গাইল, 'মেরি লগন লগী হরি আওয়ন কি।' 'উমড় ঘুমড়' বর্ষা নামছে অভিসারে যেতে হবে।

এবারে আমি চুপি চুপি বরকে বললাম, 'ঐ সেই মেয়েটি! সেই আমার বিয়ের সময়ে যে হাঁসুলী দিয়েছিল।' বরও চুপ করে বসেছিল। কিছু বললে না। আমার ইচ্ছে এগিয়ে যাই। কথা কই। কিন্তু কথা কইবার উপায়ও নেই অত ভিড়ের মাঝে। আবার ভরসাও নেই যদি সে না হয়, কিম্বা চিনতে না পারে।

ধর্মশালায় ফিরে এলাম। ঠিক করলাম আবার কাল যাব গান শুনতে একটু আগে, তাহলে কথা কইলে কথা কইতে পারব। বরকে বললাম।

পরদিন সন্ধ্যার সময় গেলাম। সেদিন আর সে গায়িকা এল না। অন্য আরও কার গান হল। আমার বর কাকে জিজ্ঞাসা করলে তার কথা। তারা বললে সে বর্ষাণা গ্রামের মন্দিরে আজ লাডলীজী (রাধিকাজী)-কে গান শোনাতে গেছে। তারপর দ্বারকা চলে যাবে।'

আমরা বর্ষাণায় গেলাম। শুনলাম সে চলে গেছে মথুরায়। মথুরায়ও গেলাম তীর্থদর্শন করতে। ভাবলাম তাকে দেখতে পাব। কিন্তু সে তখন দ্বারকায় চলে গেছে।

আমি বললাম, 'আর দেখতে পেলি নি ?'

সে বললে, 'না। তারপর এই বাড়ি ফিরেছি ক'মাস হল।'

'ও এসে খুব অসুখে পড়ল। অনেকদিন পড়ে রইল বিছানায়। খুব ভাবত সব সময়।

তারপর একদিন বললে, 'ওই মেয়েটির কথা তখন তোমায় বলি নি। আমি ওকে চিনি। ওর নাম হল, যমুনা বাঈ। ও হল ভক্তনদের মেয়ে। অর্থাৎ কীর্তনীদের মেয়ে। ওর মা'র খুব টাকা পয়সা ছিল। খুব ভালো নাম-করা গায়িকাও ছিল ওর মা। খুব বিখ্যাত। নাম ছিল চন্দ্রভাগা বাঈ। এমন গান গাইত যে রাত্তিরে বেহাগ ধরে না থেমেই ভোরে ভৈরবীতে শেষ করত গান। লোকে পুতুলের মতন বসে থাকত। আমি ছোট থেকে ওদের বাড়িতে যেতাম। ওর সঙ্গে আমার খুব ভাব ছিল। তারপর ওর মা মরে গেলে আমিই দেখাশোনা করতাম। সেপাইর কাজের মাঝেই।

তারপর আমারও মা-বাপ মরে গেল। আমার বিয়ে দিতে পারল না। বিয়ে করতে চাইলাম না। ক্রমে লোকে আমাদের খুব নিন্দে করতে লাগল। ওরও নিন্দে হল গাঁয়ে খুব।

শেষকালে ও-ই তোমার সঙ্গে আমার বিয়ের ঠিক করে দেয়, অন্য লোক দিয়ে কথা কয়ে। তোমায় দেখেছিল আগেই।

আমি বিয়ে করতে চাই নি। বলেছিলাম, 'তোমার তো টাকা আছে। আর আমারও কাজ চাকরি টাকা আছে, আমরা এই রকমই থাকব দুজনে। লোকে নিন্দে করে করুক।'

ও বলেছিল, 'তুমি বুড়ো হবে। তোমার দেখাশোনা সেবাযত্ন তো আমাকে দিয়ে হবে না। আমি অন্য জাত। ভক্তন। আমরা 'ভালো' লোক নই।...বিয়ে করলে তুমি ঘর পাবে। স্ত্রী পাবে। ছেলেমেয়ে পাবে। অসুখে-বিসুখে সেবা পাবে। মৃত্যুকালে মুখে গঙ্গাজল পাবে। তোমার বাপ দাদা পিণ্ড পাবে। আমার কাছে তো তুমি এসব কিছুই পাবে না। শুধু ভালবাসাই পাবে। আর আমিও চিরদিন এইভাবে

হয়ত থাকব না। আমি তীর্থে তীর্থে মন্দিরে ভজন শুনিয়ে বেড়াব। তুমি বিয়ে কর।'

আমার খুব কষ্ট হল। ও শুনল না। বিয়ে হয়ে গেল। ওই বলেওড়া দিতে এসেছিল তোমাকে। তারপর তোমরা বললে ওর কথা। আমি ওকে খুঁজতে তখনি ওর গাঁয়ে গেলাম। ওকে দেখতে পেলাম না। তখনও তুমি হাঁসুলীর কথা বল নি। তারপর আর ওকে দেখতে পাই নি। ও বিয়ের আগেই বলেছিল, 'তোমার বিয়ের লগ্ন পূজা হয়ে গেলে আর আমাকে দেখতে পাবে না কোনোদিন।' আমি ভেবেছিলাম ঠাট্টা করছে। বাড়ি ঘর ফেলে যাবে কোথা। কিন্তু সে চলেই গিয়েছিল। বর এবারে আমার হাতটা ধরে বললে, 'সে ঠিকই বলেছিল, সব কথাই সত্যি হয়েছে তার।'

তারপর তার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। বললে, 'হ্যাঁ। তোর হাতের রুটি পানি পেলাম। তোকে লুগাই (স্ত্রী) পেলাম। তোর পেটের বাল বাচ্চাও পেলাম। সেবাও পাচ্ছি। মরবও সেবা পেতে পেতেই। সে কিন্তু কিছুই পেল না।'

কিন্তু সে কিছুই না পেয়েও ভক্তনদের মেয়ে হয়েও যেন ভগবানকেই পেযে গেল।

সেই বলেওড়া পাবার কথা শুনে আরও কত খুঁজেছি। গাঁয়ে সে এসেছে খবর পেলেই তখনি তাকে দেখতে গিয়েছি। কিন্তু দেখতে পাই নি। শুনেছি সে চলে গেছে। তার মোহ চলে গিয়েছিল নিশ্চয়। বোধ হয় সে ভজন গেয়েই ভগবান পেয়ে গেছে। কিন্তু আমি এত পেয়েও তাকে ভুলতে পারলাম না। আর একবার তাকে দেখতেও পেলাম না। বললে, 'বৃন্দাবনেও তাকে চিনেছিলাম। কিন্তু তার ঐ ভজনের সামনে যেতে ভরসা হয় নি।'

মাঙ্গী চুপ করল। আমি অবাক হয়ে গল্প শুনছিলাম। শুধু বললাম, 'ঠিক কথা। সে ভগবানকেই পেয়েছে। তার মোহ আর ছিল না।'

মাঙ্গীর চোখেও জল এসেছিল। সে বললে, 'ঠিক বাঈজী। তার কথা শুধু ভগবানই জানেন। আর কে জানে। কিন্তু আমার বর ওকে এখনও ভালবাসে।'

দুজনেই এতক্ষণে দেখলাম ঘরের বাইরে সন্ধ্যা ঘোর হয়ে ঘনিয়ে এসেছে। টিয়া-পাখীরা ক্ষেত থেকে ঘরে ফিরছে। ময়ূরগুলো উঠে গাছে বসেছে। ঘর অন্ধকার হয়ে গেছে। কুয়ো বন্ধ করেছে কুয়োচালক হালীরা। বাড়ির অন্য পরিজন কাজে নেমেছে সন্ধ্যায়। ছোট ছেলেমেয়েরা সব বাইরে বেরিয়ে গেছে।

সে তটস্থ হয়ে উঠে পড়ল। 'স্যাম (সায়াহ্ন) হয়ে গেছে। যাই ওদের রুটি পানির ব্যবস্থা করি।'

বললাম, 'আবার আসিস্।' সে ঘাড় নাড়ল।

উত্তরা—মাঘ, ১৩৭২

মালতী পাটপুর

শ্রাবণ মাসের শেষের দিক। রথের মেলা শেষ হয়েছে মাসখানেক, ফলে পুরীর ভিড় ভেঙেছে। তবু ভিড় কম নেই, জনতা অবশ্য নেই। আমরা চলেছি পুরী।

ট্রেন এসে থামল একটি স্টেশনে। বেলা শেষ হয়ে এসেছে। মেঘে নিঝুম সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে।

লম্বা থার্ড ক্লাস গাড়ির জানলা থেকে স্টেশনের নামটি পড়বার চেষ্টা করতে লাগলাম। ঘোর ঘোব সন্ধ্যায় আলোর গায়ে লেখা নামটি চোখে পড়ল, "মালতী পাটপুব"।

রেলপথে স্টেশনের নানারকম নামই চোখে পড়ে। কিন্তু এমন মিষ্টি একটি নাম কখন চোখে পড়েছে বলে মনে হয় না। তাতে আবার 'কঁড় যাওছি' 'কি মিতি করিব'র দেশে। এমন ছোট মধুর নাম তাও আবার বাংলা অক্ষরে লেখা, বড় ভাল লাগল। ওড়িয়া অক্ষর হলে বুঝতে পারতাম না। ইংরাজী অক্ষর হলে এমন মিষ্টি লাগত না।

আসন্ন সন্ধ্যা, চারিদিকে ঘন নীলাভ কালো নীলাভ মেঘ, নীচে পৃথিবীর মাটিতে ঘন গাছপালা। ছায়ায় ছায়ায় অন্ধকার হয়ে আসছে। স্টেশনে লোকজন বড় নেই। তারই মাঝে মালতী পাটপুর নাম লেখা। গ্রাম নিশ্চয় দূরে আছে। মানুষ? কেমন মানুষ তারা যাদের গ্রামের এমন নাম। ভাবছি—

সহসা গাড়ির দরজা ঠেলে টগর, বকুল ও কেয়া ফুল ভরা মস্ত একটি ডালা ভিতরে ঠেলে দিয়ে দুটি অল্পবয়সী মেয়ে গাড়িতে উঠল।

একটি শ্যামা, অন্যটি উজ্জ্বল শ্যামাঙ্গী, কারুকেই কালো মনে হল না। মাথায় মস্ত খোঁপায় বকুলের মালা জড়ানো, দু'নাকে উড়িষ্যার মেয়েদের মত নাকছাবি, পরিধানে মোটা হলদে রংয়ের ও দেশী কটকী শাড়ি, গায়ে চোলী ছোট হাতের, হাতে রূপার কাঁকন, পায়ে কাঁসার মল, কোমরে রূপার গোট ও চন্দ্রহার। উপর হাতে বাজু গলায় মুড়কি মাদুলি হার। কপালে উল্কি ও টিকা, ঠোঁটে মিষ্টি তরল হাসি ঝলমল করছে।

ঝুড়িটি পাশে রেখে তারা দুজনে বসল। দেখলাম সাজটা উজ্জ্বল শ্যামাঙ্গীরই বেশী। অন্যটির বসন ভূষণ আছে। এর যেন সাজের ঘটাটা বেশি। কিম্বা রূপের জৌলুষে তাই মনে হচ্ছে।

ফুলের ঝুড়িটিতে আরও চেনা অচেনা ফুল রয়েছে। কিন্তু মালতী ফুল কেমন

দেখতে হয়? মল্লিকাই বা কেমন? এত যাদের নাম তাদের তো দেখি নি মনে হচ্ছে। জুঁই, বেল, টগর রজনীগন্ধারই তো ছড়াছড়ি সর্বত্র। ওদের ঝুড়িতেও পাঁচ রকম ফুল রয়েছে, দূর থেকে মেঘ ও সন্ধ্যার অন্ধকারে ভাল বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু মধুর মদির তীব্র গন্ধে গাড়িটা যেন ভরে গেছে। কিন্তু ওদের গ্রামের নাম যখন মালতী পাটপুর নিশ্চয় মালতী মল্লিকায় সে গ্রামের বন অরণ্য বাড়ির আঙ্গিনা ভরে থাকে। নইলে এমন নামের কোন মানে হয় না।

মনে হল, এমন মিষ্টি যে গ্রামের নাম, যদি একবার নেমে দেখে আসা যেত। জিজ্ঞাসা করব ওদের? ওদের গ্রামের কথা, মালতী ফুলের কথা? ওরা এত সেজে চলেছে কোথায়? কেনই বা সাজার ঘটা?

কিন্তু ভাষা, তা তো জানি না!

একবার কথা কইতে গেলাম তারা আবার মধুর স্বরে বয়সোচিত তরল ভাবে লঘু হেসে আকুল হল।

আবার চেষ্টা করে জিজ্ঞাসা করি নাম, 'কঁড় যাওছি?'

এবারে নিজেদের ভাষা শুনে বলে, 'জগড়নাথ দবশন করিবি।'

ইঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এত সেজেছ কেন?'

একটু হেসে বললে, 'অজ (আজ) নাচিতে হব।'

কৌতুক ও বিস্ময়ে প্রশ্ন করলাম, 'কোথায় নাচিবে—মন্দিরে?'

বললে, 'হু'। শ্যামাঙ্গী বললে, 'ও নাচিব। আজ মন্দিরে নাচিব। কল (কাল) কনারক যিব, ললিতা সপ্তমী স্বরষ সপ্তমী অছি। সেথা নাচিব।' মনে হল মন্দিরে নাচবে, কোনারকে নাচবে। আহা রূপ ও গড়ন নাচেরই মত। আর ওড়িয়া ভাষায় বিদ্যায় কুলোয় না! শুধু শুনতে লাগলাম কলহাস্য, কথা, আর মাঝে মাঝে 'মালতী' ডাক। আর তারই মাঝে মৃদু স্বরে গায় কি এক গান। যেন মায়া গান। ভাবি ওদের মাঝে কোনটি মালতী, সুন্দরী না শ্যামাঙ্গী? গ্রামের মত মেয়েদের নামও এমন মিষ্টি?

ওদের সঙ্গ নিয়ে মন্দিরে নাচ দেখবার চেষ্টা করব? আর কোনারক গেলে আরও চমৎকার হয়। কোনারক দেখেছি। সেই নিকষ রূপসী পাষাণীর কঠিন কষ্টি কালো কোলের কাছে এই সুকোমলাঙ্গী তরুণী সুন্দরীর নাচ না জানি কি সুন্দর হবে! কিন্তু কেমন করে ওদের সঙ্গে যাব। আসন্ন সন্ধ্যা, ট্রেনেও আলো জলে নি। ফুলের ঝুড়ির কেয়া বকুলের গন্ধ আর তরুণী মেয়ে এবং অজানা ভাষায় মধুর মিষ্ট গলায় তাদের হাসি ও কথা যেন কিসের ঘোর লাগিয়ে দিলে মনে ও চোখে। চুপ করে চোখ বুজে শুয়ে শুয়ে ওদের কথা শুনতে লাগলাম। যদি বুঝতে পারতাম। কিন্তু না বোঝাতেই যেন বেশী ভাল লাগছে। গাড়িতে আর কেউ নেই।

মনে ভাবছি নিতে আসবে পাণ্ডার লোক। আসুক, যাই হোক, এদের সঙ্গ ছাড়া হবে না। এদের সঙ্গেই তাদের বলে কয়ে যাব।

কেমন করে স্টেশনে নামলাম, কি করে শ্রীমন্দিরে এলাম, আমার পাণ্ডারা কোথায় ছিলেন, তা জানি না।

সহসা দেখি মহাপ্রভুর শয়নারতির যোগাড় হচ্ছে, আমি গরুড় স্তম্ভের কাছে দাঁড়িয়ে আছি। আর সেই মেয়ে দুটি জগন্নাথের বিগ্রহের দুদিকে দুজন মুখোমুখি ভাবে স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রদীপের মৃদু আলোয় জগন্নাথের মূর্তি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। স্পষ্ট মনে হল যেন কিসের প্রতীক্ষায় চেয়ে আছে তারা সুমুখে। মেয়ে দুটিরও মুখে পড়েছে মন্দিরের বড় বড় পিলসুজের প্রদীপের আলো। সহসা তারা পায়ের নূপুরে ঝঙ্কার দিলে। তখনি তাদের হাতের বাজুর ঝুমকো, গলার হার, কোমরে চন্দ্রহার একসঙ্গে যেন ঝঙ্কৃত হয়ে শব্দময়ী হয়ে উঠল। গলায় ও মাথায় ফুলের মালা দুলে উঠল। নূপুরে আর ঝঙ্কার থামল না। নৃত্য আরম্ভ হয়ে গেল। সেকি অপূর্ব নাচ চোখে না দেখলে বোঝা যায় না। স্নিগ্ধ আলো শুধু মন্দিরের বিগ্রহের কাছে আর সব দিক অন্ধকার। সামনে তারা নাচছে। তনু দেহ দুটি তালে তালে পা ফেলছে। আন্দোলিত হচ্ছে হাত দুখানি। আঁটসাঁট কটীবন্ধ আঁচলের নিচে কোমরের গোট ও চন্দ্রহার ঝিকমিক করে উঠেছে। কোনখানে এক সঙ্গে মৃদঙ্গে ও করতালে নাচের বোল বাজছে। কি নাচ? কি বোল?

অকস্মাৎ তারা থামল। এবারে মৃদু মধুর কণ্ঠে অপূর্ব মিষ্ট সুরে তারা জয়দেবের পদাবলী গাইতে আরম্ভ করল, যেন ঘুম পাড়ানো সুরে।

'ধীর সমীরে যমুনা তীরে বসতি বনে বনমালী।'

সঙ্গে সঙ্গে মৃদু তালে অঙ্গভঙ্গীতে নৃত্য, দ্রুত তালে নয়।

কতক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। আর এক কলি কানে এলো 'মা কুরু নিতম্বিনি গমন বিলম্বনমনুসর স্বং হৃদয়েশম্'। ওগো রাধা দেরি করো না বিলম্ব করো না, অনুসরণ কর হরির, তিনি অধীর হয়েছেন।

আলো মৃদু হতে মৃদুতর হয়ে এল। গান মৃদু থেকে মধুর মৃদুতর হয়ে এল। মন্দির জনশূন্য, পাণ্ডা পুরোহিতকে দেখা যাচ্ছে না, নাচও যেন দেখতে পাচ্ছি না। আর গান বা মৃদঙ্গের তবলায় বা অন্য বাজনার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। এবারে কি বিগ্রহের শয়ন হবে?

সহসা গাড়ি থেমে গেল। চেয়ে দেখি, মেয়ে দুটি ফুলের ঝাঁকা নিয়ে দাঁড়িয়ে উঠেছে। আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

ঝকঝকে সুন্দর দাঁতগুলি টুকটুকে ঠোঁটের মাঝে হাসছে।

বললে, 'উঠ মা, নাবিব না, পুরী অসি গেল।'

ঘুমিয়ে পড়েছিলাম? কতক্ষণ হল?

পাণ্ডা এসে দাঁড়ালেন, 'মা এসেছেন? আর তোরাও এই গাড়িতে আসিলি? রায় বাড়ির মায়ের সঙ্গে চেনা হইল?'

তারা হাসলে, বললে, 'আসিলি তো! চিনিলাম মায়েরে। ঘুমাছিল, জাগাইলি!'

ওরা নেমে গেল। আমিও নামলাম। পাণ্ডাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'ওরা কে?'

পাণ্ডা বললেন, 'ওরা দেবদাসী আছে। আজ মন্দিরে নাচিবে। কাল সারারাত্রি কোণারকে সূর্য মন্দিরে নাচিবার কথা।' ওদের নাচের সঙ্গে শ্রাবণের মেঘের আড়াল থেকে এই সূর্যোদয় হবে। আগে লোকে বলত মালতী পাটপুরের ঐ মেয়েরা নাচলে শ্রাবণ মাসে ললিতা সপ্তমীতে মেঘ কেটে যায়। আকাশ পরিষ্কার হয়ে যায়। খানিকক্ষণের মত। বছরে চারটি সূর্য সপ্তমী। আগে চার বারই ওরা জগন্নাথকে নাচ দেখিয়ে কোণারকে নাচত। এখন সব আর আসে না, পারেও না। সে রকম মেলাও বসে না। এক মাঘ ছাড়া। তাছাড়া 'নিয়াখিয়া' নদী শ্রাবণ মাসের জলে ভরাভরি। পার হতে নৌকা বানচালের ভয় আছে। এইজন্য লোকে কোণারক বর্ষায় যায় না।

জিজ্ঞাসা করলাম, 'তাহলে নাচ হবে না সেখানে? আর মন্দিরে?'

পাণ্ডা বললেন, 'সেখানে হবে না। তবে মন্দিরে আর সে নাচ হয় না, আগে যা হত জয়দেবের পদাবলী নিয়ে।'

বললাম, 'পদাবলী নিয়ে? ধীরে সমীরে যমুনাতীরে গেয়ে?'

সবিস্ময়ে পাণ্ডা বললেন, 'আপনি কোথায় শুনলেন ও গান, বৃন্দাবনে? এখানে এখন তো আর নিয়ম করে দেবদাসীরা নাচে না। তবে মাঝে মাঝে নাচে। বৈশাখ মাসে নরেন্দ্র সরোবরে অক্ষয় তৃতীয়ায় মেলা হয়। চন্দনযাত্রা হয়। তখন নাচ হয়।'

আমি অন্য মনে ভাবতে লাগলাম, যেমন স্বপ্ন দেখলাম, অমনিই কি নাচে গায় ওরা? জিজ্ঞাসা করলাম, অন্য গানও গায় পদাবলী থেকে? পাণ্ডার সঙ্গে যেতে যেতে স্বপ্নের কথা বললাম।

তিনি আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'ঐ রকমই সব গান কয়েক বছব আগেও হত। এখন ওসব প্রায় উঠে যাচ্ছে। দেবদাসীর নিয়মও উঠে যাচ্ছে কিনা।'

আগ্রহভরে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আজ হবে? ওরা বললে যে?'

পাণ্ডা হাসলেন, বললেন, 'সে জগবন্ধুর ইচ্ছায় তো আপনার কৃপা দর্শন হয়ে গেছে। আজ বোধ হয় হবে না। যা মেঘ করেছে। আজ এখন বাড়ি চলুন। দেখুন ওরাও ভিজে যাবার ভয়ে গাড়িতে উঠল।' দেখি মেয়ে দুটি রিকসায় উঠেছে, কোলে ফুলের ডালাটি।

আকাশের দিকে চেয়ে দেখলাম। ঘন কালো মেঘেরা অতি ব্যস্ত হয়ে আকাশের চারিদিকে আনাগোনা করছে। সন্ধ্যার লেশটুকুও দেখা যাচ্ছে না।

পাণ্ডা বললেন, এই গানটার একটা কিম্বদন্তী বা কাহিনী আছে জগন্নাথের লীলায়। ভক্তমালে পাওয়া যায, এক মালিনী মেয়ের এই কাহিনীটি··· লোকেরা বলে ওরা সেই মালিনী মেয়ের বংশের মেয়ে। জগবন্ধুর অতি প্রিয় গান এটি।

অকস্মাৎ একটা তীব্র বিদ্যুৎ চমক ও গর্জনের সঙ্গে তুমুল ধারায এমন বৃষ্টি নেমে এল আর কিন্তু কিছু শোনা গেল না। তারই মাঝে বাড়ি এসে পডলাম।

অভিযাত্রী—শারদীয়া, ১৩৬২

ধান

ধানক্ষেত একেবারে ভরে গেছে। কালু শেখের ছ-সাত বিঘা ক্ষেতের শ্যামা জননীর পীত অঞ্চলে যেন আর ধান ধরে না। কালু শেখের সাত বিঘে, তার ভাই মণি শেখের তিন বিঘে। তারপর গ্রামের আর সকলের, কারু বেশি, কারু কম। সিধু মোড়লের ধান-জমি কালুর সীমানার পাশেই।

কালু এসে দাঁড়াল ক্ষেতের পাশে। তারপর চলতে চলতে তার ঘরের সামনে গ্রামের মাঝে এসে পড়ল।

ঘরের দুয়ারে শিকল দড়ি দিয়ে বেশ শক্ত করে বাঁধা, যেমন করে বেঁধে রেখে চলে গিয়েছিল। কালু উন্মনাভাবে এদিক ওদিক তাকাল। তার ভাইয়ের ঘরও সেই ভাবেই শিকল টানা আর কাঠি দিয়ে দড়ি বাঁধা। কালু ক্লান্তভাবে দাওয়ার ওপর বসল। তাহলে কি তারা আসে নি? মাথাটা যেন কেমন হয়ে গেছে। মনে হল, বিষম তৃষ্ণা পেয়েছে।

খানিক বসে থাকার পর তার হঠাৎ মনে হল, হয়তো বাড়ির সবাই এসেছে, অন্য জায়গায় কিছু কাজে গিয়ে থাকবে। কিন্তু ঘরের দাওয়ার ধুলোর ওপর পায়ের দাগ একটিও পড়ে নি। কয়েক মাসের মধ্যে মানুষের গতিবিধি হয়েছে সেখানে এমন মনে হয় না। কিন্তু মনে সে কথা ভাবতে চায় না। কালু উঠে দাঁড়াল। যদি ঘরে কলসি থাকে জলের, তা হলে একটু জল এনে খাবে, তারপর জল ভরে রেখে তাদের ওপাড়া থেকে ডেকে আনবে। একটু রান্নার যোগাড় করতে পারে যদি কারুর কাছে দুমুঠো চালের যোগাড় করে। ক্ষেতের দিকে চেয়ে তার চোখে জল এল। কি দুর্দিনই গেছে, দীর্ঘ চার মাস ধরে। ছোট ছোট ছেলেমেয়ে, জোয়ান

ছেলে হবিব, তাদের মা, হবিবের বউ—আট-ন জন পথে পথে ঘুরে ঘুরে—তারপর ছোট ছোট তিনটি শিশুর মৃত্যু; হবিবের বউয়ের একটি মৃত সন্তান হয়ে জ্বরে ভুগে খেতে না পেয়ে অর্দ্ধমৃত অবস্থা। তারপর হঠাৎ তারা কোন্‌দিকে ঘুরতে ঘুরতে চলে গেল, ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল, বুড়ো কালু শেখ তা জানে না। কালুর বিবির কাছেই ছিল দুটি ছেলে—জমির আর ফকির। হঠাৎ দেখলে, তার সঙ্গে যেন তারা নেই। কলকাতার পথে পথে কদিন ধরে খুঁজে তাদের পায় নি। লরী ভর্তি করে লোক নিয়ে গেছে, লোকে বললে। কোথায়, তা কেউ বলে না। কালু ভাবলে, হয়তো তারা দেশেই সকলে এসেছে। কথা তো তাই ছিল, ধান পাকলে দেশে ফিরবে। তারা এলেই কালুও দেশে ফিরবে। কথাই ছিল, এই কটা মাস কোনক্রমে ভিক্ষে করে প্রাণটা বাঁচালে আল্লা আর কোন অভাব রাখবে না।

কালুর চোখ ঝাপসা হয়ে গেল। ক্ষেতের দিকে চেয়ে সে চোখ মুছতে লাগল। উন্মনাভাবে বিড়বিড় করে মুখে বলে, 'বাবা-মায়েরা, বহুত ধান হয়েছে। তোরা এক-মুঠো ভাত চোখে দেখতি পেলি না বাপ। আজ ভরপেট ভাত খেতে দিতাম বাপ।' কালুর ঝাপসা চোখের সামনে সমস্ত ক্ষেত মিলিয়ে গেল, কেবলই ছোট ছোট তিনটি বালকবালিকার শীর্ণ কঙ্কাল তনু ভেসে ভেসে আসতে লাগল। শহরে ভিক্ষান্ন মেলে নি, এবং অন্ন তো দৈবাৎই মিলেছে, তাদের সকলের তো প্রায়ই, শিশুগুলিরও পেট ভরে নি। শিশুগুলিকে বহু আশ্বাস দিয়ে নিজেরা বহু আশা করে দিনের পর দিন ওরা পথে পথে বেড়িয়েছে, যদি কোন রকমে এই কটা মাস বাঁচিয়ে রাখা যায় তা হলে আবার সব হবে। তারপর—

কালু ঘরের দরজা খুলে ভেতরে প্রবেশ করল। না, তারা কেউ এখানে আসে নি। জলের কলসি, ধান-চালের জালা, হাঁড়িকুড়ি ধূলায় ধূসরিত। মেঝেতে বহু ইঁদুরের গর্ত। মাটি কুরে কুরে ঘরখানা ক্ষতবিক্ষত করেছে তারা। কালু চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর কলসিটা নিয়ে গ্রামের দিকে এগিয়ে গেল।

চৌধুরীদের বড় পুকুরে জল নিয়ে ফিরবে, আর দেখবে, যদি ওই দিকে কোথাও হবিব তার মাকে বউকে নিয়ে এসে থাকে। তা হলে কদিনের জন্যে চারটি চাল যোগাড় করবে। তারপর? আর এবারে অন্নের দুঃখ খোদা রাখেন নি।

চৌধুরী পুকুরের আশপাশে ঘাটে আঘাটায় কয়েকজন জল নিতে, স্নান করতে এসেছিল।

কালু কলসি নিয়ে নিজেদের ঘাটের দিকে গেল।

অন্য ঘাট থেকে পতিত রুইদাস জিজ্ঞাসা করলে, 'কালু শেখ আইলে নাকি? ভাল সব?'

কালু কলসি রেখে বললে, 'হাঁ ভাই, আলাম তো। হবিবরে দেখেছ নাকি?'

পতিত স্নান করছিল, সে বললে, 'না ভাই। সবাই এসেছ তো? তোমার ক্ষেতে খুব ফসল হয়েছে ভাই। আর দেখ না, সব ক্ষেতেই কি ফলন ফলেছে!' একটু নিঃশ্বাস ফেলে তারপর বললে, 'শুধু দেশে আর মানুষ নাই।'

পতিত স্নান করে চলে গেল।

কালু মাথায় মুখে খানিক জল দিয়ে চুপ করে বসে রইল। তা হলে এরা হবিবদের দেখে নি!

খানিকটা জল খেয়ে কলসিটা ভরে কালু ঘাটের ওপর একটু ছায়া দেখে বসল।

আশেপাশে এঘাটে ওঘাটে প্রায় জনহীন গ্রামের কয়েকটি লোক স্নান করতে এল। কেউ তারা কালুকে চেনে, কেউ চেনে না ভাল করে। অনাথ আতুরের মত কালুর চেহারা হয়েছে, চেনাও শক্ত। কালু ভাবতে লাগল, একবার সিধু মোড়লের বাড়িতে খোঁজ করবে, সে হয়তো জানে হবিবের খবর। বেলা পড়তে আরম্ভ করে। কালু ক্লান্তভাবে উঠে দাঁড়াল।

সিধু মোড়লের ঘরখানা কালুর ঘরের খানিকটা পেছনের দিকে। তার ঘরের দুয়ার খোলা। আঙিনায় একটা শীর্ণকায় গরু, তার বাছুরটা নেই কোথাও। সিধুর একটা কুকুর ছিল, সেটা এখন যেমন হ্যাংলা তেমনি খেঁকি। কালুকে দেখে ঘেউঘেউ করে এল। আঙিনায় জঙ্গল ভরে গেছে। দাওয়ার ওপর বহুকাল লেপা পড়ে নি।

কালু ডাকলে, 'সিধু ভাই, ঘরে আছ?'

ঘরের মধ্যে থেকে অতি ক্লান্ত স্বরে জবাব এল, 'আছি, কে তুমি? উঠে এস, আমার জর।'

কালু ঘরের দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল, 'আমি কালু শেখ, ভাই। তুমি জ্বরে পড়ে আছ? ভাই, হবিবের মা'রে—ওদের দেখেছ? এখানে আইল নাকি? তোমার কাছে এখানে কেউ নেই? সবাই কোথায়? খুব ধান হয়েছে তোমার ক্ষেতেও দেখলাম।'

কঙ্কালসার সিধু একবার উঠে বসবার চেষ্টা করলে, পারলে না। কোটরেবসা চোখ দুটোয় জল চকচক ক'রে উঠল। একটু পরে শান্তভাবে ধীরে ধীরে বললে, 'হ্যাঁ ভাই, ধান হয়েছে। রামের খুব অসুখ করল—জ্বর পেটের অসুখ, তার মায়েরও জ্বর হল। তারপর তারা দুজনেই আমায় ফেলে চলে গেল। সিধুর চোখের কোলের জল দু'ফোঁটা গ'ড়িয়ে পড়ল। 'ভাই, পাকা হাড়ে খুব সয়, তাই আমি জ্বরে ভুগেও, না খেতে পেয়েও টিকে আছি! ওরা সইতে পারলে না।'

কালুরও চোখে জল পড়ছিল। সে বললে, 'হ্যাঁ ভাই, আমারও তিনটা বাচ্চারে

কলকাতাতে রেখে আলাম—ফতি, আয়েষা, সোনা। তারা খিদেতে শুকিয়ে গেল ভাই—ভাতের জন্থি। আর এত ধান—'

দুজনেই নীরব হয়ে গেল। ঘরের সামনে থেকে দেখা যায় সিধু মোড়লের ধানের ক্ষেত ফসলের ভারে নুয়ে পড়েছে। সিধু জিজ্ঞাসা করলে, 'আর সবাইরে নিয়ে এসেছ?'

কালু শেখ উঠে দাঁড়াল, বললে, 'গেরামে তাদের দেখতি পাব মনে ভেবে আলাম তো। তারা যে কমনে গেল! খুঁজে দেখি। তোমাদের দিকে আসে নাই?'

সিধু বললে, 'না তো। তোমার বিবিরে কি ছাওয়ালদের তো এদিকে দেখি নাই, তা আমি তো জরে শুয়ে পড়ে, দেখি মেয়েটা ছেলেটা ফিরলে শুধুব, তারা জানবে হয়তো।'

কালু শেখ উন্মনাভাবে সারা বেলা অনাহারে তাদের গ্রামে হবিবদের আর তার মাকে খুঁজে বেড়াল! না, তারা এ গ্রামে আসে নি। দুমুঠো চাল এনে সন্ধ্যাবেলা সিধু মোড়লের মেয়ে বললে, 'কালুকাকা, দুটো বেঁধে খাও আজ। এক মুঠো খেয়ে কাল আবার ভিন্ গাঁয়ে দেখ, হয়তে আসতেছে। পথ চিনতে দেরী নাগে তো।'

পতিত রুইদাসও তাই বললে। গ্রামের ঘর বেশির ভাগই শূন্য, কোঠাবাড়িতেও লোক যেন নেই, চেনা পথের মাটিতে পায়ের দাগ যেন গুনে নেওয়া যায়—এত কম। গরু বাছুর বলদও নেই, লোকে বেচে দিয়ে চলে গেছে। যারা কিছু ধান রাখতে পেরেছিল লুকিয়ে চুরিয়ে, তারাই পড়ে আছে, হয়তো বেঁচেও আছে। বাকি সব পালিয়ে গেছে। বেঁচে আছে? কেউ জানে না! আর ফেরে নি।

কালু কোনক্রমে দুটো রাঁধে। মুখে গ্রাস ভাল করে ওঠে না। মনে হয়, হয়তো তারও কবিলা নেই, আর জমির ফকির—কচি ছেলে দুটো? সিধু মোড়লের কথা মনে হয়, পাকা হাড়ে খুব সয়। তার মন হু হু করে ওঠে, চোখে উচ্ছ্বসিত হয়ে জল আসে। অবশিষ্ট ভাতগুলি সিধুর গরুর কাছে কুকুরের কাছে ঢেলে দিয়ে ওদেরই দাওয়ার পাশে শুয়ে পড়ে। বললে, 'লক্ষ্মী, শূন্যি ঘরে যেতে মন সরছে না মা, আজ তোদের ঘরকে হেথায় পড়ে থাকি।'

লক্ষ্মী ম্লানভাবে হেসে বলে, 'শোও তাই, একখানা মাদুর দিই।' কার্তিকের রাত্রের মাঠের কনকনে হিম ছেঁড়া কাপড়ের বাধা মানে না। কালুর ঘুম শীতেও আসে না, ভাবনাতেও আসে না।

রাত্রি শেষ হবার আগেই মন আশান্বিত হয়ে ওঠে। সত্যি ভিন্ গাঁয়ে—ওই পাশের গাঁয়ে হয়তো এসে জিরুচ্ছে তারা। খাওয়া নেই কতকাল, হয়তো জরে পড়েছে, হয়তো কমজোর হয়ে গেছে। কালু ছেঁড়া কাপড়টা টেনেটুনে গায়ে দিয়ে

প্রভাতের আগেই পাশের গ্রামের দিকে যায়।

সে গ্রামের প্রায় সকলেই অচেনা মানুষ, সেখানেও যেন নেই। কাকে জিজ্ঞেস করবে, কে তাদের চেনে, কেবা ওকে চেনে, কিছুই যেন বোঝা যায় না।

অখাদ্য আহারে কঙ্কালসার রোগা জীর্ণকায় এক-একজনকে দেখে কালু জিজ্ঞেস করতে যায়, কি জিজ্ঞাসা করবে যোগায় না। হতবুদ্ধির মত গ্রামের পথে পথে খুঁজে খুঁজে ঘুরে বেড়ায়। তারা পাঁচজন হবিব, তার মা, বউ, ছেলে দুজন। যদি একজনকেও দেখতে পায়!

গ্রামে কোঠাবাড়ি নেই বললেই হয়, কাঁচা ঘর প্রায় খালি, যারা আছে তাদের দেখলে মনে হয় আর অল্প কয়েক দিনের জন্যেই আছে। গ্রামের আশপাশের ক্ষেত কিন্তু ফসলের ভারে হেলে পড়ছে। কিন্তু এখনও যারা বেঁচে আছে, পথে উঠে বসেছে, তাদের কারও দৃষ্টি উদাসীন, কারও বা হতবুদ্ধি, আতঙ্ক-অভিভূত। ফসল? ফসল কার? তাদের লোকেরা কি ছিনিয়ে নিতে আসবে না আর? আর ফসল কে খাবে? কে কাটবে? খাবার লোক, অতিপ্রিয়তম যারা, তারা অনেকেই যে নেই! কাটবার জন্যে যারা আছে তাদের শক্তিও নেই আর প্রয়োজনবোধও নেই; শোকে রোগে ভয়ে ভাবনায় জড়ের মত হয়ে আছে। সকালে একবার শুধু গ্রামে পথে উঠে আসে। তারপর ফিরে গিয়ে জীর্ণ খড়-ছাওয়া কুটিরখানিতে গিয়ে বসে থাকে। বিকালের দিকে হয়তো জ্বর আসে, ছেঁড়া কাঁথাখানা গায়ে দিয়ে শুয়ে পড়ে।

কালু এ-গ্রাম ও-গ্রাম ঘুরে বেড়ায়। ভদ্রলোক কারুকে দেখলে কাছে গিয়ে সঙ্কুচিতভাবে দাঁড়ায়। সকলে ভয় পায়, পাছে ভাত চায়, খেতে চায়। কালু বলে, 'না বাবুমশায়, খেতে চাচ্ছি না, মোর কবিলারে ছাওয়ালদেরকে খুঁজতে আলাম এধার পানে, মোরা মোছলমান।' সে অন্ন চায় না, আশ্রয়ও চায় না, শুধু ছত্রভঙ্গ সঙ্গীদের খুঁজে বেড়াচ্ছে। আজ আর অন্ন আশ্রয়ের অভাব তার খোদা রাখেন নি। কেউ সহৃদয়ভাবে বলেন, 'না বাপু, মোছলমান দেখি নি কারুকে এ গাঁয়ে।' কেউ বিরক্ত হয়ে বলে, 'শোন কথা ব্যাটার, ওর কবিলা কোথায় আমরা তার হিসেব রাখি যেন।'

কোনদিন আশপাশের গ্রামেই পড়ো ঘরের দাওয়ায় শুয়ে পড়ে, কোনদিন গ্রামে ফিরে আসে। এমনই করে দশ-বারো দিন গেল। পাশাপাশি কলুদের ক্ষেতের, সিধু মোড়লের ক্ষেতের, পতিতের ক্ষেতের, সকলের ক্ষেতেরই ধান পেকে উঠল। সিধুর ছেলে নিতাই দু-একজন আপন জন ডেকে জড় করে ধান কাটতে আরম্ভ করলে।

কালু উদাসীন নির্বোধের মত ওদের দাওয়ার এক পাশে বসে থাকে নিজের ক্ষেতের দিকে পিছন ফিরে।

এখন সিধু কোনক্রমে শরীর টেনে নিয়ে তার পাশে এসে বসতে পারে। বলে, 'ভাই, তামুক খাও।' কল্কেটা হুঁকা থেকে নামিয়ে দেয়।

কালু কল্কেটা হাতে নিয়ে বসে থাকে। তারপর ফুঁ দিয়ে টানতে গিয়ে তার চোখ জলে ভরে যায়। কল্কে নামিয়ে রাখে।

সিধু বললে, 'কি হল ভাই, বিষম খালে?'

কালু চোখ মুছে বলে, 'কি জানি।'

কালু বসে বসে দেখে। লক্ষ্মী খুঁজে-আনা সঙ্গিনী জড় করে ধান মাপে, ঝাড়ে, তোলে। নিতাইয়ের ক্ষেতের কাজ শেষ হয়ে এল। এবার একদিন সন্ধ্যাবেলা নিতাই বললে, 'কালুকাকা, আমার কাজ হয়ে এল। এবারে তোমার খ্যাতে নাগব সবাই, কাল বাদে পরশু নাগাত।'

কালু অবুঝের মত নিতাইয়ের পানে চাইলে।

সিধু ঘর থেকে বললে, 'হ্যাঁ, দশে মিলে কাজ করলে, তোমারও কাজ উঠে যাবে ভাই, ভাবছ কেনে?'

কালু এবারে হাউহাউ করে কেঁদে ফেললে।

ধান কাটা হয়ে উঠবে কিনা, তার কাজ উঠবে কি না, কালু ভাবে নি। সে ক্ষেতের দিকে আর চাইতেই পারে নি। কালু কিছু ভাবতেই আর পারে নি।

দুটি কিশোর তরুণ-বয়স্কের, তাদের বাপেরও চোখ শুকনো রইল না। কালুর কান্না সিধুর শোক জাগিয়ে তুলল। কিন্তু সিধুর ঘরে এখনও নিতাই আছে, লক্ষ্মী আছে। আবার ধীরে ধীরে তার সমস্ত দুঃখের ক্ষতে প্রলেপ পড়বে, আবার হয়তো এই আঙিনা ভরে নিতাইয়ের লক্ষ্মীর কোলে শিশুদেবতার পায়ের চিহ্ন পড়বে। নিতাইয়েয জননীর কথা, রামের কথা তারা জানবে না, সিধুও হয়তো তাদের মধুর হাসি-কাকলির কলশব্দে আজকের গ্রামের জনহীন এই নিস্তব্ধ ভয়াবহ দুর্দিনকে ভুলে যাবে।

চোখ মুছে লক্ষ্মী বললে, 'কালুকাকা, কেঁদো না। কাকী বুড়ো হযেছে, হয়তো হাঁটতে পারে না তেমন। আর হবিব ভাই তো সঙ্গে আছে। তুমি আজ দুটি রেঁধে খাও, কাল আবার খুঁজতে বেরিও। ওরাও তো জানে ধান কাটার সময়। ওরা আসবেই ফিরে।'

নিতাই বললে, 'হ্যাঁ, তাই কর। তুমি ফিরে এলে আমি তোমার ধান কাটতে শুরু করব।'

সিধু বললে, 'তখন যদি গাঁ ছেড়ে না যেতে ভাই, তা হলে আর এমন হত না!' কালু চোখ মুছে নীরবে বসে রইল।

নিতাই বললে, 'ঘরে যদি খাবার চাল থাকত, তা হলে কি আর লোকে যেত বাবা!

এমন করে গাঁ লক্ষ্মীশূন্যি করে দিলে যে—'

নিতাই চুপ করে গেল। চোখের সামনে যেন ভেসে এল উর্দি-চাপরাস-পরা সরকারী লোকের শোভাযাত্রা। লোক সভয়ে আঙিনায় গোলার পাশ থেকে সরে দাঁড়াল, বীজধানের জালা খুলে দেখিয়ে দিলে। কেউ বা কয়েকটা টাকা পেলে, কেউ বা পেলে না। কি জন্যে কি নীতিতে গ্রাম লক্ষ্মীশূন্য অন্নহীন হয়ে গেল একদিনের মধ্যে, তা আজও নিতাই জানে না। দু-এক ঘর গৃহস্থ শুধু ধান চাল রাখতে পেরেছিল। তারা ইনিসপেকটার সাহেবের কাছে সেলাম করতে গিয়েছিল। নিতাইরা তাদের কাছেই ধার চেয়ে ক্ষেত বাঁধা দিয়ে আজও মরে নি। নইলে ওরাও গাঁ ছেড়ে যেত না কি? তবু তো মা গেল, ভাই গেল।

দুখানি ইঁট দিয়ে উনান করে লক্ষ্মী বললে, 'কালুকাকা, এইখানেই দুটি ভাতে ভাত করে নাও।' কালু হতবুদ্ধির মত লক্ষ্মীর নির্দেশমত ভাতে ভাত বসিয়ে দিলে ওদেরই গোয়ালে। লক্ষ্মীদের ঘরে সকলের খাওয়া হল। কালুর ভাতে ভাত সিদ্ধ হয়ে গেল। রাত্রি গভীর হয়ে আসতে লাগল। সিধু রোগা মানুষ, তার ঘরের আগল বন্ধ করে লক্ষ্মী বললে, 'কালুকাকা, খেয়ে এসে আজ ওই পাশের ভাঙা ঘরখানায় শোও। বাইরে বড় ঠাণ্ডা। আর রাত করো না!'

দেয়ালে ঠেস দিয়ে কালু মূঢ়ের মত চুপ করে বসে ছিল। শুধু বললে, 'আচ্ছা তুমি শোও গা মা।'

রাত্রি গভীরতর হল। রাত্রি কত প্রহর হল ওরা বোঝে ঘড়ি না দেখেই। কালু নিদ্রাহীন দৃষ্টিহীন চোখে আকাশের সীমান্তে চেয়ে রইল। মনে আসে তিনটি শিশু বালক-বালিকার কথা। গত বছরের কথা, তারপর হবিবের মা, হবিব, ফকির, জমির, বউ, ভাইদের বাড়ির সকলের কথা; সকলেই ছিল তারা। ধান কাটা, ঝাড়া, তোলা, তাদের কত কাজ, কত আনন্দ! চৌধুরী-বাড়ি 'লবান্নর' (নবান্ন) জন্যে নতুন ধান কুটে চাল দিয়ে আসে হবিবের মা। তেনারাও তারে নবান্ন দেয়—কাঁচা চাল দুধ গুড় ফল সন্দেশ, তারা খেয়েছে সকলে। আর এবারে তারা কেউ নেই। ধান? ওরা কাটবে বলেছে। কিন্তু কি করবে কালু ও ধান নিয়ে? কে খাবে? কাদের খাওয়ার জন্যে ও ধান কাটবে? কোন সময় খেঁকিটা কালুর ভাত কটি উনান ঠাণ্ডা হলে খেয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে সেইখানেই ঘুমিয়েছে।

অকস্মাৎ পূর্বদিক রাঙা হয়ে উঠল। কালু সোজা হয়ে বসল। তারপর আস্তে আস্তে দাওয়া থেকে নেমে গেল। সরু পথের দুধারে ওদেরই ক্ষেতের ফলন্ত ভারী ধানের শিষ নুয়ে এসে তার গায়ে লাগে—যেন সাপের স্পর্শের মত তার সর্বাঙ্গ শিউরে

ওঠে। চোখে আকুল হয়ে জল আসে। সে অভিভূতের মত দ্রুতপায়ে ক্ষেতের সীমানা, গ্রামের সীমানা অতিক্রম করে যেতে চায়। কিন্তু কোথায় খুঁজতে যাবে? মহানগরীর মানুষের অরণ্যেই কি কোথাও তারা হারিয়ে গেল? অথবা—? অথবার কথা কালু ভাবতে পারে না। দূরে বহুদূরে মানুষ দেখে। মনে হয়, ওরা কি জানে তাদের কথা, হোক অচেনা, হয়তো জানে। হয়তো ওদের মাঝেই হবিবকে, জমিরকে —একজনকেও দেখতে পাওয়া যাবে।

সরকারী খাদ্য-বিভাগের কর্মচারীরা এসে দেখছিল, কোন গ্রামে কত ধান হয়েছে।

গাছে ঠেস দিয়ে সাইকেল রেখে খাকি স্যুট পরা দু-তিনটি লোক পতিত রুইদাসের ক্ষেতের পাশে এসে দাঁড়াল। এই নতুন ধানের শিষের মত নধর হৃষ্টপুষ্ট গোল সবল চেহারা, পরস্পরের মধ্যে বললে, 'বাঃ, চমৎকার ফসল হয়েছে তো।'

পতিত ধান ঝাড়ছিল, আতঙ্কে তার হাতের কাজ থেমে গেল।

খাকি-পরা একজন জিজ্ঞাসা করলে, 'এ ক্ষেত কার, তোমার?'

সভয়ে পতিত বললে, 'আজ্ঞে।'

'ওটা?' সামনে সিধু মোড়লের ক্ষেতের সামান্য ধান মাপা বাকি ছিল।

ওটা সিদ্ধেশ্বর মোড়লের।

এবারে পতিতের আশেপাশে কয়েকজন জড় হল—নিতাই, লক্ষ্মী, পতিতের ভাই, তার লোকজন।

'আর ওটা? ওটা যে কাটাই হয় নি, কার?'—ঠিক নাকের নীচে কাঁঠালে মাছির মত করে গোঁফ ছাঁটা একজন জিজ্ঞাসা করলে।

নিতাই বললে, 'ওটা কালু শেখদের।'

'কাটে নি যে?'

'তারা হেথায় নেই। তারা চলে গিয়েছিল মন্বন্তরের সময়—' পতিত বললে।

'মস্ত ক্ষেত যে, কতজন তারা?' একজন পকেট থেকে নোটবই পেন্সিল নিয়ে লিখে নিচ্ছিল কি সব।

'তা উনিশ-কুড়ি জন হবে। কালু শেখ, তার বউ, তার চার ছেলে দুই মেয়ে, এক ছেলের বউ, তার ভাই মনি শেখের দুটো পরিবার, তাদের সাত-আটটি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে।'—নিতাই বললে।

আশ্চর্য হয়ে মাছি-গোঁফওয়ালা বললেন, 'কেউ নেই তারা? কেউ ফেরে নি? এত ধান হয়েছে, কাটবে না?'

নিতাই বললে, 'কালু শেখ এসেছিল, চার দিন হল তাকে আর দেখছি না। মনি শেখের মোরা কোন খবর জানি না। বর্ষার সময় গাঁ ছেড়ে চলে গিছল তারা।'

অন্নাভাবে পলাতক মারীতে উজাড় জনহীন গ্রামে তাঁদেরই হাতে রোপণ করা শস্যভারানত ক্ষেত্রের পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই লোকেরা কি সব লিখে লিখে নিতে লাগল।

কালু শেখের সাত বিঘে, মণি শেখের তিন বিঘে, পীতাম্বর কুমোরের দু বিঘে, সরস্বতী মাইতির খানিকটা ক্ষেত, সোনা বাউরীর আর কার সঙ্গে ভাগের ধান-জমি, আরও কার কার সব নাম লেখা হয়ে গেল। শুধু তারা যে কোথায় গেছে বা আছে, লেখা গেল না।

খাকি-পরা তারা জিজ্ঞাসা করলে, 'এদের তোমরা চেন?'

পতিত নিতাই হাতজোড় করে বললে, 'হাঁ বাবু, এক গেরামে বাস ছোটকাল থেকে। চিনি বইকি।'

'বেশ।'

তারপর তারা সাইকেল চড়ে পাশের গ্রামের দিকে চলে গেল। সরু সুঁড়ি পথের আশেপাশে তাদের সামনে পিছনে প্রায় জনশূন্য গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে যাবার পথে সোনার শিষে ভরা ধান নুয়ে নুয়ে পড়তে লাগল। যেন কাদের জন্য তাদের আর মিনতির শেষ নেই।

শনিবারের চিঠি—বৈশাখ, ১৩৫১

ভাত

ভাত ফুটছিল টগবগ করে। আর উনুনে জ্বাল ঠেলে দিচ্ছিল খোকার মা। বনজঙ্গল থেকে সংগ্রহ-করা কাঠকুটো, শুকনো পাতা, নারকেল পাতার বালদো—যা কুড়িয়ে বাড়িয়ে ছেলেমেয়েরা ঘরে এনে রেখেছে।

ঝি চারদিন কামাই করেছে। মা পাঠালেন, যা আজ ডেকে সঙ্গে করে নিয়ে আয়। বাড়ি কাছেই। কাজেই কলেজ থেকে ফিরেই যেতে হল।

খোকার মা আমাকে দেখে অপ্রস্তুত হয়ে গেল। বললে, 'দিদিমণি, পেরথমে হল আমার জ্বর। তারপর খোকাটার জ্বর হল। আজ এই কোলের কচিটার পেট খারাপ হয়েছে—যেতে আর পারি নি। কাল সকালেই যাব।'

আমি বললাম, 'না, আজই একবার চল। সঙ্গে করে নিয়ে যেতে মা বলেছেন। মা আর পারছেন না!'

'তাহলে ভাত কটা নামিয়ে ওদের একমুঠো করে দিয়ে যাই। সকাল থেকে হাঁ

করে বসে আছে কখন খাবে বলে।'

জিজ্ঞাসা করি, 'কেন সকালে রাঁধ নি?'

সে বললে, 'সকালে আর কই রাঁধতে পারি। বাসি পান্তা দুটো খায়।'

কথা কইতে কইতে জ্বাল-ঠেলা ভাল করে হয় নি। ভাতের ফুটটা কমে গিয়েছিল। এবারে আবার সে একরাশ শুকনো পাতা কুটো ঠেলে দিলে উনানে। লাল রঙের ভাতগুলি আবার টগবগ করে ফুটতে লাগলো।

সে বললে, 'আচ্ছা, তুমি বাড়ি যাও দিদিমণি। আমি যাব'খন ঠিক।'

'না, মা বলেছেন, সঙ্গে করে নিয়ে আসিস। অনেক বাসন পড়ে আছে। ক'দিনের জমে আছে।'

দাওয়ার ওপর পিঁড়িতে বসে আমি দেখছি ওর ঘরকন্না।

ঘরের এককোণে একটা মাটির তেলকো, তাতে একটা কেরোসিনের কুপি বসান। তার পাশে পা-ভাঙা একটা ছোট চৌকি ইঁটের ঠেকো দিয়ে পা-টা সোজা করে দেওয়া হয়েছে। তার পাশে একটা জীর্ণ কাঠের সিন্দুক। তার ওপর ছেঁড়া কাঁথা কয়েকটা পাট করে রাখা আছে—একপাশে একখানা মাতুর দাঁড় করানো রয়েছে। তার ওপর একটা দড়ির আলনায় রয়েছে গুটি তিন ছেঁড়া ময়লা জামা—একখানি ছোট ডুরে শাড়ি—ওর মেয়ে সোনার। আর একটি ছেঁড়া হাফ প্যাণ্ট, একখানি ময়লা জীর্ণ শাড়ি, নেকড়া কানি ঝুলছে।

ঘর দেখা হয়ে গেল। ভাবছি কি দিয়ে খাবে। তরকারি তো কুটল না। মাছও নেই। ডালও রাঁধা হয়েছে কিনা দেখতে পাচ্ছি না। আর সব রাঁধতে গেলে তো আরও দেরি হবে। কতক্ষণ বসে থাকব? চলে গেলে হয়তো যাবেই না। জিজ্ঞাসা করলাম, 'আর সব কি রেঁধে রেখেছ—ভাত হচ্ছেই হবে?'

খোকার মা বললে, 'এই যে, এই শাক কটা ভেজে দেব—তাই দিয়েই খাবে।'

'কই শাক? শুধু শাক দিয়ে খাবে? কেন ডাল করনি? মাছ নেই?'

খোকার মা হাসলে, 'মাছ ডাল কোথায় পাব মা। ঐ শাক কটা উঠোনে দিয়েছি, দুটি করে ঐ দিয়েই যা হোক করি। কচুও হয়। ওখানে আছে। ওলও ওঠে মাঝে মাঝে।'

বলি, 'তা হলে দুটি আলু ভাতে দিলে না কেন?'

খোকার মা আবার হাসলে, 'আলু কি করে কিনব মা।'

ভাবি, কেন, আলু তো আট আনা সের, এখন তো তত মাগগি নেই মা'র মুখে শুনি। মাছ না হয় দু-তিন-চার টাকা। চুপ করে রইলাম। ডাল? ডাল কত দর জানি না ঠিক। মা-ই তো সব করেন।

ভাত হয়ে এল। ছেলেরা সবাই কাছাকাছি বসে আছে বড় বড় কচুপাতা পেতে। দু-একখানা এনামেলের কাঁসিও রয়েছে উনুনের কাছে। একপাশে একটা মাটির কড়া আর তার পাশে খানিকটা শাক রয়েছে একটি কচুপাতায়। বড়ছেলে খোকা একটা গামছা প'রে নিয়েছিল আমাকে দেখে। বড় মেয়েটি একটি ছেঁড়া শাড়ির টুকরা পরেছিল। আর তিনটি শিশু একেবারে উলঙ্গ।

ভাত নামল। শাকটা চড়াল মাটির কড়ার ওপর খোকার মা। শীতের বেলা পড়ে আসছে। সাড়ে তিনটে প্রায়। ফেন গালা হল। এক গামলা ফেন।

তাদের মা বললে, 'বোস্ তোরা, আয় এগিয়ে। ঠাণ্ডা হোক ভাতটা।'

একটা লোহার হাতা করে সে ভাত দিল চারখানা পাতায়। কোলেরটিকে ভাত দেবে না, বললে, জ্বর রয়েছে। কিন্তু সে কাঁদতে লাগল। দু' বছরের ছেলে, সে ভাত খায় রোজ, আজও খাবে।

মা বললে, 'কলাই-করা বাটি দুটো পাত—আগে একটু করে গরম ফেন নুন দিয়ে খেয়ে নে। তারপর শাক-ভাজা দিয়ে ভাত খাস।'

আমি বললাম, 'ফেন কেন দিচ্ছ?'

খোখার মা হাসলে, বললে, 'ফেলে দেব মা অত ফেন? আগে ফেনটা খেয়ে নিলে পেটটা ভরবে। ভাত দুটি সকালের জন্যে রাখতে পারব পান্তা করে। আঠার টাকা মণ চাল কিনি তিরিশ সের মাসে। ঘর ভাড়া দিই তিন টাকা। আর নুনটি তেলটি কখনও চুনোমাছ মসলা ডাল আনাজ কিছু কিনি। তোমাদের বাড়িতে পাই ১০ টাকা, আর দু' জায়গায় কাজ করি, পাঁচ-দশ পাই। তাতে ভাতই হয় না, কাপড় জামা কানি তো হয়ই না। পুজোর কাপড় তিনখানাতে আমার হয়, ওদেরটা চেয়েচিন্তে হয়।'

ছেলেদের ভাত ঠাণ্ডা হয়েছে। ফেনটা তারা বিলিতী বইতে পড়া সুপ খাওয়ার মত চুমুক দিয়ে খেয়ে নিলে, একটু নুন দিয়ে। এখন তারা তাকিয়ে আছে কড়ার দিকে, মা'র শাক ভাজা হল কিনা!

হ্যাঁ, শাক সেদ্ধ হয়েছে। উঠোন থেকে দুটো লঙ্কাপাতা এনে একটু তেল ছড়িয়ে দিয়ে মা শাকটা নাড়াচাড় করে নামাল।

মেজ ছেলেটা বললে, 'মা শুধু শাক বিচ্ছিরি!'

'না বাবা বিচ্ছিরি কেন? দেখ্ না কেমন ভাল শাক। ঐ দেখ লাল টুকটুকে রঙ হয়ে গেল দিদির ভাতের। কেমন লাল রঙ দেখ্ না মেখে। সব ভাতগুলি মাখ একেবারে—সব কেমন লাল হয়ে গেল ঐ!'

খোকার মা আমাকে বলল, 'কালকে পুকুরে নাইতে গিয়ে একটা লেটা মাছ কেমন করে খোকা ধরেছিল, তাই কাল একটু রান্না করে দিয়েছিলাম। রোজ কোথায় পাব।

যাদের পুকুর তারা মাছ ধরতে দেখলে বকবে। পান্নু সেই মাছ মনে করে রেখেছে। আজও ভাবছে আছে।'

কলেজে পড়ি। কলেজে ম্যাগাজিনে গল্প কবিতা সবাই লেখে, আমিও লিখি। দুঃখ দারিদ্র্যের কল্পনা করি। পরিকল্পনায় বিলাসও করি। ডিবেটিং ক্লাবে তর্ক করি।

বড় মেয়ে সোনা বললে, 'মা, আর দু'টি ভাত দেবে?'

খোকার মা হাঁড়িটার ভেতর দেখলে। তারপর একমুঠো তুলে দিলে। এবারে খোকা বললে, 'মা, আমাকে দুটি দেবে?'

মা একটু ভেবে বললে, 'আর দেব না। তা হলে সকালে কি খাবি?'

খোকা আর বড় মেয়ে দুজনেই বললে, 'দুটিখানি দাও মা। মোটে পেট ভরে নি।'

আমি বললাম, 'শুধু ভাতই তো খাচ্ছে—তা দাও না আর দু'টি।'

দ্বিধাভরে মা দু'টি করে ভাত আরও দিলে।

ছেলেদের খাওয়া হয়ে গেল। বেলাও পড়ে আসছে।

'চল দিদিমণি, এবারে যাই, ওদের বিছানাটা করে দিই শুয়ে পড়ুক। আমার তো কাজ সেরে আসতে রাত হবে।'

কচুপাতা থেকে চেটেপুটে ভাত খেয়ে সতৃষ্ণভাবে হাঁড়ির দিকে চেয়ে ছেলেমেয়েরা আঁচাতে গেল।

খোকার মা খুব ছেঁড়া কাপড়টি ছেড়ে আলনা থেকে অন্য কাপড়টি নিয়ে পরল। বুঝলাম ওটা তার রাজবেশ।

তারপর ঘরের অন্য দিকে মা গুটানো জীর্ণ মাদুরখানা পাতলে, তার ওপর ছেঁড়া ময়লা দু'খানি কাঁথা পাতলে। তেলচিটে নেকড়ায় বালিস দুটো মাথার কাছে দিলে।

ছেলেমেয়েরা এল। মা বললে, 'সবাই শুয়ে পড়। এবারে আমি কাজে যাই।'

ছোটরা শুলো। বড়রা বললে, 'মা একটু ছবি দেখি—পরে শোব—এখুনি অন্ধকার হলেই শোব। দেখলাম, আমাদের বাড়ি থেকে পুরানো ক্যালেণ্ডার আর কয়েকটি ছবির ক্যাটালগ কুড়িয়ে এনেছে ওর মা। ছবি আছে এঞ্জিনের মেক্যানিকাল কলের সব।

জিজ্ঞাসা করলাম, 'তুমি কোথায় শোবে? ঐ দুটো বালিসে সবারই হবে?'

খোকার মা একমুখ হেসে বললে, 'হ্যাঁ দিদিমণি, ওখানেই আমার জন্যে একটু জায়গা হবে ছোটখোকার পাশে। আর বালিস কোথায় পাব, আর নেই।'

তারপর বেরিয়ে আসতে আসতে তাদের বললে, 'শীত লাগে তো কেঁথাখানা ছোটখোকার গায়ে দিস।' আমাকে বললে, 'বালিস ছিল আর দুটো দিদি। তা

একটা শাউড়ির মাথায় ছিল মরণকালে, গেল। আর একটি গেল ওদের বাপের সঙ্গে। তা আমাদের ওতেই হয়ে যায় দিদিমণি।' আর কিছু বলতে বা ভাবতে কিন্তু আমিও পারছিলাম না। গল্প পড়ি, লিখি, কাব্য করি দরিদ্রকে নিয়ে। কিন্তু কেমন হতবুদ্ধির মত মনে হল নিজেকে এখন।

শুধু মনে হয়, ওর অভাববোধ, দারিদ্র্যবোধ, তার জন্য ক্ষোভ কিছুই নেই। সামনে দিয়ে একটা রিক্সাওয়ালা চলে গেল। তার জামার একটা হাতা আর পিঠটা নেই দেখলাম। একটা কয়লাওয়ালা গেল তার পরিধানে শুধু গামছা। তা হলে এই অনুভূতি বা অভাববোধ কি ওদের কারুরই নেই? জীবনে আজই যেন প্রথম ওদের দেখলাম।

বাড়ি এসে পড়েছি। মা বকবার জন্যে মুখিয়েছিলেন। বললেন, 'এত দেরি করলি? কি করছিলি ওর বাড়িতে বসে? আর খোকার মা, কি কাণ্ড বাছা, এমনি করেই কামাই করে? বোস্, বোস্ বাসনে। আমার প্রাণ গেল চারদিন ধরে। ওকে জল খেতে না দিয়েই তোর কাছে পাঠিয়েছি।'

খোকার মা অপ্রস্তুত মুখে একটু হেসে বাসনে বসল।

মা আমাকে বললেন, 'খাবারও খেয়ে যাস নি, এত দেরি করলি। খাবি আয়।'

লুচি, তরকারি, মিষ্টি—বিকেলের খাবার সাজানো রয়েছে। সব ভাইবোন খেয়ে চলে গেছে।

বললাম, 'সন্ধ্যে তো হয়ে গেছে, এখন খাবার খেলে আর রাত্তিরে ভাত খেতে পারব না, একেবারেই ভাত খাব।'

মা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, 'না হয় রাত করে খাবি।'

'না, কাপড় ছেড়ে আসি। ভাত-খাবার একসঙ্গেই খাব। সন্ধ্যের পরেই খেয়ে পড়তে বসব।'

খোকার মা'র তখন সন্ধ্যের পরেই বাসন মাজা ধোয়া হয়ে গেছে। রান্নাঘর মুছে দিয়ে কাপড় ছেড়ে বাটনা বাটতে আসবে।

আমি খেতে এলাম। বিকালের খাবার লুচি তরকারি এল। রাত্রির জন্য রান্না ভাত ডাল মাছের তরকারি ভাজা চচ্চড়িও পাতে মা দিলেন সাজিয়ে।

খোকার মা বাটনা বাটছে মাথা নিচু করে।

খেতে খেতে মাকে বললাম, 'কত তরকারি, না মা?'

মা বললেন, 'কই আর বেশি? ওঁর তো এতেও কম হবে।'

আমি অন্যমনে তখনকার কথার জবাব দিলাম। বললাম, 'খোকার মা রান্না করছিল তখন, ছেলেদের খাইয়ে শুয়ে এল।

মা করলেন মেয়েলী প্রশ্ন চিরকালের, 'কি রাঁধলি খোকার মা?'

খোকার মা বাটনাই বাটছিল। আমাদের দিকে চাইল। একটু হেসে বললে, 'ঐ তো দিদিমণি দেখে এল—শাকভাজা আর ভাত।'

আমার পাতের ডাল তরকারি মাছভাজা লুচি কি তার চোখে পড়ল? নাঃ। সে আবার বাটনার নোড়ায় মনঃসংযোগ করেছে।

আমি বললাম, 'শুধু লাল শাক আর ভাত করল। ছেলেরা তাই দিয়েই খেল।'

মা বললেন, 'তা আর কি করবে!' (অর্থাৎ ওর ভাগ্য! ওরা ঐ রকমই খায়।) তারপর তাকে বললেন, 'রাত্তিরের রান্না সেরে নিলি বুঝি? তাই এত দেরি হল?'

খোকার মা আবার নোড়া রেখে মুখ ফেরালে। 'আমাদের আর রাত্তির আর দিন মা। ঐ একবারই দুটো সেদ্ধ করি। কয়লা কিনতে পারি না। কোথায় কাঠ, কোথায় কুটো, দুবার উনুন কি জ্বালতে পারি মা?'

'তা হলে রাত্তিরে কি খাবে ওরা?'

একমুখ হেসে খোকার মা বললে, 'রাত্তিরে আর ওরা খায় না মা।'

মা বললেন, 'সে কি রে? কাঁদে না? ক্ষিদে পায় না ঐ চারটে বেলায় খেয়ে?'

খোকার মা তেমনি হেসেই বললে, 'ওরা জানে, 'নোকে' একবারই খায়। রাত্তিরে খেতে হয় ওরা জানে না মা।'

ওর সরল হাসিতে মা যেন বিব্রত হয়ে উঠলেন। খোকার মা আবার হলুদ থেঁতো করতে আরম্ভ করল। আমি অন্যমনস্ক হয়ে ভাত খাচ্ছিলাম। আমার পাতের দিকে চেয়ে মা হঠাৎ বললেন, 'ভালো করে খা, ও কি খাওয়া হচ্ছে? ওতে শরীর স্বাস্থ্য থাকে? একটু দুধ দিয়ে খা না ভাতগুলো, ফেলিস নি অত ভাত।'

আমি চচ্চড়ি দিয়ে ভাত মেখে খাচ্ছিলাম। মনে পড়ল ওদের শাক দিয়ে মাখা লাল ভাতগুলি খাওয়ার কথা। তারপর মনে পড়ল ওরা আর দুটি ভাত চাইল, খোকার মা দিতে পারল না। আমি বলেছিলাম, দাও না—ওদের পেট ভরে নি। খোকার মা বললে, না দিদি পেট ভরেছে ওতেই। ওদের 'আহিক্কে' পেট ভরলেও চাইবে।

মাকে বললাম, 'না খাচ্ছি। ফেলছি না।'

কিন্তু পেট ভ'রে গেছে, আর পারছি না খেতে। ভাবি, কিন্তু, খোকার মা'র ছেলেরা কি করে পেট ভরলেও খেতে পারে? মাকে জিজ্ঞাসা করি, 'আচ্ছা, 'আহিক্কে' কাকে বলে মা?'

মা'র অত কথা যেন আর ভাল লাগছিল না। বললেন, 'কী আবার, খেয়ে নে না শিগ্‌গির করে।' মা'র মনে পড়ছিল কি, ওদের একবারই খাওয়া শুধু শাক দিয়ে। আর

আমার এত প্রাচুর্যের খাওয়া—খোকার মা দেখতে পাচ্ছে কি? মা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন যেন। যদি খোকার মা মুখ তুলে তাকায় আমার থালার দিকে, তেমন ভাবলেন কি? খোকার মা কিন্তু দেখতে পায়ই নি। বাটনাই বাটছিল।

মৃদুস্বরে ভয়ে মা'র মুখের দিকে চেয়ে বললাম, 'মা, একদিন ওর ছেলেদের ডাল তরকারি দিয়ে ভাত খেতে বলবে?'

'আচ্ছা থাম তো', বলে মা এমন ভুরু কুঁচকে চাইলেন, উঠে পড়লাম তাড়াতাড়ি। কথাবার্তা—ফাল্গুন ১৩৬৫

নীল চোখে

মহাকালের মহা নাটকের গর্ভাঙ্কের দৃশ্যপট পরিবর্তন হয়েছে।

হ্যারিসন রোডের ওপর কর্পোরেশনের একটা লরি এসে দাঁড়াল। পথের দুধারে ফুটপাথের ওপর নরনারী শিশু বালক-বালিকাতে ভরা। পাশে ছেঁড়া কাঁথা নেকড়া, হাতে মাটির সরা টিনের মগ এনামেলের বাসন দু-একখানি করে নিয়ে সব বসে আছে। ফ্রী কিচেন, লঙ্গরখানা—গৃহস্থ বাড়িতে অনেকেই খিচুড়ি ভাত ফেন পেয়েছে। কেউবা পায় নি, সন্ধ্যাবেলা পাবে সেই আশায় আছে। মাথার ওপর মধ্যাহ্ন রৌদ্র, রাস্তায় নানা রকম যানবাহন—রিকশা গাড়ি ট্রাম মোটর। ওরা বসে আছে ফুটপাথের ওপর। সংক্ষেপে ওরা ফুটপাথকে বলে 'ফুট'।

'ওরে, নরি আসছে, নরি আসছে'—একটা গোল উঠল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই যে যে পারলে লোকের বাড়ির দেউড়ির মধ্যে, পানের দোকানের নীচের খুপরিতে, সরু গলির মধ্যে লুকিয়ে পড়ল।

বহু বাকি রয়ে গেল, হতবুদ্ধির মত। লরি থেকে দুটো লালপাগড়ী নেমে এল, দু-তিনজন এ আর. পি.র লোকও। তারা হাত ধরে একে একে পথবাসী-পথবাসিনীদের লরিতে তুলতে লাগল।

বালক-বালিকারা উৎফুল্ল হয়ে উঠল, ডাকাডাকি করে, 'ওরে নরিতে চাপবি আয়, আয় শিগগির।'

বিমূঢ় হতবুদ্ধি পুরুষেরা; দু-একজন মেয়ে জিজ্ঞাসা করলে, 'কোথায় নিয়ে যাচ্ছ মোদের? জেলখানায়?'

কেউ উত্তর দেওয়া প্রয়োজন বোধ করলে না। ভয়ে শঙ্কায় আতঙ্কে তারা নির্বাক হয়ে বসে রইল। দ্বিতীয় বার জিজ্ঞাসা করবার ভরসা তাদের নেই। লরি বোঝাই

হয়ে গেল নিরন্ন মানুষে। চলতে আরম্ভ করল। দেখতে দেখতে মহানগরীর পথ শেষ হয়ে গেল। শহরতলীও শেষ হল। লরি থামল।

লাল সৈন্য, কালো সেপাই, তাদের কালো কেরানী কর্মচারী বৈকালিক অবসরটুকু উপভোগ করবার জন্যে বেরিয়েছে। বহুদিন সঙ্গে সঙ্গে থেকে লালকালোতে খানিকটা সহৃদয়তা এসে গেছে। আরও এক যাত্রায় যে পৃথক ফল হবে না, তা তো জানেই।

কেউবা গেছে ময়দানে হাওয়া খেতে; কতক বা ময়দানের সামনের হোটেলে খানা খেতে। কতক যথেচ্ছ ঘুরে বেড়াবার জন্যে শহরতলীর সীমানা ছাড়িয়ে প্রায় জনহীন নিস্তব্ধ গ্রামের উপকণ্ঠে চলে এসেছিল।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘোর হয়ে এসেছে। তিনজন লাল আর দুইজন কালো আপন মনে ঘুরে বেড়াচ্ছিল।

হঠাৎ একজন সাদা বললে, 'এই, দেখ দেখ, ওই ঝোপের তলায় কি একটা নড়ছে।'

বিদেশী মানুষের অজানা ভাষার সাড়া পেয়ে যে নড়ছিল, সে একেবারে স্থির হয়ে গেল। কিন্তু বেশিক্ষণ নয়, তার কোলের শিশুটি চেঁচিয়ে উঠল।

দেশী দুইজন এগিয়ে এল। শিখ বললে, 'কোন্ হ্যায় তুম? বাহার আও।' বাঙালী কেরানী চুপ করে রইল।

যে নড়ছিল, সে বেরিয়ে এল। কোলে অতি শীর্ণকায় একটি শিশু, ছ মাসেরও মনে করা যায়, দু বছরেরও মনে হতে পারে। পাশে একটি বালক জননীর অঞ্চল দৃঢ়-মুষ্টিতে ধরে।

সকলে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। প্রশ্ন করবার মত নানা কথা মনে আসতে লাগল সকলের। কোথায় বাড়ি, কেন এই ঝোপের তলায় বসে আছে, রাত্রি একটু গভীর হলেই শেয়াল কুকুর ছিঁড়ে খেতে আসবে শিশুটিকে।

শীর্ণ জননী সভয়ে সকলের মুখের দিকে চাইছিল।

এবারে বাঙালী জিজ্ঞাসা করলে, 'কোথা থেকে এসেছ তুমি? এই ঝোপের মধ্যে রাত্রি কাটাবে কি করে? শেয়ালে যে ছিঁড়ে খাবে তোমার ছেলেদের। গাঁয়ে যাচ্ছ না কেন?'

বাংলা কথা বোধহয় তার মনে ভরসা এনে দিয়েছিল। সে বললে, 'গাঁ তো আমাদের এখানে নয় বাবু, অনেক দূরে। পাঁশকুড়ো ইস্টিশন থেকেও আরও খানিক গিয়ে।'

'তা অত দূর থেকে এখানে কেন? সেই দেশেই কাছাকাছি কোথাও থাকলে পারতে।'—কেরানী বললে।

'খেতে পেলাম না বাবু। ঘরে যা ধান ছিল, তা সরকারী লোকেরা নিয়ে গেল, যে ট্যাকা ধরে দিলে তা মহাজনে নিয়ে নিলে। ভাবলাম, আউশ ধান হলে ঘরে ত্বটো খেতে পাব। তাও ভেসে গেল, হেজে গেল।'

'তুমি একালই এসেছ?'—আশ্চর্য হয়ে কেরানী জিজ্ঞাসা করলে।

'না বাবু, ভাই ছিল, সোয়ামী ছিল, গেরামের লোক আরও সব ছিল। তাদের সবাইকে নিয়ে ওই হোগলা কুঁড়েয় তুলেছিল।—' হঠাৎ সন্দিগ্ধভাবে সে চুপ করে গেল।

কেরানী জিজ্ঞাসা করলে, 'তারপর? তারা গেল কোথা?'

এবার মেয়েটি কেঁদে ফেললে। বললে, 'ভাইয়ের পেটের অসুখ করল জোয়ারি সেদ্ধ খেয়ে, তারপর পা ফুলে উঠল। সোয়ামী জ্বরে পড়েছিল। তা তেনাদের ডাক্তার এসেছিল। সোয়ামী বললে, মোদের ত্বটি ভাত দিতে বলুন না মশাই, এমন বাজরা-জোয়ারি খেলে ছেলেগুলানও বাঁচবে না, মোরাও মরে যাব। তা তেনার পাশে যাঁরা দাঁড়িয়ে ছিল, তেনারা বললে, ভাত কোথায় পাব? আর মরবিই তো আজ নয় কাল। বাঁচবি নাকি?'

মেয়েটি চোখ মুছতে লাগল। শিখও উৎসুকভাবে শুনছিল, বিশেষ বুঝতে পারে নি কিছু।

কেরানী চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল। গোরারা জিজ্ঞাসা করলে, 'ব্যাপার কি?' কেরানী সংক্ষেপে কাহিনীটা বিবৃত করলে।

গোরাগুলো নীল চোখে জীর্ণবাসাবৃত কঙ্কালসার-দেহ কালো জননী ও তার শিশুদের দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে রইল, তারপর হঠাৎ একজন পকেট খুঁজে চারখানা বিস্কুট বের করলে, অন্যেরাও কেউ চকোলেট কেউ বিস্কুট যা ছিল বের করে হাত বাড়িয়ে দিলে।

বালকটি এগিয়ে এসে নিলে। ক্ষুধার্ত জননী তার হাত থেকে ত্বখানা ছিনিয়ে একটি কোলের শিশুর হাতে দিলে, একটি নিজের মুখে পুরলে।

পশ্চিম আকাশে শেষ লাল আভাটুকুও মিলিয়ে এল। প্রহর-ঘোষণাকারীর প্রথম প্রহর ঘোষণার সময় হয়ে এল।

কেরানী বললে, 'তা তোমার ভাই আর সোয়ামী গেল কোথায়? রাত্রে এই বনের মধ্যে থাকবে কি করে?'

মেয়েটি বললে, 'তেনাদের কথা শুনে সোয়ামী বললে, বাতাসী, তুই পেলিয়ে গিয়ে ভক্ষে-শিক্ষে করে যেন খাইয়ে ভাত খাইয়ে ছেলে ত্বডারে বাঁচা। এখানে থাকলে ওরা মরে যাবে! বেঁচে থাকি, আবার দেখা হবে। আমি পেলিয়ে এলাম।

কিন্তক ওদের নরি মোদের দেখতে পেলেই তুলে নিচ্ছে। তাই লুকিয়ে লুকিয়ে থাকছি।'

করবার কিছু ছিল না আর। গোরারা চিন্তিত মুখে শিস দিতে দিতে ক্যাম্পের দিকে ফিরল। বাঙালী আর শিখ নীরবে আসতে লাগল।

এরা পাঁচজন প্রায় একসঙ্গেই ঘোরে।

কয়েক দিন পরে সেই বনের পথে তাদের সম্মুখে এসে দাঁড়াল একটি বুভুক্ষু বালক। সঙ্কোচে ভয়ে সাহসে দ্বিধা ভাবে সে সুমুখে এসে দাঁড়াল তাদের। বললে, 'সায়েব, একটা বিস্কুট দেবে?'

ভাষা না বুঝে সকলেই তার পানে অবাক হয়ে চাইল।

শুধু বাঙালী কেরানী তার পকেট থেকে কি একটু বের করে দিলে। দেখাদেখি অন্য সকলেও যা ছিল বার করলে।

বাঙালী একটু দেখে তাকে জিজ্ঞাসা করলে, 'তোর মা আর ভাই কোথায়? তুই একলা ঘুরছিস?'

বালক কেঁদে ফেললে। বললে, 'পরশু ভাইডারে শেয়ালে টেনে নিয়ে গেছে। মা'র জ্বর হয়েছিল, ঘুমিয়ে পড়িছিল। তারপরে মা শেয়ালের পেছনে ছুটল! মোকে বললে, ফেলা, তুই শহরে পেলিয়ে যা, আমি খোকাডারে নিয়ে আসতেছি।'

ছটি নীল চোখ আর দু জোড়া কালো চোখ তার দিকে চেয়ে ছিল। আন্দাজে যেন সব বোঝা গিয়েছিল। তবু তারা উৎসুকভাবে বাঙালীর দিকে চাইলে। কেরানী শুধু বললে, 'ওর ভাইকে শেয়ালে নিয়ে গেছে, মা খুঁজতে গিয়ে আর ফেরে নি। তোমরা ক্যাম্পে যাও, আমি একে কোথাও রেখে আসছি।'

সারি সারি খাট পাতা। এক এক করে সব শুয়ে পড়বার যোগাড় করছে। কেরানী ফিরে এল।

একজন নীলচোখ জিজ্ঞাসা করলে, 'রেখে এসেছ?' কেরানী ঘাড় নাড়লে।

শিখটি বললে, 'আমরা হলে এমন করে মরতুম না। যেমন করে হোক বাঁচবার চেষ্টা করতাম।'

ওরা সরকারের সমাদৃত সৈন্যের জাত; মারবার ভরসাও রাখে, হাতিয়ারও রাখে, তাই মেজাজও রাখে।

আর একজন নীলচোখ শিস দিচ্ছিল নিজের মনে, সে বললে, 'ঠিক বলেছ। এ রকম ইঁদুরের মত মৃত্যু,—আমাদের দেশ হলে গবর্মেণ্ট উল্টে যেত। বিপ্লব হয়ে

যেত। তোমরা কি ?'

কেরানী জামা-কাপড় ছাড়ল, ফিরে দাঁড়াল, ক্যাম্পের আলো পড়ল মুখে, তারা কালো চোখ জ্বলে উঠল যেন।

তারপর সে আবার পিছন ফিরলে। র‍্যাকের ওপর কোট টাঙাতে টাঙাতে শুধু বললে, 'দেশ তো আমাদের নয়, তাই ওরা পোকা-মাকড়ের মত মরছে।'

তাঁবুর সমস্ত নীলচোখ-কালোচোখের দৃষ্টি এবারে নত হয়ে গেল। স্বাধীন দেশের বিপ্লবী সৈনিক-মন, পরাধীন শিখের বাহুবল-আস্ফালন অপ্রতিভ হয়ে গেল যেন কেরানীর ওই কথাতে।

খুন লুট বিপ্লব কিছুই হয় নি কোনখানে।

কিন্তু মহানগরীর পথে আর বুভুক্ষিতেরা নেই। আদিম একান্ত প্রথমতম প্রয়োজন—শুধু বেঁচে থাকবার জন্যে ফেন চেয়ে, ভাত চেয়ে, কখনও ছেঁড়া কানি নেকড়া চেয়ে, স্বচ্ছন্দ চাকুরেদের, ধনী অধিবাসীদের, গৃহস্থদের, প্রবাসী আগন্তুকদের, বিদেশী পর্যটকদের, বিভিন্ন দেশের দর্শকদের আর তারা শান্তি ভঙ্গ করে না, চোখের সুমুখে দাঁড়ায় না। সরকারী ব্যবস্থায় নগরপ্রত্যন্তসীমায় লঙ্গরখানায় তারা বিনামূল্যে জোয়ার-বাজরার খাদ্যাখাদ্য খাচ্ছে। দু-চার দিন সহ্য হচ্ছে, তারপর পেটের অসুখে ভুগে ভুগে হাত-পা ফুলে উঠছে। তারপর ?

বিজ্ঞজনেরা বলছেন, মৃত্যু ওদের অনিবার্য, আজ নয় কাল হবেই।

শনিবারের চিঠি—অগ্রহায়ণ, ১৩৫০

টিনের মাংস

এ গাড়িখানা প্যাসেঞ্জার, যাতে থার্ড ক্লাস থেকে সকল ক্লাসেই অনুচিত ও যথোচিত যাত্রী ঠাসা ও ভরা। এখানা অতি সসম্ভ্রমে স্টেশনের প্ল্যাটফর্মের সোজা পাশের লাইনটা ছেড়ে দিয়ে একটা সাইডিঙের লাইনে সঙ্কুচিতভাবে বহুক্ষণ থেকে দাঁড়িয়েছিল !

অনেকক্ষণ পরে একখানা গাড়ি আসার আভাস দেখা গেল, সিগন্যালটা পড়ল। 'পাখা পড়েছে' বলে জন তিন-চার কুলি একটু নড়েচড়ে বেড়াল।

দেখতে দেখতে একখানা প্রকাণ্ড লম্বা মিলিটারি গাড়ি এসে পড়ল। লালচে চুল নীল চোখওয়ালা সাদা সাদা অসংখ্য মুখ, আর জানলা ভরে সুন্দর সুস্থ সামঞ্জস্যময়

শরীর দেখা যেতে লাগল।

ক্রমে রুগ্ন সৈন্য, বিকলাঙ্গ সেনা, সবল সহজ সেপাইয়ের গাড়ি একে একে দাঁড়াল। প্যাসেঞ্জারের যাত্রীদের দৃষ্টির পথ পার হয়ে গেল। তারপর আসতে লাগল রেশনের গাড়ি অর্থাৎ ভাঁড়ারের গাড়ি, রান্নার গাড়ি, তারপর রন্ধনকারী কালো সেবকদের গাড়ি, তারপর কয়লার গাড়ি ইত্যাদি। গাড়ি যেন আর শেষ হয় না।

বহুক্ষণ নির্বিকার বসে থেকে থেকে প্যাসেঞ্জার গাড়িখানার ঘুম এসে গেল যেন। হঠাৎ বহু সমবেত গলায় চেঁচামেচি হৈ হৈ শুনে সে-গাড়ির সকলে সচকিত হয়ে মুখ বাড়াল জানলা থেকে। দেখা গেল মিলিটারি গাড়ির দু'ধারে অসংখ্য কণ্ঠের গোলমাল। কালো কালো জীর্ণশীর্ণ-তনু যত ভিখারী নিরন্ন যেখানে যা ছিল, সকলে এসে দাঁড়িয়েছে—ঐ গাড়িটার জানলার পাশে পাশে। খানিক আগেও এই গাড়িটার পাশে ওদের দেখা গিয়েছিল। কিন্তু অত জন ওরা কোথায় ছিল, আর কেমন করে বা এখনি এসে জুটল। আর নির্ভয়ে চীৎকার করছে গোরাদের জানলার পাশে। লাল মুখকে ভয় নেই, গাড়ির তলায় পডবার আতঙ্ক নেই, পিছনের লাইনে অন্য গাড়ি এসে পড়বার কথাও ভাবছে না। কিসের ভিড়, কি জন্য ওরা দাঁড়িয়ে, দেখবার জন্য এ গাডির সকলেই ঝুঁকে ঝুঁকে দেখতে লাগল।

বেশি ঝুঁকতে হল না, গোরাদের জানলা থেকে রুটি, বিস্কুট, কাগজে মোড়া ভুক্তাবশিষ্ট মাংস, কলা, কমলালেবু, নানা রকম খাদ্যের ছোট ছোট টিন ঝুপঝুপ্ করে তাদের দিকে পড়তে লাগল, দেখতে পাওয়া গেল।

কুখাদ্য ভোজন, অনশন ও আসন্ন মৃত্যুর শেষ ধাপে পৌঁছে আর আজ তাদের গোরাদের সঙ্কোচ বা সৈন্যদের কোনো ভয় নেই। অনায়াসে বিশীর্ণমুখে ভিক্ষা চাইছে, গোলমাল করছে। আর গাড়িভরা নীল চোখ অদ্ভুত কৌতূহলের সঙ্গে আশ্চর্যভাবে সমবেদনাভরে তাদের দিকে চেয়ে আছে। হয়ত তারা ভাবছিল, এই উষর মাটির মত বিবর্ণ রঙের কঙ্কালসার দেহের জীবদের কি মানুষ বলা হয়? অথবা এরা মানুষ নয়। ভারতবর্ষের অসংখ্য প্রকার জীবজন্তুদের মত এরাও এক রকম জীব। হয়ত তেমনি ধারাই কারুর বা এরা খাদ্য! কিন্তু ওই শীর্ণ কঙ্কালরা কারুর খাদক কি না কে জানে!

কিছু খাদ্য সংগ্রহ করে এল কয়েকজন। দুজনের হাতে দুটি টিন। প্যাসেঞ্জার গাড়িখানার বিসর্পিত ছায়ায় কয়েকজন এসে বসল।

একজন টিনের ভেতরে দেখে বললে, 'ভাই এডা কি?'

অপরজন নিজের হাতের টিনের সবটুকু মুখটা খোলবার চেষ্টায় ছিল। সে বললে, 'খায়ে ছাখ না, মুই কি জানি?'

অপরজন মুখ দিয়ে বললে, 'মনে লাগে মাংস ঝ্যানো।'

'ওনারা তো মাংসই খায়—গোরা সিপুইরা।'

যে মাংস খেয়েছিল, সে টিনটা হাত থেকে মাটিতে রাখল, তারপর বললে, 'ভাই কিসের মাংস হবি?'

অন্যজন নিজের টিনের ভিতরের খাদ্য নিয়ে ব্যস্ত ছিল। সে বিরক্ত ভাবে বললে, 'তা কে জানে?'

যে মাংস খেয়েছিল সে চুপ করে শুয়ে পড়ল ক্লান্ত ভাবে, আর খেল না! এ নিজের টিন থেকে খেতে আরম্ভ করেছিল, বললে, 'শুলি যে, খায়ে ফ্যাল? কুকুরে নিয়ে যাবে, ওই দেখ্ কুকুর।'

যে শুয়েছিল সে বললে, 'নিক'।

অন্যজন বললে, 'ক্যানো, কুকুরকে দিবি ক্যানো? খা-না, দে—মোরে, খাই।'

সে নির্লিপ্তভাবে দিয়ে দিল টিনটা, বললে, 'খা।'

এ আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, 'কি হল তোর, ক' না কেনে?'

এবারে এর চোখ থেকে জল পড়তে লাগল, বললে, 'ভাই মাংসটা কিসের বটে! সাহেবরা তো সব মাংস খায়।'

অন্যজন খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, 'তুই হিঁদু?'

এ চোখ বুজেই বললে, 'হ্যাঁ।'

এবারে অন্যজন একটু দূরে সরে বসল, তারপর একটু পরে বললে, 'বাই, আমি তো মোছলমান।'

এ আশ্চর্য হয়ে উঠে বসল, তারপর আবার শুয়ে পড়ল। কিছুই বললে না।

কিন্তু মুসলমানটিও আর খেল না। বহুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, 'বাই, ওরা ত হারামও খায়। মুইও তো খ্যায়েছি ওদের টিনের মাংস।'

মিলিটারি গাড়ি চলে গেছে। লাইন খালি হয়ে গেছে। এবারে প্যাসেঞ্জারখানাও তার দীর্ঘ বিসর্পিল দেহ নিয়ে এক লাইনে এগিয়ে এল। ভিখারীরা যে যেখানে পারে চলে গেছে। প্যাসেঞ্জার গাড়ির ছায়াতলে আশ্রিত হিন্দু-মুসলমান দুজনেরই গায়ে অপরাহ্ন রোদের সমস্তটা এসে পড়ল।

রৌদ্রের তাপে তারা এবারে সচকিত হয়ে উঠে বসল। দেখলে মাংসের টিন দুটো তাদের পাশে নেই। কুকুরে নিয়ে গেছে বোধ হয়।

দু'জনেই উঠে দাঁড়াল। কিছু দূরে একটা গাছের ছায়ায় গিয়ে বসল। বহুক্ষণ পরে সহসা হিন্দুটি বললে, 'ভাই, ভিখিরীর আর জাতধর্ম কোথা? মোরা তো ভিখিরীই হয়েছি বটে।'

ক্ষুধিত ক্লান্ত মুসলমান নীরবে তার দিকে চেয়ে রইল শুধু। হয়ত বহুদূরস্থিত নিজেদের দেশ, স্বজন ও গ্রামের কথা তার মনে পড়ল। কিন্তু গ্রামে কি আর কেউই বেঁচে আছে? অথবা সে আর কোনোদিন ফিরে যেতে পারবে?

প্রবাসী—ভাদ্র, ১৩৫১

রক্তের ফোঁটা

স্থান স্বর্গ।

স্বর্গে এখনও যেতে পারি নি সুতরাং সে যে কিরকম জায়গা বলতে পারা শক্ত।

তবু দেখতে পাচ্ছি অপূর্ব স্বর্গ তোরণের ভিতর দিকে মর্তভূমির মতই একখানি ছোট দড়ির খাটিয়া পাতা রয়েছে। মহাত্মা গান্ধী সেই খাটিয়ার ওপর বসে নবজীবনের প্রুফ দেখছেন। সেটা মর্তে আসবে কি স্বর্গের প্রচারের জন্য তা আমরা জানি না, পাশে তক্লীটি রাখা আছে। তাঁর সামনে স্বর্গীয় তালপাতার তৈরী চাটাই বিছানো। তাতে বসে আছেন মৌলানা আবুল কালাম আজাদ সাহেব, রফি আমেদ কিদওয়াই সাহেব, প্যাটেলজীরা দু'ভাই, রাজেন্দ্রপ্রসাদ এবং সরোজিনী নাইডু, আরও অনেকে।

সামনে স্বর্গীয় আলোয় বিভাসিত বৃক্ষলতা বিস্তৃত প্রাঙ্গণ। আঙিনার একদিকে দুটি দুগ্ধবতী ছাগী বাঁধা রয়েছে। তার কাছাকাছি এক জায়গায় কস্তুরবা গান্ধীর বৈকালিক জলযোগের খেজুর মনাক্কা বেছে ভিজিয়ে সাজিয়ে রাখছেন।

সহসা তোরণ দ্বারের শিখরে দুন্দুভি বেজে উঠল।

সকলে চকিত দৃষ্টিতে তোরণ পথে চাইলেন। কে এল? কে আসছেন? বিশিষ্ট মানুষ কার মৃত্যু হল?

পণ্ডিত জহরলাল নেহরু এসে দাঁড়ালেন। গান্ধীজীকে নমস্তে জানালেন। হাসিমুখে গান্ধীজী চোখ তুললেন, 'ও তুমি! তুমিও চলে এলে?'

নেহরু বললেন, 'হ্যাঁ আসতে হল।'

গান্ধীজী। 'তা বেশ। তা সব খবর ভালো তো? বোস।'

পণ্ডিতজী। 'হ্যাঁ তা ভালোই সব একরকম। তবে—' একটু চুপ করে রইলেন।

গান্ধীজী। 'তবে কি? কোনও গোলমাল নেই তো দেশে? কোনও কষ্ট নেই তো?'

নেহরু অপ্রস্তুতভাবে বললেন, 'না, তা কিছু নয়। এই বড় ধার-দেনা করে ফেলেছি।'

গান্ধীজী এবারে তকলীতে সুতা কাটছেন।

পৃথিবীর সতেরো বছরের মাস দিন বছরের হিসাব স্বর্গের হিসাবে অন্য রকম। মর্তের সব খবরও সেখানে কেউ মরে গেলে পৌঁছয় তখন। খবরের কাগজের স্তূপও সেখানে পৌঁছয় না।

গান্ধীজী তাঁকে বললেন, 'বোস। তা ধার—ধার করতে গেলে কেন? ব্রিটিশ আমলে তো ধার ছিল না এত!'

বিব্রতভাবে জহরলাল বললেন, 'এইসব বড় বড় প্ল্যানিং পরিকল্পনা নিয়ে বড় বড় বাড়ি প্রাসাদ অট্টালিকা আর অনেক কারখানা বাঁধ করে বড় ধার হয়ে গেছে। এখনও হচ্ছে।'

গান্ধীজী স্মিতমুখে তার পরম প্রিয় শিষ্যের বিব্রত মুখের দিকে একটু চেয়ে রইলেন। তারপর বললেন, 'তা ধার হয়েছে হোক। তা মানুষের অন্ন-বস্ত্রের শিক্ষার ব্যবস্থা করেছ তো? স্বাধীন ভারতের কামনা আমাদের।'

পণ্ডিতজী অপ্রস্তুতভাবে বললেন, 'না সেটা ঠিক পেরে উঠি নি এখনও। দেশকে উন্নত করতে গেলে বড় খরচ তো। অন্য সব ধনী সমৃদ্ধ দেশের সঙ্গে সমানভাবে দাঁড়াবার চেষ্টা আগে করেছিলাম। তাই—'

গান্ধীজী বললেন, 'তা বেশ। তা ওরা খেতে-পরতে পাচ্ছে তো?'

পণ্ডিতজী। 'তা ঠিক আমি জানি না। খাদ্যমন্ত্রীরা জানেন।'

চারিদিকে তাকালেন। খাদ্যমন্ত্রীরা কেউ স্বর্গে আসেন নি। এখনও মর্তেই রয়েছেন। অবশ্য রফি আমেদ কিদওয়াই সাহেব ছিলেন।

পণ্ডিতজী বললেন, 'আর মন্ত্রী অনেক হয়ে গেছে। রাজ্যও অনেক হয়েছে, বড় খরচ সেজন্যেও হচ্ছে তাদের পিছনে। আর আপনিও তো বলেছিলেন মন্ত্রীদের ঠাট মর্যাদা বজায় রাখার জন্য মাইনে বাড়ানো হোক, সেই ইংরাজ আমলের 'পাঁচশ' টাকায় আর কেউ কাজ করতে চায় না। স্ট্যাণ্ডার্ড অব লিভিং বেড়েছে তো!'

গান্ধীজী নীরব, ভাবলেন কি সেটা ব্রিটিশকে ধাপ্পা দেওয়া হয়েছিল ত্যাগ স্বীকারের? না সত্য ছিল সেটা?

মাথা নীচু করে গান্ধীজী অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন। চোখে একটু জল এল বুঝি।

তারপর বললেন, 'তাহলে তোমরা গরিবদের জন্য কিছুই করতে পার নি? আর শিক্ষা? তা প্যাটেল রাজেন্দ্রপ্রসাদ তোমরা তো উঁচু পদে ছিলে—তোমরাও আমার মত ভাব নি? আগে তো গরিবদের কথা ভাবতে? সত্যাগ্রহী ছিলে যখন? বারদৌলী চম্পারণে?—'

শিক্ষা-অন্ন প্রশ্নে সকলেই নীরব রইলেন। তবু প্যাটেলজীরা নড়েচড়ে বসলেন। বল্লভভাই প্যাটেল বললেন, 'আমি তো দেশীয় রাজ্যগুলো রিপাব্লিক করেই স্বর্গে চলে এলাম। মানে মরে গেলাম। রাজেন্দ্রপ্রসাদ অনেকদিন ছিল বটে।' পণ্ডিতজীর নাম করলেন না।

গান্ধীজী। তা দেশীয় রাজ্যের প্রজারা জমি-জায়গা পেল তো? না এখনও কিছু হয় নি?

সকলেই নতশির নীরব।

অতঃপর রাজেন্দ্রপ্রসাদ অপ্রতিভভাবে বললেন, 'বাপুজী, ভেবেছিলাম কিছু করব। কিন্তু বড়লাট কিম্বা রাষ্ট্রপতি হলে বড্ড বক্তৃতা, বিদেশ যাওয়া, স্যালিউট নেওয়া এই সব করতে হয়! বড় ঝামেলা। এসব করা তো কম কাজ নয়। বহু অতিথিও আসেন। তারপর নিজের ছেলেমেয়েদের জন্যও কিছু করতে হল। বুড়ো বয়সের সে ভাবনা—। ওদের দাঁড় করিয়ে দিতে হল।...কত সেবককে...'

গান্ধীজী। আর জহর তুমি?

জহরলাল বিব্রতভাবে নীরব।

'কত কোটি ধার করেছ? কারা শোধ করবে? কবে করবে? এই নিরন্ন গরিব দেশে!'

'সেটা অর্থমন্ত্রী ঠিক বলতে পারবেন। তা তিনি তো মর্তেই রয়েছেন এখন।'

সহসা দেখা গেল গান্ধীজীর বুকের গুলির সেই ক্ষতের দাগ থেকে ফোঁটা ফোঁটা করে রক্ত পড়ছে।

জহরলাল এগিয়ে এলেন, 'বাপুজী, একি? আপনার বন্দুকের গুলির সেই আঘাত সতের বছরেও শুকোয় নি? ধন্বন্তরীজী কি দেখেন নি?'

গান্ধীজী একটু চুপ করে রইলেন।

তারপর বললেন, 'ও ঘা সেই গুলির নয়—'৪৮ সালের।'

সকলে অবাক হয়ে বললেন, 'সে কি? ও ক্ষত তবে কি করে হল?'

গান্ধীজী এবার কোন কথা বললেন না। ওঁরা সকলে নীরব হয়ে রইলেন।

দেবরাজ ইন্দ্র খবর পেয়ে ধন্বন্তরীকে অশ্বিনীকুমারদের পাঠালেন।

গান্ধীজী হাতের তকলী রাখলেন। ছোট খাটিয়াটিতে শুলেন।

ধন্বন্তরি আর অশ্বিনীকুমারদ্বয় ক্ষত পরীক্ষা করলেন। বিশল্যকরণীর, অস্থিসঞ্চারিণীর ব্যবস্থা করে দিলেন অশ্বিনীকুমাররা।

ধন্বন্তরি বললেন, 'এ-ক্ষত দুটি অনেক ভিতরের। গডসের গুলির ক্ষত নয়। আমি ওষুধ পাঠাচ্ছি এখনি।'

বৈদ্যরাজরা চলে গেলেন।

সকলে চিন্তিত ও নীরব। জহরলাল আবার বললেন, 'কিসের ক্ষত এ বাপুজী?'

এবারে গান্ধীজী কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললেন, 'এ-ক্ষত একটি দেশ বিভাগের। আর একটি আমি চিরকালের জন্য দেশবাসীর কাছে মিথ্যাবাদী হয়ে গেলাম। তাদের 'রামরাজ্য' হবে বলেছিলাম। সেই মিথ্যার আঘাতের ক্ষত!'

সকলে নতশির স্তব্ধ। রক্ত ফোঁটায় ফোঁটায় পড়তে লাগল। কস্তুরবা মুছিয়ে দেন। তবু আবার ফুটে ওঠে।

বসুমতী—৩০শে কার্তিক, ১৩৭২

—শেষ—